উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৭তম বর্ষ
(১৩৬১ মাঘ হইতে ১৩৬২ পৌষ)

সম্পাদক
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩ ৷

ষিক মূল্য ৫৲ প্রতি সংখ্যা ॥০

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(বর্ণানুক্রমিক)

মাঘ, ১৩৬১ হইতে পৌষ, ১৩৬২

উদ্বোধন

পথ

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো

মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।

তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ

স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ॥

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪।৪।৮

যুগযুগান্তর হইতে প্রসৃত পুরাতন বহুবিস্তৃত পন্থা—বহুজ্ঞানীজনসেবিত অতিসূক্ষ্ম মুক্তিমার্গ! সেই সুদুর্লভ পথ আমায় আসিয়া স্পর্শ করিল। পলকে চমক লাগিল, সুচিরকালের তিমির বিদীর্ণ করিয়া শত আলোক ঝলকিয়া উঠিল। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা টুটিয়া গেল, সংশয় দূর হইল, সকল মোহ, সকল দৈন্য, সকল ভয় শূন্যে লয় পাইল। পথকে বরণ করিয়াছি, চিনিয়াছি, উহা ধরিয়া জীবনের পরমলক্ষ্যে নিশ্চিতরূপে পৌঁছিয়াছি। মানবজন্ম সার্থক, সকল আকাঙ্খা, সকল চেষ্টা, সকল তৃপ্তি পরিপূর্ণ।

আত্মসত্যকে আবিষ্কারের, আত্মসত্যে বিশ্বসত্য নিরীক্ষণের রাজপথ শুধু আমারই পথ নয়, সকল কালের সকল সত্যকামীদেরও পথ। দুর্বিজ্ঞেয় হইলেও সেই সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার মার্গ তাহার অকুণ্ঠ আহ্বান মানবমাত্রের প্রতি প্রসারিত করিতেছে। এস, চাও, চলো, বস্তুলাভ করিয়া ধন্য হও—ইহাই তাহার মর্মবাণী। যুগ যুগ ধরিয়া কত শত সাধক, সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, চলিয়া এই জীবনেই পরম ও চরম শ্রেয়কে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৃহত্তম সত্যের উপর দাঁড়াইয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। আবার, এই জীবনের পরে সেই সত্যেরই সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিয়া চিরতরে মিশিয়া গিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

৫৭তম বর্ষের প্রারম্ভে

উদ্বোধনের নূতনবর্ষে আমরা সহৃদয় পাঠক-মণ্ডলী, লেখক-লেখিকা এবং শুভার্থিগণকে হৃদয়ের আন্তরিক প্রীতি জানাইয়া আমাদের ব্রতে ও কার্যে সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'বর্তমান সমস্যা'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের আদর্শ নির্ণয় করিয়াছিলেন—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য—"এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা"—প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা, ত্যাগ, সত্ত্বগুণ—পাশ্চাত্যের 'উদ্যম··স্বাধীনতা-প্রিয়তা ··· আত্মনির্ভর···অটল ধৈর্য···কার্যকারিতা একতাবন্ধন ··· উন্নতিতৃষ্ণা।" ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্য ও সুপ্রাচীন সংস্কৃতি যাহাতে বর্তমান বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন রূপ ও শক্তি লইয়া আমাদের চিন্তা ও কর্মকে জীবন্তভাবে স্পর্শ ও নিয়ন্ত্রিত করে ইহাই আমাদের লক্ষ্য। প্রাচীনকে অন্ধভাবে আমরা অনুসরণ করিব না—উহার মধ্যে যাহা শাশ্বত, সকলের কল্যাণকর, তাহাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিব, বহুশতাব্দীর ঘটনা-বিপর্যয়ে উহার ভিতর যাহা "দুর্বল, দোষযুক্ত, মরণশীল"-রূপে সঞ্চিত হইয়া ও ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্ষতিসাধন করিতেছে তাহা যদি কালের দাবিতে ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতে দুঃখিত বা ভীত হইব না। পক্ষান্তরে নূতনকেও সর্বতোভাবে বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার মোহ আমাদের যেন না থাকে। আমাদের দৃষ্টি হইবে গভীর, . বিবেক সদাজাগ্রত, বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তবেই আমরা বাঁচিবার মতো বাঁচিতে পারিব—শুধু খাওয়া-পরার বাঁচা নয়—উচ্চতম সত্য, উদারতম প্রেম ও শক্তি লইয়া বাঁচা। সেই বাঁচা শুধু আমাদেরই জন্য নয়, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত ভারতেতর দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর জন্যও।

অবিচলিত বিশ্বাস লইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন—

"মানুষকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করা—পশুস্তরের মানুষকে দেবমানবে পরিণত করা—এই মহান্ জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমাদের দেশমাতৃকা সম্রাজ্ঞীর মতোই ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। স্বর্গে বা মর্ত্যে এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহার গতি প্রতিরোধ করতে পারে।"

এই উক্তির সময় হইতে আজ প্রায় ষাট বৎসর পরে ভারতবর্ষে এবং বাহিরের দুনিয়ায় তাঁহার বিশ্বাসের প্রতিকূল অনেক কিছু ঘটিতে থাকিলেও বিবেকানন্দ-দৃষ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে যে ধীরে ধীরে বাস্তব হইয়া উঠিতেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ভারতবর্ষ বারংবার যে আজ আন্তর্জাতিক দরবারে বিভিন্ন জাতির মনোযোগ ও সমাদর আকর্ষণ করিতেছে তাহা কি তাহার সামরিক শক্তি বা শিল্পসমৃদ্ধির জন্য, না তাহার জাতীয়জীবনের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য—সত্য ও মৈত্রীসাধনার জন্য?

কিন্তু আত্মশ্লাঘার সময় এখনও আসে নাই। ভারতবাসীর প্রত্যেককেই এখন অতন্দ্রিত কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অকম্পিত সাহস, ধৈর্য এবং উদ্যম লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়া চলিব—ভারতকে যথার্থভাবে চিনিয়া, সুসঙ্গতভাবে তুলিয়া, ভারতের শক্তি ও শান্তিদ্বারা বিশ্বের দুর্বলতা ও অশান্তি দূর করিবার পথে।

জন্মদিনে স্মরণীয়

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার, স্বামী বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্মদিন। প্রতিবৎসর দেশের নানাস্থানে বিভিন্ন জনমণ্ডলী তাঁহার স্মরণোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন, এবারও করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই উৎসব-গুলির আকার এক 'পুরাতন মৃত শ্রদ্ধার পাত্রে'র

প্রতি একটি সাময়িক আবেগ এবং 'ভক্তির পূজা' মাত্রে পর্যবসিত হয়। আমরা ভুলিয়া যাই স্বামীজী অতীত ইতিহাসেরই একটি আলোড়নকারী চরিত্র মাত্র নন্—সৃজ্যমান বর্তমান ইতিহাসেরও একটি জীবন্ত প্রেরণাদায়ক শক্তি। একদিন বিবেকানন্দের অগ্নি-বাণী ভারতের যুবশক্তিকে দেশের জন্য আত্ম-বিসর্জন করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। আজ স্বাধীন ভারতেও তাঁহার বাণীর প্রয়োজনীয়তা ফুরায় নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের প্রেরণাই বিবেক-বাণীর সর্বমর্ম নয়—অংশমাত্র। স্বাধীনতালাভ যে সম্মুখযাত্রার একটি ধাপমাত্র তাহা আজ দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনায়কগণও বুঝিতেছেন ও ঘোষণা করিতেছেন। পরের ধাপ—অনেকগুলি ধাপ। এই ধাপগুলি লইয়া দেশের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত লোকের বহু গবেষণা, বহু সুচিন্তা-দুশ্চিন্তা, আশা-নিরাশা, আবেদন-আন্দোলন দেখা যাইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা এই বিষয়ে আমাদের কর্মধারার অনেক বিমূঢ়তা কাটাইতে সাহায্য করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। রাষ্ট্রে ও সমাজে একদিকে যে গতানুগতিকতা ও অন্যদিকে যে উষ্ণ প্রতিক্রিয়া বর্তমান কালে আমাদের চিত্তে বিষম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতেছে সেই দ্বন্দ্ব দূর করিবার সঙ্কেত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের জাতির জনক (Father of the nation) শুধু একজনমাত্র নন্—বহু কর্মী, মনীষী, জ্ঞান-তাপস বর্তমান ভারতের স্রষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। জাতির সেই সকল জনকদিগকে কাচের ঘরে সাজাইয়া রাখিবার দিন এখনও আসে নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে—আমাদের সমস্যা-সমূহের সমাধানের সময় তাঁহাদের উপদেশ হইতে আলোক খুঁজিতে হইবে। বিশেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ আমাদের চিন্তায় ও কর্মে গভীর এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসর এই পৃথিবীতে ছিলেন। এই স্বল্প-পরিমিত জীবনে তাঁহার মধ্যে যে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল উহাও যেমন বহুমুখীন, তাঁহার কথিত এবং লিখিত বাণীর বিষয়-বৈচিত্র্যও সেইরূপই বিস্ময়কর। এই কারণে স্বামীজীর চরিত্রের একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকা বা ধারণা করা যেমন সুকঠিন সেইরূপ তাঁহার বিভিন্ন উক্তির মধ্যে নিঃসন্দিগ্ধ সামঞ্জস্য আবিষ্কার করাও অনেকেরই পক্ষে দুঃসাধ্য মনে হয়। তাঁহাকে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় জ্ঞান-ভক্তি-যোগমার্গে সিদ্ধ একজন প্রখরবৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হইতে পারে, আবার সমাজকল্যাণৈকলক্ষ্য, জনগণের ইহলৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানতৎপর আত্মবিস্মৃত দেশসেবকের চিত্রও তাঁহার মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও মনে হয়, স্বামীজী একজন গভীর তত্ত্বদ্রষ্টা দার্শনিক, আবার কখনও মনে হয় তিনি অপূর্ব দূরদর্শিতাসম্পন্ন একজন সমাজবিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষাবিদ্। অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে পান সনাতন হিন্দুধর্মের একজন অতি-নিষ্ঠাবান তেজস্বী প্রতিনিধি, অনেকে আবার মনে করিতে পারেন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত হিন্দুধর্ম সনাতন পন্থা হইতে অনেক দূর সরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার বিদেশিনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এবং জয়া (মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউড্) সাক্ষ্য দেন 'ভারত' 'ভারত' বলিতে তাঁহাদের আচার্যদেবের মুখমণ্ডলে অন্তরের কী গভীর আবেগ ফুটিয়া উঠিত! সেই বিবেকানন্দকেই আবার অনেকক্ষেত্রে একজন প্রকৃত বিশ্বমানব (Citizen of the world) মনে হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। যখন তিনি চীনের কথা বলিতেছেন, জাপানীদের জীবনধারা, শিক্ষা, কর্মোদ্যমের বিশ্লেষণ করিতেছেন, ইয়োরোপের হৃৎস্পন্দন ঐতিহাসিকের প্রজ্ঞা দিয়া অনুভব করিতেছেন, আমেরিকান সমাজের সর্বস্তরে তাহা-দেরই একজন হইয়া মিশিতেছেন, মিশরের, তুরস্কের,

গ্রীসের ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছেন, তখন কে বলিবে বিবেকানন্দ শুধু ভারতবাসী, তাঁহার দৃষ্টি শুধু ভারতের কল্যাণ দেখিয়াই পরিতৃপ্ত ?

তথাপি স্বামীজীর চরিত্রের এই বিভিন্ন দিক্‌গুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র নিশ্চিতই আছে। ঐ বিভিন্ন চিত্রগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ নিশ্চিতই নয়।

যখন স্বামীজীকে বলিতে শুনি—"আগামী পঞ্চাশৎ বৎসর ধরিয়া পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েকবর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন —এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি। ··প্রথম পূজা বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা।" (মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা—'ভারতের ভবিষ্যৎ') তখন প্রশ্ন জাগে এই ব্যক্তিই ভক্তি, জ্ঞান, তপস্যা, বৈরাগ্যের কথা অন্যত্র অত উদাত্ত কণ্ঠে কি করিয়া বলিয়াছিলেন? কোন সময়ে স্বামীজী প্রাচীন ভারতের মহিমাকীর্তনে ভরপুর, আবার কখনও বা প্রাচীন বহু রীতিনীতির তীব্র সমালোচনায় তৎপর; একসময়ে তাঁহার কথার মধ্যে পাই পাশ্চাত্ত্য সমাজ, শিক্ষা, বিজ্ঞানের উদ্বেল প্রশংসা, অপর সময়ে দেখি ভোগোন্মুখ প্রতীচ্য সভ্যতার অসারতা সম্বন্ধে নির্ভীক ঘোষণা।

তবুও এই সকল আপাত-বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি নিবিড় সামঞ্জস্য যে নাই একথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'-নামক প্রবন্ধে স্বামীজী ভারতবর্ষের যে ভাবী উন্নতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন উহা কোন একদেশী সংপ্রাপ্তিকে অবলম্বন করিয়া নয়—উহা একটি সর্বাঙ্গীণ পরিবিস্তার—অশন-বসন, নিরাপদ বাস, স্বাস্থ্য শিক্ষা শিল্পসমৃদ্ধি তো বটেই—সামাজিক স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য এবং সর্বোপরি ধর্মের জীবন্ত অনুভূতিও উহার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার মতে ভবিষ্যতের এই সমুন্নত ভারত হইবে মানবেতিহাসের একটি অভিনব সত্য। প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব ধারায় নিজ আদর্শের অগ্রগতি লাভ করে। ভারতেরও অগ্রগতির একটি স্বকীয়তা থাকিবে—তাহা ইংলণ্ডের সহিত মিলিবে না, আমেরিকা, চীন, জাপান বা রাশিয়ার সহিতও মিলিবে না। এক জাতিকে অপর জাতির আদর্শে পুরাপুরি ঢালাই করিতে গেলে ঐ জাতির প্রাণশক্তিই ব্যাহত, এমন কি বিনষ্ট হয়—স্বামীজী বার বার এই সতর্কবাণী দেশবাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ হইতে অনেক শিখিবে কিন্তু 'পাশ্চাত্ত্য' বনিয়া যাইবে না।

ভারতের সমস্যার অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্যের জন্যই স্বামী বিবেকানন্দকে বহুবিধ কথা বলিতে হইয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকটিই সত্য, কোনটির সহিত কোনটির বিরোধ নাই। ভারতের জাগতিক উন্নতি তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে বিনাশ করিয়া দণ্ডায়মান হইবে না। ভারত তাহার শিল্পবিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, কিন্তু তাহার ঈশ্বরবিশ্বাস পূজার্চনা ধ্যানধারণাকে বর্জন করিয়া নয়। প্রাচীন স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের গ্লানিমুক্ত হইয়া ভারতে এক বলিষ্ঠ সমাজ গড়িয়া উঠিবে কিন্তু সেই সমাজ-রীতিতে থাকিবে না উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিবেক, ভোগসর্বস্বতা। ভারতের সমস্যাগুলির এইরূপ এক সমন্বিত সমাধানই আমরা খুঁজিয়া পাইব স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে। ভারতের ভাবী আদর্শ মানুষের চরিত্রও হইবে এক সমন্বিত চরিত্র—বহুতর বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য-মণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। এইরূপ চরিত্রও আকাশ-কল্পনা নয়—বাস্তব সত্য। স্বামী বিবেকানন্দই তাহার প্রমাণ। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছিলেন—"কালে ভারতে হাজার হাজার বিবেকানন্দের আবির্ভাব হবে।" এই ইঙ্গিতের কি কোন গূঢ় তাৎপর্য নাই ?

হৃদয়ের পরিবর্তন

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৫।২) উপাখ্যানচ্ছলে বলিতেছেন,—দেবতা, মানুষ এবং অসুর, প্রজাপতির এই অপত্যত্রয় একবার তাঁহার নিকট পর পর গিয়া ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করে। দেবতাদিগকে তিনি বলিলেন,—'দ', দেবতারা বুঝিলেন পিতার সংক্ষিপ্ত উপদেশের মর্ম হইতেছে, 'দাম্যত'—"প্রবৃত্তি দমন কর।" অসুরগণের প্রতিও প্রজাপতি উচ্চারণ করিলেন,—'দ'। তাঁহাদের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই পিতার বাণীর নিষ্কর্ষ হইতেছে, 'দয়ধ্বম্'—"দয়া কর।" মনুষ্যগণ প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও তিনি বলিলেন, 'দ'। তাঁহারা ধরিতে পারিলেন ইহার অর্থ হইতেছে, 'দত্ত'—"দান কর।" আচার্য শঙ্কর এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন —'স্বভাবতো লুব্ধা যূয়ম্, অতো যথাশক্তি সংবিভজত' —"তোমরা মানুষ, স্বভাবতই ধনতৃষ্ণাসম্পন্ন, অতএব সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আত্মবিকাশের জন্য তোমাদের আচরণীয় ধর্ম হইতেছে যথাশক্তি ধনের সংবিভাগ।"

দানরূপ মানবধর্ম বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণাদির মধ্য দিয়া বহু সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্মধারায় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। এই দানকে ভারতীয় সমাজ কিন্তু প্রধানতঃ ব্যক্তিমুখ (Subjective) ধর্মানুশীলনরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত। দান কেন? না—নিজের আত্মার উন্নতি, পুণ্যসঞ্চয়, ইহলোকে তৃপ্তি, পরলোকে সুখলাভ ইত্যাদি। বহুসংখ্যক ব্যক্তির দানদ্বারা সমাজের একটি বস্তুগত (Objective) ব্যাপক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রমাণ ইতিহাসে বোধহয় খুব বেশী নাই। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয়-মানসের দানধর্মের প্রেরণা বস্তুগতভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে ভারতের বহু প্রান্তের বহু বিত্তবানদের দ্বারে দ্বারে দেশের অবহেলিত সর্বহারাদের দুঃখ-নিবারণের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কেহ কেহ সাড়া দিয়াছিল, অনেকেই দেয় নাই।

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর, পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর।...আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

(মান্দ্রাজী যুবক-বন্ধুগণকে লিখিত পত্র, ইয়োকোহামা —১০ই জুলাই, ১৮৯৩

স্বামীজী প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন 'হৃদয়ের পরিবর্তন' আনয়ন করা সত্যই কঠিন কথা। তথাপি তিনি দানধর্মের প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টায় বিরতি দেন নাই। মহীশূরের মহারাজাকে আমেরিকা হইতে লিখিয়াছিলেন (চিকাগো, ২৩শে জুন, ১৮৯৪)—

"হে মহামনাঃ রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে! * * * ঈশ্বর করুন, আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ দীনহীন সন্তানের জন্য কাঁদে, ইহাই প্রার্থনা।

ভারতে ফিরিয়া তিনি একাধিক বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট মনুকে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন "এই কলিযুগে একটি কর্ম মানুষের করিবার আছে। আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় কোন ফল হয় না। এখন দানই একমাত্র কর্ম।* ধর্মদান—বিদ্যাদান—প্রাণদান—অন্নদান।" স্বামীজীর দানধর্মের অনুশীলনের আবেদন শুধু দাতার ব্যক্তিগত তৃপ্তি বা পুণ্যলাভের আবেদন নয়—বস্তুগতভাবে দেশের দুঃখমোচন ছিল ঐ আবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইদানীং আচার্য বিনোবা ভাবে মানুষের হৃদয়ে দানধর্মের প্রেরণা বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি

* তপঃ পরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥
মনুসংহিতা—১।৮৬

'অহিংস বিপ্লব' সৃষ্টি করিবার আশা রাখিতেছেন। তাঁহার চিন্তা ও কর্মপ্রণালীকে অনেকে সমর্থন করিতেছেন, অনেকে উহার সাফল্যে সন্দিহান হইতেছেন। শেষোক্তদের মতে মানুষের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ব্যষ্টিগতভাবে এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড ভাবে খানিকটা হয় বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেশ জুড়িয়া একটি বিরাট বস্তুগত কার্যোদ্ধারের (যেমন ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন) জন্য মানুষের স্বেচ্ছাকৃত দানধর্মের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। রাষ্ট্রের, বিশেষতঃ জনকল্যাণরাষ্ট্রের শক্তিকেই (এই শক্তি অহিংস হওয়া কঠিন নয়) এখানে অবলম্বন করা বিধেয়। সে যাহাই হউক, আচার্য বিনোবা ভাবের প্রচারের দ্বারা বিত্তবানদের চিত্তে একটি আত্মজিজ্ঞাসা যে উঠিবে, উপনিষদোক্ত লোকপিতা প্রজাপতির উপদেশের কথা মনে পড়িবে এবং কিছু কিছু হৃদয়ের পরিবর্তনও যে আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্মতিথি

পৌষ সংখ্যায় আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের কয়েকটি জন্মতিথির তারিখ জানাইয়াছি। পরবর্তী কয়েকটি তারিখ নিম্নে দেওয়া হইল—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ)—মাঘী শুক্লা দ্বিতীয়া, ১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী, '৫৫), মঙ্গলবার।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ—মাঘী শুক্লা চতুর্থী, ১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ—মাঘী পূর্ণিমা, ২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী), সোমবার।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

খ্রীঃ ১৯১৬ সালে কালীপূজার পর মঠ থেকে ৺কাশীধাম যাওয়ার পথে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ মিহিজামে নামেন। চন্দননগরের ভূষণ বাবুদের বাড়ী আমরা উঠলাম। তার পরদিন রাত্রের গাড়ীতে যাওয়া হবে। সকালে বেড়াতে বেড়াতে মহাপুরুষ মহারাজের সহিত বাবুরাম মহারাজও মিহিজাম ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন; সেখানে একজন খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম তিনি মহাপুরুষ মহারাজের পূর্বপরিচিত। দুজনে করমর্দন করলেন, বাবুরাম মহারাজ এমনি নমস্কার করলেন। মহাপুরুষ মহারাজ মিশনারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলেন?" তিনি বললেন, "নিকটবর্তী এক পল্লীতে অসুস্থদের ঔষধের ব্যবস্থার জন্য," ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে বাইবেলের কথা উঠলো। মিশনারী ভদ্রলোক বেশ বাংলা জানেন, প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ষ্টেশন মাষ্টার ওয়েটিং রুম থেকে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। নিম্নোক্ত কথোপকথন চলেছিল :—

মহাপুরুষ মহারাজ। বাইবেলে বিশ্বাস, ভালবাসা ও ত্যাগ এই তিনটে খুব ভগবান্ দেখিয়েছেন। এসব আমাদের শাস্ত্রেও তো আছে।

মিশনারী। আমি Sacred Book of the East Series থেকে উপনিষদ্ পড়েছি, তাতে ঐ সব কথাই আছে, কিন্তু প্রভু খ্রীষ্টের জীবনে সেগুলো যেরূপ অভিব্যক্ত—বিশ্বাস, ভালবাসা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা—এরূপ জগতে আর কখনও দেখা যায় নি।

বাবুরাম মহারাজ। গঙ্গার ধারে কিছুদিন পূর্বে একজন রামকৃষ্ণ বলে সাধু ছিলেন জানেন?

মিশনারী। তাঁর নাম ও তপস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি। তবে ভাল করে তাঁর সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করিনি।

বাবুরাম মহারাজ। একবার পড়ে দেখবেন। ওই ওঁরই আর এক রূপ।

মহাপুরুষ মহারাজ। বাইবেলে জ্ঞানের কথাও আছে, যেমন সেণ্টজনে শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব। আবার খ্রীষ্ট নিজেকে পরম পিতার সঙ্গে এক করেছেন, সকলকে তাঁর মতো পূর্ণ হতে বলছেন। তবে পিতৃ-ভাব, দাস্য-ভাবটাই খুব প্রকট, অন্যান্য ভাবের প্রকাশ তেমন বোঝা যায় না।

মিশনারী। তিনি শুধু নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি, তিনি সকলেরই পূর্ণত্ব স্বীকার করেছেন, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." —(Mathew ch. V. 48)। খ্রীষ্টান সেণ্টস্‌দের মধ্যেও কেউ কেউ "Word" কে মাতৃভাবে উপাসনা করেছেন। ব্যাম্বিনো বা বেবি ক্রাইষ্টের বাৎসল্যভাবের উপাসনাও আছে। মধুরভাবের উপাসনাও খ্রীষ্টজগতে অনেক সময় খুব পরিস্ফুট দেখা যায়। আপনারা বোধ হয় রসেটির মেরি ম্যাগডেলেন পড়েছেন?

বলে তিনি আবৃত্তি করলেন, "O loose me! Seest thou not···ইত্যাদি। এখানে তার অনুবাদ দেওয়া হল—

"তোমরা ছাড়িয়া দাও মোরে!
দেখিছ না, প্রিয়তম মুখখানি সম্মুখে আমার!
　　　　আমারে করিছে আকর্ষণ!
তাহার চরণ তরে তৃষ্ণার্ত চুম্বন,
চঞ্চল কুন্তলদাম, নয়নের অশ্রুধারা
　　　　আজি মোর মাগিতেছে সে যে!
উহুঃ—হুঃ বাক্য কি বলিতে পারে সেই দেশ কাল
যে দেখিবে মোরে—জড়ায়ে ধরেছি তার রক্তাক্ত চরণ!
সে যে মোরে চায়, তার প্রয়োজন মোরে!
সকরুণে ডাকিছে আমায়, সে যে মোরে ভালবাসিয়াছে!
　　　　তোমরা যাইতে দাও মোরে!"

বাবুরাম মহারাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসব হিন্দু আইডিয়া। তবে এসকলেরও পরাকাষ্ঠা আমাদের চণ্ডীদাসে আছে—

"তরুণ মুরলী করিল পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইনু কি করিবে দোসর পরে॥"
"পহেলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল।
না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥"

জীব যখন সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ করে, তখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই হয়ে যায়—নির্বাধ, নিরুপাধিক ; সে পরমানন্দে আবার স্ত্রী-পুরুষ উপাধি কি করে থাকবে ?

* * * *

সেই বার কাশীতে একদিন বাবুরাম মহারাজ দাউজীর (দাদাজী-বলরাম) মন্দির দেখতে গেলেন, সঙ্গে আমি, যোগী (কৈবল্যানন্দ) ও বলাইদা (অবধূতানন্দ)। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, সেবাশ্রমের কাছেই। এমন সুন্দর মূর্তি ও হাসি খুবই কম দেখা যায়। এখানে আমাদের আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা গোপনে জপধ্যান করতে আসেন, বিশেষতঃ চারু বাবু (স্বামী শুভানন্দ)। জুঁই, বেল, মল্লিকার ঝাড় চারি পাশে। এখানে আবার টোল আছে, বিদ্যার্থীদের থাকবার ছোট ছোট ঘর। ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি মোটামুটি পড়া হয়, বিদ্যার্থীরা খেতেও পায়। বাবুরাম মহারাজ একখানা বেঞ্চিতে বসে বলতে লাগলেন—

"এসব হিন্দু আমলের প্রাচীন ঠাট কেবল বজায় আছে। শাস্ত্র, পণ্ডিত, বিদ্যার্থীদের প্রতি রাজা-রাজড়া হতে সাধারণ লোকের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই, কারণ সংস্কৃতভাষার দ্বারা এখন আর অন্নসংস্থান হয় না, কারণ ম্লেচ্ছ রাজ্য, তাদের ভাষা ও শাস্ত্র না পড়লে চাকরি বাকরি পাওয়া যায় না, তার রাজ্য চালায় তাদের ভাষা ও শাস্ত্র দিয়ে, এতে ভারতের মূল সনাতন অনুশীলন একেবারে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একটা পণ্ডিতের মাইনে ৩০৲, ৪০৲ টাকা, কিন্তু একটা প্রফেসারের মাইনে ১৫০৲, ২০০৲—৪০০৲ ৫০০৲ টাকা—কে সংস্কৃত পড়বে ? বা দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে এসে সংস্কৃতের পুষ্টিসাধন কোরে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কার দায় পড়েছে ? ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীন যা কিছু সব নষ্ট করা, ভুল প্রমাণ করা, প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানকে পুষ্ট কোরে তোলা নয়,—এর নামে হচ্ছে রিসার্চ। এইটে সিদ্ধ হলেই প্রাচ্যের পাশ্চাত্যের নিকট শিষ্যত্ব কায়েমী হয়। এ বিদ্যা গঠনমূলক একেবারেই নয়, এ হলো ধ্বংসাত্মক নীতি। স্বামীজী শেষদিন আমাকে বলে গেলেন, যাতে প্রাচীন ধারা বজায় থাকে, অথচ নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানেরও তার সহিত অনুশীলন হয়, এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার জন্য। বেলুড় গাঁয়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখালেন, 'এই সব জমি নিয়ে এখানে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' এ সব টোলে বড় জোর দু-চারটে গোঁড়া পুরুত ঠাকুর তৈরী হতে পারে যাতে 'জনেউ' (পৈতা) 'সাদির' (বিবাহের) ঠাটটা বজায় থাকে। আবার এ সব পুরুতরা নীচ জাতির যজনযাজন করে না, তা হলে জাত যাবে, পতিত ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। এতে যে কি ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হচ্ছে এই অদূরদর্শী বামুনরা তার কিছুই বুঝতে পারছে না ; এরা ইংরেজী শিখে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র হিন্দুজগতের মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াবে। স্বামীজী ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করতে বলেন নি, পরন্তু সমস্ত জাতটাকে ব্রাহ্মণদের সদাচার এবং শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ কোরে তুলতে বলেছেন। তিনি যে শূদ্রজাতির আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যাদের ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে সেবা-ধর্ম বেদান্তের ভিত্তিতে তারা আধুনিক অপদার্থ শূদ্র নয়, তাদের নবীন রূপ হবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমবায়ে এক অভূতপূর্ব জাতি, যাদের ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক মান হবে স্বামীজী প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণাদর্শভিত্তিতে। সেই আদর্শ 'হংস' জাতি গড়ে তোলবার ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজী তোদের ওপর ; এ আদর্শ সুসম্পন্ন যদি করতে পারিস তো ফের সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। আর সে হবেই। স্বামীজী বলতেন, 'ঠাকুরের পাদস্পর্শে ধীরে ধীরে সত্যযুগের আবির্ভাব হচ্ছে ; তবে তার মধ্যকার ব্যাপারটা অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরী হবে।' বড় কাজ কি আর একদিনে হয় ?"

পল্লী ও নগর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জন্মেছিলাম পাড়াগাঁয়ে সুখেই ছিলাম বেশ।
আশেপাশেই দশখানা গাঁই ছিল আমার দেশ।
জানতাম না দালানকোঠা যানবাহনের ঘটা,
বিজলি-আলোর ছটা।
তৃপ্ত ছিলাম পল্লীমায়ের দানে,
তৃপ্ত ছিলাম শ্যামল শোভায় পাখীর, বাঁশীর গানে।
ছিলাম দুধে-ভাতে,
দিনের অন্ন প্রসাদ হ'ত আঙট্‌কলার পাতে।
সুলভ ছিল আনন্দ আহ্লাদ,
যা পেয়েছি তাই দিয়েছে সুধার মত স্বাদ।
আমার আদুল পিঠে
পৌষপ্রভাতের রৌদ্রখানি লাগ্‌ত বড়ই মিঠে।
বোশেখ মাসে বট-অশথের ছায়া
জুড়িয়ে দিত কায়া।
জুড়িয়ে দিত দিনের দাহ দীঘির কালো জল,
লাগ্‌ত মধুর ক্ষেত-বাগানের অম্লকষায় ফল।
অনাবৃত অঙ্গে শীতল পরশ দিত বায়ু।
বাড়িয়ে দিত আমার পরমায়ু।
আট্‌কা কোথাও পড়্‌তনাক চাঁদনী রাতের আলো।
নয়নে তার স্নিগ্ধ পরশ লাগ্‌ত বড়ই ভালো।
হ'তনা কি পদে পদে মান্‌তে নিষেধ মানা,
এর বেশি কি কাম্য আছে ছিল না মোর জানা।
পড়্‌তাম মহাগ্রন্থখানা আকাশ পটে লেখা,
সন্ধ্যা প্রাতে গ্রন্থকারের সঙ্গে হ'ত দেখা।
নগরমাঝে আনলে মোরে, বিদ্যাজ্ঞানের দেবি,
কি লাভ হ'ল তোমার চরণ সেবি?
কণ্ঠে আমার পরায়েছ অগ্নিকণার মালা।
হৃদয় আমার পুড়্‌ছে তা যে জুড়ায় না তার জ্বালা।

কেবল আমি ভাবি,
পেলাম না হায় প্রাপ্য আমার, মিট্‌লো না মোর দাবি।
সত্য বটে, অনেক কিছু জেনেছি এই ভবে,
দেহের সাথে সব ফুরাবে সঙ্গী কে আর হবে?
অনেক কিছু পেলাম বটে যায় না ত আফ্‌শোস,
হারিয়েছি আসল জিনিস শান্তি ও সন্তোষ।
সবায় ঘৃণা করতে শেখায় জ্ঞানের অভিমান,
দেখি কখন ছেড়ে গেছেন আমার ভগবান।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনালোকে নারীর অধিকার*

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী

শ্রীশ্রীমাকে আমরা দেখতে পাই তিনি গরীবের ঘরে, পাড়াগায়ে জন্মেছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ব্রাহ্মণদম্পতীর ঘর আলোকরে কন্যারূপে লীলা করেছিলেন, বিবাহ যদিও ৫ বছর বয়সে হয়েছিল তথাপি তিনি ১৪ বছর বয়সের আগে বধূরূপে ঘর করতে আসেন নি; যখন এলেন, তারপর থেকে যতদিন শ্বশুরঘর করলেন, আমরা দেখি কোথাও তাঁর আচরণে এতটুকু খুঁত নেই—যেমন শাশুড়ীর সেবায়, পরিজনের অভাবমোচনে, সখীস্থানীয়া লক্ষ্মীদিদির সাথে সাহচর্যে, স্নেহের পাত্র ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্রীগণের সস্নেহ পরিচর্যায়; আর স্বামীর তো কথাই নেই, তিনি একাধারে গুরু, দেবতা, অভিন্ন-হৃদয় পতি—দেবদম্পতীর কামগন্ধহীন দেহাতীত অপূর্ব সম্বন্ধ সেখানে। তারপরে তিনি এলেন দক্ষিণেশ্বরে—ভগবতী এলেন সাধিকারূপে সাধকের সহধর্মিণী হয়ে। "আমি তোমার সহায় হতে এসেছি" শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের বাণী। ১৮ বছরের মেয়ে তার অক্ষুণ্ণ অধিকারে যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে নিজের স্থান করে নিলেন, কেউ বাধা দিতে পারলো না। কোন্ শক্তির সাধ্য আছে এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? যে চেষ্টা করবে সেই যে চূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ অধিকার নিয়ে কোন মারামারি নেই। সেই ছোট্ট অপরিসর ন'বত ঘরে নিজের অপরিসীম মহিমায় সকল অসুবিধাকে আনন্দময় করে সুবিধায় পরিণত করেছেন—সকলের জন্যে; শাশুড়ী, স্বামী, ভক্ত-মেয়েরা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তছেলেরা সকলকে যোগ্যভাবে পরিবেশন করেছেন—তাঁর মাতৃহৃদয়ের অনুপম অমৃত। ঠাকুর তাঁকে ফল-হারিণী কালীপূজার রাত্রে ষোড়শীপূজা করলেন, তাঁর চরণে তাঁর সকল সাধনার ফল পূর্ণরূপে জপের মালা সহ নিবেদন করে দিলেন, কিন্তু সেই মহীয়সী নারী যাঁর মধ্যে মহাশক্তি বিরাজমানা, তিনি একটুও টললেন না; এত বড় মান পেয়েও তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যের তালিকা একচুলও এদিক ওদিক হ'লো না, সবই ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট-পথে, তাঁর হৃদয়ে যে 'অনন্দের পূর্ণঘট' বসানো ছিল তারই আলোকে আলোকিত হয়ে অমৃতময় হয়ে সকলকে আনন্দ বিতরণ করতে লাগলো। তারপরে ঠাকুরের গলার অসুখ, কাশীপুরের বাগানে চলে

* আনন্দ আশ্রম (নাকতলা) মাতৃ-মঙ্গলসমিতির ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

এলেন চিকিৎসার জন্যে; ঠাকুরের দিক্‌পাল ছেলেরা, যাঁরা ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ গড়ে তুলবেন, সব চলে এলেন তাঁর সেবার জন্য ঘরবাড়ী ছেড়ে; কিন্তু এ সকলের পিছনে থেকে, অলক্ষ্যে থেকে যিনি শক্তি যোগাচ্ছিলেন, তিনিই শ্রীমা, নিজের মহিমায় মহিমময়ী, পরিপূর্ণ দীপ্তিতে দীপ্তিময়ী, সকল শক্তির আধার। তাঁকে না হলে কিছুই চলে না—একদিন তিনি ঠাকুরের জন্যে সুজির পায়েস নিয়ে নীচের তলা থেকে ওপরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মাথাঘুরে পড়ে গেলেন; পায়েস তো নষ্ট হ'লোই ঠাকুরের একমাত্র খাদ্য তখন, অধিকন্তু নিজেও আঘাত পেলেন। ঠাকুর কিন্তু রসিকতা করে, হাত ঘুরিয়ে নথের অনুকরণ করে বললেন "ওযে পড়ে গেলো, এইবার আমার খাওয়ার কি হবে?" রসিকতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন এই যে অভাববোধ এ কত বড়, কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে! শুধু ঠাকুরের নয় তাঁর দেবর্ষি ছেলেদের খাওয়াদাওয়াও তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠতো—চলতো না তা না হ'লে—মাকে না হ'লে ছেলেদেরও চলতো না। তাঁরা তখন যুগাবতারের সেবা ও নিজেদের সাধনা নিয়ে রয়েছেন. মাতৃহৃদয়ের অমৃত না হলে শরীর তখন থাকতো কি?

তারপরে ঠাকুরের শরীর গেল। শ্রীমতীর বিরহ মূর্ত হয়ে দেখা দিল আবার এ যুগে, কিন্তু তার মধ্যেও অসীম ধৈর্যের প্রতিমা এ তীর্থে ও তীর্থে ঘুরে দয়িতের স্পর্শলাভ করছেন, তাঁর বাণী শুনছেন. দেখছেন তাঁকে, এ যুগের লীলায় আরো যে কটা দিন বাকি আছে, তারই মধ্যে তাঁকে করতে হবে ঠাকুরের আরব্ধ কার্যকে প্রাণবন্ত, সূক্ষ্মকে করতে হবে স্থূলে প্রকাশিত, অলক্ষ্যে থেকে অপরাজেয় শক্তিতে গড়ে তুলতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, মা হয়ে জগজ্জননী হয়ে তাপদগ্ধ জীবের জ্বালা জুড়াতে হবে, মাতৃহৃদয়ের অনুপম অমৃত পরিবেশন করে—আচণ্ডালে, গুরু হয়ে মন্ত্রদান করতে হবে—মুক্তির পথ খুলে দিতে-হবে সন্তানের, বদ্ধজীব, সে জানে না কিসের মোহে ঘুমিয়ে আছে সে, তাকে জাগিয়ে দিতে হবে, মা ছাড়া কে পারবে জাগাতে? প্রচণ্ড আঘাতে সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে, কে সেই অবোধ শিশুকে বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দেবে, স্নেহের রসধারায় তার তৃষিত শুষ্ক চিত্তকে সঞ্জীবিত কোরবে? আর কে হতে পারবে সেই মা, মুক্তিদায়িনী মহাশক্তিরূপিণী জননী সারদা ছাড়া—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনার ভাবঘন বিগ্রহ? ভগিনী নিবেদিতার কথায় তিনিই ভারতীয় রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরমকথা।

এসব কথা আপনারা সকলেই হয়তো পড়েছেন। কমাস ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন ভাবধারার ভিতর দিয়ে কত রূপে কত আলোচনা, কত বক্তৃতা হয়েছে, কত দৈনিক, মাসিক, ও সাপ্তাহিকে তাঁর কথা মনোজ্ঞ ভাষায় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রবন্ধাকারে বের হয়েছে—আপনারা সকলেই পড়েছেন, শুনেছেন, আলোচনা করেছেন, কোন কোন ভাগ্যবতী হয়তো ধ্যানে বসে অন্তর্লোকে সে মহিমময় জীবনের এতটুকুও ধারণা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের আজকের এই প্রবন্ধ মায়ের জীবনী আলোচনা করবার জন্য শুধু নয়, আজ আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর জীবনালোকে আমরা আমাদের অধিকারের দাবিকে যাচাই করে নেবো। প্রথমেই বলেছি সে কথা।

মানুষের অধিকারে যারা বঞ্চিত করে মানুষকে, তাদের অপরাধের সীমা নেই, তাদের কুকর্মের ফল জন্ম জন্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে তাদের দুঃখভোগের জন্য। আর যারা বঞ্চিত হয় তারাই বা হয় কেন বঞ্চিত? এও এক প্রশ্ন। আমি জানি, একথা শুনে অনেকেই আমার প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন, কিন্তু বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে,

যে দেশে বৈদিকযুগে নরনারীর অধিকারের কোনই তারতম্য ছিল না, মেয়েরা ব্রহ্মবাদিনী পর্যন্ত হয়েছিলেন, ঋষিপদবাচ্যা হয়েছিলেন, সেদেশে অন্ধকার যুগ কি করে ঘনিয়ে এল মেয়েদের জীবনে যে তারা নিজেরাই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। সেই অন্ধকার যুগেরই শেষ প্রান্তে যুগ-জননী শ্রীসারদা-দেবী এসে জন্ম নিলেন ভারতের এক কোণে, ভারতীয় নারীরূপে। মিশে গেলেন ওতপ্রোতভাবে একান্ত তাদেরই সাথে। কন্যারূপে, বধূরূপে সহধর্মিণীরূপে, গুরুরূপে, বিশ্বমাতৃকারূপে তিনি পেয়েছেন সর্বোচ্চ অধিকার; কে দিল তাঁকে সে অধিকার? অধিকার নিজেই এসে সে মহিমময় চরণে লুটিয়ে পড়ল, ধন্য হল তার 'অধিকার' নাম।

কিনা করেছেন তিনি? শুধু যে কন্যারূপে, বধূরূপে, সহধর্মিণীরূপে সামাজিক জীবনের স্তরে স্তরে আদর্শনারীরূপে লীলা করেছেন তাইই নয়। সুগৃহিণী ও সন্ন্যাসিনী দুইই ছিলেন তিনি একাধারে; সমাজসংস্কারও তিনি করেছেন তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক সহজ সরল আচরণ দিয়ে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে তিনি, মুসলমান ছেলেকে যত্ন ক'রে খেতে দিয়েছেন, তার এঁটো ফেলেছেন, বলেছেন ভক্তের একজাত, সেখানে জাতিভেদ করেননি—সমাজ তো নিয়েছে মাথা পেতে তাঁর সে আদেশ। কেন? না, ভারতীয় সংস্কৃতির ও সাধনার যে মূল সুর আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ তারই অপরূপ মূর্ছনায় তাঁর জীবন মাধুর্যমণ্ডিত, তিনি নিজের মহিমায় নিজেই পূর্ণরূপে মহিমময়ী।

তিনি যখন এলেন তখনো অন্ধকার যুগের আঁধার কেটে যায়নি, নবোদিত ঊষার মতো নবযুগের প্রভাতে তিনি উদিত হলেন, এসে বিশ্বের নারীজাতিকে তার বিরাট ও মহিমাপূর্ণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখাতে। তাঁর জীবনের আলোতে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি যে অধিকার আমাদের পেতে হবে সমাজে, রাষ্ট্রে, আইনে, ঘরে বাইরে; কিন্তু ঝগড়া করে যে-অধিকার আমরা পাবো তা হবে আলগা, পরগাছার মত, আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে তার কল্যাণময় যোগ থাকবে না। কিন্তু নারীত্বের, মাতৃত্বের কল্যাণময় আদর্শে আমরা যদি উদ্বুদ্ধ হতে পারি, সহজ, সরল স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা সম্মুখাগত সমস্যার সমাধান করতে পারি, আত্মার আলোকে যদি আলোকিত হতে পারি—তবে অধিকার আপনি এসে আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

প্রার্থনা করি তাঁর চরণে, আবার এ দেশে তেজস্বিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রীর আবির্ভাব হোক্। পরানুকরণের শৃঙ্খল থেকে যেন আমরা মুক্ত হই। নিজেরা নিজেদের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নূতন জাতি গড়ে তুলি তাঁর কৃপায়, যে জাতি বিশ্বের দরবারে প্রেমমৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-কথা*

আইডা আন্‌সেল

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে মানবধর্ম সম্বন্ধে একটা অভিনব ভাবধারার পরিচয় পাই, তখন তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে আমি ভাষা খুঁজে পাই না। ভাষার ভিতর থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বিশেষণের সবগুলি ব্যবহার করলেও, আমার মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাঁর বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু সংক্ষেপ কেবল আমার নিজেরই মনে রাখবার

* 'Vedanta and the West' পত্রিকার সৌজন্যে। মূল ইংরেজী হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত।

উদ্দেশ্যে আমি সে সময়ে লিখে রেখেছিলাম। কোন দিন ভাবিনি যে সেগুলি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

আমার মনে হয়েছিল—যেন অনন্ত নীলিমার অতি উচ্চস্তর থেকে একটি জ্যোতির্ময় সত্তারূপে তিনি পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, কিন্তু তবুও মর্ত্যের মানুষের প্রতিটি ভাবকে বোঝাবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর! তাঁর বাগ্মিতাশক্তি, মনোরম হাস্য-কৌতুক, সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা বা অসহিষ্ণুতাকে ঘৃণা এবং সর্বোপরি মানুষের যে কোন দুঃখের প্রতি উদার সহানুভূতি—এইগুলির জন্য প্রত্যেক স্তরের লোক তাঁর উপর আকৃষ্ট হত। আমাদের ক্ষুদ্র সীমা-বিশিষ্ট আদর্শের তুলনায় স্বামীজীর মহান্ ভাবধারায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর বক্তৃতা শোনবার পর যখন আমরা হলের বাইরে চলে আসছিলাম, তখন তাঁর সুললিত কণ্ঠে উচ্চারিত সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনি, আমাদের অন্তরে ঝঙ্কার তুলে এই বোধই জাগ্রত করেছিল যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন জীবনের একটি নূতন এবং বৃহত্তর অর্থ।

সুদীর্ঘ জীবনের ফেলেআসা অতীত দিনগুলির এবং মনের মূল্য-বোধের বিবর্তন-রীতির কথা ভাবতে বেশ মজা লাগে। আবার এ-ও দেখি, কতগুলি ছোট ছোট অকিঞ্চিৎকর ঘটনা মানুষের সমগ্র জীবনধারাকে কিভাবে বদলে দিতে পারে। হাই স্কুলে ভর্তি হবার আগে, যদি না আমি ষ্টেনোগ্রাফি শিখতে রাজি হতাম এবং স্কুলের দ্বিতীয় বছরেই যদি না স্নায়বিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হতাম, তাহলে স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা শুনতে পেলেও, তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ আমি পেতাম কিনা সন্দেহ। স্কুলে পড়তে পড়তেই আমি পিয়ানো বাজাতে শিখছিলাম—ডাক্তার নির্দেশ দিলেন, "হয় তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে; নয় বাজনা বাজানো বন্ধ করতে হবে—তা না হলে পরে দুটোর কোনটাই তোমার কাজে লাগবে না।" তখন আমাকে মিস্ লিডিয়া বেলের (Miss Lydia bell) কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। তিনি ছিলেন সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে কালিফর্ণিয়া স্টেটের হোম্ অব্ ট্রুথের (Home of Truth) অধিনেত্রী। আমি এই 'হোম্'-এ প্রতিদিন মিস্ বেলের সকাল বেলাকার আলোচনা ও রবিবাসরীয় বক্তৃতার শর্ট হ্যাণ্ডে বিবরণ লেখার কাজ নিয়ে রয়ে গেলাম। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ (এই বইখানি তাঁর প্রথমবার আমেরিকায় থাকাকালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়) সম্বন্ধে আলোচনা হত। সেই সময় স্বামীজী ছিলেন লস্ এঞ্জেলিস্-এ। তিনি রেভারেণ্ড মিল্‌স্ (Rev : B. Fay Mills) এর অনুরোধে ওক্‌ল্যাণ্ডের একটি গির্জায় (Unitarian Church) কয়েকটি বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি মিস্ বেল ও আরও কয়েকটি বান্ধবীর সঙ্গে সেখানে গেলাম এবং তাঁকে দেখে ও তাঁর ভাষণ শুনে আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি যে সাধারণ মানুষের অনেক উপরে একজন 'মহাত্মা' অথবা 'দিব্য পুরুষ' সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইলো না। আমি নিজে আমেরিকান বলে লজ্জা হতে লাগলো। মনে হল—যে সভ্যতার ভেতর থেকে স্বামীজীর মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে সভ্যতার কি বিকৃত ব্যাখ্যাই না এতদিন আমরা শুনেছি!

স্বামীজীর অধিকাংশ বক্তৃতাই শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল কতকগুলি মিস্ বেলের সঙ্গে, কোন কোনটি বা অপর বন্ধুদের সাহচর্যে। প্রতিবারই দেখেছি, সকলের ভিতর একটি গভীর উদ্দীপনা; অবশ্য কেউ কেউ তাঁর উপদেশের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বেই বেশী আকৃষ্ট হত। আমার বেশ মনে আছে, একবার একটি ধনী অভিজাতবংশের

তরুণী, যে আমারই সঙ্গে একই শিক্ষকের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করত, স্বামীজীকে দেখে একান্ত মুগ্ধতার সঙ্গে বলেছিল, "আহা, যেন একটি সুন্দর স্বর্ণমূর্তি!"

জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও স্বামীজী কখনও কখনও ধ্যানে আগ্রহী ছাত্রদের নিয়ে সকালে ক্লাস করতেন। টার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়ির একটি নির্দিষ্ট ঘরে ঐ ক্লাস বসত। এই ঘরটি মিসেস্ হান্স্ব্রাও (Mrs Alice Hansbrough) (শান্তি) এবং মিসেস্ অ্যাস্পিনাল (Mrs Emily Aspinall) (কল্যাণী) দুজনে মিলে স্বামীজীর ক্লাসের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমি মাত্র কয়েকবার এই অধিবেশনে যোগ দিতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে সময় কোন বিবরণ লিখে রাখিনি। সেখানে কিছুক্ষণ ধ্যান তারপর কিছু উপদেশদান, এবং প্রশ্নোত্তর হত। পরে স্বামীজী ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খাদ্য সম্বন্ধে কার্যকরী নির্দেশ দিতেন। তিনি খাদ্যবিষয়ে মিতাচারী ও মৃদু স্নিগ্ধ আহার্য গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দিতেন। একটি উপদেশের কথা মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন মাঝে মাঝে অন্ততঃ একটি সপ্তাহও আমরা যেন লবণ না খেয়ে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর স্নিগ্ধতা বজায় রাখি, লবণ স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে দেয়। অনেক প্রশ্নেরই উত্তর তিনি এই ক্লাসে দিতেন। ক্লাস আরম্ভ হবার কিছু আগে যাঁরা পৌঁছাতে পারতেন, তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিছু আলাপ করবার সুযোগও পেয়ে যেতেন। কখনও কখনও আমরা তাঁর খাবার ঘরে যাবার জন্যে আমন্ত্রিত হতাম ও সেখানে সাধারণভাবের কথাবার্তায় যোগ দিয়ে খুবই আনন্দ ও তৃপ্তি পেতাম। আমাদের ব্যস্তভাবে এখানে ওখানে ছুটোছুটিকরা স্বভাবের উল্লেখ করে, তিনি কৌতুক করতেন। তিনি নিজে কখনও তাড়াহুড়া করতে ভালবাসতেন না—তাঁর ভিতর সব সময়ই একটা গম্ভীর প্রশান্তি বিরাজ করত। চলতি কোন গাড়ী ধরবার জন্যে কাউকে দৌড়াতে দেখলে, স্বামীজী খুব আমোদ বোধ করতেন। জিজ্ঞাসা করতেন, "আর কি কোন গাড়ী আসবে না?" বক্তৃতা বা ক্লাস আরম্ভ করতে তাঁর দেরি হলে তিনি ভ্রূক্ষেপই করতেন না। তাঁর ভাষণ শেষ করারও কোনই নির্দিষ্ট সময় থাকত না, তাঁর বক্তব্য যতক্ষণ না শেষ হত ততক্ষণ তিনি ক্রমাগত বলেই যেতেন। কখনও কখনও তিনি নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দ্বিগুণ সময় নিতেন। সকালের ক্লাসের আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অতি সাধারণভাবেই কথাবার্তা হত। সে সময় স্বামীজী ধূসর রঙের গরম পায়জামাটি পরে আরাম কেদারায়, পায়ের ওপর পা রেখে বসে বসে ধূমপান করতেন ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন—মাঝে মাঝে হাস্যপরিহাসের গল্পও করতেন। ক্লাস আরম্ভ হবার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দু' মিনিট পরে, গৈরিক বেশে ক্লাসে এসে দাঁড়াতেন—তখন তাঁর চুলগুলি বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ান থাকত, কেবল মুখে ধূমপানের পাইপটি আর দেখা যেত না। তখনও কিন্তু তাঁর মুখে হাসিখুসির সুমিষ্ট ভাবটি লেগেই থাকত। এবং গুরুতর বিষয় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই তিনি একটু কৌতুক করে নিতেন। জনসাধারণের কাছে বক্তৃতার সময়ও পরিহাসছলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি, 'মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে, তখন তার নিজ ব্যক্তিত্বের কি পরিণতি হয় বলতে পার? তোমরা তো এই দেশে নিজ ব্যক্তিত্ব-নাশের কথায় রীতিমত ভয় পেয়ে যাও। কিন্তু কেন? তোমাদের তো এখনও ঠিক ঠিক নিজ ব্যক্তিত্বের জ্ঞানই হয়নি। যখন তুমি তোমার নিজস্ব স্বভাবটি পরিপূর্ণভাবে জানতে পারবে, কেবল তখনই তুমি তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে চিনতে পারবে, তার আগে নয়।

ভগবানকে জানলে, তুমি কিছুই হারাবে না।—আর এক কথা, এই দেশে প্রায়ই আমি তোমাদের একটা কথা বলতে শুনি যে, তোমরা এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিল ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে চাও। কিন্তু তোমরা কি জান না যে, জগতে যত কিছু উন্নতি আজ পর্যন্ত হয়েছে, সবই এই প্রকৃতিকে জয় করেই সম্ভব হয়েছে। যদি আমরা উন্নতি করতে চাই, তাহলে প্রতিপদক্ষেই আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে এই প্রকৃতিকে।”

প্রত্যেক বক্তৃতার পরে, তাঁকে প্রশ্ন করবার জন্যে তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন। একবার একজন বললেন যে, স্বামীজীকে অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বোধ হয় পরিশ্রান্ত করা হচ্ছে, তাই শুনে তিনি তখনই বললেন, 'তোমরা যত ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার—বরং যত বেশী জিজ্ঞাসা করবে ততই ভাল। এর জন্যেই তো আমার এখানে আসা—যতক্ষণ না তোমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, আমি এখান থেকে যাব না। ভারতে সকলে আমায় বলত যে, জনসাধারণকে 'অদ্বৈত বেদান্ত' শিক্ষা দিতে না যাওয়াই ভাল। তার উত্তরে আমি বলি যে, একটি শিশুকে পর্যন্ত বোঝাবার ক্ষমতা আমার আছে। সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যকে বোঝাতে ও শিক্ষা দিতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না।”

মানবের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলতেন, “যতই কম পড়া যায় ততই মঙ্গল। তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা তুমি গীতা ও বেদান্তের সার অংশগুলি পড়লেই জানতে পারবে। আজ-কালকার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মানুষের মন, চিন্তা করবার শক্তি অর্জন করবার আগেই ঘটনাবৈচিত্র্যের জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে যায়। মনকে সংযত করবার শিক্ষাই সর্বপ্রথম করা দরকার। আজ যদি আমি নতুন করে শিক্ষালাভ করতে যাই ও এবিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পাই, তাহলে আমি আমার মনকে আয়ত্তে আনবার শিক্ষাই সর্বপ্রথম করব, তার পরও যদি প্রয়োজন থাকে, তবেই ঘটনাবলীকে জানবার চেষ্টা করা যাবে। কোন একটা বিষয় শিক্ষা করে তাকে আয়ত্তে আনতে মানুষের অনেক দিন লেগে যায়, তার কারণ তারা তাদের মনকে নিজ ইচ্ছামত একাগ্র করতে পারে না। মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস (History of England) মুখস্থ করতে আমার তিনবার পড়তে হয়েছিল। কিন্তু যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ হৃদ্‌গত করতে আমার মায়ের মাত্র একবার পড়বার প্রয়োজন হত। নিজ মনকে সংযত করতে পারে না বলেই, মানুষ দুঃখ ভোগ করে।”

ক্রমশঃ

স্বামীজী

শ্রীশান্তিময় ঘোষ

অসি হ'ল বাঁশী তোমা পাশে আসি—মানবের প্রিয়তম!
পাষাণে ফুটিল প্রাণের প্রসূন—পারিজাত মনোরম॥
দরদে ছুখিল শত হিয়াতল
ব্যথীর ব্যথায় বিধুর, বিভল,

সমবেদনার স্নেহে সুশীতল
হ'ল সুকঠিন মন।

যে নয়নে ক্রূর কঠিন চাহনি
পরদুখে কভু সরল হয়নি
সে দিকেতে দিল দয়ার লাবণি
তব পূত পরশন ॥

ভালবাসা শুধু মানব-সমাজে—মানুষের পরিচয়,
ত্যাগে চিনে-নেওয়া, ত্যাগে জিনে-নেওয়া—প্রাণে প্রাণ বিনিময়।

আর্তেরে দিতে আশ্রয়ে কূল,—
ব্যর্থের বুকে ভরসা বিপুল,—
মানুষ,—মানব-জনম অতুল
লভেছে মহিমময়।

নিজের স্বার্থে হয়ে অচেতন
পরার্থে ঢালি দেওয়া প্রাণ, মন—
সেই তো সত্য সফল জীবন—
নিষ্কাম, নির্ভয় ॥

তুমিই শোনালে প্রথম এ নীতি—প্রীতির পরশমণি!
"অবহেলে প্রাণ দিতে বলিদান"—অমর মন্ত্রধ্বনি!

বিশ্বের কানে ওঙ্কার সম
পশিল পলকে, ঝরে গেল ভ্রম,—
ভরে গেল প্রাণ আনন্দে ঘন,—
হিয়ার হীরক-খনি

খুলে গেল গাঢ় সহানুভূতির
মানুষের পূজা পরমারতির
নির্দেশ পেল—বসি সারথির
পদে সেনা নারায়ণী ॥

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাণীর কী অদ্ভুত শক্তি ! শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ শুধু একটি বাণীর অপেক্ষায় ছিল। সেই অমৃতবাণী যা ভেদবুদ্ধিকে দূর ক'রে দিয়ে সবাইকে মেলাবে। কোথায় সেই ঋষি যাঁর অগ্নিমন্ত্রের আলোয় আমরা পরস্পরকে জানবো একই মায়ের সন্তান ব'লে ? দুর্বল মস্তিষ্ক হারিয়ে ফেলেছে চিন্তাশক্তি। কোটী কোটী কণ্ঠ মৌন হয়ে আছে। গুরু কোথায় যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জাতিকে নিয়ে যাবেন দেশাত্মবোধের নবপ্রভাতের জ্যোতির মধ্যে ? এলেন ঋষি বঙ্কিম, মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারিত হোলো মহামন্ত্র বন্দেমাতরম্। আঁখি থেকে আবরণ খ'সে গেল। দেশপ্রেমের চৈতন্যের মধ্যে জাতি নবজন্ম গ্রহণ করলো।

দুর্ভাগা দেশ এমনি আর একটি বাণীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। দিগন্তপ্রসারী দারিদ্র্য। অনশনে অর্ধাশনে কোটী কোটী মানুষ যেন জীবন্ত নরকঙ্কাল ! অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘে সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন ! স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই। নিষ্প্রভ চোখে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত হতাশা। ঋষির বংশধরেরা পশুর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অগণিত মানুষের অভিশপ্ত জীবনকে রূপান্তরিত করবার জন্যে প্রয়োজন ছিলো এক নূতন মন্ত্রের। এই নূতন মন্ত্র দরিদ্রনারায়ণ। বন্দেমাতরম্ উৎসারিত হয়েছিল গৃহীর কণ্ঠ থেকে ; দরিদ্রনারায়ণ উৎসারিত হোলো সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে। গৃহীই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক—চাপরাশ-পাওয়া মানুষ যখন বাণী উচ্চারণ করে যুগের প্রয়োজনের তাগিদে—সেই বাণী কখনও নিষ্ফল হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র আর বিবেকানন্দ দুজনেরই সংবেদনশীল মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল দেশের জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দৈন্যের ছবি। এই দুঃখদৈন্যের নাগপাশ থেকে তাদের জীবনকে মুক্ত করবার প্রয়োজন এঁরা দু'জনেই অনুভব করেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। প্রয়োজন অনুভব না করলে বঙ্কিম আর দশজন হাকিম যা করেন তাই করতেন ; আদালতে গোরুচুরির আর কাঁঠালচুরির বর্ণনা শুনতেন ; এজলাশে অথবা বাড়ীতে ব'সে মামলার রায় লিখতেন, দিনগত পাপক্ষয় ক'রে ক্লাবে গিয়ে ব্রিজ খেলতেন, খেতেন, ঘুমোতেন, গৃহকর্ম পালন করতেন। বিবেকানন্দও সংসার ত্যাগ ক'রে আশ্রমবাসী অথবা গুহাবাসী হতেন, নির্জনে ধ্যান-ধারণা করতেন মোক্ষলাভের আশায়।

কিন্তু কি দেখলাম ? দেখলাম ডেপুটী বঙ্কিমের মধ্যে আর একটি মানুষ যার চোখে জল। বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য এই মানুষটির মনে কি বিপুল সমবেদনা ! হাকিমের চোগা-চাপকান আলনায় ঝুলিয়ে রেখে সাহিত্যিক-বঙ্কিম কলম নিয়ে বসেছেন হাসিম সেখের আর রামা কৈবর্তের দৈন্যজীর্ণ জীবনকে রূপান্তরিত করবার প্রেরণায়। দুর্ভাগা স্বদেশকে নতুন ক'রে গড়বার প্রেরণা থেকে বঙ্কিমের লেখনী প্রসব করলো আনন্দমঠ, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্গদেশের কৃষক। একই প্রেরণায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ছুটলেন সমুদ্রপারে আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজী মাদ্রাজে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার মধ্যে দেখতে পাই কম্বুকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন :

> "তোমরা অনেকেই জানো, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি তথায় যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা প্রতীকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল।

আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি। কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেইজন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে, তাহারা অবশ্য একথা জানো। ধর্ম-মহাসভা ফভা হল না হল, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংসরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর নেয় কে?"

কালপুরুষ বিবেকানন্দকে বেছে নিলেন তাঁর কাজ করবার জন্যে। দরিদ্রনারায়ণের সেবার কাজকে বিবেকানন্দ বেছে নেন নি। নির্বিকল্প সমাধির অনির্বচনীয় আনন্দের সুধাসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সকলের হয় না। বিবেকানন্দের হয়েছিল। তাঁর অন্তরের মধ্যে সকল সময়ের জন্যে একটি কান্না ছিলো যার কথা জানতো শুধু তাঁর অন্তরঙ্গেরা। জীবনের দুঃখ-সুখের তরঙ্গলীলা থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে তলিয়ে যাবার জন্যে একটা গভীর ব্যাকুলতা ছিলো তাঁর অন্তরের গভীরে। জগতের কুরুক্ষেত্র থেকে দূরে কেবল তিনি আর তাঁর ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে তিনি ডুবে রয়েছেন। সমাজসেবার কোন তাগিদ নেই, কাজের কোন ঝঞ্ঝাট নেই। ঈশ্বরের চরণপদ্মে তাঁর মন-মধুপ নিঃস্পন্দিত হ'য়ে আছে। কর্মবীর বিবেকানন্দের অন্তরের অন্তঃপুর থেকে ক্লান্তির যে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতো তার সংবাদ কয়জন রাখে?

কিন্তু তাঁর চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে যারা তাদের কথা তিনি, ভুলতে পারছেন কৈ? বভুক্ষু নরনারী যারা বছরে একদিনও পেট ভ'রে খেতে পায় না! মেয়েদের পরিধানে কী নোংরা শাড়ী! কিন্তু কি করবে ওরা? একখানিমাত্রই শাড়ী ওদের সম্বল। অস্পৃশ্যেরা প'ড়ে আছে সমাজের এক প্রান্তে অপরিসীম অবহেলার মধ্যে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ চলেছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। চলছেন আর দেখছেন মহাশ্মশানে চলমান নরকঙ্কাল। কোথায় বেদগানে মুখরিত গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ভারতবর্ষ আর কোথায় অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত বর্তমান ভারতের শ্মশানভূমি! বিবেকানন্দের মন থেকে নির্বিকল্প সমাধির চিন্তা স'রে গেল। মনকে জুড়ে বসলো বুভুক্ষুদের ম্লান মুখচ্ছবি। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে চলেছেন দণ্ডধারী পরিব্রাজক অন্তরে রোরুদ্যমান জগতের পুঞ্জীভূত বেদনাকে বহন ক'রে। নিদ্রাহীন রজনীর প্রহরগুলিকে পূর্ণ ক'রে আছে এক চিন্তা। দেশের দুর্দশার চিন্তা বিবেকানন্দের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুমারিকা অন্তরীপে এসে বিবেকানন্দ তাঁর জীবনকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিলেন দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। ১৮৯২ তাঁর এই আত্ম-নিবেদনের স্মরণীয় বৎসর। রোমা রলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে ঠিকই লিখেছেন: He had not chosen his way of life His mission had chosen him

এখন থেকে শুরু হোলো জীবনের নূতন পর্ব। বিবেকানন্দ কর্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। ভুলে গেলেন নিজেকে, ভুলে গেলেন আর সব কামনা, ভুলে গেলেন মুক্তির চিন্তা পর্যন্ত। পরোপকারের জন্যে শরীর যদি যায় তাতেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়ে আসছে, আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে কুসংস্কারের পঙ্ককুণ্ডে, হারিয়ে ফেলেছে আত্মবিশ্বাস—এদের টেনে তোলা তো সহজসাধ্য নয়! যে শিক্ষিত সমাজ জনসাধারণকে পরিচালিত করবে কল্যাণের পথে, তারা রক্ষকের কাজ ছেড়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাদের আত্মকেন্দ্রিক জীবনে ভোগেচ্ছার প্রবলতা। যারা

ভোগী নয় তারাও রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে ধ্যানধারণা নিয়ে ব্যস্ত পারলৌকিক স্বার্থের অন্বেষণে। জনসাধারণের দুঃখদৈন্যের কথা তারা ভাবে না। তারা আছে তাদের ভাবসম্ভোগে নিমজ্জমান।

স্বামীজী তাদের কাছে নবতর আদর্শ দিলেন—মানবসেবার আদর্শ। বললেন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

মাদ্রাজে জীমূতগর্জনে ঘোষণা করলেন তিনি:

"হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটী কোটী দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটী কোটী ব্যক্তি শতশত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে? তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ?"

"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম-জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েকবর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তুমি কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?"

এই অগ্নিবচনের তীব্র কশাঘাতে ভারতবর্ষ তার যুগ-যুগান্তের ঘুমের মাঝে পাশ ফিরলো। মাদ্রাজের বক্তৃতার মধ্যে যে তূর্য বাজলো তার ধ্বনি ঘুমন্ত জাতির কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্মের মধ্যে প্রবেশ করলো। সেই দিন থেকে শুরু হোলো জাতির মহাজাগরণের স্বর্ণ-উষা। রলাঁ (Romain Rolland) ঠিকই বলেছেন: From that day the awakening of the torpid colossus began

এর পরে এলো গান্ধীর গণবিপ্লবের ঝড়। লাখো লাখো মানুষের শক্তিকে সংহত করলেন তিনি। সেই শক্তির গরিমাময় প্রকাশ হোলো সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের মধ্যে ভারতের জাগ্রত জনসাধারণের শৌর্যের যে অভিব্যক্তি আমরা দেখলাম তার গোড়ায় কিন্তু স্বামীজীর মাদ্রাজের বক্তৃতার সেই প্রাথমিক তাড়িতস্পর্শ।

যুগধর্মের অগ্নিমন্ত্র স্বামীজী উচ্চারণ করলেন: দরিদ্রনারায়ণকে—শোষিত, লাঞ্ছিত নর-দেবতাকে জড়তা থেকে, ভীরুতা থেকে, দৈন্যজীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার-লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করবার অগ্নিমন্ত্র। যুগধর্মের এই আহ্বানকে হৃদপিণ্ডের প্রতিটি শিরা উপশিরার মধ্যে অনুভব না করলে কোন মানুষের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সৃষ্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব নয়। মনীষী সোরোকিন (P. A. Sorokin) তাঁর Social Philosophy of an Age of

crisis এ ঠিকই লিখেছেন : Without such a need being felt a given group or person does not set out to do the requisite creative work

কিন্তু এই সর্বোদয়ের কাজ তো একা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী আহ্বান করলেন ভারতের যৌবনকে তাঁর কাজে সহায় হবার জন্য। তিনি বিশেষ ক'রে আহ্বান করলেন বাংলার যৌবনকে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিবেদন করতে। বললেন :

"নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকদের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যসকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। * * কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে সেই মুহূর্তেই তুমি শক্তিহীন।"

স্বামীজী জোর দিলেন আত্মবিশ্বাসের উপরে। বেদান্তের শিক্ষার উপরে তিনি যে বারংবার এত জোর দিয়েছেন সে ভারতের ঝিমিয়ে-পড়া অবসাদগ্রস্ত যৌবনকে নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তাকে সেবাধর্মের কাজে লাগবার জন্যে। মানুষের ভাবপ্রবণতায় দরকার আছে তাকে প্রাণোচ্ছ্বাস সরবরাহ করবার জন্যে। কিন্তু মাত্র ভাবাবেগকে আশ্রয় ক'রে মানুষ তার প্রাণোচ্ছ্বাসকে কতদিন অম্লান রাখতে পারে? ভাবাবেগের বন্যা আসে যেমন উন্মাদ কলরবে তেমনি আবার চলেও যায়। কিন্তু মগজের মধ্যে আমরা কোন আইডিয়াকে যদি সত্য ব'লে একবার গ্রহণ করি, সেই আইডিয়া আমাদিগকে কর্মপথে এগিয়ে যাবার সাহস দেয়, কাজ করবার সংকল্পকে অনির্বাণ রাখে আমাদের মনের মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে যে পরম সত্যগুলি উচ্চারণ করলেন তাদের প্রভাব অর্জুনকে মুক্ত করলো ক্লৈব্য থেকে, তাঁকে সাহস দিলো অবসাদের অন্ধকারে, তাঁকে সংকল্প যোগালো দুষ্টের দমন এবং ধরিত্রীর উদ্ধারের কাজে অবিচলিত থাকবার। ভাবাবেগের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে শুভকাজে মানুষকে প্রণোদিত করবার জন্যে; কিন্তু আইডিয়ার প্রয়োজন বোধ হয়, আরও বেশী। ভারতের অবসাদগ্রস্ত যৌবনকে স্বামীজী তাই পান করালেন বেদান্তের সোমরস। রলাঁ ঠিকই লিখেছেন :

If he attached so much importance to the teaching of the Vedanta, it was because he saw in it a sovereign tonic :

"To revivify the countty through the thundeting notes of the Vedic rhythm."

স্বামীজী বললেন :

"আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, যাহা কিছু ভালো সকলই আসিবে।"

"সুতরাং দেখা যাইতেছে বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট লোক হিতকর কার্যের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্য-জাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্বদ্বয়ের প্রচার করিতে হইবে।" যে কারণে স্বামীজীর আমেরিকায় ধর্মমহাসভায় যাওয়া সেই কারণেই ভারতের যৌবনকে বেদান্তের অগ্নিবচন শোনানো। উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই দরিদ্রনারায়ণের উদ্ধার।

উত্তরকালে গান্ধীজী স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে আত্মিক শক্তিকে আশ্রয় করলেন ভারতবর্ষকে

ভয়শূন্য ক'রে বিপ্লবের পথে দাঁড় করবার জন্যে। সত্যাগ্রহের মধ্যে মানুষের আত্মিক শক্তিরই প্রকাশ। ইংরেজের মারের ভয়ে আমরা মাথা তুলতে পারছিলাম না। গান্ধীজী বললেন, "লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই ক'রে মরে। আসল মানুষটা যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা।" গান্ধীজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের যাদু আমাদের আসল মানুষটিকে জাগিয়ে দিলো, জ্বালিয়ে দিলো আমাদের ভিতরের আলোর শিখাটিকে, আমাদের আত্মাকে করলো প্রবুদ্ধ। জাতির আত্মা যেই প্রবুদ্ধ হোলো অমনি এলো শক্তি—সাম্রাজ্যবাদীর উদ্যত তরবারির আর বন্দুকের শক্তিকে উপেক্ষা ক'রে অকুতোভয়ে মরবার শক্তি। চার্চিলের বারুদের শক্তি পরাভূত হোলো জনসাধারণের জাগ্রত আত্মার অপরাজেয় আত্মিক শক্তির কাছে।

বিবেকানন্দে যার আরম্ভ গান্ধীতে তার গরিমাময় সফলতার প্রকাশ। বিবেকানন্দ মন্ত্র দিলেন, সেই মন্ত্রকে অনুসরণ করে গান্ধী জাতিকে জীবন্ত ক'রে তুললেন। বিবেকানন্দ জাতির স্রষ্টা। এ যুগ বিবেকানন্দের যুগ। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে বিবেকানন্দের বৈদ্যুতিক চিন্তাধারার স্পর্শ। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ভারতের এই তিনজন মহামানবের মন বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, পরিপুষ্ট। এঁরা বিবেকানন্দেরই চিন্তাধারার ও কর্মধারার ধারক ও বাহক।

নিরুত্তর

শান্তশীল দাশ

পেয়েছি অনেক কিছু এ জীবনে :
আলো-হাসি-গান ;
পেয়েছি যা করিনি সন্ধান।
আমার চাওয়ার পাত্রখানি
ক্ষীণকায় ; অতি অল্পে পূর্ণ হয় জানি।
সেই পাত্রখানি ভরে কত না দানের সমারোহ,
এ জীবন করেছে সুবহ।
বদ্ধ অঞ্জলি মোর সকলই সে করেছে গ্রহণ ;
সে দানের উচ্ছলতা, দেহে, মনে, হৃদয়ের
গোপন কোঠায়
অকুণ্ঠ করেছে বিচরণ।
চাওয়ার অনেক বেশী এ জীবনে পেয়েছি আমার ;
ছোট মোর পাত্রখানি দ্বিধায়, সংকোচে বারবার
ভরে নিয়ে অকৃপণ দানে।
সার্থক হয়েছি আমি—তবু সেই গানে,
মাঝে মাঝে অকারণ কী করুণ বেজে ওঠে সুর!
কী যেন হয়নি পাওয়া, তারই লাগি এ হৃদয়
হয়ে ওঠে অশ্রান্ত আতুর।
বুঝি না সে কী বেদনা,
কী পাইনি এ জীবন মাঝে ?
দানে দানে এ জীবন ভরেছি তো,
কেন ব্যথা বাজে ?
এত-পাওয়া-মাঝে তবু কেন লাগে শূন্য হৃদয় ;
কেন মনে হয়,
যা চেয়েছি পাইনি তা, যা পেয়েছি এ আমার নয়!
মেলে না উত্তর :
অনেক পাওয়ার মাঝে একটি না-পাওয়া ব্যথা
ভরে থাকে সারাটি অন্তর।

ভারতে রঞ্জনশিল্প।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন শর্মা রায়

রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব সভ্যতার উন্মেষের সহিতই রঞ্জনশিল্পের প্রসার হইয়াছিল। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতে বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাদির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় নীল, পীত, গৈরিক ও রক্তাম্বর পরিধান তৎকালে বিশেষ যত্নের সহিত করা হইত ; শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র পরিধানের সহিত বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। পৌরাণিক কাল হইতেই গৈরিক বস্ত্র হিন্দুসন্ন্যাসীর একমাত্র পরিধেয় বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সকল বস্ত্র রঞ্জিত করার পদ্ধতি তৎকালে যে ব্যাপকভাবে হিন্দুসমাজে জ্ঞাত ছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত রঞ্জন-বিজ্ঞান একমাত্র ভারতবর্ষেই আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতেই ইয়োরোপের গ্রীস দেশের সহিত ভারতবর্ষের ব্যবসার আদান-প্রদান আরম্ভ হইলে বিচিত্র বর্ণের ভারতীয় বস্ত্র ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পরিচিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ যুগে যেমন ভারতীয় স্থাপত্য, শিল্পকলা, জ্যোতিষ প্রভৃতি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ভারতীয় সূক্ষ্মবস্ত্র-নির্মাণও তৎকালে চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত বিবিধ স্থায়ী বর্ণে রঞ্জিত মসলিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় নরপতি ও ধনিগণের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া ভারতীয় বণিগ্‌গণ প্রচুর অর্থ ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেন। এই সকল বর্ণ তৎকালে দেশীয় বৃক্ষলতা, মূল ও কয়েকটি খনিজ রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে পরিণত হইত।

ভারতীয় রঞ্জনশিল্পে বর্ণ মাত্র তিনটি, যথা – রক্ত (লাল), পীত (হলুদ) ও নীল (ব্লু)। হিন্দুবিজ্ঞান-মতে কেবলমাত্র এই মূল তিনটি বর্ণের ন্যূনাধিক মিশ্রণদ্বারা যে কোন প্রার্থিত বর্ণ লাভ করা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে শুভ্রবর্ণকে শুদ্ধসত্ত্ব, পীতবর্ণকে সত্ত্ব, রক্ত বর্ণকে রজঃ ও নীল বর্ণকে তমোগুণের প্রকাশক কহে। এ বিশ্ব যেরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমষ্টিদ্বারা সৃষ্ট, হিন্দুবৈজ্ঞানিকের মতে অন্যান্য বর্ণে উক্ত তিনটি বর্ণ বিদ্যমান। সৌরালোকের সপ্তবর্ণও তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাই অদ্যাবধি সূর্যকে সপ্তাশ্ব নারায়ণ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। আধুনিক রঞ্জন-বিজ্ঞান সূর্যের সাতটি বর্ণকে (vibgyor) মূল বর্ণরূপে নির্দেশ করিলেও হিন্দুবৈজ্ঞানিকের ঐ তিনটি মাত্র বর্ণের (রক্ত, পীত ও নীল) সাহায্যে যে কোন বর্ণকে রূপায়িত করা সম্ভব ইহাও ইদানীং স্বীকৃত হইতেছে।

ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের মতে রঙিন পদার্থের প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ বর্ণ নাই। সূর্যের আলোক—যাহা সাতটি বর্ণের মিশ্রণমাত্র, উহাই প্রত্যেক বস্তুতে পতিত হইয়া সেই সেই বস্তুতে শোষিত হয় এবং উহার যে বর্ণটি বস্তুদ্বারা গ্রহণীয় হয় না, মানবের অক্ষিপুটের (ratina) সামর্থ্যের তারতম্য তাহারই বর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। এই কারণেই মানুষের বর্ণজ্ঞানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাহাদের অক্ষিপুট তেমন সবল নয় তাহাদের মধ্যে কেহবা সবুজ বর্ণকে নীলবর্ণ দেখিয়া থাকে, অপর কেহবা গাঢ় বাদামী বর্ণকে কাল বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করে।

শুদ্ধসত্ত্বকে যেমন কোন গুণমধ্যে ধরা যায় না, শুভ্র বর্ণও তেমনই কোন বর্ণ নয়, কৃষ্ণবর্ণকেও

বর্ণাতীত রূপের বর্ণনায় হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের সকল বর্ণের (সপ্তবর্ণ) সমমিশ্রণকে শুভ্র ও বর্ণাতীতকেই কৃষ্ণবর্ণ (absence of all colour is black) নামে যেরূপ অভিহিত করিয়া থাকেন হিন্দুবৈজ্ঞানিকগণের শুদ্ধসত্ত্বই শুভ্রবর্ণ এবং বর্ণাতীতই কালী বা কৃষ্ণ এই মতবাদ সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়।

হিন্দুবৈজ্ঞানিকগণের ধাতুবিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা পুরাকালে বিভিন্ন ধাতু পোড়াইবার সময় উহার আলোক হইতে যে উজ্জ্বল বর্ণসকল বিকীর্ণ হইত তাহা দ্বারাই ধাতুর গুণাগুণ ও পরিচয় নির্ণয় করিতেন। পারা ও লৌহ ভস্ম করিয়া সিন্দুর ও কৃষ্ণসার প্রস্তুত করা তৎকালে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সর্বপ্রথম আতস বাজী প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিতেন। আলেকজাণ্ডারের পশ্চিম ভারতজয়ের উৎসবসভায় এরূপ বহুবর্ণের আতস বাজী পোড়াইবার বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বাজীর মধ্যস্থিত বিভিন্ন বর্ণের উত্থিত আলোকমালা বিভিন্ন ধাতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার উত্তপ্ত বিস্ফোরণ মাত্র। ভারতীয় অতি স্থায়ী রঞ্জনসকল প্রধানতঃ বৃক্ষপত্র, ফল মূল ও বীজ হইতে সংগৃহীত হইলেও হিন্দুবৈজ্ঞানিকগণ উহাতে বহু প্রকার ধাতব লবণ প্রভৃতির সংযোগ করিতেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, তাঁহারা যে সকল স্থায়ী বর্ণ বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার করিতেন তাহা বহুকালের অভিজ্ঞতালব্ধ ও বহুপরীক্ষিত। ভারতীয় মঞ্জিষ্ঠা, নীল প্রভৃতির ন্যায় উজ্জ্বল ও স্থায়ী বর্ণ অদ্যাবধি ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতীয় প্রণালী দ্বারা যে সকল রঞ্জন প্রস্তুত হয় তাহার স্থায়িত্ব ইয়োরোপীয় ধৌতপ্রণালী অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডার নামক উগ্র রাসায়নিক পদার্থ সহ্য করিতে সক্ষম না হইলেও ভারতীয় ধৌত-প্রণালী অর্থাৎ ধোপধোলাই ও রৌদ্রতাপ প্রভৃতি ইহাদের বর্ণের উজ্জ্বলতা কিম্বা গভীরতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বরং আরও অধিককাল স্থায়ী এবং উ ল করে।

ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যাঁহারা রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রঞ্জনশিল্পের জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম রঞ্জনের উপাদান ভারতীয় নীল আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে ইয়োরোপে আনীত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ভারতবর্ষ হইতে নীল ইয়োরোপে আনীত হইয়াছিল বলিয়াই গ্রীসদেশে নীল ইণ্ডিগো নামে পরিচিত হইত। ইণ্ডিয়া (India) ভারত-বর্ষেরই ইয়োরোপীয় নামকরণ, তাই নীল ভারতেতর দেশে অদ্যাবধি ইণ্ডিগো (Indigo) বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মিশর, গ্রীস, ও তুর্কীস্থান প্রভৃতির সহিত ভারত-বর্ষের বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা চলিবার কালে বহু তুর্কী ব্যবসায়ী এদেশ হইতে মঞ্জিষ্ঠার রঞ্জনপদ্ধতি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে ঐরূপ রক্তবর্ণে রঞ্জিত ফেজ নামক টুপী মিশর ও গ্রীসদেশে বিক্রয় করিতে থাকেন। পরবর্তিকালে গ্রীক ভাষায় এই মঞ্জিষ্ঠাকেই ম্যাডার (madder) ও তুর্কীদেশীয় রক্তবর্ণকে তুর্কী লাল (Turkey Red) নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। অদ্যাবধি ঐ নাম প্রচলিত আছে।

ভারতীয় রঞ্জন-প্রণালী দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও অপর পক্ষে বর্তমান ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম রঞ্জনসকল সুলভ ও ইহাতে অল্পকাল মধ্যে অধিক তন্তু রঞ্জন করা যায় ইহা সত্য বটে। এই কারণেই ক্রমশঃ বিদেশীয় রঞ্জনশিল্প ভারতের পৌরাণিক রঞ্জনশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন। ভারতীয় রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা কেবলমাত্র উপরোক্ত দুইটি কারণকেই ভারতীয় শিল্প-বিলোপের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

ভারতে ইংরেজরাজত্বের প্রথমাবধিই ইংরেজ বণিগ্‌গণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নীলের ক্ষেত্রসকল ক্রমে ক্রমে প্রভূত অর্থে ক্রয় করিতে থাকেন এবং প্রতিটি নীল-উৎপন্ন এলাকায় একএকটি কুঠি স্থাপন করিয়া নীল ইয়োরোপের বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানি করিতে থাকেন। আপনাদের স্থায়িত্ব নিরাপদ হইবার পর ঐ সকল কুঠির মাধ্যমে বৈদেশিক ক্রেতাগণকে ক্রমশঃ হস্তগত করিয়া ভারতের বাহিরে নীল রপ্তানিকার্যে এই কুঠিয়ালগণই একমাত্র অধিকার লাভ করেন। এ বিষয়ে অদূরদর্শী ভারতীয় নৃপতিগণের এরূপ একাধিপত্য দান ইংরেজদিগকে যে যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে ভারতের স্বাধীনতা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন হইয়া পড়িলে দেশীয় নীলকরগণের উপর আইনের বাধা নিষেধও আরোপিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র নীল-শিল্প কেন, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপরেও যে অবিচার সাধিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় ইতিহাসে ইংরেজ-শাসনের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় তন্তুবায়গণের হস্তচ্ছেদ, নীল কুঠিতে শ্রমিকগণের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির ইতিবৃত্ত অদ্যাবধি ভারতীয় জনসাধারণ ভুলিতে পারে নাই।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু নব নব আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞান-জগতে অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইঁহাদের দ্বারা কৃত্রিম নীল ও মঞ্জিষ্ঠার আবিষ্কার বর্তমান রঞ্জনশিল্পের প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। মিঃ হোর্স্‌ফল ও মিঃ লরী "রঞ্জন-বিজ্ঞানের" ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, নীল বা ইণ্ডিগো শব্দের অর্থ এমনই ব্যাপক যে ইণ্ডিগো বলিতে স্থূলভাবে যে-কোন রঞ্জনদ্রব্যকেই বুঝাইত। কেবলমাত্র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ গাষ্টভ স্কাল্‌ট্‌জ রচিত "রঞ্জন-সূচীপত্র" প্রচারিত হইবার পর হইতে বিভিন্ন রঞ্জনপদ্ধতির বিভাগ ও রঞ্জনদ্রব্যগুলির গোষ্ঠি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইয়োরোপীয় রঞ্জনবিজ্ঞানের ইতিহাসলেখক মিঃ এইচ্‌ জি ওয়েলস্‌ বলিয়াছেন যে মানব সভ্যতার উন্মেষকাল হইতেই বিবিধ চিত্র-বিদ্যায়, বিভিন্ন বর্ণে মানবের দেহ-বিলেপনে ও প্রস্তরমূর্তির রঞ্জনকার্যে পিগমেণ্ট বা ধাতব বর্ণসকল ব্যবহৃত হইত। অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণের দুরূহ চেষ্টায় এই রঞ্জন-বিজ্ঞান পরবর্তিকালে এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইয়া বর্তমান রঞ্জনজগতে এক অভিনব ও অতি প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বিচিত্র বর্ণের কার্পাস বস্ত্র, ছাপা রেশমী বস্ত্র ও নীল প্রভৃতি ইয়োরোপে আমদানি হইতে থাকিলে তৎকালীন ইংলণ্ড, জার্মাণী ও ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের অনুরূপ বস্ত্র, ছাপ ও রঞ্জন প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করেন। ইজিপ্ট ও তুরস্ক হইতে জ্ঞাত ভারতীয় পদ্ধতিতে ব্রেজিল ও মেক্‌সিকোর বনজঙ্গল হইতে সংগৃহীত লগউড (কৃষ্ণদারু) ও ম্যাডার (মঞ্জিষ্ঠা) ইয়োরোপের প্রথম রঞ্জন দ্রব্য। মিঃ উইলিয়ম নামক ঐতিহাসিকের লিখিত পুস্তকে এই সময়কার (১০৯৫—১১৪৩) রঞ্জন-শিল্প সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে অর্ণবপোতে আনীত হরিতকী (Tannic Acid) হীরাকস্‌ (Ferrous Sulphate), লাক্ষা (Lac) প্রভৃতি দ্রব্য যে রঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত হইত তাহার উল্লেখ দেখা যায়। রাণী প্রথম এলিজাবেথের জীবনীলেখক দ্বিধাহীন ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে নাবিকগণ দ্বারা আনীত কুসুমপুষ্প, খয়ের, মঞ্জিষ্ঠা, নীল, কৃষ্ণদারু প্রভৃতি দ্বারাই রাজপরিবারের বিচিত্র বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত। অতএব ইয়োরোপীয় নিজস্ব রঞ্জনশিল্প যে দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ বৈজ্ঞানিক ডবলু এইচ প্যার্কীন, প্রফেসার হফম্যানের সহকারী থাকাকালে

এলিটলুইডিন নামক পদার্থ হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে যাইয়া একপ্রকার রক্তবর্ণ দ্রব্য আবিষ্কার করেন। এনিলিন নামক পদার্থের সংযোগে উহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ এবং এলকহল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তিনি উহা হইতেই মউভ (Mauve) নামক আদি রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুত করেন। এই মউভ কৃত্রিম রঞ্জনের প্রথম আবিষ্কার। প্রফেসার পার্কীন এই আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জীবন রঞ্জন-শিল্পের প্রসারে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন এবং এনিলিন নামক পদার্থকেই কৃত্রিম রঞ্জনের মূল ভিত্তিরূপে স্থির করিয়াছেন। এদিকে প্রফেসার পার্কীনের গুরু প্রফেসার হপ্‌ম্যান জার্মানীতে ফিরিয়া গিয়া তৎকালীন অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতায় এনিলিন হইতে ধারাবাহিক বহুপ্রকার কৃত্রিম রঞ্জন প্রস্তুত করিতে থাকেন। ফরাসী দেশস্থ বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃকও এই একই সময়ে এনিলিনের উপর গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ নিকলসন নামক বৈজ্ঞানিক সরাসরি জলদ্বারা দ্রাবণ হইতে পারে এরূপ একটি নীলদ্রব্য আবিষ্কার করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পি গ্রীচ্‌ এমাইন নামক এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কিরূপে এজো গোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিভিন্ন সংযোজনা দ্বারা বহুবিধ বর্ণ কণিকার উদ্ভব হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করেন। এইরূপে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ক্রোইসেণ্ট ও ব্রোটানিয়ার, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ উইট্‌ ও মিষ্টার ব্যারো, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বোটীজার প্রভৃতি মনীষিগণ স্থায়ী ও অল্পকালস্থায়ী বহু রঞ্জন দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিয়া রঞ্জন-শিল্পে অমর হইয়া রহিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বৈজ্ঞানিক এ জি গ্রীণ প্রিমুলীন নামক হলুদ বর্ণের আবিষ্কার করিয়া এজো, ডায়াজো প্রভৃতি রঞ্জন গোষ্ঠীর এক নূতন অধ্যায় রচনা করিলেন। জার্মানীর বেয়ার নামক কোম্পানি হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হয়। ভারতীয় নীল মৃৎপাত্রে পচাইয়া রঙ করিতে হইত বলিয়া উহার রঞ্জন পদ্ধতিকে ভাটি বলা হইত। এই নবাবিষ্কৃত কৃত্রিম নীলও সেই কারণে ভ্যাট বা ভাটিনীল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই জাতীয় যে সমস্ত রঞ্জন তৎপর আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদিগকে ভ্যাট-জাতীয় রঞ্জনের গোষ্ঠীগত বলা হয়। জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, সুইস ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকগণের দুরূহ চেষ্টায় এই ভ্যাটজাতীয় রঞ্জন স্থায়িত্বে যেমনই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে বর্ণ-বৈচিত্র্যেও তেমনি এই গোষ্ঠী মানুষের সর্বপ্রকার প্রার্থিত বর্ণ দান করিতেছে। অপর দিকে এজো গোষ্ঠীর ক্রমাগত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া জার্মানীর বৈজ্ঞানিকগণ নেপথল নামক রঞ্জন হইতেও সবুজ ভিন্ন অন্য সকল বর্ণের অত্যুজ্জ্বল স্থায়ী বর্ণ সকল দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নেপথল-জাতীয় রঞ্জনগুলির রঞ্জন-পদ্ধতি সহজ ও সরল বলিয়া ইহারা সর্বাধিক আদরের বস্তু হইয়াছে।

বিগত দুইটি মহাযুদ্ধে রঞ্জন-শিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সত্য, তথাপি যুদ্ধোত্তর কালে বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ইয়োরোপের সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই অল্পাধিক নিজ নিজ রঞ্জনশিল্পের কারখানায় রঞ্জন-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। বাহিরে চাহিদা থাকায় উহাদের মধ্যে অনেক রাষ্ট্রই বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে তাহাদের রঞ্জনদ্রব্য সরবরাহ করিতেছে। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ভারতবর্ষই কৃত্রিম রঞ্জন সর্বাধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। বিগত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ বৈদেশিক রঞ্জনশিল্পের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে ও আহমেদাবাদের কতিপয় বস্ত্র-শিল্পের মালিকগণ একত্রিত হইয়া ভারতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণে রঞ্জন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই 'অতুল প্রডাক্ট' নামে পরিচিত। এই সকল রঞ্জন গন্ধকজাত অথবা

এনিলিন গোষ্ঠীভুক্ত। অতএব স্থায়িত্বের দিক দিয়া এই সকল রঞ্জন খুব উচ্চস্থান অধিকার না করিলেও রঞ্জন-কার্যে যে ভারতে ইহাদের চাহিদা অতি ব্যাপক তাহাতে সন্দেহ নাই। এসোসিয়েটেড্ রিসার্চ লেবোরেটারী নামে অপর একটি উদ্যমশীল প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে আনীত রঞ্জন প্রস্তুত কার্যের মূল উপাদান (raw materials or bases) হইতে বহুবিধ এজো সল্ট (Napthol Salts) ও ছাপার রঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন। ভারত সরকার রঞ্জন প্রস্তুতকারীগণকে উৎসাহিত করিবার মানসে যথাশক্তি সাহায্য করিতেছেন এবং উক্ত শ্রেণীর রঞ্জন আমদানির উপরেও বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী রঞ্জন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বোম্বাইয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রঞ্জন ব্যবসায়ী অমৃতলাল এণ্ড কোঃ লিঃ কল্যাণ সহরের সন্নিকটে একটি বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই কারখানায় প্রস্তুত রঞ্জনসকল 'অমর প্রডাক্টস্' নামে পরিচিত। আশা করা যাইতেছে যে, এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রকার রঞ্জন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন এবং বৈদেশিক শিল্পের ন্যায় স্বদেশেই রঞ্জন-শিল্পের মূল উপাদান প্রস্তুত করিয়া লইবেন। ভারতবর্ষের জনগণ বিচিত্রবর্ণপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষেই সর্বাধিক রঞ্জন ব্যবহৃত হয়। যদি স্বাধীন ভারতে কৃত্রিম রঞ্জন প্রস্তুত হইয়া এতদ্দেশের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয়, তবে ভারতীয় রঞ্জন-শিল্পের পুরাতন ঐতিহ্য কিয়ৎ পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রতিবৎসর যে ৮।১০ কোটি টাকা রঞ্জন-দ্রব্যাদির মূল্যস্বরূপ বাহিরে চলিয়া যায়, সে পথও রুদ্ধ হইবে।

সাগরদ্বীপ

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

দূরে দেখা যায় মেঘের মায়ায় চিত্রলেখা,
ধান-সাগরের পারে থাকে আঁকা রৌদ্ররেখা,
সমুদ্দুরের ললাটে পরানো সবুজ টীপ,
বাংলা মায়ের স্নেহ দিয়ে গড়া সাগরদ্বীপ।

এখানে আকাশ ধান-দিগন্তে ঘুমায় নুয়ে,
এখানে সাগর সূর্যের হাসি জ্বালায় ঢেউয়ে,
আকাশে-সাগরে প্রাণ-জোয়ারের ছন্দ শুনি',
আবার ভাঁটায় শুনি বিদায়ের চিরন্তনী।

চাঁচর-বালিতে উড়ে ফিরে যায় সিন্ধু-পাখী,
মহামিলনের পতদলে তার প্রণাম রাখি',
গঙ্গা-সাগর কল-কল্লোলে সম্মিলিত,
জোয়ারে-ভাঁটায় তাইতো হৃদয় উদ্বেলিত।

এখানে মানুষ　　নতুন দিনের　　স্বপ্ন দেখে,
লাঙলের ফালে　　ধরণীর বুকে　　ছন্দ লেখে,
নতুন কালের　　ভগীরথ ওরা　　কর্মরত,
প্রাণগঙ্গার　　ধারা বয়ে আনে　　সিদ্ধব্রত।

চিরশ্যামলেব　　মেদুর-মায়ায়　　স্বপ্নে-গড়া,
তৃণ তরুদল　　কাঁপে চঞ্চল　　ছন্দে ওড়া,
স্থলে জলে চলে　　চির-কানাকানি　　কী কল্লোল!
জাগে বাতাসের　　অধীর আবেগে　　কী হিল্লোল!
স্বর্গ-মহিমা　　মর্ত্য-মাধুরী　　মিলন-ভূমি,
হরিতে-হিরণে　　চির-লাবণ্যে　　ধন্য তুমি!

উল্‌টা সমঝিলি রাম

স্বামী পরশিবানন্দ

আমরা প্রায় সকলেই নিজেকে সাধারণতঃ মহা-বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ মনে করি এবং তদনুযায়ী কার্য করিয়া সুখ্যাতি এবং সুখ-শান্তি লাভ করবার আশা পোষণ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদিগকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। অথবা আত্ম-সুখ চাইতে গিয়ে দুঃখকেই বরং ডেকে নিয়ে আসি। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর গল্প বলেছেন।—একজন বৃদ্ধ একটি ভারী মোট মাথায় করে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা জানালেন একটি ঘোড়ার জন্য।—'এক টাট্টু দিলায়ে দে রাম' এই বলে। রাম একটি ঘোড়া আমায় দেওয়ার ব্যবস্থা কর; যাতে আমার বোঝা সহ ঘোড়ায় চড়ে একটু আরামে পথ চলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারি। ভগবান্ রামচন্দ্র ভক্তের আহ্বানে সাড়াও দিলেন। অদূরেই কতিপয় সিপাই ঘোড়ায় চড়ে কার্যোপলক্ষ্যে অন্যত্র যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে অকস্মাৎ একটি গর্ভবতী ঘোটকী বৎস প্রসব করলো। এখন সমস্যা দাঁড়ালো সদ্যপ্রসূত বাচ্চাটিকে কে বইয়ে নিয়ে যায়! ইত্যবসরে আমাদের সেই পথশ্রান্ত বৃদ্ধটি তথায় গিয়ে হলেন হাজির। সিপাইগণ সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন হাতে হাতে। সদ্য-প্রসূত অশ্ব-শাবকটিকে বৃদ্ধের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে ওদের পেছনে চলতে আজ্ঞা করলেন। বৃদ্ধ একে তাঁর নিজের ভারী বোঝা নিয়েই চলতে পারছিলেন না, তদুপরি অশ্ব-শাবকের ভার তাঁর স্কন্ধে, তাই প্রভু রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে দুঃখে করুণকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'উল্টা সমঝিলি রাম'—'উল্টা সমঝিলি রাম!' হে রাম! তুমিতো ঘোড়া আমায় দিলে সত্য, কিন্তু উল্টো হয়ে গেল যে? কোথায় আমি ঘোড়ায় চড়ে আরামে পথ চলবো, তা'না হয়ে কিনা ঘোড়াই আমার স্কন্ধে আরোহণ করলে?

আমাদের অবস্থাও আজ ঐ বৃদ্ধেরই মত। ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসককে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী

খেয়ে যথেষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদ পরে অসীম শান্তি ও আনন্দে জীবন কাটিয়ে দেবো ইহাই ছিল কামনা। বিদেশে আর অর্থ যাবে না, সব ধন-সম্পদের, খাদ্য-শস্যের মালিক হব আমরাই; সুতরাং আমাদের সুখ-শান্তির আর অবধি থাকবে না! এদিকে ইংরেজ ফরাসী চলে গেলো সত্যই ভারত থেকে এবং আরো বিদেশী যাঁরা আছেন এখনও রাজদণ্ড নিয়ে, তাঁরাও অদূর ভবিষ্যতেই যেতে বাধ্য হবেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? আমরা কি প্রচুর সুখাদ্য খেতে পারছি—না পাচ্ছি? আমাদের দুঃখদৈন্য, অসুখবিসুখ কি দূরে চলে গেছে?—একটি গল্প বলি শুনুন—একটি লোককে ভূতে পেয়েছিল। ভূত তাড়াবার জন্যে একজন সুদক্ষ রোঝা লাগানো হলো। রোঝা তার মন্ত্রপূত সরষে নিয়ে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভূত তাড়াবার জন্যে ঝার ফুঁক করতে লাগলেন। কিন্তু ফল দাঁড়ালো উল্টো! প্রথমে একটিমাত্র ভূতে ঐ ব্যক্তিকে পেয়েছিল; কিন্তু সরষে দিয়ে ঝার ফুঁক করার ফলে দেখা গেল যে, প্রত্যেক সরষের ভেতর থেকে এক একটি ভূত নির্গত হয়ে ঐ ব্যক্তিকে অধিকসংখ্যক ভূতগ্রস্ত এবং একেবারে পাগল করে তুললো।

আমরাও আজ ঐ ভূতগ্রস্তব্যক্তির ন্যায় আমাদেরই দেশবাসী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা সর্ববিষয়ে বঞ্চিত, প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি। খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন কি যে খাদ্য খেয়ে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা মানুষের মতো বেঁচে থাকবে সেই খাদ্যের বেলায়ও চলেছে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা ও কৃত্রিমতা! রুগ্নব্যক্তি বহু অর্থব্যয়ে রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার জন্যে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হলেন। চিকিৎসকও ঔষধ প্রয়োগ করলেন ঠিক; কিন্তু উহাতেও চলেছে প্রতারণা। দেখা গেল ঔষধটি খাঁটি না ভেজাল। রোগ প্রশমিত না হয়ে ক্রমশঃ বেড়েই চললো! কোনও গরীব অন্যায়ের প্রতিকারোদ্দেশ্যে বিচার বা সমাধান-প্রার্থী হয়ে গিয়ে দেখেন তাঁর জন্যে তা নয়। প্রচুর টাকা ঢাল, তবেই পাবে বিচার! জনহিতকর কাজের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করা হলো, তাও জনগণের সেবায় না লেগে আত্মসেবায় লাগাবার দিকেই লোকের উৎসাহ উদ্দম প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এজন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা সকলেই। তা'হলে আমাদের দ্বারাই যেমন সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কলুষ ও নীচতার সৃষ্টি হয়েছে তখন আমরাই আবার একে দূর করে দিয়ে সুস্থ ও সবল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আর ইহা কার্যে পরিণত করতে হলে আমাদিগকে সমষ্টিগতভাবে দলের মাধ্যমে কিছু করবার পূর্বে ব্যক্তিগত জীবনকেই উন্নততর আদর্শে গড়ে তোলবার জন্যে অধিকতর চেষ্টিত হতে হবে। অপরের দোষক্রটি খুঁজে বের করবার প্রযত্ন ত্যাগ করে আত্মদোষটিকে খুঁজে বের করে ভাল হওয়ার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। এ বিষয়ে আমরা এত উদাসীন যে প্রাণ-প্রতিম সন্তানসন্ততির কল্যাণচিন্তাও আমরা ভুলে গিয়ে যথেচ্ছব্যবহার করে থাকি। যত ছোটই হোক না কেন ছেলেমেয়েরা কিন্তু সকলেই ৩।৪ বছর বয়স থেকেই সব কিছু বুঝতে ও অনুকরণ করতে শেখে এবং পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনই হয় তাদের প্রথম অনুকরণের আদর্শবস্তু। শরীরের রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কত কষ্ট স্বীকার করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার চেষ্টা পিতামাতা করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের আদর্শ-হীনতার জন্যই সব কিছু ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হতে শুরু করেছে। সুতরাং আজ পিতামাতা গুরুজনকে একটি উন্নত আদর্শ-জীবন যাপন করতে চেষ্টিত হতে হবে। তবেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তুলতে সমর্থ হব। নতুবা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই চিরকাল থাকতে হবে। স্বাধীনতালাভও বৃথা হবে।

মানুষমাত্রকেই ইন্দ্রিয়ের তাড়না সহ্য করতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়রিপুর মধ্যে বিশেষ করে কাম ক্রোধ ও লোভ মানুষকে কিরূপে বিপথগামী করে তা বিবেকী ব্যক্তিগণের অজানা নেই। এই প্রধান রিপু তিনটি প্রায় এক সঙ্গেই আমাদিগকে আক্রমণ করে থাকে। কোনও জিনিস পাবার জন্যে লোভ হলো—ইহাকে কামও বলা যায়। কারণ ঐ দ্রব্যটি লাভের আকাঙ্ক্ষাই কাম। আর ঐ কাম ও লোভের বস্তুলাভের পথে যখনই কেউ বাধা সৃষ্টি করলো তখনই ক্রোধের উদ্রেক হলো। ক্রোধান্ধ হয়ে মানুষ কত অঘটনই না ঘটিয়ে ফেলে! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই কামক্রোধকে মহাশত্রু বলে গীতায় নির্দেশ করেছেন।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিনম্॥"

—ইহা রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে মহাশত্রু ব'লে জানবে।

এই কামক্রোধাদির উৎপত্তি মানবমনে কি করে হয়, তাহাও গীতাতে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিষয়সমূহ চিন্তা করতে করতে মানুষের সেই সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা বা তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। ঐ কামনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে পরিণত, ক্রোধ হইতে কর্তব্যাকর্তব্যরূপ-বিবেকনাশ এবং বিবেকনাশ হইতে শাস্ত্র ও আচার্যোপদেশ-জনিত সৎসংস্কারের স্মৃতিবিলোপ আর স্মৃতি-বিভ্রম হইতে মানুষের সদসদ্ বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং উহা ঘটলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

এই কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ যত প্রকারের স্বার্থপর কর্ম এবং অপরের অনিষ্টসাধন করে থাকে। ভালবাসা প্রেম, প্রীতি, দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণরাজী লাভে মানব বঞ্চিত হয়।

বলা অবশ্য সোজা যে কামনাবাসনা ত্যাগ কর। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর। কিন্তু বলামাত্রই তো আর কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে পড়ে না? এজন্য চাই প্রকৃষ্ট শিক্ষা ও অধ্যবসায়। স্বার্থপরতার বশেই মানুষ নীচ কাজ করতেও লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে না। এখন প্রশ্ন—কি ভাবে এই স্বার্থপর কাম ক্রোধ ও লোভাদির হস্ত থেকে মুক্ত হওয়া যায়? ইহাদিগকে কি তাহলে মেরে ফেলতে হবে, না ভোগ্য বিষয়বস্তু হতে দূরে অতি দূরে গিয়ে আমাদিগকে পালিয়ে বাস করতে হবে? না, ইহাদের একটিও নয়। সমস্যার সমাধান ইহা দ্বারা হবে না। ইন্দ্রিয়কে মেরে ফেললে কি হবে? আমাদের চক্ষু দুটিকে অন্ধকার দেওয়া হলো, তারা বাহ্য বস্তু আর দেখতে পেলে না; কিন্তু মনকে তো আর মারা যাচ্ছে না? সে যে সদাই ক্রীড়াশীল। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন:—

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

যে মূঢ়ব্যক্তি হস্তপদ ও বাক্যাদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরে সংযত করে মনে মনে শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, তাকে মিথ্যাচারী ব'লে জানবে। সুতরাং এখানে ভগবান্ আমাদিগকে হাত পা গুটিয়ে না থেকে বরং নিয়ত কর্ম করতেই নির্দেশ দিয়েছেন। 'নিয়তং কর্ম কুরু ত্বম্। কারণ কর্ম না করলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও নির্বাহ হবার নয়। তবে তাঁহার মতে ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করাই শ্রেয়ঃ; তা'হলেই কামনাবাসনা কমে আসবে আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও বশে এসে যাবে। আরো একটি বিষয়ে তিনি খুব জোর দিয়েছেন—সেটি হচ্ছে আত্মচিন্তা ও সুখের কথা না ভেবে শ্রীভগবান্

এবং চতুর্দিকস্থ জীবজন্তু প্রাণীজগতের দিকেও লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। তাই তিনি বললেন—'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'—যাহারা শুধু নিজের জন্যেই অন্ন রন্ধন করে তাহা পাপান্ন ভোজন করে থাকে। অপরের দুঃখ এবং অভাব-চিন্তনের এবং উহা দূরীকরণের চেষ্টার মাধ্যমে স্বভাবতঃই আমাদের নিজ নিজ বাসনা ত্যাগ হয়ে থাকে।

গীতাতে ভগবান্ বললেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ এবং অনুষ্ঠান করেন আপামর সাধারণ তাহাই অনুসরণ এবং অনুকরণ করে। অতএব আমাদের সমাজকে, দেশকে উন্নত করতে গেলে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে রয়েছেন তাঁদের সকলকে আদর্শচরিত্র হতে হবে কারণ তাঁদের দেখেই অপরে শিখবে। তাঁরা যদি ধর্মত্যাগী হন সাধারণ লোকও তাহাই করবে। ইহা ছাড়া যে সকল মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং মহান্ আদর্শ স্থাপন করে ইহজগৎ হতে বিদায় নিয়েছেন তাঁদের আদর্শ এবং কথা স্মৃতিপথে রেখে নিজ নিজ জীবনকে মহান্ পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। কবির কণ্ঠে তাই গীত হয়েছে ঃ—

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন
হয়েছেন চিরস্মরণীয় !
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয় ॥"

যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ইন্দ্রিয়সংযম বিষয়ের সমাধান অতি সুন্দররূপে করেছেন। উহাই আমাদের এখন অনুসরণীয়। তিনি বলেছেন—কামক্রোধাদি রিপু একেবারে যাবার নয়। মেরেও ফেলা যাবে না। সুতরাং মোড় ফিরিয়ে দাও। যে মনে আত্ম-সুখের কামনাই সদা জাগরূক সেই মনকে বল ভাবতে, চিন্তা করতে যে সকলেই যদি সুখী হয় তা'হলে ত আমিও সুখীই হব। সকলের মধ্যে যে আমিও একজন। আত্ম-তৃপ্তির জন্তে যে লোভ তোমাকে সর্বদা অপরকে প্রবঞ্চনা করতে প্রলুব্ধ করছে তাকেও বলো যে জন-সাধারণের কাজে আত্মনিয়োগকারী যেমন সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র সম্মানিত ও আদৃত—আত্মসুখ ছেড়ে এরূপ উন্নতিই তোমার লোভনীয় হউক। যে ক্রোধ সর্বদা মানুষকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন এবং হিতাহিত বিবেচনাশূন্য করে দিয়ে নিজের এবং অপরের অনিষ্টসাধন করতে উদ্যত, তাকেও বলো—এই অনিষ্টকারী মনোবৃত্তির উপরই তাহার কুপিত দৃষ্টিপাত করতে। অর্থাৎ তোমার আমার যে সব ইন্দ্রিয় অন্তরে এবং বাহিরে আছে তাহাদিগকে স্বার্থ-বুদ্ধি থেকে বৃহত্তর কাজে ও স্বার্থে নিয়োজিত করো। ভগবান্ সর্বব্যাপী সর্বত্র তাঁর অধিষ্ঠান—এইটি মনেপ্রাণে জেনে বৃহত্তর দৃষ্টি নিয়ে কার্য কর। তা'হলেই আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র ও দেশ, আমাদের এই পৃথিবী দুদিনেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। একমাত্র তখনই আমরা বুঝতে পারব যে, অপরের অনিষ্টাচরণে নিজেরই অনিষ্ট সাধিত হয় ; তেমনি অপরের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আমারও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আমারও শান্তি ! ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব সমাধান। সর্বশেষে আদর্শ মানব-সমাজগঠনে কবি অতুল প্রসাদ সেন মহাশয়ের একটি সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত পাঠকবর্গকে স্মরণ করতে অনুরোধ করি ঃ—

"সবারে বাসরে ভাল, নইলে (মনের) কালো
ঘুচবে নারে।
আছে তোর যাহা ভাল, ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ, বিলিয়ে দেনা যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী, তারো মাথায় আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী, ভবের বনে
ভয় বা কারে।
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে, রাখবি
কারে, কারে ফেলে
একই নায়ে সকল ভায়ে, যেতে হবে রে ওপারে॥"

সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জ্ঞানং মহৎ যদ্ধি জ্ঞানেষু রাজন্।
বেদেষু ধর্মেষু তথৈব যোগে॥
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধে পুরাণে।
সাংখ্যাগতং তন্নিখিতং নরেন্দ্র॥

মহাভাঃ শান্তি পর্ব

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যাবতীয় জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, বেদে, ধর্মে ও যোগে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, যে জ্ঞান বিবিধ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলই সাংখ্যাগত বা সাংখ্যেরই জ্ঞান। কিন্তু এই সাংখ্য যে প্রচলিত সাংখ্যদর্শন নহে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদিসূক্ষ্মপর্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থইব পরার্থ আরম্ভঃ।

সাং কাঃ—৫৬

এই কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন: এই আরম্ভ বা সৃষ্টি প্রকৃতি-কৃত, ঈশ্বরকৃত নহে। মহৎ হইতে সূক্ষ্ম পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিই প্রকৃতি-কৃত। এই সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্ম নহেন। ইহার যে কারণ নাই, তাহাও নহে। প্রকৃতিই ইহার কারণ। সৃষ্টি যদি অকারণ হইত, তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত ভাব বা অত্যন্ত অভাব হইত, অর্থাৎ তাহা হইলে হয় তাহাকে নিত্য বলিতে হইত, নতুবা তাহার অস্তিত্বই নাই বলিতে হইত। কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশশীল জগৎ নিত্য হইতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাও বলা যায় না। চিতিশক্তি অপরিণামী; সুতরাং ব্রহ্মও জগতের উপাদান হইতে পারেন না। ঈশ্বরাধিষ্টিত প্রকৃতি-কতৃ ক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না. কেননা ঈশ্বর নির্ব্যাপার (নিষ্ক্রিয়)। তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব। প্রত্যেক পুরুষের মোক্ষের জন্যই প্রকৃতি চেষ্টা করে—যেন স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহাই সৃষ্টি।

প্রকৃতি-কর্তৃক যাবতীয় সৃষ্টি হয়, জীব স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। সে ফল কর্মের স্বকীয় শক্তিদ্বারাই উৎপন্ন হয়। কর্মের ফলদাতা কোনও পুরুষ নাই। ইহাই সাংখ্যমত। সুতরাং এই দর্শনে জগদ্ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই নাই। সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের কোনও স্থানই নাই। সুতরাং এই দর্শনকেই ভীষ্ম সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে।

সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বর স্পষ্টই অস্বীকৃত হইয়াছেন।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাং সূ ১।৯২ (ঈশ্বর অসিদ্ধ—এইজন্য।) ইহার ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন: "ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ ন দোষঃ"—ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এই জন্য দোষ হয় না। এই সূত্রটি উত্তরপক্ষ, পূর্বপক্ষের উত্তর। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে এই সূত্রদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ইহাই মাত্র বলা হইয়াছে। যে উপলক্ষ্যে এই সূত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এই:

সাংখ্যসূত্রে প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—
যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং
তৎপ্রত্যক্ষম্ ১।৮৯

যে বিজ্ঞান (বুদ্ধি-বৃত্তি) সম্বদ্ধ (বিষয়ের সহিত) হইয়া সম্বদ্ধ বস্তুর আকার ধারণ করে, তাহাকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। অর্থাৎ বিষয়ের সন্নিকর্ষ-নিমিত্ত বুদ্ধি যে আকার ধারণ করে, বুদ্ধির সেই আকার বা বৃত্তিই প্রত্যক্ষ। কিন্তু ইহাই যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে যোগীদিগের

প্রত্যক্ষকে তো প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অতীত, অনাগত ও ব্যবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ। তাহাতে বুদ্ধির সহিত প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর সম্বন্ধ কোথায়? এই পূর্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলেন—

যোগিনাং অবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন দোষঃ

সাং সূ—১।৯০

অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যোগীদিগের প্রত্যক্ষ অবাহ্য প্রত্যক্ষ। তাহাতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যোগীদিগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সংজ্ঞা যে একেবারেই অপ্রযোজ্য, তাহাও নহে।

লীনবস্তু-লব্ধাতিশয়-সম্বন্ধাৎ বা অদোষঃ। ১।৯২

যোগীদিগের চিত্তের সহিত লীনবস্তুদিগের বাস্তবিকই যোগ হয়। উৎপাত বা বিনাশ প্রকৃতপক্ষে কোনও বস্তুরই হয় না। যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহার কারণে লীন অবস্থায় আছে; যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাও তাহার কারণে লীন অবস্থায় আছে। এই লীন বস্তুদিগের সহিত যোগীদিগের চিত্তের বাস্তবিকই সম্বন্ধ ঘটে। (অতিশয় সম্বন্ধ=যোগীদিগের চিত্তের সম্বন্ধ)

ইহার পরে যে আপত্তি উঠিতে পারে তাহার খণ্ডনের জন্যই 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' সূত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর যোগী ও ভক্তগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায়। কিন্তু তিনি অতীন্দ্রিয় ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বুদ্ধি তাঁহার আকার ধারণ করিতে পারে না। এ অবস্থায় তাঁহার প্রত্যক্ষ কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহারই উত্তর—প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও ঈশ্বর আছেন, অপ্রত্যক্ষরূপে আছেন, এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। ইহার পরে আছে—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।

সাং সূ ১।৯৩

পুরুষ দ্বিবিধ—মুক্ত ও বদ্ধ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের পুরুষের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ নহে। এই সূত্রদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বই যে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই প্রতীত হয়। তবুও কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, কেবল ইহা বলাই সাংখ্যকারের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। ইহার পরে আছে—

উভয়থাপি অসৎকরত্বম্। সাং সূ ১।৯৪

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ঈশ্বর যদি মুক্তপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার স্রষ্টৃত্বাদি থাকে না; কেননা মুক্তপুরুষে সৃষ্টির প্রযোজক অভিমান ও রাগাদি নাই। যদি বদ্ধ পুরুষ হন, তাহা হইলে মূঢ়ত্ববশতঃ তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি ক্ষমতা থাকিতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন, মুক্ত ও বদ্ধ উভয়বিধ পুরুষেরই লিঙ্গ শরীর আছে, বলিয়া তাঁহারা প্রত্যক্ষযোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের লিঙ্গ শরীর নাই বলিয়া তিনি প্রত্যক্ষ নহেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাই মাত্র ৯৩ ও ৯৪ সূত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় নাই।

ইহার পরেও ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহাদের খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা। সাং সূ ১।৯৫

ঈশ্বর ভক্তগণকে দর্শন দিয়াছেন, এবং তাঁহার দর্শন পাইয়া ভক্তগণ তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যদি অসিদ্ধই হন, তাহা হইলে এই সকল শাস্ত্রীয় উক্তির কি হইবে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিতেছেন "সে সকল স্তুতি মুক্ত আত্মাদিগের প্রশংসা। অথবা অণিমাদি-সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের উপাসনা; ঈশ্বরের স্তুতি নহে। যাঁহারা সাংখ্যের নিরীশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন মুক্ত পুরুষগণ গুণসঙ্গাতীত হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। পরমাত্মার

প্রতি মানসিক গতি ফিরাইবার জন্য মুক্ত পুরুষ-দিগের স্তুতি করা হইয়াছে। কিন্তু পরমাত্মার কথা সাংখ্য কোথায় বলিলেন, তাহা তাঁহারা বলেন না।

পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় প্রকৃতি কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা সাংখ্য মত। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-বশতঃ প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে, ইহাও তো বলা যায়? সাংখ্য এ যুক্তিও স্বীকার করেন নাই। ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—

তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। সাং সূ ১।৯৬

পুরুষের অধিষ্ঠান-বশতঃ প্রকৃতি সৃষ্টি করে, সত্য। কিন্তু সে অধিষ্ঠান সংকল্পপূর্বক অধিষ্ঠান নহে। তাহা সন্নিধান মাত্র। যেমন অয়স্কান্ত মণির (চৌম্বক লৌহের) সন্নিকর্ষ-বশতঃ শল্যবিদ্ধ অঙ্গ হইতে শল্য বাহির হইয়া আসে; সেখানে অয়স্কান্ত মণির কোনও সংকল্প নাই, তেমনি পুরুষের সন্নিধিমাত্র দ্বারাই প্রকৃতির মহৎরূপে পরিণাম হয়। এই পরিণামে পুরুষের কোনও কর্তৃত্ব নাই। সুতরাং জগতের সৃষ্টিকর্তা কোনও পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বর যদি না থাকেন তবে কর্মের ফল দেয় কে? ইহার উত্তর—

ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎ-সিদ্ধেঃ। সাং সূ ৫।২

ঈশ্বর জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্মের ফল দান করেন না। কর্মের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারাই তাহার ফল উৎপন্ন হয়।

পরে আছে—

স্বোপাকারাৎ অধিষ্ঠানং লোকবৎ। সাং সূ ৫।৩

সংসারে লোকে কর্ম করে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। ঈশ্বর বলিতে তো পূর্ণ পুরুষ বুঝায়, তাঁহার কিছুরই অভাব থাকিতে পারে না। সাধারণ লোকের মতো কর্ম করিবেন তিনি কিসের অভাবে?

লৌকিকেশ্বরবৎ ইতরথা। সাং সূ—৫।৪

ঈশ্বরের নিজের স্বার্থ আছে, যদি বল, তাহা হইলে তিনি তো লৌকিক ঈশ্বর—অর্থাৎ অপূর্ণকাম সুখদুঃখযুক্ত শ্রেষ্ঠ মানুষের মত হইলেন, তবুও যদি এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বল, তাহা হইলে—

পারিভাষিকো বা। সাং সূ—৫।৫

ঈশ্বর শব্দ একটা পরিভাষামাত্র হইয়া পড়ে, তিনি প্রকৃত ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাহার পরে রাগ বা উৎকট ইচ্ছা ব্যতীত তো জগতে অধিষ্টিত হইয়া জগৎব্যাপার নির্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। কেননা, রাগই কর্মপ্রবৃত্তির নির্দিষ্ট কারণ। কিন্তু ইষ্টার্থ সিদ্ধির জন্য উৎকট ইচ্ছা ঈশ্বরে সম্ভবে না। তাঁহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। ইহাই তো ঈশ্বর শব্দের অর্থ।

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ। সাং সূ—৫।৭

রাগ যদি ঈশ্বরে থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নিত্যমুক্ত বলা যায় না। যদি বল—

প্রধানশক্তিযোগাৎ চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। সাং সূ—৫।৮

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাদি পুরুষে যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গপ্রাপ্তি হয় বলিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ তো অসঙ্গ। যদি বল জগতের সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরের নিজের কোনও কার্য না থাকিলেও কেবল তাঁহার সন্নিধিমাত্রেই অয়স্কান্ত মণি কর্তৃক লৌহে গতিশক্তি সঞ্চারের মতো জগৎব্যাপার নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে তো সকল পুরুষকেই ঈশ্বর বলা যায়, কেননা, প্রত্যেক পুরুষের সন্নিধিবশতঃই প্রকৃতির ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

সত্তামাত্রাৎ চেৎ, সর্বৈশ্বর্যম্। সাং সূ—৫।৯

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাইই, অনুমান ও শব্দ প্রমাণও নাই।

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। সাং সূ—১।১০

সম্বন্ধ যদি থাকে তবেই সেই সম্বন্ধ হইতে অনুমান

করা যায়। সম্বন্ধ=ব্যাপ্তি। অভাব=অসিদ্ধি। মহদাদি কার্য, সুতরাং তাহারা সকর্তৃক অর্থাৎ তাহাদের কর্তা আছে। এই ন্যায়ে যদি বল ঈশ্বরই তাহাদের কর্তা, তাহা হইলে ঈশ্বর হইলেন কর্তৃত্বের ব্যাপ্য। কিন্তু ঈশ্বর অপ্রযোজক বলিয়া অর্থাৎ তিনি ক্রিয়াহীন বলিয়া তাঁহার ব্যাপ্যত্ব অসিদ্ধ। সুতরাং এই অনুমান অসিদ্ধ।

সম্বন্ধাভাবাৎ ন অনুমানম্। সাং সূ—৫।১১

শ্রুতিও জগৎকে প্রধানেরই কার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতিঃ অপি প্রধানকার্যত্বস্য। সাং সূ—৫।১২

শ্রুতিতে আছে অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা (সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী) এক অজা (প্রকৃতি) আপনার সরূপ বহু প্রজা সৃষ্টি করেন। সুতরাং শব্দপ্রমাণও ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের অনুকূল নহে।

ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই—এই উক্তি নিতান্তই আশ্চর্যজনক। "বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ"—তাঁহার স্রষ্টৃত্বের প্রমাণ নাই? যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" শ্লোকটি আছে তাহার আদ্যন্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। উহার তৃতীয় শ্লোকটি এই—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

"ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ স্বগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) দ্বারা প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বরের আত্মশক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেই পরম দেবতাই কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা প্রভৃতি সৃষ্টির গৌণকারণসমূহকে নিয়মিত করেন।"

উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

"ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম দৈবত, পতিদিগের পতি, শ্রেষ্ঠ (হিরণ্যগর্ভ) হইতেও শ্রেষ্ঠতম, চিরবন্দনীয় ভুবনেশ্বর পরমদেবকে আমরা জানি।"

কত উদ্ধৃত করিব? সমস্ত উপনিষৎখানি ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ। তবুও ঈশ্বরসম্বন্ধে শব্দপ্রমাণ নাই! যে অজার কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, সেই অজা প্রকৃতিকে উক্ত উপনিষদে 'মায়া' বলা হইয়াছে এবং মহেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" (৪।১০)

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ
কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ৬।১৬

তিনি বিশ্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ, কালের কর্তা, গুণী, সর্ববিৎ, প্রধানের ও জীবাত্মার স্বামী, সত্ত্বাদিগুণের নিয়ন্তা এবং সকলের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের কারণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সকল প্রমাণ-খণ্ডনের চেষ্টা প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের ঈশ্বরাস্বীকৃতিকে প্রৌঢ়িবাদ বা অতিশয়োক্তি বলিয়াছেন। (প্রৌঢ়িবাদ=Bold aseertion, pompous speech—Monnier Williams) বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরবাদী। তাঁহার মতে সাংখ্যের ঈশ্বরের অস্বীকৃতি উদ্দেশ্যমূলক। ঐশ্বর্যে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বর স্বীকার করিলে নিত্য ঐশ্বর্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ঐশ্বর্যে বৈরাগ্য সম্ভবে না। নিত্য ঐশ্বর্য স্বীকার করিলে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাভ্যাসে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। এই জন্যই সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরের প্রতিষেধ করিয়াছেন। বিজ্ঞান-

ভিক্ষুর মতেও সাংখ্যের এই অংশ দুর্বল। দর্শনের উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার। অন্য কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা দার্শনিকের চালিত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং অন্য কোনও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাংখ্যকার ঈশ্বরসম্বন্ধে সত্যগোপন করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর অর্থে সগুণ ব্রহ্ম—জগৎস্রষ্টা, ইচ্ছাময়, সকল কল্যাণ, গুণের আকর সগুণ ব্রহ্ম। সাংখ্য সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকারও সাংখ্য করেন নাই। যদিও তিনি পুরুষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উপনিষদের ব্রহ্মের বর্ণনার অনুরূপ, তথাপি তাঁহার পুরুষ বহু, কিন্তু ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না।

সত্য বটে, সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা পুরুষ-বহুত্ব প্রমাণিত হয় না—জীব যে বহু তাহাই প্রমাণিত হয়। সাংখ্য-মতে প্রত্যেক পুরুষই বিভু ও অন্যনিরপেক্ষ। তাহারা—একরস চৈতন্যস্বরূপ। কোনও ভেদই এক পুরুষের সহিত অন্য পুরুষের নাই। কিন্তু দুই বস্তুর মধ্যে যদি কোনও ভেদই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন বলা যায় না। বস্তুতঃ সাংখ্য পুরুষের যে সকল ধর্মের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারা এক অখণ্ড বিভু চিন্ময় ব্রহ্মেই সংগত হইতে পারে। সাংখ্যের পুরুষে বহুত্ব সাংখ্যদর্শনের পক্ষেও অপরিহার্য নহে। কিন্তু সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না।

সাংখ্যের মহৎ সমষ্টিবুদ্ধি অথবা ব্যষ্টিবুদ্ধি সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মহৎকে ব্যষ্টিবুদ্ধি বলিলে যে অসঙ্গতির উদ্ভব হয়, পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মহৎ হইতে যদি ভিন্ন ভিন্ন তন্মাত্র ও স্থূল ভূতের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জীবের জগৎ অন্যান্য জীবের জগৎ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে, সর্বজীবসাধারণ এক জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা তাহা হইলে করা যায় না। সুতরাং প্রকৃতি হইতে প্রথম যে মহতের উদ্ভব হয়, তাহা বিশ্ব-বুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতই গ্রহণযোগ্য। মনুসংহিতায় প্রথম যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে এই মতই গৃহীত হইয়াছে। মনুসংহিতায় আছে তমোভূত, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির প্রেরক (তমোনুদঃ) অব্যক্ত, স্বয়ম্ভু, অপ্রতিহত-সৃষ্টিসামর্থ্য (বৃত্তৌজাঃ) ভগবানই অব্যক্তাবস্থাপন্ন আকাশকে মহাভূত প্রভৃতিতে প্রকাশিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ততঃ স্বয়ম্ভু ভগবান্ অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥

মনুসংহিতা—১।৬

তারপর—

যোঽসৌ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়ং উদ্বভৌ॥

মনুসংহিতা—১।৭

ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্বভূতময়, অচিন্ত্য পুরুষ যিনি ছিলেন, তিনি নিজে মহদাদি কার্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

চরকসংহিতায় যে সাংখ্যমতের বর্ণনা আছে, তাহাতে অব্যক্ত আত্মা বলা হইয়াছে। এই আত্মা পরমাত্মা নামেও অভিহিত হইয়াছেন। চরকমতের সহিত মনুর বর্ণনার বিরোধ নাই। প্রকৃতি হইতে প্রথম আবির্ভূত মহৎই মনুবর্ণিত ভগবান্। সাংখ্য মতে এই মহৎ হইতে যাবতীয় সৃষ্টি হয়; মহতের মধ্যে ইচ্ছা আছে, রজোগুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তিও আছে। সুতরাং এই মহৎ বা হিরণ্যগর্ভকে ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিতে বাধা নাই।

কিন্তু সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্যসূত্রে মহৎকে

ঈশ্বর বলা হয় নাই। ইহাদের মতে মহৎ অচেতন; পুরুষের প্রতিবিম্ব ইহার উপর পতিত হয় বলিয়া ইহা চেতনের সাদৃশ্য লাভ করে। যদিও বহুসংখ্যক পুরুষের প্রত্যেকেই অসীম, এবং প্রত্যেকের দ্বারাই সমগ্র প্রকৃতি উজ্জলিত হইতে পারে, এবং তাহার ফলে বিশ্ব-মহতের আবির্ভাব হইতে পারে, তথাপি বিশ্ব-মহতের অধিষ্ঠাতা অন্য কোনও পুরুষের কথা সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যকারিকায় নাই। পরন্তু সাংখ্য-সূত্রের একাধিক সূত্রে ঈশ্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যে মহৎই যে ঈশ্বররূপে স্বীকৃত হইতেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। উপনিষদে মহৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; চরক-সংহিতার অব্যক্ত পুরুষ হইতে মহতের উদ্ভব বলা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রেও ইহার সমর্থক প্রমাণ আছে। প্রচলিত সাংখ্যসূত্র হইতে ঈশ্বর-স্বীকৃতি-সূচক সূত্রসকল সযত্নে বর্জিত হইলেও, দুই একটি সূত্রে ঈশ্বর-স্বীকৃতির প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীসে পাইথগোরীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত সকল দার্শনিক মতই পাইথাগোরাসের মত বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন এসকল মতের সকলগুলিই পাইথাগোরাসের মত নহে। তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের অনেক মতও পাইথাগোরাসের নামে চলিয়া আসিয়াছিল; সাংখ্যসূত্রের সকল সূত্রই কপিলরচিত বলিয়া প্রচারিত হইলেও, ইহার সকল সূত্রই যে কপিল রচিত নহে এবং অন্যান্য সাংখ্যাচার্যদিগের মতও যে ইহার মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। অন্য আচার্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহাদের মতও সাংখ্যসূত্রে সংগৃহীত হওয়ার ফলে, ভাষ্যকারদিগকে পরস্পরবিরুদ্ধ মতের সমন্বয় করিতে হইয়াছে। তাই বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বর-বাদী হইলেও, তাঁহার ব্যাখ্যা নিরীশ্বরবাদের সমতুল্য হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৬ ও ৫৭ সূত্রে প্রাচীন সাংখ্যে ঈশ্বর-স্বীকৃতির বলবৎ প্রমাণ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু কষ্টকল্পনার সাহায্যে উক্ত সূত্রদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সূত্রকারের অর্থ ঢাকা পড়িয়াছে।

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা,
মগ্নবৎ উত্থানাৎ। সাং সূ ৩।৫৪

অকার্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ
পারবশ্যাৎ। সাং সূ ৩।৫৫

প্রকৃতিলীন হওয়াই কৃতকৃত্যতা নহে। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন জল হইতে উত্থিত হয়, প্রকৃতিলীন ব্যক্তিও তেমনি পুনরুত্থিত হয়। কিন্তু যে প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেল, তাহাকে পুনরুত্থাপিত করে কে? প্রকৃতি তো অন্য কোন কারণ দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন পারবশ্যতা বশতঃই ইহা সম্ভবপর হয়। এখন এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই "প্রকৃতেঃ অকার্যত্বেঽপি, অপ্রের্যত্বেঽপি, অন্যেচ্ছানধীনত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পুনরুত্থানৌচিত্যং তল্লীনস্য কুতঃ? পারবশ্যাৎ, পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ।" প্রকৃতি কাহারও কার্য নহে, তাহার প্রেরক অপর কেহ না থাকিলেও, প্রকৃতি অপরের ইচ্ছাধীন না হইলেও "তদ্‌যোগঃ" অর্থাৎ প্রকৃতিলীন ব্যক্তির উত্থানকার্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? উত্তর—পর-বশতা-হেতু, অর্থাৎ পুরুষার্থসাধনরূপ কর্ম প্রকৃতির আছে বলিয়া বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে পারবশ্য অর্থ লীন পুরুষের বশ্য।

কিন্তু এইভাবে অর্থ করিবার কোনও সংগত কারণ নাই। অনিরুদ্ধের ভাষ্যে "পর" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "আত্মা"। "অকার্যত্বম্ অপ্রযো-জকত্বম্, কিন্তু পরতন্ত্রত্বম্ প্রকৃতৌ অস্তি ইতি তদ্যোগাচ্চ বন্ধনযোগঃ, পর আত্মা কিংরূপ ইত্যত্র আহ।" অকার্যত্ব অর্থাৎ অপ্রযোজকত্ব প্রকৃতির আছে, কিন্তু পরতন্ত্রত্বও আছে। তাহাতেই বন্ধযোগ হয়। "পর" অর্থাৎ আত্মা কিরূপ তাহা সূত্রকার পরবর্তী সূত্রে বলিয়াছেন,—

"স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা।" সাংখ্যসূত্র ৩।৫৬ · তিনি সর্ববিৎ ও সর্বকর্তা এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্টতঃই কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি "সঃ" শব্দে প্রকৃতিলীন পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছেন।

"স হি পূর্বসর্গে কারণ-লীনঃ সর্গান্তরে সর্ববিৎ সর্বকর্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি। প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদ প্রাপ্তৌচিত্যাৎ। (যিনি পূর্ব সৃষ্টিতে কারণলীন ছিলেন, তিনি সর্গান্তরে সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা ঈশ্বর আদিপুরুষ হন, প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহারই প্রকৃতি-পদ-প্রাপ্তি হয় বলা উচিত।) কিন্তু প্রকৃতিলীন পুরুষ তো একজন মাত্র নহেন। প্রলয়ে মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্য সকল পুরুষই প্রকৃতিতে লীন হন। সুতরাং "সঃ" শব্দে কোন্ লীন পুরুষকে বুঝাইবে? এইরূপ অমুক্ত কোনও পুরুষই প্রকৃতির স্পষ্ট কার্যের প্রবর্তক হইতে পারেন না। প্রকৃতির যে বিকারের ফলে তিনি পুনরায় উদ্বুদ্ধ হন তিনি কখনও সেই বিকারের কর্তা হইতে পারেন না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে সকল পুরুষই চিরকালই নির্লিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সহিত কোনও পুরুষেরই যোগ কখনও হয় না। প্রকৃতিতে লয় হইতে পারে লিঙ্গশরীরের, পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রাহী লিঙ্গ শরীরের। প্রলয়ান্তে উদ্বুদ্ধও হয় লিঙ্গশরীরই। যে লিঙ্গশরীরের প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই হয় নাই, তাহা কখনও সর্বজ্ঞ ও সবকর্তা৽ হইতে পারে না। প্রকৃতির বিকার লিঙ্গশরীরের সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সূত্রের "সঃ" শব্দ যে প্রকৃতিলীন পুরুষের সূচক নহে, তাহা নিশ্চিত। পূর্ব সূত্রে পারবশ্য শব্দের 'পর'ই তাহার লক্ষ্য।

পরবর্তী সূত্রে আছে—

"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" সাংখ্যসূত্র ৩।৫৭

এবংবিধ ঈশ্বর সিদ্ধ অসিদ্ধ নহেন। এখানেও বিজ্ঞানভিক্ষু "ঈদৃশেশ্বর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রকৃতিলীন জন্য ঈশ্বর।" কিন্তু ৫৬ সূত্রের "সঃ" শব্দের লক্ষ্য তৎপূর্ব সূত্রের "পর" শব্দ ধরিলে "ঈদৃশেশ্বর" শব্দের অর্থ হয় সর্ববিৎ, সর্বকর্তা, নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম নিজে কোনও কর্ম করেন না, ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যে প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, এবং যাবতীয় জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং তাহাকে সর্ববিৎ, সর্বকর্তা বলিলে দোষ হয় না। এই ব্রহ্মকর্তৃক অনুস্যূত মহৎ সগুণ ঈশ্বর। তাহা হইতে পরবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি হয়। মহৎই মহান্ আত্মা, তিনি হিরণ্যগর্ভ, "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্।" তিনি ব্রহ্মা। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সম্বভূব। বিশ্বস্য কর্তা, ভুবনস্য গোপ্তা।" প্রলয়ে তিনি সুপ্ত হন, সর্গে পুনরাবির্ভূত হন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যক্ত রূপ। তিনিই "সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো।" তিনি "ধিয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" প্রাচীন সাংখ্যে তিনি স্বীকৃত ছিলেন। অর্বাচীন সাংখ্য তাঁহাকে বর্জন করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

• সেশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত পাতঞ্জল সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ইহা হইতে মনে হয় সাংখ্য বহুল পরিমাণে পাতঞ্জল দর্শনে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার সমাধিপাদের ২৩ সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধান সমাধিলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে,—প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ। আবর্জিত ঈশ্বরঃ (সাধকের ভক্তিবশতঃ তাহার অভিমুখীকৃত ঈশ্বর) তম্ অনুগৃহ্নাতি (তাহাকে অনুগ্রহ করেন।) এই ঈশ্বর প্রধান ও পুরুষের অতিরিক্ত। তিনি ভক্তির বশ। ঈশ্বরের বর্ণনা পরবর্তী সূত্রে আছে। (ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল ও অকুশল কর্ম, কর্মের বিপাক (কর্মফল) ফলের অনুরূপ আশয় (বাসনা বা

সংস্কার)—এই সকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অন্যান্য পুরুষ হইতে ভিন্ন, এইরূপ এক পুরুষই ঈশ্বর। "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং" "পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ।" ১।২৫—২৬ তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান বর্তমান অর্থাৎ সর্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি তাহাতে বিদ্যমান্, তাই তিনি সর্বজ্ঞ, যাঁহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তিনিই সর্বজ্ঞ।

তিনি পূর্ববর্তী গুরুদিগেরও (কপিলাদির) গুরু, তিনি কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। "ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—কৈবল্যপ্রাপ্ত অনেকেই হইয়াছেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়াই কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ কোনও বন্ধন কখনও ছিল না, কখনও হইবেও না। স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বরঃ—তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। এই সদা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে সাধকের চিত্তের অভিনিবেশের ফলে বিবেকসিদ্ধির বাধা-সৃষ্টি হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলি সে ভয় করেন নাই, তিনি তাঁহার উপাসনার বিধি দিয়াছেন সমাধি-লাভের উপায় বলিয়া।

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বেও অনুগীতা পর্বা-ধ্যায়ে (৪০ অধ্যায়ে) মহত্তত্ত্বের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে মহত্তত্ত্ব ও ঈশ্বর অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাহাতে আছে "মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্বত্র বিদ্যমান্, তিনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান্ আছেন।...ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপাক্ষ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরমপুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, তিনি বুদ্ধি-তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহৎতত্ত্ববুদ্ধি (ব্যষ্টিবুদ্ধি) হইতে ভিন্ন। তিনি "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ ততঃ"—মহান্ আত্মা। তিনি নির্গুণব্রহ্মের ব্যক্ত-রূপ। তিনি ঈশ্বর। ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি সাধকের অনুভবগম্য হন।

অনেকের মতে "তত্ত্বসমাস" সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থ। কিন্তু তত্ত্বসমাস বলিতে গেলে একখানি সূচীপত্র মাত্র। ইহাতে ২২টি মাত্র সূত্র। কোনও সূত্রেই ঈশ্বরের কথা নাই। আসুরির নামে প্রচলিত তত্ত্বসমাসের এক ভাষ্য আছে। মহত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে তত্ত্বসমাসের বৃত্তিতে আছে "অব্যক্তাৎ প্রাক্ উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণ অধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে।" *এই সর্বগত পুরুষই ঈশ্বর। তিনি প্রাচীন সাংখ্যে স্বীকৃত ছিলেন।

* ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাংখ্যপরিচয়ে উদ্ধৃত।

"আমার দৃঢ় প্রত্যয়, প্রত্যেক হিন্দুই অপর সব হিন্দুর ভাই; আমরাই "ছুঁইও না, ছুঁইও না" রবে কোটি কোটি হিন্দুকে অধঃপতিত করিয়া ফেলিয়াছি। আর ইহারই ফলে আজ সমগ্র দেশ নীচতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত। এই উপেক্ষিত জনসাধারণকে সমাজের উচ্চস্তরে লইয়া আসিতে হইবে; আশা এবং আত্মমর্যাদার বাণীর দ্বারা তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে; বলিতে হইবে, 'তোমরাও আমাদের মত মানুষ; তাই সামাজিক জীবনে আমাদের যে-সব সুবিধা আছে, সে-সবই তোমাদেরও প্রাপ্য।'"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ ও বঙ্গদেশ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
(অধ্যক্ষ সংস্কৃত-শিক্ষাপরিষৎ)

বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিচালিত সংস্কৃতশিক্ষা-সমিতির নির্দেশ-অনুসারে বিগত ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার বাহাদুর বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়নকে সংস্কৃত কলেজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ এই নূতন নামে বিভূষিত করেন। সেই সময় হইতে এই পরিষদ্ নিরন্তর অভ্যুন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে পরিষদের সাহায্যপ্রাপ্ত টোল সংখ্যা ছয় শত। বিগত বৎসরে পরিষৎকে ত্রিশ হাজার চিঠির উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় এই পত্রসংখ্যা দৈনিক তিনখানাও ছিল না, এবং বৎসরে এক হাজারের অধিক পত্র ব্যবহার করতে হতো না।

সংস্কৃত কলেজে থাকতে পরিষদের বিলের সঙ্গে বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। (ট্রেজারী মারফতে বিল-প্রেরণের বা অর্থবিতরণের ব্যবস্থা ছিল না) পরিষৎ লক্ষ লক্ষ টাকা বঙ্গদেশের বিভিন্ন ট্রেজারীর মারফতে পণ্ডিতমহাশয় ও ছাত্রগণের নিকট বিভিন্ন খাতে প্রেরণ করেছেন।

সংস্কৃত কলেজ থেকে পরিষদ্ বিভাগের পূর্বে পরিষদের ব্যয় ছিল মোটের উপর ১৫,০০০ টাকা, তা কেবল পরিষদের ছাত্র ও অধ্যাপক-বৃত্তি-প্রদান এবং অফিসের খরচেই ছিল সীমাবদ্ধ। এখন ১৫টি জেলার পরিদর্শক-বিভাগের সংস্কৃত-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ আমাদের পরিষদের কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং গ্রাণ্ট ও প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক প্রভৃতির পারিশ্রমিক বিশেষভাবে প্রবর্ধিত হওয়ায় খরচ প্রায় তিন লক্ষ টাকায় পরিণত হয়েছে।

আগে, বৎসরে কার্যকরী সমিতির ২-৩টির বেশী অধিবেশন হ'তো না। এখন ছয়টি বোর্ড অফ্ ষ্টাডিস্, পরিষদ্, কর্মসমিতির অধিবেশন, নানা রকমের অধিবেশন নিয়ে বৎসরে প্রায় শত-সংখ্যক সভার অধিবেশন হয় পরিষদে।

১৯৪৮ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সালে ৩,৪৫৩, ১৯৪৯ সালে ৭,৮৪৯; ১৯৫০ সালে ৮,০৭৭, ১৯৫১ সালে ৭,৬০০; ১৯৫২ সালে ৭,৩০৬, ১৯৫৩ ৭,৬৫৮; জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছে। এবৎসরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,০০০। পরীক্ষা-কেন্দ্রও ১৯৪৮ সাল থেকে বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশের বাইরে সর্বসমেত ৮টি বেড়েছে। বঙ্গদেশে ২৪ এবং বঙ্গদেশের বাইরে ২৭টি কেন্দ্রে বর্তমানে আমাদের পরীক্ষা গৃহীত হচ্ছে।

আমরা মোটের উপর বৎসরে ২৬৭ খানা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করি—তার মধ্যে আবার বহু বিভাগ ও উপ-বিভাগ আছে। কোনও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অধিক প্রশ্নপত্র রচিত হয় না। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা কম অথচ পত্রসংখ্যা বেশী বলে মোটের উপর আমাদের বৎসরে ২,৫০০ বড় পার্শ্বেল ও তন্মধ্যে ছোট-বড় সর্ব-সমেত প্রায় দশ হাজার প্যাকেট ভারতবর্ষের সর্বত্র সংপ্রেরণ এবং পুনর্গ্রহণ করতে হয়।

১৯৪৮ সালের পূর্বে, অর্থাৎ এসোসিয়েশনের কালে কার্যোপলক্ষে আগত পণ্ডিতমহাশয়গণ ও অন্যান্য ব্যক্তির সংখ্যা গড়পড়তা দৈনিক ৪-৫ জনের অধিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে উক্ত সংখ্যা দৈনিক একশতেরও অধিক।

পূর্বে রেজেষ্ট্রীকৃত পণ্ডিত মহাশয়গণের সংখ্যা তিনশতের অধিক ছিল না। সম্প্রতি কেবল পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ষোলশত রেজেষ্ট্রীকৃত পণ্ডিতমহাশয় আছেন। এ সমস্ত পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে আমাদের নিত্য-সম্পর্ক। এতদ্ব্যতীত নিখিল ভারতে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচলের সমগ্র পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ —কারণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সর্বসমেত প্রায় দশটি সংস্কৃতপরীক্ষা-সংস্থা (Examinies body) থাকলেও আমাদের সংস্থাই প্রাচীনতম এবং আজ পর্যন্ত এর ডিগ্রী নিখিল ভারতে সর্বাগ্রগণ্য এবং আমাদের ছাত্রসংখ্যা, পণ্ডিতমহাশয় ও টোলের সংখ্যাও সর্বাধিক। তজ্জন্য আমাদের পরিষদের ৫১টি কেন্দ্রের মধ্যে সাতাশটি কেন্দ্রই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। এবৎসরেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কেবল মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিশ জন ছাত্র কলিকাতায় সমুপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিয়ে গেছেন।

আমরা যারা সংস্কৃতজননীর সামান্য সেবা করবার সুযোগ লাভ করে ধন্য হচ্ছি, তারা দেখতে পাচ্ছি—সংস্কৃতশিক্ষার প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি ও অনুরাগ দিনে দিনে কত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক অতি অপরিষ্কৃত ও অবাঞ্ছিত সরু গলিতে আমাদের অফিস অবস্থিত হলেও সংস্কৃতানুরাগী প্রত্যেকেই বহু কষ্ট স্বীকার করেও আমাদের সঙ্গে থাকেন নিত্যসংপৃক্ত, প্রত্যহ নিজেরা এসেই জানিয়ে যান তাঁদের প্রাণের শুভ কামনা। ভারতের বাইরে চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে সমাগত বিশিষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডলী ও সাধুবৃন্দ এঁদো অপরিষ্কৃত, অতি নোংরা গলিতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করেন।

এরূপ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে আমাদের পরম আদরের এই পরিষদ্ পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অন্যতম প্রধান সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে—তাই আমাদের পরম আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

পরিষৎ সর্বান্তঃকরণে বাসনা করেন যে—প্রথম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে পশ্চিম বঙ্গীয় সরকার-কর্তৃক বিঘোষিত সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূর্ণরূপ অবিলম্বে দেওয়া হোক।

আমাদের প্রার্থনা—সরকার-বাহাদুরের সদিচ্ছা ভগবদনুকম্পায় অচিরেই প্রকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করুক। এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ক পরিষৎ সংস্থাপনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য :—

(১) জ্যোতিষপরিষৎ-স্থাপন — কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে উৎসাহশীল। আমরা সরকার-বাহাদুরের নিকট এসম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সমিতির যে মত উপস্থাপিত করেছি, তা কার্যে পরিগণিত হলে বঙ্গদেশে অভিনব জ্যোতিষশিক্ষার প্রসার পরিলক্ষিত হবে, সন্দেহ নাই। নূতন পরিকল্পনায় এর মানমন্দিরাদি স্থাপন বিশেষভাবে অভিপ্রেত।

(২) কথকতা ও ভাষণ-পরিষৎ।

(৩) সংস্কৃতশিক্ষক-শিক্ষণ-পরিষৎ (Sanskrit Teachers College)।

(৪) আয়ুর্বেদ-পরিষৎ।

(৫) পৌরোহিত্য-পরিষৎ।

(৬) সঙ্গীত ও নাট্যকলা-পরিষৎ।

(৭) শিল্পবিজ্ঞান-পরিষৎ।

পরিষদের নূতন পাঠ্যতালিকা

আমরা সম্প্রতি বিগত পাঁচবৎসর-কালব্যাপী অনেক সভা-সমিতির মাধ্যমে ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মতানুসারে পরিকল্পিত পরিষদের নূতন পাঠ্যতালিকা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেছি। এ পাঠ্যতালিকা যে সুকঠোর পরিশ্রম ও সুগভীর মননের ফল, সে সমস্ত শ্রম ও শুভানুধ্যান যেন অচিরেই সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করে, এ প্রার্থনা। দেশের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ সংরক্ষণপূর্বক আমাদের

উত্তরোত্তর শিক্ষোন্নতি সংবিধানই আমাদের এ পাঠ্যতালিকার মৌলিক উদ্দেশ্য। ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যহেতু জনসাধারণের শিক্ষা থেকে সংস্কৃতশিক্ষা হয়ে পড়েছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন। স্বাধীনতাগমের ফলে আজ যখন দেশীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও প্রকৃত দেশ-প্রেমের প্রতি দেশবাসী সকলে সমাসক্ত, এ সময়ে সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণ শিক্ষার বিচ্ছেদ-সাগরের উপর সুদৃঢ় সেতু-নির্মাণই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। এ জন্যই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সঙ্গে সর্বতোভাবে তুলনীয় আমাদের আদ্য পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা নির্মাণ এবং মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাও তুলনীয়ভাবে উচ্চস্তরীয় ক'রেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংস্কৃতসাহিত্যের জন্য যেমন, পালিসাহিত্যের জন্যও সমভাবে তুলনীয় পাঠ্যতালিকা বিনির্মিত হয়েছে। পালিসাহিত্যের পরীক্ষাবিষয়ক সমুন্নতি এবং সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের সন্নিকর্ষ-সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে সরকারবাহাদুর বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুরসভার সম্পাদক এবং মঠাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধর্মাধার মহাস্থবিরকে পরিষদের অন্যতম সরকারী মনোনীত সদস্যের পদে বৃত করেছেন, এটিও পালিসাহিত্যরসিক বিবুধ-মণ্ডলীর পক্ষে পরম আনন্দের বিষয়।

আমাদের পরিষৎ ও ভারতের অন্যান্য বিশিষ্ট সংস্থা

বিগত দু বৎসরে নিখিল বিশ্ব সংস্কৃত-সম্মেলন ও অখিল ভারত প্রাচ্য তত্ত্ববিৎ সম্মেলনের বারাণসী ও নাগপুরের এবং আহমেদাবাদের অধিবেশনে পরিষৎ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন, বিহার, হায়দরাবাদ, পুণা প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক সংস্থার সহিত আমাদের পরিষৎ বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা সংবিধানের জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছেন। ভারতের সর্বত্র এখন যে সংস্কৃতশিক্ষা সংপ্রসারণের পুণ্য প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার ফলে ভারতের বিভিন্ন পরীক্ষার সংস্থা-গুলির মধ্যে একটি সহজ সংযোগ অবশ্য সংগঠনীয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন উপাধিসমূহের একটি তুলনামূলক মূল্যনির্ধারণ অবশ্য বিধেয়। যা হোক আমাদের তীর্থ-উপাধিধারীরা ভারতের সর্বত্র বিশেষ সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত, ইহাই আমাদের পরম আনন্দের ও গৌরবের কথা।

উপসংহার

যদিও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ পশ্চিম বঙ্গীয় সরকার-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান, তথাপি নিখিল ভারতের সঙ্গে এ সংস্থান পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এটি প্রকৃতকল্পে একটি অখিল ভারতীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের মতই কাজ করছে। বঙ্গদেশে আর কোনও এরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই, যার নিখিল ভারতের উপর কোনও অধিকার আছে বা নিখিল ভারতের সঙ্গে যার আত্মিক সুদৃঢ় সংযোগ আছে। সংস্কৃত নিখিল ভারতের প্রকৃত যোগসূত্র, প্রকৃষ্ট যোগসূত্র। এ সূত্র যেদিন ত্রুটিত হবে, সেদিন ভারতবর্ষ টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। সংস্কৃতপ্রধান ভারতীয় বিশিষ্টতম ভাষাগুলির মাধ্যমে সংস্কৃতই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র-ভাষার কাজ করে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ একথা অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য। আমাদের জাতীয় সাহিত্যই সংস্কৃত এবং সংস্কৃতপ্রধান সাহিত্য। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সরকারী সংস্কৃত-প্রতিষ্ঠান ভারতে সর্বপ্রাচীন এবং এখনও সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অধিকতর গৌরবপূর্ণ পরিচালনার দিক থেকে যে যে বাধা ঘটছে, সেই সব বাধা দূরীভূত করা জাতীয় সরকার এবং দেশবাসী উচ্চহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য-কর্তব্য। সংস্কৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের একমাত্র সংরক্ষণীয় বস্তু, অন্যদের নয়—এ বুদ্ধি অতি মারাত্মক এবং প্রমাদপঙ্কিল। বঙ্গদেশের চক্রপাণি দত্ত, জুমর নন্দী, ত্রিলোচন দাস, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি জাতিতে

কায়স্থ ছিলেন ; বঙ্গদেশের মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস সেন, কবি কর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) শিবদাস সেন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। অথচ এঁদের গ্রন্থের বিষয় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকণ্ঠে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিভিন্ন অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাই চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে এ গ্রন্থগুলিকে মাথায় করে, বুকে করে রেখেছেন। এখন পর্যন্ত প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সঙ্গে যাঁরা মেলামেশা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন—তাঁরা কোন্ বুদ্ধিতে উদ্দীপিত। শিষ্যকে পুত্রের চেয়েও অধিক স্নেহ প্রদর্শন করা, ভালবাসা—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহাশয়গণের সনাতন ধর্ম। কোন অবস্থাতেই তাঁদের এ ধর্মবুদ্ধির অবসান ঘটেনি বা হ্রাস পায়নি। এজন্যই সংস্কৃত সর্বজনপ্রিয়। সকল ভারতীয় মনীষীর মাতাপিতার পুণ্য অস্থি এই সনাতন ভাগীরথীতেই চিরতরে স্থান পেয়েছে। এই চিরকাল থাকবে। কারণ, এই দেবভাষা, অমর ভাষা। তাই দেশবাসীমাত্রেরই ধ্রুব লক্ষ্য হওয়া উচিত—পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের এ সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর হিতকামনা ও হিতসাধনা করা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। বন্দে মাতরম্॥

ব্রজগোপী ও মীরাবাঈ

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সাহিত্যভূষণ

রাজস্থানের মহিয়সী মহিলা মীরাবাঈ বৈষ্ণব ধর্মের যুগ প্রবর্তনকারিণী। "মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহি মিলে নন্দলালা"—এ সঙ্গীত বাঙালীর অতি প্রিয়। আত্মানং বিদ্ধি (Know thyself) বা নন্দলালার সহিত মিলনের সন্ধান মীরাবাঈ আপন জীবন-সাধনার দ্বারা প্রকট করিয়াছেন।

মীরাবাঈয়ের জীবন রহস্যাবৃত। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক ও নাট্যকার মীরাবাঈয়ের জীবনী ও নাটক কর্ণেল টড্ সাহেবের রাজস্থানের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়াছেন। "মীরাবাঈ মহারাণা কুম্ভের মহিষী। মহারাণা কর্তৃক তিনি উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন ইত্যাদি অধিকাংশের বিষয় বস্তু।" পরবর্তী যুগে রাজস্থানের মুন্সী দেবীপ্রসাদ, হীরাচন্দ ওঝা, গহলোতজী, সারড়াজী প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ বহু আলোচনান্তে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, মহারাণা কুম্ভের সঙ্গে মীরাবাঈয়ের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। উভয়ের মধ্যে শত বৎসরের ব্যবধান। মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের স্ত্রী কোনো প্রকারেই নহেন। তিনি সাঁগা বা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজের স্ত্রী ছিলেন। (ওঝাজীর উদয়পুর রাজ্যকা ইতিহাস, মুন্সীজীর মীরাবাঈ কা জীবনচরিত্র, সারেড়াজীর মহারাণা সাঁগা, বদনীরাধীশ গোপালসিংহ মেড়াতিয়ার জয়মলবংশ-প্রকাশ, গহলোতজীর রাজপুতনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

মীরাবাঈ ভাগবত জীবন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরা শিশুকালে তাঁহার মাকে বলিয়াছিলেন—

"মাই ম্হানে সুপনে মে পরণ গয়া জগদীশ" (মীরাবাঈকী শব্দাবলী ২৭) মা স্বপনে জগদীশ আমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরবর্তী আরেকটি ঘটনাতে পাওয়া যায় শিশুসুলভ চপলা মীরা বরযাত্রীদল দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পতি কে হইবে। মা গৃহদেবতা

গিরিধর গোপালকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—উনিই তাঁহার পতি হইবেন। তাই মীরা সাধনা-প্রারম্ভে গাহিয়াছিলেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
জা কে সির মোর মুকুট মেরী পতি সোঁই॥

গিরিধর গোপাল ব্যতীত আমার আর কেহ নাই। যাহার শিরে ময়ূর-মুকুট তিনিই (গিরিধর গোপাল) আমার পতি।

সাংসারিক প্রথানুযায়ী ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে মেবার-পতি রাণা সাঁগার পুত্র ভোজরাজের সহিত মীরাবাঈয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। (মীরা মাধুরী, মীরা মন্দাকিনী—মুন্সী দেবীপ্রসাদজী) মীরাবাঈ জন্ম অবধি তনু-মন প্রাণ শ্রীগিরিধরে সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। প্রভুর ভাবনাতেই তিনি দিবারাত্র সমাহিতা থাকিতেন। বিবাহ তাঁহার নিকট বাহ্যিক ব্যাপারমাত্র ছিল। প্রভুর নিকট মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সাংসারিক ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ছিলেন। একমাত্র ভগবৎকৃপাব্যতীত ভোগবিলাসী সাংসারিক জীবের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। এ যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মীরাবাঈ শ্রীগিরিধরকে পতিরূপে বরণ করিয়া কি ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত শ্রীজীব গোঁসাই ও মীরাবাঈয়ের সাক্ষাৎকারে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরম পার্ষদ শ্রীজীব গোস্বামী ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে যান। আর মীরাবাঈ ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। প্রিয়াদাসজী ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী ও মীরাবাঈয়ের সাক্ষাৎকার বিষয়ে লিখিয়াছেন:—

বৃন্দাবন আই জীব গোঁসাই
জু সৌ মিলি ক্ষিণী
তিয়া মুখ দেখিবে কো পণ লৈ
ছুটায়ৌ হ্যা

বৃন্দাবনে আসিয়া মীরাবাঈ শ্রীজীব গোঁসাইয়ের সহিত মিলিত হইবার বাসনা জানাইলে গোঁসাইজী স্ত্রীমুখ দেখিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা জানাইয়া পলায়ন করেন। মীরাবাঈ গোস্বামীজীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে—এখনো গোঁসাইজীর প্রকৃতি-পুরুষে ভেদ রহিয়াছে। তাঁহার তো সমদর্শী হওয়া উচিত ছিল। মীরাবাঈ আরো বলিলেন:—

"বাসুদেবঃ পুমানেকঃ স্ত্রীময়মিতরজ্জগৎ" বাসুদেব একমাত্র পুরুষ অন্য জগৎ প্রকৃতি—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী। গোঁসাইজী নিজেকে পুরুষ বলিতেছেন। শ্রীশ্রীগিরিধরজী ব্যতীত ব্রজে অন্য যে পুরুষ আছে তাহা তিনি গোঁসাইজীর নিকট হইতেই অবগত হইতে পারিলেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি।

এখন মীরাবাঈয়ের এ প্রকৃতিভাবের সাধনার আলোচনা করা যাক। এ প্রকৃতিভাবের অপর নাম—মধুরভাব। বৈষ্ণব সাধনার ইহা অন্যতম পন্থা। জীবপ্রকৃতির পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনের যে লীলা তাহাই মধুর ভাবের ভজন। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা ঘটিতেছে—সবই প্রকৃতির খেলা। ইহার সমাপ্তিতে বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিবে না। আবার প্রকৃতি একাকিনী অচলা,—পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত কিছু করিতে সমর্থ নহেন। পুরুষের ঈক্ষণে তাঁহার চাঞ্চল্য দেখা দেয়—তখনি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভগ্ন হইয়া যায়। পুরুষ দেখিতেছেন—ভোগ করিতেছেন—এই আনন্দে রঙ্গময়ী প্রকৃতি বিচিত্র লীলা-ভঙ্গীতে বিশ্বকে বিকশিত করিয়া তুলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার মোহিনী মূর্তি হইতে পুরুষের দৃষ্টি প্রত্যাহৃত হয়—তখনি প্রকৃতি অনুভব করিতে পারেন—পুরুষ আর কিছুই ভোগ করিতেছেন না। অভিমানিনী প্রকৃতি ক্ষণমধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া লন। এই যে—পুরুষকে দেখাইবার জন্য—তাঁহাকে ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির বিলাস। এই খেলার মধ্যে মধুর ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

বৈষ্ণব সাধনার দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথম স্তরে যাইয়া সাধক বলিতেছেন—"আমি তাহার—আমি তোমার। তোমার পায়ে সকলই সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ডাকিয়া লও।" দ্বিতীয় স্তরে সাধক বলিতেছেন—"তিনি আমার, তুমি আমার। আমায় যাতনা দাও, অশেষ দুঃখ দাও, তথাপি হে প্রভু, তুমি আমারই।" প্রথম ভাব তদীয়া রতি। দ্বিতীয় ভাব মদীয়া রতি। এই মদীয়া রতিই **ব্রজের গোপীভাব**।

বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে গোপীভাব ব্যতীত শৃঙ্গার রসোপাসনার অধিকার জন্মে না। বাহির ও ভিতরের মিলনের গোপীভাবই মিলনের ভূমি। সন্ধিনী শক্তির কাজ থাকা অর্থাৎ এই শক্তিরই ভাব। আর সংবিৎ বা চিৎ বা জ্ঞানশক্তির কাজ জানা। কে আছে এবং জানিতেছে? জগতে ইহার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বন্দ্ব থাকিলেই মিলন থাকিবে। গোপীভাবই মিলনের ভূমি। গোপীগণ দেখিতেছেন বৃন্দাবনে আর দ্বিতীয় কোনো পুরুষ নাই। তাঁহাদের নিকট সুবল, মধুমঙ্গল, নন্দ, উপানন্দ সকলই গোবিন্দের সেবক। বৃন্দাবনের জীব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতাগণ একজনের মুখ চাহিয়া আছে।

গোপীগণের সুখ—শ্রীকৃষ্ণসুখে। শ্রীকৃষ্ণের শোভা দেখিয়া গোপীগণের শোভা বৃদ্ধি পায়। গোপীগণের প্রার্থনা—প্রভো, তুমিই আনন্দিত হও। আমার মধ্যে তুমি বিরাজ করিয়া আনন্দ উপভোগ কর। আমার আপন বলিতে কিছু নাই। তোমাকে নিয়েই আমি। আমার মধ্যে তোমার যাহা আছে তুমি গ্রহণ করো। হে প্রভো! **তোমার রসে আমি রসিকা।** সে রস তুমি ভিন্ন আর কাহাকে দান করিব? আমাকে গ্রহণ করিয়া আমাকে সার্থক করো।

মীরাবাঈ মদীয়া রতিভাবের উপাসিকা। জনম অবধি গিরিধরের নিকট দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। মীরার কোন প্রার্থনাতে আত্মসুখের জন্য নিবেদন নাই। সবই প্রভুর তৃপ্ত্যর্থে। নাভাদাসজী বলিয়াছেন :—

সদারিস্ গোপিন প্রেম প্রকট, কলিজুগহি দিখায়ো।
নির-অংকুস অতি নিভর, রসিক জস রসনা গায়ো॥
ভক্তি নিসান বজায়ো, কাহু তে নাহিন লজী।
লোকলাজ কুল শৃঙ্খলা তজি মীরা গিরিধর ভজী॥

কলিযুগে মীরা গোপীপ্রেম প্রকট করিয়াছিলেন। নির্ভয় নিরঙ্কুশ হইয়া রসিকের (হরির) যশোগান গাইয়াছিলেন। ভক্তিনিশান বাজাইয়া কাহাকেও লজ্জা না করিয়া—লোকলাজ ও কুলের শৃঙ্খলা ত্যজিয়া গিরিধরকে ভজনা করিয়াছিলেন। (ভক্তমাল ১৫)

প্রভুর সঙ্গে মীরার বহুজন্মের পরিচয় ছিল। এক পদে গাহিয়াছেন—

মীরা কুঁ প্রভু দরসন দীজ্যো,
জনম জনম কো চেলী
(মীরাবাঈকী শব্দাবলী ১৬ পৃঃ)

মীরাকে প্রভু দরশন দাও। আমি যে তোমার জন্ম জন্মের দাসী। মীরা শ্রীগিরিধরের চিরপরিচিতা ছিলেন। এজন্মে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের তীব্র বাসনা জাগে—তাই তাঁহার আকুল নিবেদন।

মীরামাধুরী-লেখক বলিতেছেন—গোপীগণ ভক্তির এক নিজস্ব প্রেম-পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন। আর এই পদ্ধতিতে মীরাবাঈ আপন সাধনপথ নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। মীরা কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়াস করেন নাই। অথবা কাহাকেও এ সাধন পথে আসিতে আহ্বান করেন নাই। তাঁহার ভক্তি স্বভাবজা ছিল। **তিনি নিজে পূর্বজন্মে গোপী ছিলেন।** তাঁহার উপাস্য শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পতিভাবে ভজন করিয়াছিলেন। মীরা স্বয়ং গাহিয়াছিলেন—

"পূরব জন্ম ম্যায় হু গোপিকা"

• আমি পূর্বজন্মে গোপিকা ছিলাম।

মীরা ব্রজ গোপীদের মতো আত্ম-নিবেদন করিয়া প্রভুর সহিত মিলনের আকুল বাসনা জানাইয়া ছিলেন। মীরার ভজনাবলীতে গোপীদের মতো বিরহ ও মিলনের ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। মীরা ইহজীবনে প্রভুর নিকট তাঁহার দর্শন-ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। এক পদে গাহিয়াছেন :—

দরস্ বিন্ দুখন লাগে নৈন।
জবসে তুম বিছুরে পিয় প্যারে, কবহুঁ ন পায়ো চৈন॥
শব্দ সুনত মেরী ছতিয়াঁ কাঁপে মীটে লাগে বৈন।
এক টকটকী পন্থ নিহারু, ভই ছমাসী রৈন॥
বিরহ বিথা কাসী কহুঁ সজনী, বহ গই করয়ত নৈন।
মীরাকে প্রভু কব হো মিলোগে, দুখ মেটন সুখ ছৈন॥

হে প্রিয়, তোমার দরশন ব্যতিরেকে আমার নয়নে দুঃখ লাগে। হে প্রাণপ্রিয়, যখন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ তদবধি আমি আর শান্তি পাই নাই। তোমার নাম শুনিয়া আমার অন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তোমার নাম কিন্তু আমার মিষ্ট লাগে। আমি একদৃষ্টে তোমার জন্য পথপানে চাহিয়া থাকি, এ সময় আমার অতি দীর্ঘ লাগে। হে সজনি. কাহার নিকট এ বিরহব্যথার কথা বলিব? মনে হয় আমার নয়নে করাত দিয়া কেহ আঘাত করিতেছে। হে মীরার প্রভু, তুমি কখন মিলিত হইবে—আর আমার অন্তরজ্বালা নির্বাপিত করিয়া শান্তি প্রদান করিবে।

এরূপ বিরহ-জ্বালায় ভস্মীভূত হইয়া ব্রজ গোপীদের মতো সর্বত্র কৃষ্ণদর্শন করিয়াছিলেন। মীরা মিলনের গানে গাহিয়াছেন।

ম্যারা আলগিয়া ঘর আয়া জী।
তনকী তাপ মিটি সুখ পায়া, হিলমিল মংগল গায়া জী॥
ধনকী ধুনি সুনি মোর মগন ভয়া, যূঁ মেরে আনন্দ ছায়া জী॥
মগন ভই মিলি প্রভু অপনা সূঁ, ভৌ কা দরদ মিটায়ো জী।
চন্দ কু দেখি কমোদনি ফুলে, হরখি ভয়া মেরী কায়া জী।
রগ শীতল ভই সজনী, হরি মেরে মহল সিধায়া জী।
সব ভগবত কা কারজ কীন্হা সোই প্রভু মৈঁ পায়া জী।
মীরা বিরহিণী সীতল হোই দুখ দুঁদ হরি হসায়া জী।

প্রভু আমার বিদেশ হইতে আসিয়াছে। দেহ-তাপ দূরীভূত হইয়া সুখ পাইতেছে। সকলে মিলিত হইয়া মঙ্গল গান কর। প্রভুকে পাইয়া মগ্ন হইয়াছি। তিনি আমার আনন্দস্বরূপ। প্রভুর সঙ্গে সকলে মত্ত হও। ভয় দূরীভূত করো। চন্দ্র দেখিয়া পদ্ম যেমন প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ আমার দেহ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। ওহে সজনি, আমার দেহ শীতল হইয়াছে। প্রভু আমার মহলে আসিয়াছেন। সব ভক্তের সহায় কানাইয়া, সখি, আমি প্রভুকে পাইয়াছি। বিরহিণী মীরা শান্ত হইয়াছে। মীরার সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়াছে।

গোপীনী মীরা প্রভুকে পাইয়া পূর্ণানন্দে অভিভূতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মীরার প্রবর্তিত প্রেমময় ধর্মের রসাস্বাদ করিয়া ভক্তমণ্ডলী আনন্দ লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

মেদ জাতি

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ

ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য জাতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু একদা প্রবল মেদজাতি সম্বন্ধে তাদৃশ আলোচনা অদ্যাবধি কেহই করেন নাই, অথচ এই মেদজাতি সম্পর্কে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র-গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ঐতিহাসিক শিলালিপি-গুলিতে পর্যন্ত যথেষ্ট তথ্য রহিয়া গিয়াছে। আর্য সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ইহাদের কিছুমাত্র দান আছে কিনা এবং থাকিলেও তাহা কতখানি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যে অত্যন্ত প্রয়োজন তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতা-বিস্তৃতির পূর্ব পর্যন্তই বা এই মেদ জাতির কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহার পরে আর্যধর্মের প্রসারতা তাহাদিগকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নহে।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কোথাও এই মেদজাতির উল্লেখ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে ভগবান্ মনু প্রথম এই মেদজাতির কথা সকলের গোচরীভূত করেন। তিনি বলেন "কারাবর-নিষাদাৎ তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে। বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রাম প্রতিশ্রয়ৌ।" (মনুসংহিতা ১০-৩৬)। ইহা হইতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈশ্য পুরুষের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তানকে বলা হয় বিদেহ; এবং এই বিদেহ পুরুষের ঔরসে নিষাদ (চণ্ডাল) রমণীর গর্ভে জাত সন্তানই মেদ বলিয়া পরিচিত। মনুসংহিতার দুই শ্রেষ্ঠ টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট উক্ত শ্লোকটির টীকায় উহা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ("বৈদেহিকাদ্বাবন্ধ্র-মেদৌ, কন্যাং স্ত্রিয়াং কারাবরীনিষাদ্যৌ তয়োরত্র সন্নিধানাৎ" মনুসংহিতার ১০-৩৬ শ্লোকের মেধাতিথির ভাষ্য দ্রষ্টব্য। "বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদাখ্যৌ ····· অন্তরানির্দেশাদ্বৈদেহিকেন চ বৈদিহ্যাং জাতস্য গর্হিত-বৈদেহকস্যাপ্যুচিতত্বাৎ কারাবরোনিষাদজাত্যোশ্চাত্র শ্লোকে সন্নিধানাৎ কারাবরনিষাদস্ত্রিয়োরেব ক্রমেণ জায়তে" উক্ত শ্লোকের কুল্লুকভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য)

তাহা হইলে দেখা গেল যে, ইহারা অত্যন্ত নীচ ও ছোটজাতি এবং এইজন্যই বোধ হয় ইহাদের গ্রামের ভিতরে বসবাস করিবার অধিকার নাই। অত্রি, অঙ্গিরা, যম, নারদ সংহিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্যের প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরা-রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর ও পরাশর স্মৃতির টীকাকার মাধবাচার্য—সকলেই মেদ জাতিকে অন্ত্যজজাতির মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। ("রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বুরু [র?] ড় এব চ। কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥" অত্রি ১৯৫, অঙ্গিরা-৩, যম-৫৪, নারদ-১১, উপরোক্ত সকল গ্রন্থই ১২৯৪ সনে কলিকাতায় বিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। যাজ্ঞবল্ক্যের ৩-২৬৫ শ্লোকের মিতাক্ষরা টীকা—বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত—৪২৯ পৃষ্ঠা। পরাশরের ২-৩১ শ্লোকের মাধবাচার্য প্রণীত টীকা—গভর্মেণ্ট সেণ্ট্রাল বুক ডিপো হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত বামনশাস্ত্রী ইসলামপুরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত, দ্বিতীয়খণ্ড, প্রথম সংখ্যা—১১৪ পৃষ্ঠা। ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বর অন্ত্যজজাতিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং সামান্য উচ্চে মেদজাতির স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পরাশর সংহিতার ২-৩৩ শ্লোকের টীকায় মাধবাচার্য অন্ত্যজজাতির এই দুই বিভাগের মধ্যে কাহারা কোন বিভাগে অন্তর্ভূক্ত তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। "চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা স্মৃতো বৈদেহকস্তথা। মাগধা যোগবৌ চৈব সর্বে

হন্ত্যাবসায়িনঃ") মেদজাতি যে নিম্নবংশসম্ভূত তাহার প্রমাণ মহাভারতেও আছে। সেখানে পুক্কসদিগের সহিত মেদজাতির নাম জড়িত রহিয়া গিয়াছে ["মেদানাং পুক্কসানাং চ তথৈবান্তেবসায়িনাং। কৃতং কর্মাকৃতং বাপি রাগমোহেন জল্পতাম্"—মহাভারত (বঙ্গবাসী এডিসন) ১৩-২২-২২ মহাভারতের দক্ষিণ ভারতীয় পাঠে (টি. আর কৃষ্ণাচার্য ও টি. আর ব্যাসাচার্যের সম্পাদনায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইএর নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত ও কুম্ভকোণম্ হইতে প্রকাশিত) দেখা যায় যে 'মেদানাং' এই পাঠটি নাই, তাহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত পাঠ রহিয়াছে-'ধনেন পুক্কসানং চ' ইত্যাদি।] কোন কোন ঐতিহাসিক শিলালিপিও মেদজাতির নিম্নকুলোৎপত্তি বিষয়ে ঐ একই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বিখ্যাত চান্দেল্লরাজ পরমর্দিদেবের সময়ে প্রচারিত 'সেমরা শিলালিপি ("গ্রামাণামুপগতান্ ব্রাহ্মণানন্যাংশ্চ মান্যানধিকৃতান্ কুটুম্বিকায়স্থদূতবৈদ্যমহত্তরান্ মেদচণ্ডালপর্যন্তান্ সর্বান্ সংবোধয়তি"—এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ভল্যুম ৪, পৃষ্ঠা ১৫৭ ও 'সগৌড় শিলালিপি' (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ভল্যুম ২০—পৃষ্ঠা ১৩০) এবং ত্রৈলোক্য-বর্মার সময়কার গররা শিলালিপি (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—ভল্যুম ১৬—পৃষ্ঠা ২৭৬) পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক জীবনে মেদ জাতির স্থান কোথায় ছিল। ঐ তিনটি লিপিতেই চণ্ডালের সহিত মেদ জাতির নাম একত্র জড়িত আছে।

অতএব ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মেদজাতির অত্যন্ত নীচ কুলে জন্ম, এই বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রাদি মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া ঐতিহাসিক শিলালিপিগুলি পর্যন্ত সকলেই একমত। কোনরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাহাদের বিন্দুমাত্র ছিল না এবং উচ্চতর শ্রেণীর নিকট তাহারা ঘৃণার পাত্র ছিল। মনুসংহিতার মতে বন্য পশু বধ করিয়া এই মেদজাতি জীবনধারণ করিত ("মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূনামারণ্যপশুহিংসনম্" • মনুসংহিতা, ১০।৪৮) এবং বোধ হয় তাহাদের এই ঘৃণিত কার্যের জন্যই গ্রামের মধ্যে তাহাদের বসবাস নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ("বহির্গ্রাম প্রতিশ্রয়ৌ" মনুসং ১০।৩৬) শূদ্র কমলাকর বলিয়াছেন যে মেদজাতির প্রধান কার্যই ছিল আবর্জনাপূর্ণ স্থান, সোপানশ্রেণী, মলমূত্রাগার প্রভৃতি পরিষ্কার করা। (পি, ভি, কানে, 'হিষ্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, ভল্যুম—২, পার্ট—১, পৃষ্ঠা—৭০) মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন যে, মেদজাতি মৃত গো-মহিষ ও ঐপ্রকার অন্যান্য জন্তুর মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। ("মেদা গো-মহিষ্যাদীনাং মৃতানাং মাংসামশ্নন্তঃ" মহাভারতের ১৩।২২।২২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা) উপরে উক্ত মতামতগুলি সম্যক্ পর্যালোচনা করিলে কি ইহাই মনে হয় না যে মেদজাতি আর্যসমাজবহির্ভূত ও অতিশয় ঘৃণ্য ?

তবে ইহার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ধর্মশাস্ত্রগুলির রচনা-সময়ে এই মেদজাতির সামাজিক প্রতিপত্তি (তাহা যাহাই থাকুক না কেন) যেরূপ ছিল, পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক শিলালিপি-গুলির সময়ে তাহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ঠিক একরূপই ছিল বলিয়া মনে হয় না। শিলালিপি-গুলি বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, মেদজাতি যেন ততটা নীচে আর নাই। তাহাদের স্থান কিছুটা উপরে উঠিয়াছে। ভূদানের সময়ে রাজা অন্যান্য সকলের সহিত মেদজাতিকেও সাক্ষী মানিতেছেন। রাজার সেই ভূদানের সময়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির সহিত মেদজাতিরও উপস্থিতি কাম্য ছিল। অতএব সেই কালে তাহারা নিশ্চয়ই একেবারে অপাংক্তেয় ছিল না। থাকিলে তাহাদের সংশ্রব উচ্চবর্ণ একেবারেই ত্যাগ করিত। তাই মনে হয় যে, সেই সময়ে হয়তো তাহাদের সামাজিক

প্রতিপত্তি কিছুটা উন্নত হইয়াছিল এবং লোকচক্ষে তাহারা ততটা ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইত না।

এই মেদজাতি ভারতবর্ষের কোন স্থলের অধিবাসী সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এ সম্বন্ধে নীরব। উপরোক্ত শিলালিপিগুলি বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কাজেই উহা হইতে মনে হয় যে এই মেদজাতিরা বোধ হয় বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের লোক। আর এক শ্রেণীর মেদজাতির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা মহীশূর অঞ্চলে বসবাস করে। ইহারা বেতের ঝুড়ি, মাদুর প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া এবং ভোজসভায় বাদ্যকরের কার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুর্গদিগের মত বেশভূষা করিয়া থাকে। এই মেদজাতির মধ্যে অধিকাংশই কুর্গভাষায় কথা বলে, কেহ কেহ বা কানাড়ী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। (ইম্পিরিয়াল গেজেটার অফ ইণ্ডিয়া, ভল্যুম ১১, পৃষ্ঠা ২৮) বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রচলিত প্রবাদবাক্য হইতে স্থানীয় মেদজাতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্যার হার্বার্ট রিজ্‌লি। সেখানে সেই মেদজাতিকে 'মকরাণ কূলবর্তী সমুদ্রগামী বা সমুদ্রযাত্রাপ্রিয়' বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তাহারা নৌচালনা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং তাহাদের গায়ের রং বেশ কালো। (বোধহয় অধিক সমুদ্রযাত্রা-হেতু)। প্রচলিত নানা প্রবাদের মধ্যে স্যার রিজ্‌লি সংগৃহীত একটি প্রবাদ নীচে দিলাম। প্রবাদটি হইতেছে এই "মেদ-নাবিকও নৌযাত্রায় বহির্গত হয় ও তার স্ত্রীও প্রণয়ীর সংসর্গ করে" (স্যার হার্বার্ট রিজ্‌লি, দি পিপল্‌ অফ ইণ্ডিয়া।' স্যার রিজ্‌লি ঐ পুস্তকেরই ৩৫৪-৩৫৫ পৃষ্ঠায় মেদজাতির শরীরের বিভিন্ন অংশের নৃতত্ত্বমূলক মাপ দিয়াছেন (ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মেদজাতির নৈতিক জীবন বড় সুখের ছিল না এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও কোন বাধ্যতামূলক ছিল না। রিজ্‌লি আরও বলিতেছেন যে, এই মেদজাতি মোটেই সাহসী নহে এবং অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। ('দি পিপ্‌ল্‌ অফ ইণ্ডিয়া,' পৃষ্ঠা - ৩২৮)

স্যার রিজ্‌লি-প্রদত্ত সংবাদ কিন্তু মনুসংহিতার সাক্ষ্যের সহিত মেলে না। 'মেদজাতি যে নৌযাত্রা-প্রিয়' এরূপ কথা মনু বা কোন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা বলেন নাই। তাঁহারা মেদজাতির পশুমারণাদি কার্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক শিলা-লিপিতেও মেদজাতিসম্বন্ধে এমন কিছু লেখা নাই যাহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, তাহারা নাবিক ও নৌযাত্রাপ্রিয় ছিল। মহীশূর এবং বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল সমুদ্রতীর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া ঐ অঞ্চলে অবস্থিত মেদজাতির পক্ষে নৌবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান কি? উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—বেলুচিস্থান, বুন্দেলখণ্ড ও মহীশূর এই তিন অঞ্চলে যে মেদজাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ইহা হইতে কি মনে হয় উহারা একই মেদজাতি, কালক্রমে যাযাবর বৃত্তির ফলে তিন অঞ্চলের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে, না উহারা তিনটি বিভিন্ন জাতি এবং উহাদের নামটি একই হওয়ার কারণ নিতান্তই আকস্মিক? এই প্রশ্নের উত্তরে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড় সহজ কথা নহে। তবে ঐ তিন প্রদেশেরই মেদদের নীচকুলোৎপত্তির কথা শুনিলে মনে হয় যে, ইহারা হয়তো পূর্বে ভারতবর্ষের একটি অঞ্চলেই বসবাস করিত এবং সেই অঞ্চলটি ভারতবর্ষে আর্যদের প্রথম উপনিবেশ পঞ্চনদ অধ্যুষিত পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা বেলুচিস্থান হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে এবং ইহা মনে করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, বৈদিক 'পনি' প্রভৃতির যে বাণিজ্য-প্রীতির কথা শুনা যায় তাহার মূলে বোধ হয় এই

সমুদ্রযাত্রাপ্রিয় মেদজাতির কোন প্রভাব ছিল। ইহা এখন সর্বজনসম্মত যে, ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য জাতির নিকট হইতে আর্যেরা অনেক কিছু শিক্ষায় বিষয় নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটি এই সমুদ্রবিদ্যা হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?

আমাদের বিবেচনায় প্রাক্-আর্য মেদজাতির দান আর্যদিগের নৌশিক্ষার মূলে অনেকখানি। কিন্তু কালক্রমে এই মেদ জাতি তাহাদের পুরাতন আবাসস্থল (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান) হইতে আর্যগণ-কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদের একদল বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিল এবং আর একদল আরও দক্ষিণে মহীশূর অঞ্চলের নিকটবর্তী প্রদেশে বসবাস আরম্ভ করিল। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই দুইটি স্থানের কোনটিই সমুদ্রের নিকটবর্তী নহে, সুতরাং চর্চা ও অনুশীলনের অভাবের ফলে তাহারা কালক্রমে নৌবিদ্যা বিস্মৃত হইল এবং জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল ও নানাপ্রকার বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাই বলিয়া বেলুচিস্থান বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাহাদের চিহ্ন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এখনও যে সেখানে তাহারা স্বল্প সংখ্যায় বসবাস করে স্যার রিজলি তাহা দেখাইয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে মেদজাতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। হিন্দুসমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অবহেলিত জাতিগণের ইতিহাস সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বহু কিছু আছে। সুধী পাঠকবর্গ যদি এই দিকে আগ্রহবান্ হন তাহা হইলে প্রবন্ধকারের শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সমালোচনা

আধুনিক বাংলা কবিতা—বুদ্ধদেব বসু-[স]াদিত; এম্ সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, [কলি]কাতা—১২; পৃষ্ঠা—২৫৭+২০ মূল্য—৫৲ [টাকা]়, শোভন সংস্করণ ৬৷৷৹ আনা।

আলোচ্য বইখানি উনপঞ্চাশ জন বাঙ্গালী কবির [আ]ধুনিক কবিতার' একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ, [প্রম]থ চৌধুরী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কয়েকটি [কবি]তা এই সঙ্কনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর [...] যাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বিমুক্তি কামনা [করে]ছিলেন, হয়তো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা [করে]ছিলেন, তাঁদের রচনাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-[...]তে বহু বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। তাতে করে [এক]দিকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের আঁধি আমাদের সত্য[...]র পক্ষে যেমন বাধা সৃষ্টি করেছে, অপরদিকে আহতের মানসিক উত্তাপ সহজ সৃষ্টির ধারায় স্নিগ্ধতা লাভ না করে বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষেই পর্যবসিত হয়েছে।

কিন্তু আজ ঝড় থেমে গেছে—তাপও কমে এসেছে। এই শান্ত পরিবেশে কবিতাগুলিকে উপভোগ করবার এবং তাদের রচয়িতাদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবার উপযুক্ত অবসর। সেই দিক্ দিয়ে এই সঙ্কলনটির প্রয়োজন।

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগবে এই 'আধুনিক' এর সংজ্ঞা কি? সম্পাদক বলেছেন যে, আধুনিক কবিতাকে কোন একটা চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করা যায় না। তবুও তিনি একে সনাক্ত করতে চেয়েছেন এই বলে: "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির,

সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তি।" কিন্তু আধুনিকতা তো আপেক্ষিক। কাল যা আধুনিক ছিল আজ তা আধুনিক নয় এবং আজ যা আধুনিক আগামী কাল তা আধুনিক থাকবে না। যে বিদ্রোহ, ক্লান্তি, সংশয় প্রভৃতি তিনি তাঁর সঙ্কলিত আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য বলে অনুকীর্তন করেছেন তা সকল যুগের আধুনিক কবিতার মধ্যেই স্ফূর্ত হয়েছে। কেবলমাত্র বিদ্রোহ, ক্লান্তি, সংশয় প্রভৃতির রূপেরই পরিবর্তন ঘটেছে। কালিদাসও তাঁর সময়ে ছিলেন আধুনিক। এবং সেই আধুনিকতার জন্য তাঁকেও বিদ্রোহ করতে হয়েছিল এবং নিজের সমর্থনে লিখতে হয়েছিল 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্, ন চাপি সর্বম্ নবমিত্যবদ্যম্।' দিঙ্‌নাগাচার্যের 'স্থূলহস্তাবলেপ' মহাকবিকেও উত্যক্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'নতুন' করে জন্মানোর পূর্বে যে কবিতা লিখেছিলেন তখনকার দিনে সেগুলিও ছিল আধুনিক এবং তাতেও প্রকাশ পেয়েছিল বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি ও সন্ধান। সুরেশ সমাজপতি তাঁর আধুনিকতাও বরখাস্ত করিতে পারেন নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য কালের নিকষে রসোত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। তার কারণ আধুনিকতাটাই এর সত্ত্বা নয়। ইন্দ্রিয়ানুগ জগতের অতীত লোকে প্লেটোর ভাব (Idea)-জগতের ন্যায় তৎকালীন আধুনিক এই কবিদের কাব্যে এমন কিছু আছে যা নিত্য ও সনাতন। সর্বকালের ও সর্বদেশের মানুষের মনে তা রসানুভূতির স্পর্শ নিয়ে আসে।

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার সম্বন্ধেই একথা বলা চলবে না। এগুলি কালের সৃষ্টি বটে, কিন্তু কালকে এরা সৃষ্টি করতে পারেনি। যে আধুনিককাল, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত, মার্কসীয় জড়বাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই কালের সৃষ্টিরূপে এই কবিতাগুলির উদ্ভব। কাজেই নির্জ্ঞান মনের অযৌক্তিকতা, অসংলগ্নতা ও নীতিবিরোধী প্রকাশভঙ্গী এগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। এতেকরে 'নতুন সুর' হয়তো এসেছে, কিন্তু তা মহাকালের ডমরুধ্বনির মাহেশ্বর সূত্রের মধ্যে স্থান পাবে কি না সন্দেহ। সেইজন্যই এই কবিতাগুলি 'আন্দোলন' এর সৃষ্টি করে থাকতে পারে—কিন্তু যুগের সৃষ্টি করতে পারেনি।

সমালোচনার স্বল্পপরিসরে রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করা সম্ভবপর হল না। উপরন্তু তাতে ব্যক্তিবিশেষের চিত্তবেদনার কারণও হতে হবে। সুতরাং তাতে কাজ নেই। কেবলমাত্র এইটুকুই বলতে চাই বাঙলাদেশের কাব্য মন্দাকিনীর ধারা আলোচ্য আধুনিকতার খাত পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে বেরিয়ে এসেছে। সেই খাতের ঐতিহাসিক আবেদন আছে, কিন্তু তার দিন শেষ হয়েছে। অবশ্য আধুনিক এই কবিতাগুলির মধ্যে সেইগুলিই বেঁচে থাকবে যাতে শাশ্বতের প্রকাশ রয়েছে।

যাই হোক, এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা আছে। যে আধুনিকতাকে যুগচিহ্নিতরূপে প্রচার করা হচ্ছে তার স্বরূপটি বুঝবার পক্ষে পুস্তকখানি সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর—প্রচ্ছদপট রুচিসঙ্গত।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ—ডক্টর শ্রীবিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, প্রকাশক শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২ ; পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪১ , মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

মানব জীবনের পরিপুষ্টির জন্য ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চারিটি বর্গ অত্যাবশ্যক হইলেও

চতুর্থটিই পরম পুরুষার্থ, তাই সমস্ত প্রাচ্য দর্শনেই এই প্রতিপাদ্যবিষয়-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। মোক্ষের অর্থ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সমস্ত দুঃখ হইতে চিরবিমুক্তি। গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে বেদ ও উপনিষদের মুক্তি, ষড়দর্শনমতে মুক্তি, তন্ত্রমহাভারতপুরাণধর্মশাস্ত্রমতে মুক্তি, বৌদ্ধজৈন-মতে নির্বাণ, জীবন্মুক্তি, সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি, মুক্তের ঐশ্বর্য ও কর্ম, ভক্তি ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থরচনা দ্বারা লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিফিল্ উপাধি লাভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও পুস্তকখানির জন্য তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'কি জাতীয় অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা পাঠকমাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং পাঠকের চিত্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইবে।' গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয়ের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

উপনিষৎ—ঈশ-কেন-কঠ--ব্রহ্মচারী শিশির কুমার-সম্পাদিত। প্রকাশক—নিউবেঙ্গল লাইব্রেরী ৯, গুলুওস্তাগর লেন, কলিকাতা—৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৯৫ ; মূল্য ৷৷৹ আনা।

উপনিষৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাই জ্ঞানপিপাসু মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। আলোচ্য বইটি ঈশ কেন কঠ—এই তিনখানি উপনিষদের সরল বঙ্গানুবাদসহ পকেট সংস্করণ। ভূমিকায় উপনিষৎ কি, ঈশোপনিষদের মর্মবাণী, কেনোপনিষদের সার-সঙ্কলন এবং কঠোপনিষদের সংক্ষিপ্তসার সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকখানি আদরণীয় হইবে। অনেকে উপনিষদের শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিতে ইচ্ছা করেন। যাঁহারা আবৃত্তি করিতে চান তাঁহারা এই পকেট-সাইজ পুস্তকখানি সঙ্গে রাখিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি প্রণীত। ৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬৬ ; মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের বহুগুণমণ্ডিত পিতৃদেবের জীবনালেখ্য ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে অর্পিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। একজন ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষক ও প্রকৃত সুধীজনের সন্ধান পাওয়া যায় এই পুস্তকে। বর্তমানসময়ে ছাত্রজীবনে আদর্শ ছাত্র ও শিক্ষক-জীবনে আদর্শ শিক্ষকের জীবনী সমাজে যত প্রচারিত হইবে ততই প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতীর প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। সে দিক দিয়া বইটি মূল্যবান্।

রবীন্দ্র-গীতি — শ্রীজয়দেব রায়-প্রণীত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী ফুল্লরা রায় ৪১।১৩ রসা রোড, কলিকাতা—৩৩ ; পৃষ্ঠা—২৪০, দাম—৩৲ টাকা।

লেখক বহু পরিশ্রমে 'রবীন্দ্র-গীতি' প্রণয়ন করিয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠক-সমাজের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বাংলা-গানের ধারাবাহিক ইতিহাস, বাংলার গীতি-চর্চা—অধ্যায় দুইটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ বুঝিতে সাহায্য করিবে। বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের সুর, কীর্তন, রাগসঙ্গীত, বাউলগান, কৌতুকসঙ্গীত, গীতিনাট্য, কাব্যগীতি, উদ্দীপনার গান, নৃত্যনাট্য, ছন্দ ও গীতিরীতি তথ্যপূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বহু দিক দিয়া মূল্যবান্। লেখার ভঙ্গী ভাষা ও উপস্থাপনাও সুন্দর।

The Calcutta Municipal Gazette: Twenty-ninth Anniversary Number with T. B Special supplement. Edited by Santosh Kumar Chatterjee, M. A,

F. R. Econ. S (Lond.) Page 456; Price rupee one.

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের এই বিশেষ সংখ্যাটি সুধীজনের সুচিন্তিত রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ ও সুসম্পাদিত। প্রকৃত নাগরিক হইতে গেলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, কোন্ কোন্ বিষয়ের অনুশীলন প্রয়োজন, কলিকাতা নগরীর বর্তমান সমস্যাবলী ও তাহার জ্ঞানগর্ভ সমাধান বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত এবং জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল নগরীর সাধারণের অজ্ঞাত বহু তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা একখানি মূল্যবান্ পুস্তকরূপে গণ্য হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহন, শান্তিরক্ষা এবং ক্রমবর্ধমান মারাত্মক যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধপ্রচেষ্টা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং কালব্যাধির কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবেন। Smoke Nuisance, Home Life and Environment, Civic sense and Nonsense, Social Aspects of T. B.—প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এতবড় একখানি পুস্তকের দামও স্বল্প হওয়ায় পৌরকর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

ভারত-কল্যাণ—স্বামী বিবেকানন্দ; অনুবাদ ও সঙ্কলন: স্বামী নির্বেদানন্দ; প্রকাশক: স্বামী সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

পৃষ্ঠা—১৩৫; মূল্য—২৲ টাকা, ছাত্রসংস্করণ—১॥০ আনা।

স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনাবলী হইতে সঙ্কলিত এবং নূতন করিয়া অনূদিত এই পুস্তকখানি ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারার এক ধারাবাহিক সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করে। অনুবাদের ভাষা খুব প্রাঞ্জল। আটটি বিভিন্ন অধ্যায়ে উক্তিগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে, যথা:—আমাদের মাতৃভূমি, বর্তমান অধঃপতন, পুনরুত্থানের জন্য অবশ্যকরণীয়, শিক্ষা—সমাজের সর্ববিধ ব্যাধির মহৌষধ, গণোন্নতি, জাতিভেদ-সমস্যা, নারীকল্যাণ, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু মনীষী এবং দেশসেবক অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের কিরূপ বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেকেরই জানা উচিত। স্বামীজীর মৌলিক ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা আমাদের অনেক সন্দেহ ও বিমূঢ়তার দিগদর্শনস্বরূপ। বাঙ্গলার যুব-সমাজের মধ্যে এই সময়োপযোগী স্বামীজীর বাণী-সঙ্কলন-গ্রন্থটির ব্যাপক সমাদর হউক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। কাগজ ও ছাপা সুন্দর।

দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি—স্বামী বাসুদেবানন্দ; প্রকাশক: অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৪০এ, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা ৩৮৪+৮০; মূল্য - ৫৲ টাকা।

'স্বাধ্যায়' এবং 'উপাসনা' এই দুই বিভাগে সজ্জিত—ধর্ম, দর্শন ও নীতি-সম্বন্ধীয় পৃথক্ পৃথক্ মনোজ্ঞ আলোচনা পুস্তকটিতে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রসঙ্গগুলি গ্রন্থকার তাঁহার ডাইরীতে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। নানা শাস্ত্র এবং সাধুমহাপুরুষদিগের 'দিব্যবাণী' অবলম্বনে লেখক সহজ এবং সতেজ ভাষায় যে 'প্রতিধ্বনি' উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সুখপাঠ্য এবং প্রভূত শিক্ষা-ও আনন্দপ্রদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভাবধারা অনেকগুলি প্রসঙ্গের উপজীব্য। স্বাধ্যায়-বিভাগে ৩৩৪টি এবং উপাসনা-অংশে প্রায় তিনশত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক নিবন্ধের

এক একটি আলাদা নামের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের সারনিষ্কর্ষ সুপরিস্ফুট। অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসুর নিকট বইটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

১। **নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা**—(শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী-সংখ্যা) প্রকাশিকা: সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়, ৫, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩; পৃষ্ঠা—৫৮+৮ (ডবলক্রাউন-সাইজ)

২। **বিদ্যার্থী**—(শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৬১) প্রকাশক: সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা: ১০৮+১২

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুটি অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়ের বিশেষ সংখ্যা পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। রচনা ও কবিতাগুলির নির্বাচন ও সম্পাদন প্রশংসাযোগ্য। অধিকাংশ লেখা প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থিনীগণের। জননী সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী-উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীগণের এই বাণী-অর্ঘ্যদুটি মূল্যবান্ সংগ্রহরূপে গ্রন্থাগারে রাখিবার যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

যক্ষ্মা-সেবাকার্য

রাঁচি রামকৃষ্ণমিশন যক্ষ্মা-আরোগ্যভবনের ১৯৫৩ সালের (তৃতীয় বার্ষিকী) কার্য-বিবরণী বাহির হইয়াছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এই আরোগ্যালয়ে আলোচ্যবর্ষে ৬০ জন নূতন রোগী ভর্তি করা হয় এবং ৫৪ জন আরোগ্যান্তে ছুটি পান। প্রতি মাসে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা গড়ে ৫৯ এবং সর্বাধিক সংখ্যা ৬৩; ৩৬৯ জনের অস্ত্রচিকিৎসা (তন্মধ্যে ৩৫৪ কৃত্রিম নিউমোথোর‍্যাক্স) করা হয় এবং ৫৩৩ জনের নিউমোপেরিটোনিয়াম্ ইন্‌জেক্‌ন্ দেওয়া হয়; রঞ্জনরশ্মি বিভাগের মোট সংখ্যা ৭৬৭। স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপকারার্থে রক্ষিত হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ৪২৫১ (নূতন ৩৮৯৫) জন চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। বিগত ১০ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্ত্রচিকিৎসা-বিভাগে 'ক্যাপ্টেন্ নরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল্ অপারেশন্ থিয়েটারে'র শুভ উদ্বোধন করেন। আলোচ্যবর্ষে রাজ্যপাল আর আর দিবাকর, প্রদেশ-প্রধানমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীহরিনাথ মিশ্র, কর্ণেল ডি পি নাথ, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বি সি দাশগুপ্ত, ডাঃ টি কে ঘোষ এম্ ডি, ই আই রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ পি এন্ গোখলে এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আরোগ্যভবন পরিদর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

বোম্বাই শাখাকেন্দ্র

বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই মিশনের কার্যপ্রণালী তিনভাগে বিভক্ত (১) প্রচারমূলক (২) শিক্ষাবিষয়ক (৩) সেবাসম্বন্ধীয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশন-প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্যন্ত সন্ন্যাসিবৃন্দ বেদান্তের সার্বভৌম ধর্মভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে বোম্বাই শহর ও বোম্বাই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও বক্তৃতা-সভার মাধ্যমে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ১৯৫১ ও ৫২ সালে খর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সম্বন্ধে যথাক্রমে ৩২ ও ৩১টি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা-অবলম্বনে ১২৯

ও ১১২টি, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তদর্শন-সম্বন্ধে ২৯ ও ২৫টি, দাদর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকেন্দ্রে উপনিষদের ২৩ ও ২৪টি বক্তৃতা ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়। এতদ্ব্যতীত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এই দুইবৎসরে বোম্বাই শহরের বিভিন্ন স্থানে ও পুণা, বরোদা, আমেদাবাদ, বারাণসী, কলিকাতা, ঢাকা, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, পেনাঙ, ত্রিচুর, কালিকট প্রভৃতি স্থানে সাধারণ-সভায় মোট ১২০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে মহাসমারোহে শারদীয়া পূজা মিশনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে 'নচিকেতা' ও 'উমা' ধর্মমূলক নাটক অভিনীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ৬০০০ হাজার মূল্যবান্ পুস্তক-সম্বলিত শিবানন্দ গ্রন্থাগার হইতে বর্ষদ্বয়ে ১৬৫২ ও ১৫০২ খানি পুস্তক গ্রাহকগণ পঠনার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবৈতনিক পাঠাগারে ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, হিন্দী ও মালয়লাম ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক মোট ৩৭ খানি সংবাদপত্র আসে। রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসে, ১৯৫১ সালে ২২ এবং ১৯৫২ সালে ৫২ জন বিদ্যার্থীকে ভর্তি করা হয়, তন্মধ্যে ১০ ও ৩৩ জন বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যার্থীদের মধ্যে শ্রী ভি কে জোশীর এম্ এড্ পরীক্ষায় কৃতিত্ব ও শ্রীঅমলেন্দু দাশের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃত্তিলাভ (বার্ষিক ১২৭০৲ টাকা) বিশেষ প্রশংসনীয়। আশ্রমের অবৈতনিক চিকিৎসালয়টিতে প্রতিবৎসর বান্দ্রা, খর, সান্তাক্রুজ, ডাণ্ডা, দাদার, মাতুঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে দুই লক্ষাধিক রোগী চিকিৎসালাভ করে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বোম্বাই রামকৃষ্ণমিশন (১) পর্ববঙ্গ উদ্বাস্তু-রিলিফ (২) আসাম ভূমিকম্প-রিলিফ (৩) পূর্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষ-সেবা (৪) সুন্দরবন দুর্ভিক্ষ-সেবা (৫) রায়ালাসিমা দুর্ভিক্ষ-রিলিফ (৬) টামিলনাদ সাইক্লোন-রিলিফ কার্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী শতবার্ষিকী সংবাদ

কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মহিলা-সভা

—শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত মহিলা-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শের প্রচারকল্পে নিম্নোক্ত মহিলা-সভাগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল :

(১) সিঁথি ; ৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর, ৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায় ; বক্তৃবৃন্দ : শ্রীমতী ভ্রমর সেনগুপ্তা, শ্রীমতী ইন্দুনিভা ঘোষ, শ্রীমতী বাণী বসু, ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী দেবী।

(২) মাণিকতলা-জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশুবিদ্যালয় ; ৫ই অগ্রহায়ণ (২১।১১।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী ; বক্তৃবৃন্দ : শ্রীমতী বেলারাণী দে, শ্রীমতী ঊষা দত্ত, শ্রীমতী অরু সেনগুপ্তা।

(৩) উত্তর কলিকাতা, রামকৃষ্ণ-সারদা-বিদ্যাপীঠ ; ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১।১২।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্তা ; বক্তৃবৃন্দ : ব্রহ্মচারিণী আশা দেব, শ্রীমতী ছায়া রায়, শ্রীমতী বাসনা দেবী।

(৪) কর্পোরেশন শিক্ষালয়, ১৫, শিবতলা লেন, বড়বাজার ; ২৬শে অগ্রহায়ণ (১২।১২।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু ; বক্তৃবৃন্দ : শ্রীমতী লক্ষ্যবন্তী মালহোত্রা, শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার।

(৫) মহাকালী পাঠশালা ; ১৮ই অগ্রহায়ণ (৪।১২।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী বক্তৃবৃন্দ :—শ্রীমতী অরু সেনগুপ্তা, শ্রীমতী অপর্ণা রায়, শ্রীমতী বাসনা দেবী।

(৬) ইণ্টালী; ৭৫, সুরেশ সরকার রোড; ১২ই অগ্রহায়ণ (২৮।১১।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী বাণী দেবী; বক্তৃবৃন্দ: শ্রীমতী নীলিমা গুপ্ত, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সরকার।

(৭) রাজরাজেশ্বরী বালিকাবিদ্যালয়, নেবুতলা; ১৯শে অগ্রহায়ণ (৫।১২।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী; বক্তৃবৃন্দ: শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সরকার, শ্রীমতী সুধা সেন, শ্রীমতী ইলারাণী বসু।

(৮) শ্রীজগদীশ বিদ্যাপীঠ, মধ্য কলিকাতা; ২৫ শে অগ্রহায়ণ (১১।১২।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী ভ্রমর সেনগুপ্তা; বক্তৃবৃন্দ: শ্রীমতী ভক্তি দত্ত, শ্রীমতী ইলারাণী বসু, শ্রীমতী শুক্লা রায়, শ্রীমতী কৃষ্ণা সোম।

(৯) মুরলীধর বালিকাবিদ্যালয়, দক্ষিণ কলিকাতা; ৫ই অগ্রহায়ণ (২১।১১।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী মনোরমা বসু মজুমদার; বক্তৃবৃন্দ: অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সংযুক্তা কর, শ্রীমতী শিবাণী চক্রবর্তী।

(১০) গীতাভবন, বালিগঞ্জ; ৯ই অগ্রহায়ণ (২৫।১১।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী; বক্তৃবৃন্দ: শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সরকার, শ্রীমতী সুষমা সেন, শ্রদ্ধা লুইস্, শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর।

(১১) ৪৭, ঝাউতলা রোড, পার্ক সার্কাস; ১৫ই অগ্রহায়ণ (১।১২।৫৪) সভানেত্রী—শ্রীমতী রাসেশ্বরী মজুমদার; বক্তৃবৃন্দ: শ্রীমতী মণিমালা দেবী, শ্রীমতী ভ্রমর সেন, শ্রদ্ধা লুইস্, শ্রীমতী কুন্তলিনী দেবী।

মহিলাসঙ্গীত-সম্মেলন—গত ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪) হইতে ৩রা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর) তিনদিন, ৫টি অধিবেশনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আহূত মহিলা-সঙ্গীতসম্মেলন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রভূত উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথমদিন সন্ধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তিনি তাঁহার অভিভাষণে সঙ্গীতের ঐক্যবিধায়ক শক্তির উল্লেখ করিয়া এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমাজ রাজনীতি অথবা ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, সঙ্গীত এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ভারত-মাতার সমস্ত সন্তান সমান মর্যাদার সহিত একসঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, দিল্লী, আসাম, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত এবং কলিকাতার বহু বিশিষ্ট মহিলা সঙ্গীতশিল্পী এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন—এই সম্মেলনও উপরোক্ত স্থানে ৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪) হইতে ৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) ৮টি অধিবেশনে পরিসমাপ্ত হয়। প্রথমদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচিত বিষয়বস্তু এবং সভাপতির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১ম) উদ্বোধন, অভ্যর্থনা, শুভেচ্ছাবাণী প্রভৃতি; 'আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন' বিষয়ে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দজী কর্তৃক বক্তৃতা। সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, সাধারণ সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

(২য়) ধর্ম ও দর্শন; সভাপতি—ত্রিবেন্দ্রম্ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী আনন্দবল্লী আম্মা।

(৩য়) নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্রমবিকাশ এবং নারীর অবদান; সভাপতি—ডক্টর শ্রীযদুনাথ সরকার।

(৪র্থ) শিক্ষাপ্রণালীর ক্রমবিকাশ (নারীশিক্ষার বৈশিষ্ট্যসহ); সভানেত্রী—শ্রীমতী সুনীতিবালা গুপ্ত, ভূতপূর্ব প্রধান পরিদর্শিকা, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার।

(৫ম) ভারতবর্ষে নারীর স্বাস্থ্য; সভাপতি—

ডাঃ বি সি দাসগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক)।

(৬ষ্ঠ) চারুকলা, শিল্প এবং সমাজসেবা ; সভানেত্রী—শ্রীমতী সুনয়নী দেবী।

(৭ম) ছাত্রদিবস ; বিষয়—বিশ্বের চিন্তাধারায় ও সংস্কৃতিতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাব ; সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ, সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

(৮ম) শ্রীশ্রীমা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ; সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ, অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

উপরোক্ত সম্মেলনদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক্ প্রবন্ধাকারে আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বেলুড়মঠে অনুষ্ঠান—গত ৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের ১০২তম জন্মতিথি হইতে দিবসত্রয় বেলুড়মঠে তাঁহার শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি-উপলক্ষ্যে ষোড়শোপচারে পূজা পাঠ হোম, প্রসাদবিতরণ, ভজন কীর্তন আলোচনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কয়দিনই মঠে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সম্মুখে গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। প্রথমদিন বিকালে শ্রীত্রিপুবারি চক্রবর্তী 'মহাভারতের নারী-চরিত্র' সম্বন্ধে একটি মনোমুগ্ধকর ভাষণ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে 'রামায়ণের সীতাচরিত্র' সুললিত সঙ্গীতের মাধ্যমে আলোচনা করেন শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ-দিন সকালে উক্ত মণ্ডপে 'সপ্তশতী হোমের' অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর আতশ-বাজির ব্যবস্থা সমবেত দর্শক-দর্শিকাগণকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

শোভাযাত্রা ও সমাপ্তি-সভা—শতবর্ষ-জয়ন্তীর পরিসমাপ্তি-উপলক্ষ্যে গত ১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর, ৫৪) রবিবার সকাল আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ত্যলীলাস্থল কাশীপুর উদ্যান-বাটী হইতে পত্রপুষ্পাদিসজ্জিত দোলায় শ্রীশ্রীমাতা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্র, এবং স্বামীজীর সুবৃহৎ দণ্ডায়মান তৈলচিত্র, তথা শ্রীশ্রীমাতার বাণীসমূহ লিখিত পতাকা প্রভৃতি লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। ন্যূনাধিক সাত সহস্র নরনারী বালকবালিকার উক্ত শোভাযাত্রাটি কাশীপুর রোড, গোপাললাল ঠাকুর রোড, আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর, বালি পুল, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি ঘুরিয়া বেলা প্রায় বারোটায় বেলুড় মঠে উপনীত হয়। অনেকগুলি কীর্তনীয়ার দল শোভাযাত্রার অনুসরণ করে। মঠে সমাগত সকলকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে মঠের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এবং পাঁচ ছয় সহস্র নরনারীর উপস্থিতিতে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তা ছিলেন—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (ইংরেজীতে) এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ (হিন্দীতে)।

রেঙ্গুনে সমাপ্তি-উৎসব

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণমিশন সোসাইটির উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর হইতে চারদিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনকার জনসভার নেতৃত্ব করেন ব্রহ্ম-সরকারের অন্যতম মন্ত্রী যু উইন্। বিষয়বস্তু ছিল—'সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা।' বার্মী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, ইংরেজী এবং বাঙলায় বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান ছিল সঙ্গীত-সম্মেলন। তৃতীয় দিন একটি মহিলাসভায় মহাথিরি থুধাম্মা মিসেস্ অউং সানের নেত্রীত্বে বিভিন্ন ভারতীয় এবং বর্মী বক্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। চতুর্থদিনের সভায় "নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে আমেরিকা, ইউ-কে, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং ভারতের মহিলা প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধন

শ্রেয়ের সাধনা

যতো মেরুঃ শ্রীমান্নিপততি যুগান্তাগ্নিবলিতঃ
সমুদ্রাঃ শুষ্যন্তি প্রচুরমকরগ্রাহনিলয়াঃ।
ধরা গচ্ছত্যন্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃতা
শরীরে কা বার্তা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে॥

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্যঃ প্রযত্নো মহান্
সংদীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৭২, ৭৫

[শ্রেয়ের সাধনা সময় থাকিতে আরম্ভ করা উচিত, কেননা তীব্রবেগ পরিবর্তনের স্রোতে এই সংসারের কোন কিছুরই স্থিরতা নাই।]

শুন নাই, বিরাট মেরুপর্বত পর্যন্ত কল্পশেষে প্রলয়ের অগ্নিশিখাবেষ্টনে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ছিটকাইয়া পড়ে? অসংখ্য মকরগ্রাহাদিজলজন্তুর নিলয়, অপার গভীর জলধি নিঃশেষে শুকাইয়া যায়, সুদৃঢ়-গিরিশ্রেণীধৃতা সুবিস্তীর্ণা ধরিত্রী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মহাধ্বংসে বিলীন হয়? হস্তিশিশুর কর্ণাগ্র যেমন সর্বদাই আন্দোলিত, সেইরূপ সদা-অস্থির মানব-দেহের উপর তবে আর ভরসা রাখ কোন্ বিচারে?

না, ভরসা রাখিয়ো না। যতদিন এই শরীর নীরোগ ও সবল রহিয়াছে, জরা নিকটে আসে নাই—যতদিন ইন্দ্রিয়সমূহের তেজ অটুট আছে, আয়ু নির্বাণোন্মুখ হয় নাই, ততদিনই তো শ্রেয়োলাভের জন্য দৃঢ়প্রযত্ন করিবার সময়। যদি যথার্থ বুদ্ধিমান হও তো জীবনের এই সুন্দর সময়টি হেলায় নষ্ট না করিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া দেহ-মন-প্রাণের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত কর, মনুষ্যজন্মের চরম ও পরম উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শনের জন্য একনিষ্ঠ সাধনায় ডুবিয়া যাও। গৃহে যদি আগুন একবার লাগিয়া যায় তখন আর কূপ খননের সময় থাকে কি? সে উদ্যম মূর্খতা মাত্র। বয়স যদি চলিয়া যায়, আধি-ব্যাধি-জরা একবার যদি দেহকে আসিয়া ভর করে তখন ভগবৎ-সাধনা শুরু করা সেইরূপই নিষ্ফল হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০ তম জন্মতিথি সমাগত-প্রায়। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় (এই বৎসর ১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) যুগাবতারের জন্ম-কর্ম-জীবনব্রত বিশেষভাবে অনুধ্যান করিবার অবসরে এই জিজ্ঞাসা আমাদের চিত্তে আসা উচিত—কি প্রেরণা তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন? উহা কি প্রাচীন অথবা নবীন? ইহকালের অথবা পরকালের? ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত? শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণার শক্তি কোন্‌খানে?

ঈশ্বরতত্ত্ব, ভগবৎসাধনা, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, উপনিষদে গীতায় পুরাণে, প্রাচীন আরও শত শত শাস্ত্রে, সন্ত-বাণীতে উহাদের অনেকগুলিই সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সকল প্রাচীন উপদেশের কোনটিরই অঙ্গচ্ছেদ করেন নাই, কোনটিকেই পিছনে ঠেলিয়া দেন নাই, ভূরি ভূরি সেই সকল পুরাতন উক্তি কথা বলিবার সময় উদাহৃত করিয়াছেন। প্রাচীনের উপর এমন দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে কচিৎ অন্য কাহাকেও দেখা যায়। শুধু প্রাচীন কথার উপর নয়—প্রাচীন জীবন-রীতি, আচার, সমাজ-ব্যবহার, চরিত্রাদর্শ—ইহাদেরও উপর। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা একদিক দিয়া দৃঢ় রক্ষণশীলতার পরিপোষক। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীগুলিকে 'নূতনশাস্ত্র' বলিয়া প্রচার করিতে স্বামী বিবেকানন্দ বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মর্যাদা বেদ নামধেয় সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যরাশিরই জীবন্ত ব্যাখ্যা বলিয়াই। তথাপি ঐ জীবনের প্রেরণায় নূতনত্ব কি নাই? আছে। সে নূতনত্ব পুরাতনের জড়তা ঘুচাইয়া উহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলায়—পুরাতনের মধ্যে যাহা সবল, অক্ষয়, সর্ব-হিতকর তাহাকে সজীব সাধনার দ্বারা সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বাস্তব করিয়া ধরায়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীনকে ভাঙেন নাই—উহার ধূলাকালি মুছিয়া, শিথিল সংযোগগুলির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া নূতন রূপ দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণশীলতা তাই আমাদের চিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না, আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার প্রতিমাপূজা দেখিয়া, এমন কি পরবর্তীকালে ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীর নিকট পীড়িত কেশবচন্দ্র সেনের জন্য ডাব চিনি মানত করিতে দেখিয়াও কেহ বলেন না—'কুসংস্কার।' প্রথম যৌবনে তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-আচারের (যেমন ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্ন গ্রহণ না করা) নিখুঁত পরিপালনকে 'দুর্বলতা' সংজ্ঞিত করিতে আমাদের বাধে।* তাঁহার বাল্যবিবাহে আমরা কিছু কুফল দেখিতে পাইনা, নিজের সহধর্মিণী এবং নারী-সাধারণের প্রতি লজ্জা-শীলতার উপদেশকে সমাদরের সহিতই গ্রহণ করি। 'পরমহংসত্ব' লাভ করিবার পরও তাঁহার গঙ্গাভক্তি, সন্ধ্যাবেলায় হাতে তালি দিয়া হরিনাম, বার তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি মানা—এই সকল নিষ্ঠাকে 'প্রাথমিক' বলিতে আমাদের ভরসা হয় না। অপর কোন

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-কারের সমর্থন এই প্রকার—

"ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা আমাদের ন্যায় মানবের অন্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে, ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? উত্তরে বলিতে হয়, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দুইটি এক বস্তু নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম ..শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি...। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে. কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ক্রমশঃ খসিয়া পড়ে

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৪র্থ অধ্যায়)

সনাতন-পন্থী—শ্রীধর ভট্টাচার্য, বিরূপাক্ষ গাঙ্গুলি কিংবা তারাদাস মুখুজ্যেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন আচরণ করিতে দেখিলে আধুনিকগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, হয়তো রায় দিয়া বসিবেন 'এঁরাই প্রগতির শত্রু'—কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণশীলতা আমরা স্বাভাবিকভাবেই মানিয়া লই। ইহার কারণ কি? কারণ—তিনি প্রাচীনকে একটি কল্যাণসজ্জায় সাজাইয়া দিয়াছেন—ঠকাইবার উদ্দেশ্যে নয়, আমাদিগকে লাভবান করাইবার জন্যই। যে রক্ষণশীলতার পটভূমি আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, বহুজনের হিত সে রক্ষণশীলতা নিন্দাহ নয়, উহা মানুষের জীবনে একটি প্রচণ্ড শক্তি। ঐ শক্তিকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা 'পথের দাবী'র ডাক্তারের মতো বলিতে পারি না—

"যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার,—সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক্,—আর কিছু না পারো, শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—"

বরং আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলি—

"নিন্দা কিছুরই করিও না—এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীতকালে সাক্ষৎসম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না; বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" (ভারতে বিবেকানন্দ—মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর)

"এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন-নদীতে পারাপার করিতেছে। আজ হয়তো তোমাদের নিজ দোষেই উহাতে দু একটা ছিদ্র হইয়াছে...এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণব-পোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই গিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে।...হৃদয়ের শোণিত দিয়াও উহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু উহাকে কখনই নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না। আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি।" (ভারতে বিবেকানন্দ—আমার সমরনীতি)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী আমাদিগকে যে প্রেরণা দেয় উহারও শক্তির অন্যতম উৎস যুগ-যুগ ধরিয়া সঞ্চিত প্রাচীন দ্রষ্টাগণের উপলব্ধি ও বাক্যসমূহ। তিনি বেদের ঋষিগণের কথা বলিয়াছেন; বশিষ্ঠ ব্যাস শুকদেব নারদের বহু উপাখ্যান, উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, কবীর-নানকের উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনায়, তাঁহার জীবন-লীলা শ্রবণে ও কীর্তনে মাতোয়ারা হইয়াছেন, রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত তথা বৈষ্ণবপদকর্তা এবং আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশদের গান গাহিয়া নাচিয়াছেন। কর্তাভজাদেরও নিন্দা তাঁহার সম্মুখে কেহ করিতে পারিত না। বলিতেন, আহা, এই পথেও কত লোক তাঁকে লাভ করেছে। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীতে স্বপ্রভ নূতনত্ব আছে বই কি। প্রাচীন উপদেশগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা জীবন্ত, প্রামাণিক ও সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন—ইহাই সেই নূতনত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা আধ্যাত্মিক সাধনায় নানা কল্পিত স্তর সৃষ্টি করিয়া নূতনত্বের দাবী করিতে যায় নাই। ধর্মের সত্য সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহুজনের বহু কল্পনাদ্বারা জটিলীকৃত হইয়াছে, সেই জটিলতাকে আরও বাড়াইয়া দিলে ধর্ম-পিপাসুর কোন্ সহায়তা সম্পন্ন হইবে? নূতন নূতন কল্পনা, আবার উহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কঠিন কঠিন শব্দ—ইহারা ধর্মের রাস্তা সুগম করে না, কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলে। রামবাবু-শ্যামবাবু-যদুবাবু-মধুবাবুরা সেই সকল কল্পনা ও শব্দ লইয়া বৈঠকখানায় দার্শনিক দ্যূতক্রীড়া জমাইতে পারেন, কিন্তু শত সহস্র তৃষ্ণার্তের পিপাসা উহাদের দ্বারা মিটে না।

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা প্রাচীনকে রাখিয়া, বাস্তব শক্তি দ্বারা উহাকে শক্তিমান করিয়া কিভাবে উহাকে নবীন করিয়া তোলা যায় তাহারই দিগ্‌দর্শন। এই প্রকার নবীনই কল্যাণকর, এই নবীনই অনুসরণীয়। অপর যাহা নূতনত্বের স্বপ্ন—তাহা শুধু অহঙ্কার, মোহ, দম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা মুখ্যত ইহকাল-প্রতিষ্ঠ। মৃত্যুর পরে কি হইবে না হইবে তাঁহার উপদেশে ইহার আলোচনা খুব কমই দেখিতে পাই। এই পৃথিবীতে, এই জন্মেই, এই ক্ষণেই জীবনে ধর্মের আলো আনিতে হইবে, প্রবল পুরুষকার, উদ্যম, জাগ্রত বিবেক সহায়ে মহোৎসাহে পথ চলিতে হইবে—এই প্রেরণাই তাঁহার কথাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। উদাহরণ দিয়াছেন সেই কৃষকের—যে স্নান, আহার, আরাম, নিদ্রা এ সকল সাময়িকভাবে ভুলিয়া দেহ-মনের সব শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কোদাল লইয়া খানার সহিত নদীর যোগ করিতে। একটি হিন্দীভজনের 'বনত বনত বনি যাই' পদগুলি তিনি শুনিলে বিরক্ত হইতেন। ধীরে ধীরে হইবে—একটু একটু করিয়া অভ্যাস করিব—এইরূপ দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বলতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণার বিরোধী।

পরকালের ন্যায় পরলোকের কথাও তিনি বেশী বলিতে উৎসাহী ছিলেন না। ভগবৎ-সত্য অনুভব করিলে ইহলোকই স্বর্গলোক হয়, এই এই সংসারই মুক্তির নিলয়ে পরিণত হয়—তাই তিনি দূরের খবর লইয়া মাথা ঘামাইতে বলিতেন না। জীবনে আধ্যাত্মিক রূপান্তর আনিয়া ইহ-জগৎকেই রূপান্তরিত করিবার আদর্শ নির্ণয় করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নিউ-ইয়র্কে প্রদত্ত তাঁহার 'মদীয় আচার্যদেব' নামক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"যদি কেহ বলিত, 'এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?' —তিনি হাসিয়া এই মাত্র উত্তর দিতেন,—'কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে তো ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, তাহার জন্য আমি হাজার বার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।'...... তিনি বলিতেন, যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।'"

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা যে শুধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক কল্যাণ অন্বেষণেই ক্ষান্ত হয় না, সমষ্টির জন্য ভাবা ও করাকে ধর্মসাধনার অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করে ইহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের উপমা—কূপখননের পর কাহারা ঝুড়ি কোদাল ফেলিয়া দেয়, কেহ কেহ বা অপরের কূপ খুঁড়িবার সময় উহাদের প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-জীবনের এই বিশ্বহিতপ্রেরণা উপলব্ধি করিয়াই স্বামীজী কলিকাতাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছিলেন—

"যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভ মাত্র দেখিতেছি। বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। * * * এইরূপ কোন মহান আদর্শপুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে না দাঁড়াইলে কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি, একেবারে কাজই করিতে পারে না। রাজনৈতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখনও সর্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। * * ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্মবীর —এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।"

আমাদের সকলের সহিত যিনি অনুক্ষণ নিবিড় তাদাত্ম্য অনুভব করিয়া আমাদের জন্য কাঁদিয়া

গেলেন, প্রাণ দিয়া গেলেন তাঁহাকে আমরা দেবতার সম্মান দিব, ইহা তো স্বাভাবিকই। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিলে আমাদেরও আসিবে অপরের জন্য কাঁদিবার, ভাবিবার, করিবার ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরণার শক্তিও এই বিশ্বহিতেই। তুমি যখন গঙ্গার তীরে মুখ ঘষড়াইয়া কাঁদ—'মা, এই নশ্বরজীবনের আর একটা দিন বৃথায় চলে গেল, এখনও দেখা দিলে না'—তখন আমরা বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি, তোমার ব্যাকুলতা-বৈরাগ্য-ত্যাগ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। বোধ হয় সঙ্কুচিত, ভীত, সন্ত্রস্তও করে। ভাবি, তুমি আমাদিগের হইতে কত দূর, সুদূর! তোমার নাগাল পাওয়া যাইবে না। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির পানে চাহিয়া আমরা কুণ্ঠিত দ্বিধায় স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি। কিন্তু তুমি যখন তোমার চলা শেষ করিয়া কুঠীর ছাদ হইতে আমাদিগকেও চলিতে ডাকো, হাকো—'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়'—তখন আমাদের সঙ্কোচ কাটিয়া যায়, সন্ত্রাস তিরোহিত হয়, তোমার 'মা' আমাদেরও মধ্যে জাগিয়া উঠেন। আমরা ছুটিয়া আসি, উড়িয়া চলি। আমরা যে তখন তোমার প্রেরণায় শক্তিমান হইয়াছি—তোমার পতাকা কাঁধে তুলিয়া, তোমার ব্রতে নিজেদের ঢালিয়া ঊর্ধ্ব আকাশে তারকা চিবাইবার, ত্রিভুবনকে উপড়াইয়া ফেলিবার সাহস করিয়াছি।*

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা অভিনব, কিন্তু আগন্তুক নয়। উহাতে সনাতন ভারতবর্ষই অনুস্যূত। সনাতন ভারতবর্ষের যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর তাহাকে উহা ঘোষণা করে, পরিপুষ্ট করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণায় ব্যক্তি সমুন্নত হয়, কিন্তু সমষ্টিকে বিযুক্ত করিয়া নয়। উহার দৃষ্টি বিচ্ছিন্নতায় নয়, সামগ্রিকতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে অনুপ্রেরিত করেন বিশ্বহিতসাধনই তাহার চরম লক্ষ্য—সেই ব্রতেই সে মহাশক্তি, পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করে।

* কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্ত্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥
(স্বামী বিবেকানন্দ,—স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত পত্র,
নিউইয়র্ক, ২৫।৯।১৮৯৪

"তং বন্দে গৌরজলদং—"

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় এবং শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ৪৭০তম জন্মতিথি পরিপালিত হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতগ্রন্থে মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের মঙ্গলা-চরণে ভক্ত-কবি বলিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যেন জলদ—ভক্তরূপ শস্যসমূহের জীবনদায়ী অমৃতবর্ষী মেঘ। সত্যই, কী অদ্ভুত মানব-ক্ষেত্র রচনা করিয়া গিয়াছিলেন এই দিব্যপ্রেমোন্মত্ত ভাগবত সন্ন্যাসী! পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান ঘুচাইয়া, দুষ্কৃতকারীর কলুষ-লেপ মুছাইয়া, ধনগর্বিতের ঐশ্বর্যমত্ততা কৃষ্ণৈশ্বর্যে আকর্ষণ করিয়া, অবহেলিত দীন দরিদ্রকে কৃষ্ণমহিমায় উঠাইয়া এক সুসংযত, দৃঢ়চরিত্র, নিরভিমান, ঈশ্বরবলে বলীয়ান, সেবাতৎপর মানব-সঙ্ঘকে এক লক্ষ্যে, এক ব্রতে, এক সাধনায় একত্রিত করিয়াছিলেন।

শত শত বৎসর ধরিয়া এই গৌরমেঘবর্ষিত-অমৃতপায়ী মানুষরা স্নিগ্ধ শান্ত ভাগবত জীবনের বাণী ও সাধনা বাঙালীর সমাজে তুলিয়া রাখিয়াছেন। বাঙলার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, চরিত্র সেই বাণী ও সাধনা দ্বারা নানাভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে, এখনও হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরগণ বাঙালীর ভাব-জীবনের অবিস্মরণীয় বন্ধু। তাঁহাদের অহেতুক কৃপার ঋণ বাঙালী বিগত প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া সঙ্কীর্তনে নাচিয়াও পরিশোধ করিতে পারে নাই, পারিবে না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাবপ্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন উহার ধর্ম নিশ্চিতই ছিল না শুধু ভাসানো, শুধু কাঁদানো। ঐ বন্যায় যে সত্যসন্ধতা, সাম্য, উদারতা, দৃঢ়নিষ্ঠতা, মহাশক্তি নিহিত আছে তাহা যেন বাঙালী না ভুলিয়া যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বপ্রাণের বন্দনা ও পূজা নিবেদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরতির গান রচনা করিয়াছিলেন—'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন'—ইত্যাদি। মহাকবি গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মলীলার স্মারক প্রসিদ্ধ গীতটি লিখিয়াছিলেন—'দুঃখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে'—ইত্যাদি। স্বামীজী নিজে এই গানটি গাহিয়া উহাকে মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে অনেক স্তব ও গান রচিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। রচয়িতাদের লক্ষ্য রাখা উচিত এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা যেন ফুটিয়া উঠে, শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম নয়। স্বামীজীর ও গিরিশবাবুর উপর্যুল্লিখিত গীতদ্বয় এই বিষয়ে আমাদের আদর্শ। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ভবভয়ভঞ্জন পুরুষনিরঞ্জন' এবং ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্যের (পরে—স্বামী প্রেমেশানন্দ) 'অরূপ সায়রে লীলালহরী'—এই দুটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীতের কথাও বিশেষ করিয়া মনে পড়ে।

অত্যুৎসাহীদিগকে স্বামীজী সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—

> "প্রাচীন অনাদি শাস্ত্র হইতে নূতন আলোক আসিতেছে; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।"

সত্য, ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ'; এবং 'কালে এই ছবির (তাঁহার নিজের ফটো দেখাইয়া) ঘরে ঘরে পূজা হবে'। কিন্তু এই বলিয়া তিনি কি সঙ্কীর্তনের এমন কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, পূর্ব পূর্ব অবতারগণ শ্রীরামকৃষ্ণের অংশ বা কলা? অথবা,—

> "রামকৃষ্ণের কৃপায় বিবেকানন্দ বিলায়
> ভক্তিমুক্তি বিনামূল্যে কে নিবি রে আয়।"

এইরূপ ভাব? শ্রীরামকৃষ্ণগৌরবখ্যাপনের জন্য পূর্ব পূর্ব অবতারগণকে তাঁহার কলা বা অংশরূপে প্রচার অপরিহার্য কি? ঐরূপ করিয়া ভাবিলে ভক্তের ব্যক্তিগত ভাবপুষ্টির হয়তো সহায়তা হয়, কিন্তু সমষ্টির কল্যাণের দিকে চাহিয়া ঐরূপ ভাবাতিশয্যের বহিঃপ্রচার বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবকে উহা ব্যাহত করিতে পারে। বিনামূল্যে ভক্তিমুক্তি বিলাইবার সনদ বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লাভ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কোন কথা বা কাজে কখনও প্রকাশ পায় নাই। এ সংসারে কোন কিছুই 'বিনামূল্যে' পাওয়া যায় না—ভক্তিমুক্তি তো নয়ই। ব্যাকুল হইয়া চাহিতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় অন্ততঃ 'এক ঘটি' কাঁদিতে হয়। কিছু না খাটিয়া, কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার সম্ভাবনা অতি-ভাবুকদিগের কষ্টকল্পনামাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ

সুধীরঞ্জন

শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা আর ধর্ম, অর্থ, মান
নহে মানুষের সবটুকু সার, চরম সত্য-প্রাণ।
বাহিরের বেশভূষা যাহা বল দেয় নাকো তারা কোন
"চরম-সত্য পরমমাণিক,"—সেই বাণী আজ শোন।
যে-বাণীধারায় জাগে মানবের আপন স্বরূপ জ্যোতি,
থাকে না বিভেদ, ঘুচে যায় কালি লভিয়া
আলোকরতি,—
শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বাণী লয়ে এলেন মোদের মাঝে
আছে ভগবান সবার মরমে অভিনব রূপসাজে।

ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান আর নগণ্য মূঢ়জন,
নির্বোধ বলে যাদের ধরায় দিই নাকো কোন পণ—
ঘৃণ্য বলিয়া যাদের ঠেলেছি গর্বের পদভরে,
সনাতনরূপী পরম পাবক আছেন তাদের ঘরে।
সম অধিকার আছে যে সবার লভিতে পরম জ্ঞান,
নিজের জীবনে সেই সুর সাধি' দেখালেন মহাপ্রাণ;
খুলে দিল পথ সত্যের পানে যাবার সুযোগ যত
খোঁজ অন্তরে, তব সত্তারে বিকশিতে মনমত।
এ মহা বাণী ভারতের বুকে যেদিন নামিল হায়,
জাগিল চকিতে ভারত সেদিন সত্যের সাধনায়।

শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, সাহিত্যশাস্ত্রী, এম্-এ

মাসে ফাল্গুনসংজ্ঞকে শুভদিনে চন্দ্রোপরাগক্ষণে
প্রোদ্দামৈর্হরিকীর্তনৈঃ কিল নবদ্বীপে মুহুঃ কম্পিতে।
জাহ্নব্যাঃ পুলিনে হিতায় জগতাং জাতং শচীগর্ভতঃ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥১

নানাভ্রান্তমতে বিগাহিষু মতিচ্ছন্নেষু বঙ্গেষ্বহো
ধর্মে গ্লানিজুষি প্রমুহ্যতি নয়ে সত্যে চ সংশোচতি।
অদ্বৈতপ্রভুণা প্রদত্ততুলসীগঙ্গাম্বুনাঽবর্জিতং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥২

সম্প্রাপ্তদ্বিজশাপমীশকৃপয়া বাল্যেঽতিচাপল্যতঃ
শাস্ত্রিভ্যোঽধিগতাগ্র্যশাস্ত্রনিচয়ং মেধাবিশিষ্যোত্তমম্।
আচার্যং তদনু স্বয়ং কৃতধিয়ামধ্যাপনাব্যাপৃতং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৩

ধর্মাসক্তিমথ ক্রমাদুপচিতাং পুত্রস্য সংপশ্যতা
সোদ্বেগং প্রতিকারলালসবতা পিত্রা নিয়োগাৎ পরম্।
উদ্বোঢারমনিন্দ্যকান্তিমনঘাং বিষ্ণুপ্রিয়াং প্রীতিতঃ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৪

শ্রীশ্রীবাসগদাধরপ্রভৃতিভিঃ প্রেমাস্পদৈঃ পার্ষদৈঃ
সানন্দং ক্ষপিতক্ষপং কিল হরে-রাধাদ-সংকীর্তনৈঃ।
নিত্যানন্দযতীশ্বরেণ চ তথাঽদ্বৈতাদিভির্যোজিতং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৫

প্রাপ্য স্বাজ্জননীমুখাদনুমতিং ধর্মস্য নির্ণিক্তয়ে
কৃত্বা গাঙ্গতটে সুকেশবপনং সন্ন্যাসমাসাদ্য চ।
গূঢ়ং ত্যক্তগৃহং রুদৎসু করুণং স্ত্রী-মাতৃ-মিত্রাদিষু
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৬

লব্ধ্বা কেশবভারতীশ্বরপুরীদীক্ষোপদেশামৃতং
প্রেম্নোদ্ধৃত্য চিরায় মাধবজগন্নাথাদিপাষণ্ডিনঃ।
শ্রীমদ্রূপসনাতনাদিষু কৃপামাধায় চাজ্ঞাং স্থিতং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৭

প্রব্রজ্যামনু দাক্ষিণাত্যবিষয়ে নির্বর্ত্য তীর্থাটনং
দিব্যোন্মাদদশাং প্রপদ্য সুচিরং নীলাচলং সংশ্রিতম্।
অন্তে সংহৃতসাগরোপমমহালীলঞ্চ ভক্তোত্তমং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সহগণং প্রেমাবতারং ভজে ॥৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাব্ধিলীলাং
স্তোত্রেণ সংক্ষিপ্তকলেবরেণ।
আতন্বতা যদ্ধি ময়াপরাদ্ধং
তন্মৃষ্যতাং প্রেমবশৈর্গুণজ্ঞৈঃ ॥৯

বঙ্গানুবাদ

ফাল্গুন মাসে শুভ দিনে চন্দ্রগ্রহণের সময়ে উদ্দাম হরি-সংকীর্তনের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ কম্পিত নবদ্বীপে জগৎ সমূহের মঙ্গলের নিমিত্ত শচী দেবীর গর্ভ হইতে জাহ্নবীতীরে জাত সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা করি।১

যখন বঙ্গদেশ নানাপ্রকার ভ্রান্তমতে নিমগ্ন ও মতিচ্ছন্ন, ধর্ম গ্লানিযুক্ত, নীতি মোহগ্রস্ত ও সত্য শোচনাপরায়ণ, সেই সময়ে অদ্বৈতপ্রভুকর্তৃক তুলসীগঙ্গাজলদ্বারা আকৃষ্ট সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে ভজনা করি।২

ভগবৎকৃপায় বাল্যকালে অতি চপলতাবশতঃ ব্রাহ্মণের শাপপ্রাপ্ত, শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট হইতে প্রধান প্রধান শাস্ত্রাধ্যায়ী অত্যুত্তম মেধাবী শিষ্য এবং পরবর্তীকালে স্বয়ং আচার্যপদে আসীন হইয়া তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের অধ্যাপনানিরত সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা করি।৩

পুত্রের ক্রমবর্ধমান ধর্মানুরাগদর্শনে উদ্বিগ্ন ও তৎপ্রতিকারকামী পিতার দ্বারা বিশেষরূপে আদিষ্ট হইবার পর প্রীতিবশতঃ অনিন্দ্যকান্তি নিষ্পাপ বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণকারী সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে ভজনা করি।৪

শ্রীল শ্রীবাস-গদাধর প্রভৃতি প্রেমাস্পদ পার্ষদের সহিত শ্রীহরির আস্বাদ ও সংকীর্তনে সানন্দে রাত্রিযাপনকারী এবং অদ্বৈতাচার্য, অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা করি।৫

আপন জননীর মুখ হইতে ধর্মের গ্লানি দূরীকরণার্থ অনুমতি লাভ করতঃ গঙ্গাতীরে সুন্দর কেশমুণ্ডন ও সন্ন্যাস-গ্রহণকারী এবং স্ত্রী, মাতা, বন্ধুবান্ধবদের করুণবিলাপকালে গোপনে গৃহত্যাগী সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা করি।৬

কেশবভারতী ও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা ও উপদেশামৃতপ্রাপ্ত, জগাই মাধাই প্রভৃতি পাষণ্ডগণের প্রেমের দ্বারা উদ্ধারকারী এবং শ্রীল রূপসনাতন প্রভৃতিকে কৃপাকারী ও বৈষ্ণবধর্মপ্রচারাদির নিমিত্ত আজ্ঞাকারী সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা করি।৭

সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর দাক্ষিণাত্যদেশে তীর্থপর্যটনকারী, পরে দিব্যোন্মাদদশায় সুদীর্ঘকাল নীলাচলে অবস্থানকারী এবং অবসানে সমুদ্রবৎ অপার গম্ভীর মহালীলাসংবরণকারী ভক্তশ্রেষ্ঠ সগণ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা করি।৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাসমুদ্রতুল্য লীলা সংক্ষিপ্তকলেবর স্তোত্রের দ্বারা বর্ণনা করায় আমার যে অপরাধ হইয়াছে, প্রেমবশংবদ গুণগ্রাহী সজ্জনগণ তাহা ক্ষমা করিবেন।৯

অবতার-কৃপা ও সাধনপ্রযত্ন*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

অবতার পুরুষদের জীবনে আমরা একটা বড় জিনিস দেখতে পাই। তা হচ্ছে অহেতুক কৃপা। আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা কিছু চান না কিন্তু সবাইকে সমানভাবে ভালবাসেন। এরই নাম অহেতুক কৃপা। শংকরাচার্য অবতারবাদের ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়মর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ—"তাঁর নিজের প্রয়োজন না থাকলেও জীবানুগ্রহের ইচ্ছায় শোক ও মোহসাগরে নিমগ্ন অর্জুনকে বৈদিক ধর্মদ্বয়ের উপদেশ দিয়েছিলেন।"

ঠাকুরের জীবনেও এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। দুবার তিনি গেছেন কেশব সেনের বাড়ীতে বিনা নিমন্ত্রণে। তাঁর কি দরকার? কিছুই না। একবার গেছেন কেশব বাবুর বাড়ী। দেখা হ'ল না। শুনলেন, কেশববাবু বেলঘরিয়া বাগানে রয়েছেন। গাড়ী ভাড়া করে ঠাকুর গেলেন সেখানে। তাঁর এই ছুটাছুটি, এই হরিনাম বিলানো—সবই বিনা প্রয়োজনে। তাঁরা এই ভালবাসা, এই করুণা, এই কৃপা ভাল করে ঢেলে দেন। এটা নির্ভর করে যুগের উপরেও। প্রথম ছিল বৈদিক যুগ—বেদ আর উপনিষদের যুগ। তারপর হ'ল বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধযুগের পর পৌরাণিক যুগ। এই যুগেই অবতার পুরুষরা আসেন—কৃপা করেন, অবতার পুরুষের সঙ্গলাভের আমাদের সৌভাগ্য হয়। যাঁদের এ সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা অহেতুক ভালবাসা আস্বাদন করেছেন। তাঁরাই জানেন, এ কী জিনিস!

এই যে অবতার পুরুষের এত কৃপা, এত ভালবাসা এর প্রসঙ্গ আমরা গীতায় অতি সুন্দর ভাবে পাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

(গীতা, ১০।১০)

"যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করে, আমি তাদের শুভবুদ্ধি দিই।" ভগবানের দেওয়াটা কত বেশী হ'ল। তিনি নিজে বলেছেন, "দিই কি? অহেতুক ভালবাসা—সেই বুদ্ধি যা দ্বারা লাভ করা যায়।" তারপর বলছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

(গীতা, ১০।১১)

"সেই সব ভক্তের অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার নাশ করি তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপরূপে আবির্ভূত হয়ে।" ঠাকুর বলতেন, "হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, কিন্তু দেশলাই জ্বালামাত্র অন্ধকার দূর হয়ে যায় একবারে।" অবতার পুরুষের অযাচিত কৃপা—এই আমাদের মস্ত বড় সম্বল। পৌরাণিক যুগ থেকে ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ অতি অদ্ভুত। এরই উপর সব নির্ভর করে। তবে চাই বিশ্বাস—যে বিশ্বাস নিয়ে শ্রীরামপ্রসাদ গাইছেন, "কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ।" গীতাও বলছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

... ...

এ মায়া পার হওয়া বড় কঠিন। তার পরের লাইনেই বলছেন—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং

* কাটীহার (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বক্তার ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত

তরন্তি তে॥" যারা আমার শরণ নেয় তারা এই মায়া পার হয়ে যায়।

আবার বলছেন,—

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

"মৃত্যুসংসারসাগর থেকে আমিই তাদের সমুদ্ধর্তা।"

গীতার শেষ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে বলছেন—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা, ১৮।৬৬)

গীতার কত জায়গায় এই ধরনের উক্তি—একে কী বলে? তিনি চান একটু ভজন, একটু ভালবাসা, একটু আপনার বলে মনে করা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলছেন,—"আমি বোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর্। একটু চেষ্টা কর্—পুরুষকার কর্।"

অবতারবাদে এই যে পুরুষকার—এ জিনিসটা কতটা চান? তিনি বলছেন, আমারা এক পা এগুলে ভগবান একশ' পা এগিয়ে আসেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এটা একটু বোঝার!—সত্যই এগিয়ে আসেন। এরই নাম কৃপা।

অনেকে বলেন তাঁর ইচ্ছায় সব হবে। তিনি করালেই করবো। তবে অন্যান্য কাজ নিজেই করেন। এটা হল ভাবের ঘরে চুরি। যতক্ষণ জানি ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ কাকে বলে ততক্ষণ দায়িত্ব আছে। এটা পালন করি সাধন পথে অগ্রসর হওবার জন্য। গানে যে শুনি "সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি কর মা" এতো সিদ্ধ অবস্থার কথা। আমাদের সাধনার শক্তি কত প্রয়োগ করছি—কতটা বিশ্বাস করছি! একটু যদি বিশ্বাস করে ডাকতে পারি তবে তাঁর কৃপা নিশ্চয় পাব। গীতা বলছেন—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র বলছেন পুরুষকার দরকার। পুরুষকার কর, কর্ম কর, কিন্তু তার ফল আকাঙ্ক্ষা কোরো না। ফলাফল তাঁর হাতেই ছেড়ে দাও। কিন্তু আমরা তা' করি না। কর্ম করতে গিয়ে আগে তার ফল খুঁজি। একটু কর্ম করতে না করতেই ফল খুঁজি আর ভাবি, 'কই কিছুই ত' হ'ল না'। এ যেন পয়সা দিয়ে শাকমাছ কিনে আনা।

আমাদের দিক দিয়ে ঠিক করতে পারছি কিনা আমাদের তা দেখতে হবে। এইটেই একমাত্র জিনিস যা আমাদের দেখবার। তিনি কি করছেন তা আমাদের চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা করি কি? আমরা তাঁর দিক দিয়ে বেশী চিন্তা করি—তিনি এটা করলেন না।

সব জিনিসই সময়সাপেক্ষ। অপেক্ষা করতে হয়—তাঁর উপর নির্ভর করতে হয়। পুরুষকারই সব নয়। তিনটা জিনিস আছে—পুরুষকার, দৈব ও কাল। পুরুষকার মানে চেষ্টা চাই। আমাদের চেষ্টা করতে হ'বে। দৈব মানে দেবতার কৃপা আর কাল মানে উপযুক্ত সময়। এই তিনটে জিনিস, যদি একসঙ্গে হাজির হয় তবে হবেই হবে। যেমন চাষবাসের সময় বর্ষা হ'ল উপযুক্ত সময়। তাই চাষী কি করে—না বর্ষা নামার আগেই চাষ করে। আর উপযুক্ত সময়ে ঠিক মত বৃষ্টি হ'লে চমৎকার ফসল হয়। এখানে পুরুষকার হ'ল জমিকর্ষণ, দৈব হ'ল বারিবর্ষণ, কারণ এটা দেবতার কৃপার উপর নির্ভর করে, আর উপযুক্ত সময় হ'ল বর্ষাকাল। আবার এমনও হয় পুরুষকার খুব করলে কিন্তু বৃষ্টি হ'ল না—দেবতার কৃপা হ'ল না—সমস্ত পুরুষকারই ব্যর্থ হ'ল।

আমরা বলি খারাপ সময় যাচ্ছে—দৈব অনুকূল নয়। এই যেমন হিট্‌লার উঠল। সব অনুকূল। যখন পতন হ'ল দৈব অনুকূল নয়। কিন্তু পুরুষকার করে যাচ্ছে। কত চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই হ'ল না। একটি শ্লোক আছে—

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম।
ত্রয়মেতৎ মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্॥

তিনটেই চাই। কেবল পুরুষকারে হয় না। অপেক্ষা করতে হয়—কখন সময় হবে, কখন দেবতার কৃপা হবে। তবে পুরুষকার ছেড়ে নয়। তামসিকতা যেন না আসে। পুরুষকার না ছেড়ে যদি চলি, এক সময় কৃতকার্য হব।

পুরাণে একটা বেশ গল্প আছে। সমুদ্রের ভেতর একটা পাহাড় ঢুকেছে। সেখানে কতকগুলি পাখী বাস করত। বহুকাল ধরে তারা সেখানে থাকে। সকাল বেলা তারা চরতে যেত আর খাদ্য এনে বাচ্চাদের খাওয়াত। সেখানে দুটি ছোট ছোট পাখী ঘর বেঁধেছিল। একদিন তারা চরতে গেছে। এমন সময় সমুদ্রের ঢেউ এসে চারটে ডিম সমেত তাদের বাসাটা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পাখী দুটি ফিরে এসে ডিম না দেখে সমুদ্রের ওপর তাদের ভীষণ রাগ। তারা কেবল চিন্তা করে কেমন ক'রে সমুদ্রকে এর প্রতিফল দেবে। অনেক পরামর্শ করে তারা স্থির করল যে সমুদ্রকে শুষে ফেলবে।

সমুদ্রকে শুষে ফেলার সঙ্কল্প করে তারা বসে আছে। সমুদ্রের ধারে যায়। এক এক ফোঁটা জল নিয়ে আসে মুখে করে আর সমুদ্রের ধারে বালির ওপর ঢালে। ছোট পাখী কতই বা তাদের শক্তি! কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পাখী ব্রতী হ'ল সমুদ্রকে শুষতে। কল্পনা কর কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! সমানে তাদের কাজ চলছে। খাবার পর্যন্ত সময় নাই। অন্য প্রতিবেশীরা তাদের কত বোঝাচ্ছে, "তোমাদের কি মাথা খারাপ হ'ল? ঐ বিরাট সমুদ্রের সঙ্গে কি তোমরা পার! একবার ডিম নিয়ে গেছে, আবার হবে। আমাদেরও ত' কত নিয়ে গেছে।" কিন্তু তারা তা' শুনছে না। দু'দিন তিন দিন কাজ চালাচ্ছে। তারা তাদের পুরুষকারের দিক দিয়ে করছে। কিন্তু দৈব ও সময় আসে নাই। ক্রমশঃ তারা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই রকম চার পাঁচ দিন চলছে। একদিন বিষ্ণু গরুড়ে চ'ড়ে যাচ্ছেন। তারা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দুটি ছোট ছোট পাখী ঠোঁটে করে এক এক ফোঁটা সমুদ্রের জল নিয়ে যাচ্ছে আর বালিতে ফেলে আসছে—এ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি গরুড়কে বললেন, "জেনে এসো ত' কী ব্যাপার, পাখী দুটি কেন ওরকম করছে।" গরুড় তাদের কাছে গিয়ে ব্যাপার জেনে এসে বলল। বিষ্ণু বললেন, "যাও গরুড়, সাহায্য কর ওদের।" গরুড় এসে সাহায্য করতে শুরু করল। সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিপদ দেখে বললেন, "রক্ষা কর।" দৈব অনুকূল হ'ল—সময় হ'ল। এইটা প্রয়োজন।

আমাদের সাধনভজনে ধৈর্য থাকে না। ঠাকুর বলছেন—খানদানী চাষার কথা। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি যাই হোক্ ছাড়বে না। আমাদের লেগে থাকাতেই হয়, নইলে কৃপা হয় না।

রামলালদাদার কাছে শুনেছি ঠাকুরের অহেতুক কৃপার কথা। দক্ষিণেশ্বরে রসিক নামে একজন মেথর থাকতো। ঠাকুরকে সে দেখতো প্রত্যহ দূর থেকে। কত লোক তাঁর কাছে যাচ্ছে আসছে। রসিক ভাবতো—"আমি কী পাপ করে এসেছি যে এত কাছে থাকতেও যেতে পারি না ওঁর কাছে। তাঁর কাছে কত পাপী তাপী যাচ্ছে, সবাইকে তিনি উদ্ধার করছেন। আর আমার কী দুর্ভাগ্য। চরণধূলা নিতে পারি না।" দক্ষিণেশ্বরে বাস করে—দেখা হয় দূর থেকে, কাছে যেতে পায় না। মনের ভেতর ঝড় বইছে। কতরকম তার মনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। প্রাণে শান্তি নাই। এই ভাবে দু' চার বছর গেল। অবশেষে শুভমুহূর্ত উদয় হ'ল। রামলালদাদা দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর শৌচে গেছেন, এখনই ফিরবেন। দূরে দাঁড়িয়ে রসিক ভাবছে, "আজ ভাগ্যে য থাক্, আর সহ্য করতে পারি না।" নহবৎখানার এদিকে আসতেই দু'হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমার কী হবে?" এই যে আমার কী হবে এই ভাবে বলতেই চমকে উঠেছেন। তারপর সমাধি। এমনি করে এক ঘণ্টা কেটে

গেল। রসিক পা জড়িয়ে চোখের জলে পা ধোয়াচ্ছে। প্রাণের ভেতর থেকে তার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জ্বালা ধুয়ে যাচ্ছে। পরে তাকে ধরে তুলে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "তোর সব হ'ল।" ঐ যে শ্লোক,—

"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" আমার শরণাগত হও, ধুয়ে পুঁছে সাফ করব। একদিন তাকে মুক্ত করলেন। সে আনন্দে সে রইলো। ত্রৈলোক্য বাবু তার খাবারের সব বন্দোবস্ত করল।

আর ওই গিরিশবাবুর 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস' এর কথা। তিনি বলতেন, "আমাদের দেখবি তবে ত' বিশ্বাস হ'বে। দেখ দেবতা করে দিয়ে গেছেন। কি ছিলুম কি হয়েছি। তাঁর ভালবাসার কথা কি বলব? জগাই মাধাই রেখে দে! কি করল ভালবেসে। শুনে ভালবাসতে পারবি। শাস্ত্র পড়ে এ সাধুসঙ্গ হয় না।" গিরিশ বাবু একটার পর একটা বলতেন। "আমার স্বভাব —যা করতে বলবে তার উল্টো করবো। কি করবো বলুন। বললেন, 'বিধি নিষেধের পার তোমরা, তোমাদের কিছু করতে হবে না।' ভাবলাম বেশ।"

"দক্ষিণেশ্বরে গেছি। খেতে বসেছেন। তখন একটু টানা ছিল। সেখানে গিয়েছি ঘোড়ার গাড়ীতে। গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছি। তিনি রামলালদাদাকে বললেন, 'বোতল নামিয়ে রাখ গাড়ী থেকে। খেতে ইচ্ছা হ'লে খুলে দেব। বড় মাছ গাঁথতে হলে হুইলের সুতো ছাড়তে হয়। একটু যদি বাধা দাও, যাবে—হিমসিম খাওয়ায়।' এইভাবে আমায় বেঁধেছেন। একদিনও বলেছেন, মদ ছাড়? কিন্তু শেষে দেবতা করে দিলেন।"

গিরিশবাবুর জীবনের একটি ঘটনা ঠাকুর স্বামীজীকে গিরিশবাবুর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছেন। বলেছেন, "রসুনে বাটি। হাজার হোক্ ধুলেই গন্ধ যায় না। মিশিস না!" বলেছেন, "নূতন হাঁড়িতে দই পাতলে ভাল বসে।" স্বামীজী নূতন হাঁড়ি। স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন গিরিশবাবুর কাছে। গিরিশবাবু এসে ঠাকুরকে ধরলেন, "আপনি নাকি বলেছেন নরেনকে এ কথা? বলুন, রসুনে বাটির গন্ধ যায় কি না?" "বলুন, যায় কি না?" ঠাকুর চুপ। "বলুন, গন্ধ যাবে কি না?" কি বিশ্বাস! ধমক খেয়ে ঠাকুর বললেন, "যদি আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া যায়, গন্ধ যাবে। তোমার বিশ্বাস-আগুনে যাবে।" গিরিশবাবু বললেন, "ও সব জানি না। গন্ধ যাতে যায় সে আপনাকে করতে হবে। আপনার কৃপা যে পেয়েছি।"

গঙ্গায় গাধাবোট থাকে। ষ্টীমারের সাথে জুড়ে দেয়। অবতার পুরুষরা ষ্টীমার আর আমরা গাধাবোট—যাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।

"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" এই হ'ল অবতারবাদের মূল সিদ্ধান্ত। আর জবাব দিতে পারলেন না গিরিশবাবুকে—"আপনার আশ্রয়ে রয়েছি আবার?"

তাঁকে ভালবাসা, আপনার করে নেওয়া হ'লে কৃপার অনুভূতি খুব পাওয়া যায়।

বোধি ও বুদ্ধি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

বোধি শব্দে বিচার ও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান বুঝায়, ইংরেজি ভাষায় 'ইন্টুইসন্' বলে। একে সহজ বা উপলব্ধ জ্ঞানও বলা হয়, যা মন বুদ্ধির ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধি খাটিয়ে যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি তাহা অপেক্ষা 'বোধি' যে বহুগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন ও সত্যাশ্রয়ী তা পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী হোতে আমরা প্রত্যক্ষ ও প্রতিদিন অনুভব করি। কোনো

দার্শনিকের তত্ত্ববিশ্লেষণ আমাদের হৃদয়ে 'কথামৃতের' অনুভূতি ফুটিয়ে তোলে না। কারণ "বোধি" জ্ঞানের আকর হিরণ্ময়-কোষস্থ সৎ-চিৎ-স্বরূপ; আর বুদ্ধির ক্ষেত্র ও প্রেরয়িতা ওস্থান থেকে দুধাপ নেমে বিজ্ঞানময় ও মনময় কোষাধিষ্ঠিত, জীবাত্মা। কুমার সিদ্ধার্থ সমাধি থেকে উত্থিত হোয়ে 'বোধিসত্ত্ব' বা 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হোলেন। তাঁর বাণী শুনে আপামর মুগ্ধ হোয়ে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ কোরেছিল।

কিন্তু বোধি ও বুদ্ধির মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, থাকতেও পারে না। বোধি-তত্ত্ব—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ পরাজ্ঞানের আকর থেকে, বিশুদ্ধসত্ত্ব হিরণ্ময়কোষের মাধ্যমে—সাধকের নির্মল চিত্তে ফুটে ওঠে। একে সম্যক্ 'দর্শন' বলা হয়। আর মন-বুদ্ধির একাগ্রতার ভিত্তিতে, সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি সেও সেই চিদানন্দ-স্বরূপের আকর থেকে আসে বটে, কিন্তু তিন আবরণের আড়াল থেকে প্রতিভাত হওয়ার ফলে তাতে রজ-তম খাদ মিশিয়ে যায়। আমাদের মনবুদ্ধি যতো একমুখী, একতান, যতো নির্মল ও একাগ্র হয়, তা থেকে উদ্ভূত জ্ঞান ততো বোধিরাজ্যের কাছাকাছি পৌঁছায়।

[শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে 'নকল বোধি'র প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই সব গুরু ঠাকুরেরা—অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ—বাক্‌বিভূতির সাহায্যে দুর্বল মানুষের বুদ্ধি আচ্ছন্ন কোরে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন। এঁরা প্রায়ই জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অস্বীকার কোরে শেষে ধরা পড়েন।]

বাস্তবিক পক্ষে বোধি ও বিজ্ঞানে কোথাও অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নাই, ইহা স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ চিকাগো পার্লিয়ামেণ্টে এবং পাশ্চাত্ত্যে বিশেষ রকমে প্রমাণ কোরে দিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ সাগরের এক একটি ঢেউ যেন বুদ্ধির বুদবুদ। সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে সম্বন্ধ, বোধি-বিজ্ঞানের সাথে বুদ্ধির সেই সম্বন্ধ। মানুষের "হুঁশ' যতো বাড়ে, তার চরিত্র যেমন অমলিন হোয়ে আসে, সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, সেই অধীকারীর নির্মল চিত্তে বোধির সত্য শ্যামল জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ ততো অধিক অনুভূত হয়। সে পরাজ্ঞানে ভুলভ্রান্তি প্রায় থাকে না। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ যেমন বায়ু, ধূলায় ফেনায়িত হোয়ে বহে যায়, মানুষের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিও রজতমে সীমায়িত, খণ্ডিত হয়।

ইন্‌স্টিংক্ট : মানবেতর প্রাণিজগৎও চিৎ-জড় গ্রন্থি। প্রতি সৃষ্ট পদার্থে এই মিলন রয়েছে। 'যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।' স্থাবর-জঙ্গমে মনবুদ্ধির ক্রিয়া অস্পষ্ট, তমে আচ্ছাদিত। বোধির আকর চিৎ-স্বরূপের জ্ঞান, অজ্ঞাতসারে এদের ভিতরে ক্রিয়া করে। তাই ইন্‌স্টিংক্টে ভুলভ্রান্তি নাই। আমরা বলি, এরা সব প্রকৃতিরাণীর প্রজা; তাঁর অলঙ্ঘ্য নিয়মে স্থাবর-জঙ্গমের জীবনযাত্রা নিয়মিত হয়।

মনু মহারাজ যখন 'মন'কে প্রাণিরাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে ভাল-মন্দ দ্বন্দ্বের স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন, মানুষ নিজের হাতে তার যাত্রাপথ নিয়মিত করার ভার প্রাপ্ত হোল, তখন থেকে জীব কর্মচক্র রথে আরোহণ কোরে কামনার তাড়নে নিজ ক্ষুদ্র আশ্রয়ে বোধি-রাজ্যে প্রবেশের জন্য ধাবমান। বহু জন্মজন্মের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে তার জ্ঞানবুদ্ধি, তার চরিত্র, তার স্থূল সূক্ষ্ম কোষগুলি শুদ্ধ হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বোধির স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রকাশের অমিলন ক্ষেত্রও তৈরী হোয়ে উঠছে।

বোধির স্ফুরণ অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা; তাঁরা ধ্যানযোগে প্রবুদ্ধ হোয়ে সৃষ্টিতত্ত্বসমূহ বেদ-উপনিষদে সাজিয়ে রেখেছেন। একে সম্যক্ দর্শনও বলা হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের

অনুভূতিসমূহ ভাষায় ব্যক্ত হোয়েছে। 'সীমার মধ্যে অসীমকে প্রকাশ করিতে গিয়ে নানা মুনির নানা মত হোয়ে পড়েছে। কিন্তু কোথাও বিকৃত হয়নি। ছাদে উঠা সিঁড়ির ধাপের মতো এক সত্য থেকে উচ্চতর সত্য প্রকাশিত হোয়েছে।

অন্যপক্ষে দার্শনিকেরা ক্ষুরধার বুদ্ধির সহায়ে তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ কোরে থাকেন। তত্ত্বহিসাবে তা আমাদের বুদ্ধিকে আলোড়িত করে বটে, কিন্তু হৃদয়ে প্রত্যয় আনে না, আনন্দ দেয় না। কিন্তু যদি কোনো দার্শনিক বা কবি বা সাহিত্যিক নিজ অন্তরে প্রবেশ কোরে তাঁর উপলব্ধির জিনিস ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন, সে বাণী আমাদের মুগ্ধ করে, আমরা তাঁদের 'জিনিয়াস', প্রতিভাশালী সুধী মনে করি।

ভারতের সনাতন শিক্ষা ছিল দুঃখত্রয়ের বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা তা থেকে চিরন্তন মুক্তিলাভের পন্থা-অন্বেষণ। পথ খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা উপলব্ধি করেন, বহির্বিশ্ব কার্য, আর তার কারণ ও প্রেরয়িতা অন্তরের অন্তরতম গুহায় প্রবিষ্ট ও নিহিত। তাঁদের দেখার উপকরণ 'সাধনচতুষ্টয়'-মার্গ অবলম্বন কোরে ঐ পথের দ্রষ্টা গুরুর কাছে সমিৎপাণি. কৃশহস্তে প্রণতি জানিয়ে দীক্ষালাভ। উদ্দেশ্য—আত্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিরহস্য উপলব্ধি কোরে, বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় জীবন যাপন এবং সর্ব জীবশিবের মুক্তির পন্থা-প্রদর্শন। তাঁরা জেনেছেন যে, প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ কোরে নিবৃত্তিমার্গে না গেলে বোধিতত্ত্ব লাভ হয় না।

উপনিষদের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ঋষি দার্শনিকদের জীবনে ও চিন্তাধারায় বোধির অন্তরঙ্গ স্পর্শ বেশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীশঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রমুখ সাধকদের রচনায় সমাধিলব্ধ বোধিজ্ঞানের প্রকাশ শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। তার পর থেকে, মোঘল ও ইংরেজের যুগে ভারতীয় মনীষীদের রচনায় তর্কশাস্ত্রের কচকচি, অলংকারের ধূম্রজাল, বুদ্ধির দীপ্তি সবই দেখা যায়, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তের হৃদয়গ্রাহী বাণী পাই না। সেই দিন থেকে পতনের সূচনা, জাতীয় জীবন থেকে সম্যক্ দর্শন বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়েছে। কেবল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতে আমরা বোধির বিদ্যুৎ-আভা, ভগবদ্‌বাণী শুনে মুগ্ধ হই, বুঝতে পারি, বুদ্ধি আর বোধির পার্থক্য কতো বেশী।

পাশ্চাত্ত্য ধুরন্ধরেরাও দুঃখত্রয়ের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা বুদ্ধিরথে আরোহণ কোরে বিশ্বামিত্রের ন্যায় এমন ব্যাসকাশী সৃষ্টি করতে চান যেখানকার মাটি থেকে ভোগের সকল সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে আসবে, বায়ুকে কীটাণুশূন্য কোরে আধিভৌতিক দুঃখ দূর করা যাবে, জল থেকে বাষ্প জন্মিয়ে, অগ্নি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কোরে, তাড়িৎকে কলে বেঁধে শিল্প, বাণিজ্য, জাহাজ, এরোপ্লেন দ্বারা ভোগের উপকরণ রাশি রাশি ভারে মানুষের ঘর দুয়ারে পৌঁছে দিবে। খুঁজতে খুঁজতে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরা এখন এমন সব মহাশক্তির সন্ধান পেয়েছেন যার দ্বারা তাঁরা গ্রহ উপগ্রহের কক্ষকক্ষার রহস্য উদ্‌ঘাটিত কোরে ফেলেছেন, এখন বিশ্ব ধ্বংস করার চাবিকাটি তাঁদের হাতে এসে গিয়েছে। উদ্দেশ্য, ভোগের উপকরণ বিপুলভাবে করায়ত্ত কোরে পৃথিবীর সকল দুর্বল জাতিকে কবলে রেখে গ্রহ গ্রহান্তরেও তাঁদের জয় পতাকা উড্ডীন করা।

গীতায় উক্ত আসুরিক কীর্তিকলাপ—আশাপাশ শতৈর্বদ্ধাঃ—আমরা চোখের সামনে দেখছি। বুদ্ধির দৌড় কতদূর যেতে পারে তার আভাস আমরা এ যুগে পেয়েছি।

বোধি বনাম বুদ্ধি, যেন বিরোধী তত্ত্ব বোধ হচ্ছে। বোধি জীবকে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় অমৃতত্বে নিয়ে যায়। বুদ্ধি যখন অহংকারে মণ্ডিত হোয়ে খণ্ডিত বাহ্যসুখ-সম্পদকে বরণীয় মনে করে, তখন সে জীবকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। বোধি

সমষ্টির কল্যাণকামী, ভগবন্মুখী, শান্ত-শিব-আনন্দ-পথের যাত্রী। বুদ্ধি ব্যষ্টির ভোগের ইন্ধন যুগিয়ে সর্বহারা, সর্বদা অতৃপ্ত, সকল সময়ে ত্রস্ত, কখন কে তাকে এগিয়ে এসে মারে, সবস্ব কেড়ে নেয়।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় শক্তি বোধিদ্রুমের অন্তর্নিহিত উপাদান। প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত তারই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, জ্ঞানের রাজ্যে যে এখন কোথায় গিয়ে হাজির হোয়েছে, বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রকাশে তা আমাদের হাড়ে হাড়ে মালুম হচ্ছে। একদিকে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-সম্পদের যান্ত্রিক উন্নতি বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিচ্ছে। অপরদিকে এটম-হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন বোমা তাদের ধ্বংস-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। শুনেছি পূর্ব মন্বন্তরে মানুষ যখন দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষদের এলাকায় হানা দিয়ে কামোপভোগের নেশায় উন্মত্ত হোয়ে শক্তির অপব্যয় কোরে ছুটেছিল, তখন 'এটলান্টিক' সভ্যতাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করবার প্রয়োজন হোয়েছিল।

সুরাসুরের দ্বন্দ্বকে অনেকে রূপক বলেন, জীবদেহে ভালমন্দের বিরোধ। কিন্তু প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে এদের অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে বাদ-বিসংবাদ সবদেশে বর্ণিত আছে। এখন আমরা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখছি ও ভয়ে কাঁপছি। সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়, জন্মের পর মৃত্যু, এ যেমন অবশ্যম্ভাবী ও সত্য, সুরের পার্শ্বে অসুরের অবস্থান ও দ্বন্দ্ব বোধ হয় নিত্য, সবকালে, সবযুগে বিদ্যমান। পৃথিবীতে সুর ও অসুর, দুই শ্রেণীর ভিতর থেকেই বহু অতিমানুষ জন্মেছেন, ভবিষ্যতেও জন্মাবেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে সুপার ডিভাইন ম্যানের কল্পনা কোরেছেন, যাঁকে যাঁকে শুদ্ধসত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, মানবহিতৈষী মহাপুরুষেরা এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন—দ্বন্দ্বের রাজ্যে তেমন ঘটনার সম্ভাবনা আছে কি? শ্রীরামচন্দ্রের পাশে রাবণ রাজা, যুধিষ্ঠিরের ভাই দুর্যোধন, অবতারাখ্য পুরুষদের পাশে জগাই মাধাই সবযুগে ছিল ও থাকবেই। এই মাটির পৃথিবীকে মন্থন কোরে বিষ ও অমৃত দুই উৎপন্ন হোয়ে থাকে। যাদের জীবন বোধির দ্বারা প্রভাবিত, প্রবুদ্ধ, অমৃতের অধিকারী তারাই। আর যারা পার্থিব ভোগের পিছনে ছুটেছে, যাদের দৃষ্টি ইহকালসবস্ব, রজোগুণের প্রভাবে তারা বল ও বিত্তের অধিকারী হোয়ে অমৃতভ্রমে ভয়াবহ বিষই উৎপন্ন কোরে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রলয়রূপিণী মহাকালীকে বলেছেন—করালি! করাল তোমার নাম, মৃত্যু ফিরে তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে। গোপন মৃত্যুবাণের সন্ধানী অসুররাজ্যের বৈজ্ঞানিকরা তাদের সুপারম্যান হিটলারের প্রেরণায় যে পরীক্ষা জার্মানিতে প্রথম আরম্ভ করেছিল, ধনমদে প্রমত্ত ইয়াংকিরা এখন—তাদের পূর্বপুরুষদের অপূর্ব সমন্বয়-বাণী বিস্মৃত হোয়ে সেই পাশুপত অস্ত্র আবিষ্কার কোরে রক্তচক্ষু দেখিয়ে সমস্ত প্রাণীদের কাঁপিয়ে তুলেছে!

তবে কি কোটীচন্দ্রোদ্ভাসিত বোধির স্নিগ্ধ জ্যোতি বুদ্ধিরাজ্যের নাগালের বাহিরে? মহা বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্ম বিচারের বুদ্ধির ক্ষেত্রে বোধির ছায়া পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে যখন অস্ফুটভাবে বোধির, ইন্টুইশনের জ্যোতি অনুস্যূত হোতে দেখা যায়, তখন বড় বড় বিজ্ঞানবিদের হৃদয়ে তার অভাব হোতে পারে না। কিন্তু অসুরেরা যে শ্রেয় অপেক্ষা প্রেয়কেই বরণ কোরে নেয়। তবুও ডাঃ হাল্ম থিরিঙ্গ, আইন্স্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অনুশোচনা বাণী আমরা শুনিতে পাই।

এখন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত মনীষীরা এখন ভারতের কর্ণধার। তাঁদের প্রথম ফতোয়াতে ভারতকে সেকুলার স্টেট, ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নিরপেক্ষ রাজ্য বলা হোয়েছে। ভেবেছিলাম, স্বামীজীর

বেদান্তবাণী ভারতবাসী প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হোল, সর্বভূতে নারায়ণ বিরাজিত, এবার থেকে শিশু ও ভবিষ্যৎ জনেদের মধ্যে জীব-শিবের মহান্ আদর্শ প্রচারিত হবে। কিন্তু দেখছি যে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সনাতন পথকে সযত্নে পরিহার কোরেই অগ্রসর। এঁরা না বেদান্তবাদী, না গান্ধীবাদী, পাশ্চাত্যের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বুলির সাথে ইণ্ডাস্টি য়েলিজম্‌কে আদর্শ কোরে এঁরা ধনবাদেরই প্রাধান্য স্থাপন করিতে চান। তার প্রথম ফল দেখছি, সাত বছরে ভারতের পনের আনা লোক অন্নবস্ত্রের অভাবে বোধি ও ধীহারা হোয়ে পশুত্বে পরিণত। বাকি এক আনা, যেন তেন প্রকারেণ ভোগের উপকরণ আহরণে উন্মত্ত। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজ্যে একদিকে শিক্ষা, শিক্ষক ও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের প্রতি দারুণ অবহেলা; আর অন্য দিকে হিন্দু সমাজ ও সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জন্য নিয়মশৃঙ্খল ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার আলো আনবার প্রচেষ্টা চলেছে। কর্ণধারদের সম্মুখে এখন 'শ্রেয়ের' দুই আদর্শ বিদ্যমান—রাশিয়া ও মহাচীনের একেবারে নূতন রকমের কর্মধারা; আর ইংলণ্ড ও আমেরিকার তথাকথিত ডিমোক্রেসী। ভারতের নিজস্ব সনাতনী 'শ্রেয়ের' পথ এঁরা একেবারে ত্যাগ কোরেছেন। মুখে মধ্যে মধ্যে দেশের পিতা শ্রীগান্ধীজীর আদর্শ পথের কথা বললেও অন্তরে তাঁরা ব্রিটেন—আমেরিকার শিল্প-বাণিজ্য, স্টার্লিং-ডলার সম্ভারের স্বপ্নে মশগুল। ওদের দেশে মেকানিযেসনের ফলে অসংখ্য বেকার সমস্যা মানুষকে দিন দিন পশুত্বে পরিণত কোরেছে। সেই বিষকুম্ভের দিকে তাকিয়ে আইনকানুন তৈরী করছেন দেশমুখ্যপ্রমুখেরা। বেদান্তের দেশে শ্রেয়ের কথা কেউ বলে না, বোধির কথা উপহসিত, বুদ্ধি রজোগুণ-প্রভাবে জড়শক্তি-আহরণে নিযুক্ত। ফলে রাজপুরুষদের চলচলনে দুর্নীতি এমন বিকট দন্ত বিকশিত কোরে প্রকাশ্যে নৃত্য করছে যে, পণ্ডিত নেহেরু সেদিন দুঃখ কোরে বোলে ফেলেছেন—ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের পাশে দিল্লী—বোম্বাইএর ভোগোপহত কর্মচারী ও শিল্পপতিদের নৈশ-বিহার ও জাঁকজমক তাঁর মুখ হেঁট কোরে দিয়েছে।

জয়তু গদাধর—জয় রামকৃষ্ণ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্যানে কার একাকার বিশ্বের বর্ম !
জ্ঞানে কার দিল ধরা সৃষ্টির মর্ম !
বাণী কার জগতেরে দিল নব শিক্ষা !
সাধনার পথ কার দিল নব দীক্ষা !
কার দেহে একাধারে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ !
জয়তু গদাধর, জয় রামকৃষ্ণ !

কার চিত সিঞ্চিত শুদ্ধা যে ভক্তি !
কার থির লক্ষ্যে সে শুভ্রা যে মুক্তি !
কার কাছে নারী জগদম্বার তুল্য !
কে দিল সে কাঞ্চনে মৃত্তিকা-মূল্য !
কার মাঝে নবরূপে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ !
জয়তু গদাধর, জয় রামকৃষ্ণ !

সহজ ভাষাতে দিল কে ধর্মশিক্ষা !
পরধর্মের প্রতি শিখালো তিতিক্ষা !
গৃহীদেরও কে দেখালো পথ সুসমৃদ্ধ !
সংসারী হ'য়ে কে গো তপোধন সিদ্ধ !
নরদেহী হরিহর শ্রীরাম ও কৃষ্ণ !
জয়তু গদাধর, জয় রামকৃষ্ণ !

প্রচারিল বিশ্বে কে অভিনব তন্ত্র !
মহাযন্ত্রের যুগে মহাযোগ মন্ত্র !
নবযুগে ধর্মের গ্লানি করি মুক্ত !
নানা মতে এক পথে কে ক'রেছে যুক্ত !
নব অবতার রূপে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ !
জয়তু গদাধর, জয় রামকৃষ্ণ !

ত্যাগীশ্বর

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত

তুমি ত্যাগী, তাইতো তুমি ঈশ্বর। তুমি নিরাভরণ, এই তো তোমার ঐশ্বর্য। তুমি তো বাইরের রূপ চাওনি, তাই তো তুমি অন্তরের রূপে অপরূপ। তুমি যশ চাওনি, লোকমান্য চাওনি, তাইতো লোকে লোকে প্রচারিত তোমার অমর নাম—অমিয় বার্তা, ঘরে ঘরে তোমার পূজা, হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারই ধ্যান। ভাল মন্দ জ্ঞান অজ্ঞান সব ছেড়ে তোমার সত্যকামী মন চেয়েছিল শুদ্ধা ভক্তি, তাই তো সত্যের প্রভায়, ভক্তির কিরণে তুমি আজ অগতির গতি, তুমি আজ জগতের আলো। তাই তোমার চরণে আজ আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র উদ্গীত হচ্ছে—

বঞ্চনকামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ,
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ।

গীতার অর্থ কি? গীতা ওলটালে যা হয়—অর্থাৎ তাগী বা ত্যাগী—'তাগী' ও 'ত্যাগী' দুইই ব্যাকরণগত শুদ্ধ। গীতা পড়লে কি হবে, গীতা হতে হবে, বললেন স্বামী প্রেমানন্দ,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মূর্তিমান্ গীতা। তুমি ত্যাগী, তাই তুমিই তো আমার গীতা, আমার বেদবেদান্ত! গীতায় কি আছে, কি তার মর্মার্থ আমার জেনে প্রয়োজন নেই, যদি তোমাকে জানতে পারি, বুঝতে পারি।

'প্রয়োজন নেই আমার চালকলা-বাঁধা বিদ্যায়' বললেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। সে তো অবিদ্যা যে বিদ্যায় ঈশ্বরের মহিমার উপলব্ধি না হয়। ত্যাগ করলেন বিদ্যার অহমিকা, অর্থকরী বিদ্যার অহংকার। নরেন তিন তিনটে পাস দিয়েছে, ঠাকুরের কত আনন্দ, কিন্তু আবার বলছেন, পাস যেন পাশ বা বন্ধনে পরিণত না হয়। দ্ব্যর্থক বাক্যে দিলেন অপূর্ব দ্যোতনা—"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।"

যিনি ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, অন্য সব পরীক্ষা তাঁর সে অগ্নি-পরীক্ষার কাছে কত তুচ্ছ!

এক হাতে টাকা অন্য হাতে মাটি, তফাৎ কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে কত তফাৎ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দৃষ্টি গভীর থেকে আরও গভীরে চলে যাচ্ছে—দুইই তো বিভিন্ন ধাতুর বিকার মাত্র। আরও গভীরে চলে যাও—দুইএর ভেতরে সেই অণু পরমাণুর নৃত্য। অতএব সোনা আর লোহা, হীরা আর কয়লা, টাকা আর মাটি তো একই। তবে কি মাটির জন্যে জীবনটা মাটি করব? ত্যাগ করলেন কাঞ্চনলোভ—বধ হ'ল স্বর্ণমৃগ। যিনি অকিঞ্চন, যিনি নির্লোভ, তিনি দরিদ্রতম হয়েও পরম ধনী—Having nothing, yet hath all! ধনী মারোয়াড়ী অর্থ দিতে চায়—হায়, সে কত নির্বোধ! যার কোনই অভাব নেই, যিনি অনন্ত হাতে অনন্ত ভাণ্ডার বিলিয়ে দিচ্ছেন তাকেও অর্থ দিতে চায়! চরম প্রত্যাখ্যানে অবনতশির হয়ে ফিরে গেল লছমীনারায়ণ মারোয়াড়ী।

নারীদেহ—আপাতদৃষ্টিতে কত সুন্দর, কত মনোহারী। কিন্তু আরও গভীরে চলে যাও শিরা ধমনীর মধ্যে রক্তের প্রবাহ, আর কতগুলি মেদ মাংসের নৃত্য। আরও গভীরে যেতে চাও, দেখ বিকটতম নরকঙ্কাল। এই অস্থিমজ্জাসর্বস্ব দেহের জন্য দেহপাত করব। কামিনী ত্যাগ করলেন—হলেন কামকাঞ্চনত্যাগী। তাই বলে কি ঘৃণা করতে হবে, তাও ত নয়। আরও গভীরে প্রবেশ করল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমুখী মন। দেখলেন, সেই এক জগদম্বাই 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' দেখলেন এক ষট্চক্র, এক পরমাত্মাই সকল চেতনের চেতয়িতা। দেখলেন এক বিদ্যুতেই সকল ঘর আলো।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকেই প্রণাম করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগে করলেন আত্মজয়, প্রণামে বিশ্বজয়।

'দামী শাল গায়ে দেব' ঠাকুরের ইচ্ছা হ'ল। মথুর বাবু করলেন ঠাকুরের ইচ্ছাপূরণ। খানিকক্ষণ শাল গায়ে দিয়েই বুঝলেন তার অসারতা, তখন মাটিতে ফেলে লাথি মেরে থুথু ছিটাতে লাগলেন—ত্যাগ করলেন সাজসজ্জা বেশভূষার পারিপাট্য। খাওয়ার বাসনা হল। স্তূপীকৃত মিঠাইয়ের ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মিঠাইয়ের মিষ্টত্ব তো জিহ্বায় শুরু, জিহ্বাতেই শেষ, ক্ষণিক মধুরের জন্য আমি মধুরতমকে হারাতে চাইনে। এমনিভাবে একের পর এক ত্যাগ চলল।

'উঃ' করে লাফ দিয়ে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যেন বিছায় কামড়েছে। বিছানার নীচে কে লুকিয়ে রেখেছে একটি টাকা পরীক্ষা করবার জন্য। ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু টাকার লোভ ত্যাগ নয়, টাকা দেখলে চোখ বুজে যায়, ছুঁলে হাত বেঁকে যায়। এ বড় আশ্চর্য ত্যাগ! এ ত্যাগের তুলনা নেই।

গৃহস্বামীকে জানিয়েই বৈঠকখানা থেকে কর্মচারীর কাছ থেকে আফিমের ডেলা নিয়ে ফিরছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু কোথায় পথ! যে পথের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর চেনা সে পথ কোথায় উবে গেল! এ কোন্ বনবাদাড় দিয়ে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্যে প্রতিষ্ঠিত যিনি, সত্যপথ থেকে স্খলিত হতে পারে না তাঁর পদযুগল। আফিমের ডেলা ফিরিয়ে দিয়ে এলেন—এবার তো পথ দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

মুখশুদ্ধির মশলা খেয়ে আবার কাগজে বেঁধে নিয়ে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, নহবৎখানা থেকে স্বগৃহে। দশ পা পথ। কিন্তু দশ পা পথ যেন দশ যোজন পথে পরিণত হয়েছে—গঙ্গার কিনারে গিয়ে হাজির হয়ে কাতরে বলছেন, 'মা ডুবি? মা ডুবি?" যিনি ত্যাগের বিগ্রহ, তাঁর আবার সঞ্চয়! এবারও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ পদস্খলিত হ'লেন না।

অন্যান্য অবতারের চাইতে ঠাকুরের বিশেষত্ব কি প্রশ্ন করা হল শ্রীমা সারদাদেবীকে। সর্বধর্মসমন্বয় নয়, সেবাধর্ম সংস্থাপন নয়,—মূর্তিমতী সরস্বতী উত্তর করলেন, 'এবারে দেখালেন ত্যাগ।'

অগ্নিশুদ্ধ ত্যাগপূত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী

জীবেরে শিখাতে তব জনম ধারণ—
    মুক্ত তুমি ধরা দিলে বাঁধনের মাঝে;
বুঝাতে জগতে জীবে 'জ্ঞান' কারে কয়
    নিজেরে সাজালে তুমি 'নিরক্ষর' সাজে।
পুঁথিগত বিদ্যা তার কিবা প্রয়োজন
    ব্রহ্মজ্ঞানমহার্ণবে যে করেছে স্নান?
পণ্ডিত পতিত হয় যে জ্ঞান অভাবে
    সেই জ্ঞানবর্ম ওগো তব পরিধান।
        তুমি, জ্ঞানের সাগর,
    তবু, চরণকমলে ধায় মন-মধুকর।

'যত মত তত পথ'—এই তব বাণী
    ধর্মসমন্বয় লাগি তব আগমন,
যে পথেই চলে লোকে পাইবে ঈশ্বরে
    একথা বুঝালে নিজে করি আচরণ।
'নিত্য যাঁর, লীলা তাঁর'—যিনি নিরাকার
    'ভক্তিহিমে' রূপ তাঁর ভক্তেরই লাগিয়া
নরদেহে ধরাধামে আসেন তখনি
    ভক্ত যবে চাহে তাঁরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
        তিনি—সদা ইচ্ছাময়
    তাঁহার ইচ্ছার কাছে কিছু মিথ্যা নয়।

মাতৃভাবে উপাসনা করিলে ঈশ্বরে,
মাতৃনামে হ'লে তুমি শিশুর সমান,
জগতের রমণীতে মায়ের মূরতি
আপন জায়াতে হ'ল তব মাতৃজ্ঞান।
মায়ের চরণে দিলে করি সমর্পণ
দুঃখসুখ, শুভাশুভ জ্ঞান ও অজ্ঞান,
'শুদ্ধা ভক্তি' রাখিলে কি ওগো দয়াময়
দুর্বল কলির জীবে করিবারে ত্রাণ ?
তব, নিজ কর্ম নাই
মায়ের ইচ্ছাতে কর্ম করিতে সদাই।

আনন্দপিয়াসী জীব আনন্দ লাগিয়া
নিশিদিন ছুটাছুটি করিছে ধরায়,
ব্রহ্ম হ'তে এলো জীব তাই এই ভাব,
আনন্দ নহিলে সে তো বাঁচিতে না পায়।
কামিনী কাঞ্চন আর বিষয়ের প্রতি
এই যে আসক্তি তার সে শুধুগো পেতে
'আনন্দ' 'আনন্দ' মাত্র ; কিন্তু দেখে হায়
সে আনন্দ ভেঙ্গে যায় দুদিন না যেতে।
সদা, আবিলতা-ময়
পার্থিব আনন্দ, তাই তাহা কিছু নয়।

জনম-মরণ মাঝে করিছে ভ্রমণ
অহঙ্কার-বশে জীব, তাই দুঃখ তার ;
অহঙ্কারে "আমি কর্তা" এই জ্ঞানে আসে
'তুমি কর্তা' এই জ্ঞানে পায় সে উদ্ধার।
তাইতো বিষয়ী জীবে কহিতে সতত
করিতে সংসার সদা 'যন্ত্র' মাত্র হ'য়ে ;
'প্রভু তুমি—আমি দাস'—এ হরিদ্রা মাখি'
ডুবিতে বিষয়জলে কুমীরের ভয়ে।
তুমি, বিষয়ীর তরে
ছিটালে অমৃতবিন্দু শুধু কৃপা ক'রে।

ব্রহ্মানন্দসাগরের আনন্দ সলিল
আকণ্ঠ করিয়া পান যে আনন্দ পেলে,
তাপদগ্ধ বিষয়ীরে করুণা করিয়া
সেই সে সাগর-কথা কহিবারে এলে।
কহিলে জীবেরে তুমি—আনন্দ বিমল
ব্রহ্মপদলগ্ন সদা, কর তাহা ধ্যান ;
সে আনন্দ পেলে যাবে অনন্ত পিয়াসা
এ ধরাতে কিছু নাই সে পদ সমান।
তাই, কামিনীকাঞ্চন
হ'যে গেল তব কাছে এত অকিঞ্চন।

আনন্দ সাগরে যেতে বহু আছে পথ
জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি আদি বহুবিধ যোগ,
দুর্বল কলির জীবে ভক্তি উপযোগী
ভক্তিতেই হবে সেই আনন্দ সম্ভোগ।
জ্ঞানের অতীত তিনি—পাণ্ডিত্যের দূরে
তাঁরে পায় জীবে শুধু কৃপা হলে তাঁর,
ভক্তিতে আসিবে কৃপা অতি ত্বরা করে
এই তব বাণী, ওগো যুগ-অবতার।
ভক্তি হন নারী
(মায়ের) অন্তঃপুরে যেতে তিনি সদা অধিকারী।

স্বার্থবুদ্ধি দূষিয়াছে মানুষের মন
'তুমি কর্তা' এই কথা কেহ নাহি কয়,
কাহারে বঞ্চনা করি' কে হইবে বড়
এ সাধনা চলিয়াছে সারা বিশ্বময়।
তাই এত ভেদাভেদ, এত কোলাহল
কোন জ্ঞানে নাহি পায় মীমাংসা খুঁজিয়া—
তব 'কথামৃতে' আছে ইহার উত্তর
জগতে হইবে শান্তি তোমারে বুঝিয়া।
তব উপদেশ
করিয়াছে জগতের কল্যাণ নির্দেশ।
তাই আজি দেখিতেছি পশ্চিমে পূরবে,
স্বচ্ছ কণ্ঠ তব নাম গাহিছে গরবে।

মহাজিজ্ঞাসা

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

বিংশ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিস্ময়ের চরম অভিব্যক্তি—ঐ আণবিক বোমা! হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার জঘন্য ইতিহাস আজিও অগণিত মৃতের হাহাকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। পরমাণুর সাথে পরমাণুর যে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তার বিচ্ছেদের বিরহানলেই নাকি, ঐ দানবীয় শক্তির বিকাশ। দুই পরমাণুর আকর্ষণ এত তীব্র যে সেই আকর্ষণের জোরে এস্‌রাজের একটি তারের একদিকে ঐ শক্তি ও অন্যদিকে একশ' (১০০) খানা বিরাট যুদ্ধ জাহাজ ঝুলে থাকতে পারে। ধ্বংসাত্মক শক্তির এ এক অদ্ভুত পরিণতি—তৈমুরলঙ্গের সর্বগ্রাসী লোলুপতার এ এক ঘনীভূত জমাটরূপ। কিন্তু ঐ আণবিক বোমা যতই ভীষণ হোক্, তার চেয়েও কদর্য সর্বধ্বংসী আর এক শক্তি পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—সে হ'চ্ছে মানুষে মানুষে অবিশ্বাস; যার হাতে এই বোমা একটা তুচ্ছ ক্রীড়নক মাত্র।

মানুষের সঙ্গে হিংস্র পশুর প্রভেদটা বোধ হয় সামাজিকতায়, মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, একজন অন্যজনের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হবে—এইটেই তার যথার্থ স্বরূপ। প্রেমের প্রাত্যহিক দেনা পাওনার ঐ সাতমহলা বাড়িটাই সমাজের আদর্শ; ঐটেই আঁকড়ে রেখেছে মানুষের কৃষ্টি, তার সুন্দরতর সৃষ্টিকেও। কিন্তু কেমন করে জানিনা, কোন এক ফাঁকে অবিশ্বাসের ঐ কুৎসিত বটগাছটা তার শত শিকড়ের আঙুল চালিয়ে দিল ঐ সাতমহলা বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ফলে "পিসার লিনীং টাওয়ারের" চেয়েও তাই সে আজ অধিকতর পতনোন্মুখ হয়ে উঠেছে।

এখন এমন একটা দিন এসেছে যখন মানুষের সাথে মানুষের অবারিত সহজ আলাপ অসম্ভব। ভাই ভাইকে বিশ্বাস করে না, বন্ধু বন্ধুকে নয়, ছাত্র শিক্ষককে নয়, পিতা পুত্রকে নয়। আজ একদেশের সাথে আর একদেশের শত্রুতা, এক জাতির সাথে আর একজাতির বিদ্বেষ, এক ইজ্‌ম্ (-ism) এর সাথে আর এক ইজ্‌মের বিদ্রোহ। পৃথিবীব্যাপী ভাগাভাগির এমন দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ প্রাচীর আর কখনও উন্মুখ হয়ে ওঠেনি; আর ঐ ভাগাভাগি এমনই দুশ্ছেদ্য যে কৌতূহলী হয়েও যদি একে অন্যের প্রাচীরের উপর উঁকি দেয় তো শত বোমারু বিমান ও সহস্র মেশিনগান তাহলে একই সাথে গর্জিয়ে উঠবে। বিশ্বপ্রেমিকতার তাই এখন নাভিশ্বাসের অবস্থা; অবিশ্বাসের তিক্ত ট্যাবলেট্‌কে চিনি মাখাবার জন্য ঐ বুলিটাকে মাঝে মাঝে দরকার হয়, এই যা।

পৃথিবীতে এটা কি আজ নূতন? আধুনিক, পুরাতনকে তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, তাকিয়ে দেখ তোমার মহাভারতে; সেখানেও রয়েছে জতুগৃহদাহের ঘৃণ্য কৃতঘ্নতা। উত্তরে বলতে হয়—হ্যাঁ ছিল, কিন্তু আজকালকার মত এতটা মুখোশ পরে, ভালমানুষ সেজে দেখা দিত না। Camouflage এর এতটা চটক তো আর তখন ছিল না। যক্ষ্মারোগী তখন নিজেকে জামাকাপড়ে ঢেকে স্বাস্থ্যবান বলে গর্ব করত না নিশ্চয়ই। তখন অবিশ্বাসের মধ্যেও একটা স্বচ্ছতা ছিল। বিরোধ হ'লে তাই একে অন্যকে করত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান; গোপনে চোরাবালিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতো না—বন্ধুর মৃত্যু হ'ল বালির দোষে। তখন দস্যুই ফাঁসিকাষ্ঠে অবলম্বিত হ'ত, তার হাতের রক্তাক্ত তরবারিটা নয়।

এই সর্বব্যাপী অবিশ্বাসের দীর্ঘ অভিশাপ প্রতিটি মানুষের মনে আজ অসন্তোষের তুষানল ধিকি ধিকি জ্বালিয়েছে। শত কাজের মধ্যে মানুষ তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়, একটা ছেড়ে আর একটাকে ধরতে ছোটে। আনন্দ পাবে বলে দিকে দিকে তার সে কি উন্মত্ত অভিযান! কিন্তু বাহিরের ঐ অধরা আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তাকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"। কিন্তু তাকে তখন "আগে" জানিয়ে আর কি হবে; অসন্তোষের ভুয়ো ভিতের উপর যে সে তার আশা-সৌধের শিখর উঁচু করে তুলবে ভেবে রেখেছে। ভাঙ্গবে জেনেও তাকে গড়ে তোলার সে কি উদগ্র উদ্যম, ডুবছে জেনেও কুশাগ্র ধরে বাঁচবার সে কী অদ্ভুত আতিশয্য!

শুধু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নয়—মানুষের সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া, জীবনেরই প্রতিভূ সাহিত্যেও ঐ দুঃস্বপ্নের কালো ছায়া আবর্তিত হয়ে উঠেছে। ডষ্ট্‌ভস্কির "ক্রাইম-এণ্ড-পানিশ্‌মেণ্টে"র নায়ক "রাস্‌কল্‌নিকফের" চরিত্রে ঐ ছাপ লাল কালিতে আঁকা। জীবনের বহু ঘাটে তার তরী লাগিয়েও সত্যকারের উপদ্রবহীন কোন শান্ত বন্দর সে খুঁজে পেল না। কেবল নৈরাশ্যের ব্যথান্বিত অত্যুক্তিতে সে তার জীবন ভরিয়ে তুলল। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তও ঘুরে বেড়াল গৃহ থেকে গৃহান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে কি যেন এক সান্ত্বনা পাবার আশায়; কিন্তু বাহির বিশ্বে ঐ সান্ত্বনা মেলে না, তাই তার মন শেষ পর্যন্ত মন্বন্তরে এসে হাজির হ'ল—যথার্থ জীবনস্বাদ আর খুঁজে পেল না। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের মত বিখ্যাত লেখক যোহানবোয়ারের "গ্রেট হাঙ্গারে"র নায়ক "পীয়ার হোমসের" মনেও এই অতৃপ্ত যাযাবর প্রবৃত্তি বাসা বেঁধেছে। কিছুই তার আর ভাল লাগে না। দিকে দিকে ছুটে বেড়ায় সে। জীবনে কি যেন তার হারিয়ে গেছে—বাহির বিশ্বে তাই সে দিশাহারা হয়ে খোঁজে :—

"ঘর হতে ধায় আগুন পানে, আগুন হতে পথে
পথ হতে ধায় তেপান্তরে, বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে, ধূলায় আকাশ ব্যেপে,

* * * *

অনাসৃষ্টি—সৃষ্টি আপন গড়া—
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া।"

(রবীন্দ্রনাথ)

নুটহাম্‌সনের "ভ্যাগাবণ্ড" উপন্যাসের নায়ক এড্‌ভার্টের মনও এই ব্যর্থ আশায় ভারাতুর,—ভাগ্যের ভ্রূকুটিও সেই সাথে রেখায়িত। মৎস্য-জীবীদের মাঝে সে তার তারুণ্য ও মানসিক সন্তুষ্টি নিয়ে পরমানন্দে নরওয়ের এক ফিয়োডের (fjord) ধারে বাস করছিল। হঠাৎ সেখানে গজিয়ে উঠল কারখানা। সহজ বৃত্তিলাভের চটকে সে হারাল তার মনের সম্পদ। যথার্থ সুখ ফিরে পাবার আশায় য়ুরোপের বহুস্থানে ঘুরল—অর্থও রোজগার করল অনেক, কিন্তু তার প্রথমজীবনের সেই শিশির-ভেজা স্বচ্ছ শুভ্র মানসিক আনন্দকে আর ফিরে পেল না। আন্তর লোকের রসাস্বাদ আকাশ-কুসুমের গন্ধ-লাভের মত চিরকালই অধরা থেকে গেল। বিভূতিভূষণের অপরাজিতের অপূর্বের ভাগ্যও ঐ একই সূত্রে গাঁথা। বাস্তবতার কঠিন স্পর্শে সে হারাল তার মনের সহজ শ্রীকে। বাহির বিশ্বে সে কত খুঁজল তার সেই পাঠশালাজীবনের সেই আপাতশ্রীহীন অথচ যথার্থ আন্তরিকতায় ভরপুর জীবনেতিহাসের সেই মঞ্জু আস্বাদনটুকুকে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর ঐ অন্তরশূন্য সহানুভূতির মাঝে কোন সান্ত্বনাই তাই আর তার জীবনের বসন্তবীথিকায় পুষ্পোৎসবে রূপায়িত হয়ে উঠল না। এই অবিশ্বাস ও অসন্তোষে ভরা পৃথিবীতে ওটা যে সত্যই দুষ্প্রাপ্য। গোগেলের লেখা

"ডেড্ সোর্লসে"র "চিচিকফে"র জীবনেও ঐ সমস্যার সমাধান অন্তর্হিত। লেগার্লফের লেখা "আউট কাষ্টে"র "এল্ভারসন্" তার জীবনের পাপকে—তথা অসন্তোষকে, বাহ্যিক প্রেম ও দয়ার স্পর্শে মুছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দুঃখের দুর্গম পথে তার জীবনবীণা অসংকোচে অনুরণিত হয়ে উঠল না। অন্তরের অসীম দেনা তাকে কোন দিনই আর আন্তর সম্পদের অফুরন্ত আনন্দকে ক্রয় করতে দিল কি! নিয়মকানুনের বাধা-ঘরের চারদেওয়ালের মাঝে সে শুধু মাথাটুকেই মরল। গেটের "ফাউষ্টে"র মত এরা সকলেই পূর্বাহ্ণেই জড়তার শয়তানের কাছে নিজকে বিক্রি করেছে যে। রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তনে"র "মহাপঞ্চক" ও হাডির "জুড়া-দি-অবস্কিয়োরে"ও ঐ ঝঙ্কার অনুরণিত। বার্ণাড্ শ এর "ব্যাক্-টু-মেথুলিয়া"য় ঐ একই সমস্যা। তিনি বুঝিয়েছেন আত্মার পরিপূর্ণতালাভ না হলে ঐ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি জীবনকে শতায়ু না করে আরো তিনগুণ বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, যাতে করে মানুষ তার বহু-ঈপ্সিত পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে—। এ হলেই মানুষ আবার তার "রেজারস্ এজ্" (মহয়ামের লেখা) খুঁজে পাবে—এবং অন্তরের আনন্দবেদনা তখনই তাকে করবে উদার, অবারিত। অবিশ্বাস ও অসন্তোষের অনভিপ্রেত অস্তিত্বের অবসানে মানুষ শান্তি পাবে, শান্তিতে থাকবে।

আধুনিক কবিতার রেখা ও আলেখ্য-সম্ভারেও ঐ সুর, ঐ শূন্যবাদ, ঐ নিহিলিজিম্ দেখা দিয়েছে। তাই দেহটাকে উপভোগ করার দিকে এত ঝোঁক। সিনেমা-থিয়েটার, তেল-ক্রীম-সাবান, আহার্য ও পানীয় প্রভৃতির জটলায় মানসিক সন্তোষ খুঁজে পাবার ঐ অসহজ সমারোহ। অবশ্য, জীবনের এই উপভোগের দিকটা নিঃশব্দে মুছে দিতে বলি না। কিন্তু এইটেই যে জীবনাস্বাদন তথা আনন্দানুভূতি নয়—এইটুকুই বলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন,—পৃথিবীর মত মানুষেরও দুটো গতি আছে, একটা আহ্নিক গতি,—যেটা স্বার্থের সাথে যুক্ত। আর একটা বাৎসরিক—যেটা পরার্থের, যেটাতে পৃথিবীর পৃথিবীত্ব তার গ্রহত্ব স্বীকৃত হয়। মানুষেরও তেমনি দুটো রূপ আছে—একটা স্বার্থের, আর একটা পরার্থের। পরার্থের ঐ বৃহত্তর গতিটাই মানুষের মনুষ্যত্বের মান নির্ণয় করে দেয়। আমরা আজ স্বার্থের ঐ ছোট গণ্ডিটাকেই মানুষের একমাত্র গতি ভেবেই যত ভুল করেছি। অবিশ্বাস ও অসন্তোষের অচলায়তন তাই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। দেহের ও স্বার্থের খাতে অঙ্কটা বেড়ে গিয়েছে, ফলে অন্তরের হালখাতাটার শূন্য পুঁজি, এ আর কারো চোখে পড়ছে না। বর্তমানে বীজগণিতের দেওয়া-নেওয়ার সমীকরণটাকেই এত বেশী চিনেছি, যে দেওয়ার পরিবর্তে, কিছু-না-নেওয়াই যে দেওয়ার যথার্থ সার্থকতা তা ভাবতেই পারি না। তাই এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের, "দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল", কেমন যেন একমাত্র সন্ন্যাসীদেরই করণীয় কর্ম বলে লোকে মনে করে। দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধ বর্তমানে এমন অসহায় ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে যে ভিক্ষা করতে সাধুও আজ ভয় পায়। মার্কসিষ্ট্দের মতে দয়া করে কাউকে কিছু দেওয়ার মত পাপ আর নেই,—আর পাপ না হ'লেও ওটা একটা নিছক মানসিক বিলাসমাত্র। তাঁদের মতে যদি কেউ দয়া করে তো করুক ঐ অনামিক State কে, যার ব্যক্তিগত সত্তা অন্ততঃ কিছু নেই। দেওয়ার পরিবর্তে কিছু না পেলে, 'দিও না—দিও না' শুনে সকলেই মনে করেছে ঐটাই বুঝি সত্য;—প্রচারের জোর এখানেই। গোয়েবল্স্ যে বলেছিলেন, মিথ্যাটাকে একশ'বার সত্য বলে প্রকাশ কর, মিথ্যাটাকেও লোকে সত্য বলে গ্রহণ করবে, ঐটা তার যথার্থ নিদর্শন। সেই

কারণেই, গ্রাহক ও দাতার মধ্যেকার ঐ সঙ্কোচের বিকল বিরূপ খণ্ডিত রূপটি, ঐ প্রকার মিথ্যা প্রচারের দরুণ আপাত সত্যরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাই স্বামীজী যে বলেছিলেন, "Let the giver kneel down and worship, let the receiver stand up and permit" এই কথাটা শুনলেই লোকে আঁৎকে উঠে। অন্তরের দৈন্য আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা আর বুঝতে দেরি হয় না।

তাছাড়া, বিংশ শতাব্দীর রাক্ষসী সভ্যতার শোষণে মানুষ কেমন যেন রক্তহীন হয়ে উঠেছে। সুস্থ মন নিয়ে চিন্তা করার শক্তিও যেন অবলুপ্ত। অবিশ্বাস ও অসন্তোষ পল্লবিত। চতুর্দিকে কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না। সকলেই বলে, 'আমি যা বলছি তাই মেনে চল—শান্তি পাবে; আমাকে আমার দলে থাকতে দাও, তোমার দলে টেন না, তা হ'লেই তোমার আমার মধ্যে বসন্ত বাতাসের আনন্দ-মিতালি যাবে ফুরিয়ে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষ তাহ'লে এই মুহূর্তেই শব্দায়িত হয়ে উঠবে।'

ইউ এন্ ওর দাবাখেলার আসরেও ঐ অবিশ্বাসের ভূত ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আমেরিকা এতদিন ধরে তার আণবিক বোমার দাবাটাকে চালিয়ে ভেবেছিল রাশিয়াকে কিস্তিবন্দী করে দেবে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখে, চাল ভুল হ'য়ে গেছে; রাশিয়ার দাবাটাও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই আপাততঃ কিস্তিমাতের আশ্বাসটাকে স্থগিত রেখে, ধীরে ধীরে "বোরের"-চাল আরম্ভ হয়েছে;—ওধারে শান্তির পারাবতের উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণীর দিকে কারো তাকাবার আর সময় নেই।

তাই বলি, অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের ঐ কুৎসিত ছলনার মাঝে, হে ভারত, তুমি জাগো। বিশ্বাসকে তুচ্ছতার অন্তরালে ঢাকা পড়তে দিও না। সমস্বরে ঘোষণা কর—"মানুষের সাথে মানুষের মিল অবারিত, তার মিল আন্তরিকতায়। বাহিরের সাদাকালো রূপটা দিয়ে তার বিচার চলে না। আর স্বার্থান্ধ, অলস জড় "ইজম্" (ism) এর পাষাণ প্রাচীরগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেখিয়ে দাও—উপস্থিতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ-সীমানার মাঝে একই আকাশ প্রসারিত—একই বাতাস প্রবহমান, একই আলোক অবারিত। বহিরাবরণটাকে বড় করে দেখো না। তুমি সার্ট পরেছ, আর আমি পাঞ্জাবী পরেছি বলেই কি হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান! তাই বলি, হে ভারত, উদরের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে, কমিউনিজম্, ডেমক্রেসি, অলিগার্কি প্রভৃতি রাজনীতির যে দুর্গেই তুমি বাস কর না কেন, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দাবিতে সকলকেই বুঝিয়ে দাও যে তারা মানুষ। তাদের মাঝে যে মিল, তা ঐ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" আত্মার আন্তরিকতায়। জনতার অন্তর কল্লোলের অনুরণনে যেখানে সকলের মাঝে একই বিশ্বাত্মা বিরাজিত; —যার পরশে অব্যক্তের অনুভূতি জাগে, মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব হয় সঞ্জীবিত, এবং যা প্রেমের পূর্ণ স্পর্শে স্নিগ্ধ ও সুরভিত। এই আত্মার কথা স্মরণ করেই ঋষিরা বলেছেন—একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" এই অনুভূতিতে কোন কৃপণতা নেই, কোন হানাহানি নেই; সেখানে "সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরণাধারার জলে।" সর্বমানবের মহামিলনের দ্যোতক ঐ আত্মার কথা স্মরণ করে সকল মানবকে এক মহামিলনের মঞ্জু মধুর ক্ষণে নিমন্ত্রণ কর। শান্তির পারাবতকে আবার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বিশ্রাম করতে দাও। মানুষের সাথে মানুষের অপার মিলন আবার উদাত্ত সুরে গেয়ে উঠুক :—

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ ॥
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তুমি কি দাঁড়াবে মোর জীবনের সায়াহ্ন-তিমিরে
মৃত্যুম্লান দৃষ্টিপথে ? অন্ধকার বিদুরিয়া ধীরে
প্রসন্ন কল্যাণ-হাস্যে ? কম্পমান নিস্তেজ অঙ্গুলি
তোমার চরণরজঃ স্পর্শিবারে উঠিবে আকুলি'
অধীর আগ্রহভরে ! ম্লান নেত্রে তোমারি মূরতি
মৃত্যুদ্বারে শেষবার চিত্তদীপে লভিবে আরতি
আমার ধ্যানের স্বর্গে ! হিম হ'তে হিমতর দেহে
তোমার পরশটুকু আশীর্বাদ করে' যাবে স্নেহে
পথিক আত্মারে মোর, দূর হ'তে সুদূর প্রয়াসী।
অনন্ত অতল হ'তে পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশি
চাহিবে গ্রাসিতে মোরে, তুমি দেব চিরজ্যোতির্ময়
আমারে দেখায়ো পথ। জীবনের যত অপচয়,
যত গ্লানি, যত ব্যথা, যত ভ্রান্তি যদি রহে ঘিরে,
তুমি শুধু দিও স্থান ও-চরণে বৈতরণী-তীরে।

দুটি প্রণাম

অমিয়কুমার

ভোর হয়। পাখিরা উড়ে যায় নীড় ছেড়ে, দূর থেকে আরো দূরে। হাজার হাজার কাজের চাকা ঘুরে ওঠে। মুখর পৃথিবী ডাক দেয় আমায়। আমি উঠে আসি। তখন, একটি প্রণাম জানাই তোমায়।

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মিছিল পার হয়ে পৃথিবীর পথে চলি। সে চলার সাময়িক বিরতি ঘটে সন্ধ্যাবেলায়। সব কাজের শেষে ফিরে আসি। ফিরে আসি, তোমার কাছে। সেই তো আমার নীড়। নতুন ক'রে বুঝি, তুমি আমার কতো আপন। বুঝি, শান্তি শুধু তোমার কাছেই। তখন, আর একবার প্রণাম জানাই তোমাকে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব*

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তাঁরা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্য বশতঃ ধর্মানুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সবকিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।[১]

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিত্তশালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চা ছিল না। বাঙলা গদ্য তখনো জন্মলাভ করেনি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোন উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিত্তশালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হন। এর শেষ রেশ 'হুতোমে' পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের জন্য এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পাল-পার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আন্দোলন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কোঁৎ, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তি-তর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রণীগণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অনুপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যাঁরা অধ্যয়ন

(১) বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মুনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম—যাগযজ্ঞ—পশুহত্যা—তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সর্বজনবোধ্য লোকায়ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

* দৈনিক বসুমতী (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬১)। অনুমত্যনুসারে পুনর্মুদ্রিত

করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এক দিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ —এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যাঁরা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়াতেন টোল চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেননি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রশ্নে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছায়নি।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলে' 'বিটেল বামুনরা' যে শুধু পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কান্টহেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিশুদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তত্ত্বটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 'ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর' লালন ফকিরের অর্থহীন গীত নয়।[২] এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু স্মার্ত নন, নৈয়ায়িকও ছিলেন, এবং স্মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণী জন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্ম-সমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয়নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই যে কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যার ছড়াছড়ি।
তারেও বার বার নমস্কার করি॥

'ছড়াছড়ি' শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাচ্ছিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও 'নমস্কার' করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের 'জবরদস্ত মৌলবী' ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবান্তর এমন কি অন্তরায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে 'ক' অক্ষরে 'কৃষ্ণনাম' স্মরণে 'একঘটি'[৩] চোখের জল ফেললেই অপর ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—খুব বেশী হলে, ভদ্র মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর ষড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্বল্যমান বেদ-বেদান্তের অখণ্ড দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দু-ধর্মের নব উন্মাদনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার

(২) শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:
আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

করতেন সে কথা বলা শক্ত ; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খ্রীষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,—অনুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কী পণ্ডিত অল বীরুনী, মোগল সুফী দারাশীকুহ, (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)[৪] এবং জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যানুষ্ঠান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে সংগ্রামের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই! এ স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানতঃ ব্যবহার করলেন হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত ন্যায় এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অনুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পদ্য এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অনপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয়নি এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দু-ধর্মের এই তুমুল আন্দোলন আকর্ষণ মন্থনের ফলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গদ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহু বার ঘটেছে ; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অর্ধ-মাগধী। মুহম্মদের কৃপায় আরবী গদ্য, লুথারের কৃপায় জর্মণ গদ্যের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায় ; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় ;[৫] এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণ-ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হইতে লাগল।[৬] প্রমাণ-

(৪) দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে : "হে প্রভু, তুমি তোমার সুন্দর মুখ কুফর (অবিদ্যা) কিম্বা ইমান (বিদ্যা) দু' পাশের কোনো অলকগুচ্ছ (জুল্‌ফ) দিয়ে ঢেকে রাখোনি।" এই শ্লোক ঈশোপনিষদের 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥' -রই অনুবাদ।

(৫) বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহা-পুরুষ কখনোই আরম্ভ করেন নি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীষ্ট বলেন তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেননি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে, মুহম্মদ বলতেন তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেননি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

(৬) একটা অবিশ্বাস্য গল্পে শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কল্পতরুকে 'অশ্লীল বৃক্ষ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের 'গোঁড়ামি' সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

স্বরূপ বলিতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বক্তৃতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনতে পাবে। তার মনে হয়, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনিনি। বৃন্দাবনের রসরাজ—রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেন নি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অকৃতজ্ঞ নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মও তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখিতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাইনি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর হৃদ্যতা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখিনি। মুসলমান-খ্রীষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে একটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখিতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেননি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্তনে ভাবোল্লাসে নৃত্য করে 'নিম্নশ্রেণী'র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজ কাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নফর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্য আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ত্রুটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দুধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। তার জন্য ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিম্বা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অতিশয় মারাত্মক পরিস্থিতি। দেশের দশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিত জনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত ফল আস্বাদ করতে হয়।[৭]

* * * *

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা

(৭) রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মফল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ স্থলে অবান্তর।

করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে ষষ্ঠেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসত্ত্বেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মৃদু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। স্যাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমেছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।[৮]

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?[৯]

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে। অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অন্য মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে 'নিখিরকিচ'—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটিটি—কোনো জায়গায় টোল পড়েনি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গীর। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য।' এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।" পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হ'ল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরণের 'বেগে'র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন) আচার-

(৮) আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, 'যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?' ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন 'ডোব ডোব, ডোব।'

(৯) এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, 'মাই কাপ্ ইজ স্মল; বাট্ আই ড্রিঙ্ক অফনার।'

ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে শুদ্ধমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি 'ধোপদুরস্ত' 'ফিটফাট' হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার 'ছুঁৎবাই' রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিক্টোরীয় প্যুরিটানিজ্‌ম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের 'ভণ্ডামি' লণ্ডভণ্ড করে দেবেন।[১০]

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ 'দূরের কথা' বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থাভেদে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অনুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।' 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষে বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি', 'জগৎ', এ সবের খবর থাকে না।"

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলছেন, "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই? যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে।[১১] আর একটি কথা

(১০) বিদ্যাসাগর মহাশয় এ দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। 'সীতার বনবাসে'র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্যামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই বেনামীতে, 'কাজিল-চালাক, দিল-দরিয়া তুখোর ইয়ার, তার একটি বেদড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ঠ্যাঁদড়ামি, লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বক্কেশ্বর আনাড়ির চূড়ামণি বে-অকুফের শিরোমণি।' ইত্যাদি 'গ্রাম্য' বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (!) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

(১১) শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানা-রূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

"মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণবায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

ইংরেজিতে এর প্রথম ছত্র "The Stars are blotted out!" —আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মতুয়ার (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।"[১২]

জনগণপূজ্য শক্তির সাকার সাধনা (পৌত্তলিকতা' শব্দটা সর্বদা বর্জনীয়—এটাতে তাচ্ছিল্য এবং ব্যঙ্গের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন, জড়সাধনার অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি মতুয়া কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত। যেখানেই যে মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করে (হায়, কলকাতার সরস্বতীপূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে অনেক সময় মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,—গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি? বাঙলা দেশে আজ আর ক'জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শক্ত—কারণ সে পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা আড়ম্বর তা দেখে বাঙ্গালার কত গুণী-জ্ঞানী যে বিক্ষুব্ধ হন তার প্রকাশ খবরের কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্ট্রেন করে এ স্থলে সে সত্যটি স্বীকার করি।'

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাধানের সামাজিক মূল্য কি?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার। এঁদের ধর্মাচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলামেশা করেছেন অবাধে। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীষ্টান মাইকেল, মুসলমান মুশরফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং

(১২) ডগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পন্থা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

'আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না, এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।'—গম্ভীরানন্দ

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় দ্রষ্টব্য

এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই। [১৩]

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গভাব বর্জন করেন তবে সেই অখণ্ড, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—'মহতী বিনষ্টি' হয়; এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয়নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মূল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি, তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের 'কালী-কাল্টে কন্‌ভার্ট' করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়। [১৪]

(১৩) পূর্ববর্তী যুগে পরাগল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

(১৪) এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি 'নাছোড়বান্দা' ছিলেন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন 'নাছোড়বান্দা'র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অন্য সত্যও সর্বজনবিদিত—(কামিনী-কাঞ্চনে) পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তার থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্তায় (Purse) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যাঁরা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহু বার বলেছেন, 'কলিকালে মানবের অন্নগতপ্রাণ।' এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণ-নীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্য কোন চিন্তার স্থান আর তার মস্তকে নাই। তবু যাঁরা ধর্মে অনুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, 'উপায় কি?'

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অনুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ের তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাবে আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মানুষের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌছতে চায়—রাখাল, নরেন্দ্রের মত যারা জন্মাবধি জীবমুক্ত তাদের ক'জন বাদ দিলে আর ক'টি প্রাণী সে স্তরে পৌছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি দম্ভভরে কিছু বলি, তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দম্ভভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অন্য কোন চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * * *

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্‌ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কৌতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাঙলায়, তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?'

এর উত্তরে বলবো, 'মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই।' এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই* এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছনর পরও কোনো কোনো মানুষ লোক হিতার্থে এ সংসারে ফিরে আসেন। যেমন নারদ শুকদেবাদি।' এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এ রকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এ যাবৎ কেউ নির্মাণ করেন নি।

* * * *

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে ফিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে লুঙ্গীর মত পরে আল্লা আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খৃষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে-কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কায়মনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমূলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি গাহেন তখন তিনি বলেন, 'হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।'

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই,—'হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।' অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে স্মরণ করেছেন তখন তিনিই

তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহুঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অন্য দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমূলার এর নূতন নাম করেছিলেন, 'হেনোথেয়িজম'।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আর্যধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আল্লা আল্লা করেছেন তখন আল্লাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সবধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সব কিছুর অবহেলা করেন নি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অন্য ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আর্যধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করেনি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধানে সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

আবির্ভাব ও লীলা

ব্রহ্মচারী শিবশঙ্কর

জেগেছে জেগেছে ভূমা অসম্ভব হয়েছে সম্ভব
প্রাণের পরম টানে রূপহীন ধরিয়াছে কায় ;
জীবন-মরণ-পারে রাজে যার অসীম বৈভব
ভঙ্গুর শরীর মাঝে বরিল সে ক্ষণিক সীমায়।

দাও আজি জয় জয়, গাও গান প্রাণের হরষে
গভীর আবেগ-ভরে সুর তোলো মরম-বীণায় ;
ভকতির ডালিখানি ভরি' লও ধ্যানের পরশে,
অজানায় চিনি' রাখ বসুধার আলোক-বিভায়।

আকাশে বাতাসে শুধু পুলকিয়া প্রাণের স্পন্দন
উচ্ছ্বাসের আলোড়নে বিমোহিত বিশ্বচরাচর ;
নূতনের কলতানে চমকিত চকিত পবন
প্রকৃতি প্রণত হলো ফুলে ফলে পল্লব-মুখর।

বাঙ্‌মন-অগোচর চির সেই পুরুষ পরম—
হে দেব শ্রীরামকৃষ্ণ আজি এই মরতের সাজে,
নামিয়াছ করুণায় ধরি' ক্ষুদ্র মানব-জনম
করিতে আশ্রয়দান বিশ্বলোকে আপনার মাঝে।

ধরণী ভাসিল স্নেহে হেরি' তব মধু বাল্যলীলা,
জীবনের রঙ্গমঞ্চে আরও কত মূর্ত অভিনয় ;
চমকিয়া রুদ্ধশ্বাসে, অনিমিখ নয়ন মেলিলা
নেহারি সাধন তপ সুকঠোর বিশ্বের বিস্ময়।

পথিক পাইল পথ, তাপিতের তাপ হ'ল দূর,
বিভেদ মিশিয়া গেল একতার মণিহারে আসি' ;
অতলে হইল লীন গ্লানি-মোহ-বিরোধ-অসুর,
কামনা ত্যাগের সাজে পে'ল প্রাণ চির-অবিনাশী।

তোমার উপমা তুমি সমতুল নাই ত্রিভুবনে,
অসীম-সীমার সেতু বিরাজিছ আদি-অন্ত-পথে ;
পূর্ণ হোক্ বিশ্বলোক বিরাটের ক্ষুদ্র আবাহনে
'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ'—নতি লও এ' পৃথিবী হ'তে।

আমরা ও তাঁহারা

শ্রীমতী শান্তি ঘোষ

১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে আমার ইংলণ্ড-প্রবাসের কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় ওদেশের নারীদের সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা হইয়াছে, আজ সেই কথাই লিখিতে বসিয়াছি। আমি ছিলাম লণ্ডন হইতে ১২০ মাইল দূরে ষ্ট্যাফোর্ড নামে একটি ছোট শহরে। এখানে এমন বহু মহিলা ছিলেন যাঁহারা লণ্ডন কখনও চোখে দেখেন নাই; সুতরাং আমার লেখার মধ্যে ইঁহাদের গ্রামীণ জীবনই অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষের গ্রাম বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইংলণ্ডের গ্রামকে সেইরূপ বুঝিলে আমরা প্রকাণ্ড ভুল করিব। ইংলণ্ড একটি ছোট দ্বীপ; ইহার দশ মাইল অন্তর অন্তর একটি করিয়া শহর আছে এবং গ্রাম বলিয়া যাহা কিছু তাহা এই দশ মাইলের মধ্যেই বুঝিতে হইবে। শহরের অধিকসংখ্যক দোকানপসার ব্যতীত অন্য সব সুবিধাই গ্রামে পাওয়া যায়। এখানের মেয়েরা বিদ্যুৎশক্তি বা গ্যাসে রান্না করেন, প্রায় প্রতি বাড়ীতেই টেলিফোন আছে, শহরে যাওয়ার চমৎকার রাস্তা ও দশমিনিট অন্তর অতিশয় আরামদায়ক বাসের ব্যবস্থাও আছে। ড্রেন ও কলের জলের অভাব নাই, স্থায়ী দোকান বেশী না থাকিলেও মোটরযোগে সব কিছু ফিরি করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত।

আমরা—ভারতবর্ষের মেয়েরা যখন ঘরকন্নার কাজ করিয়া থাকি তখন আমরা নানা লোকের সাহায্য লইতে বাধ্য হই। পরিচারক অথবা পরিচারিকা, অভাবে শাশুড়ী, ননদ, জা, ভগ্নী ইত্যাদি আমরা একত্রে মিলিত হইয়া কর্ম করি। গৃহকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার যতখানি গুণ ও পরিশ্রম প্রয়োজন সেগুলি আমাদের দেশে একক একটি মেয়ের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। যে মেয়ে রাঁধিতে দ্রৌপদী তাহার হয়ত বাগান করিবার সৌন্দর্যবোধটুকু নাই, অথবা যিনি গৃহের অন্য সকল কর্মে নিপুণ তাঁহার বাসন মাজিবার ক্ষমতা কম—অধিকাংশ গৃহেই এইরূপ দেখা যায়। আমাদের সমাজবন্ধন অধিক ও বৈজ্ঞানিক সাহায্য কম, এইজন্য আমরা আরও বেশী পরিমাণে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। একটি ইয়োরোপীয় ঘরকন্নার কাজ বলিতে ঘরের অগ্নিকুণ্ডের জন্য কয়লাভাঙ্গা, বাসনমাজা, রান্নাকরা, ঘর ও কারপেট ঝাড়া, স্নানাগার পরিচ্ছন্ন করা, বাজার করা, কাপড় কাচা, নিজের ফল ও ফুল বাগানের প্রতি দৃষ্টি রাখা এই সবই বুঝায়। ইহা ভিন্ন যাঁহার পুত্রকন্যা আছে তাহাদেরও পালনের ভার আছে। বাড়ীর চুণকাম, রং এবং নিজেদের গাড়ী থাকিলে তৎসংক্রান্ত সমুদয় কর্মও কর্তা অথবা কর্ত্রীকে করিয়া লইতে হয়। অধিকাংশ গৃহ বলিতে দুইজনকেই বুঝায়, যেমন কর্তা ও গৃহিণী—কর্তা যদি আফিস করেন তবে যাবতীয় কাজ গৃহিণীকে করিয়া তুলিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুজনেই অফিস করেন, আর অবকাশ সময়ে মিলিতভাবে গৃহকর্মগুলি সারিয়া লন। অবশ্য ইঁহাদের সুবিধাও আছে প্রচুর, যেমন রেশনটি প্রতিবাটীতে দিয়া আসিবার ব্যবস্থা আছে, অনেক দ্রব্যই বাড়ী হইতে টেলিফোন যোগে ক্রয় করা যায়, বাজারে মৎস ও মাংস কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া বিক্রয় করা হয়, রান্নায় মসলার হাঙ্গামা নাই, কেননা ইঁহারা অধিক পরিমাণে টিনের খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করেন। প্রতি রান্নাঘরেই রাঁধিবার গ্যাস (ইহাতে একত্রে বহু রান্না হয়) ও পার্শ্বে বাসনমাজিবার বেসিন ও কল আছে।

এত সুবিধা সত্ত্বেও অধিকাংশ ইয়োরোপীয় মহিলারা যে কাজ একা সম্পন্ন করেন আমাদের পক্ষে তাহা কল্পনারও অতীত। ভারতীয় কন্যাদের ঘরে ও বাহিরে দুদিকেরই কর্ম করিতে খুব কমই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় মহিলারা গৃহের প্রয়োজনীয় কোনও কর্ম করিতেই লজ্জাবোধ করেন না। স্নানাগার পরিচ্ছন্ন করা ইঁহাদের একটি নিত্য কর্ম। ইহা ব্যতীত আমার নিজের দেখা দুটি ঘটনা নীচে লিখিলাম। আমার পাশের বাড়ীর গাড়ীপথটি একটু উঁচুনীচু থাকাতে গাড়ী চলিবার রোজই অসুবিধা হইত। একদিন দেখি গৃহকর্ত্রী কিছু ছাই ও পাথর দিয়া রাস্তাটি সমান করিয়া তাহার উপর রোলার টানিয়া দিতেছেন। আর একদিন চোখে পড়িল, একটি বাড়ীর কয়লা কমিয়া যাওয়াতে স্বামী ও স্ত্রী দুজনে জঙ্গল হইতে একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিতেছেন। বলা বাহুল্য যে ইঁহারা সকলেই ভদ্র-গৃহস্থ।

ভারতের শহরে শহরে বহু উচ্চশিক্ষিতা মহিলা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা যেমন বহু, আবার একেবারেই শিক্ষা পান নাই এরকম মেয়েরও অভাব নাই। বিশেষ করিয়া যাঁহার হয়তো শিক্ষার প্রতি বা কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল তিনি জীবনে সুযোগ পান নাই এরকম নারীর সংখ্যাও খুব কম নহে। অক্ষর পরিচয় নাই এইরূপ নারীর সংখ্যা ভারতে লক্ষ লক্ষ। ইংলণ্ডে যে মহিলারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই ৫ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করিবার জন্য সরকার বাধ্য করিয়াছেন; এজন্য অক্ষরপরিচয় নাই, এমন মহিলা ইংলণ্ডে পাওয়া যায় না। ১৫ বৎসরের পর প্রাইমারী স্কুল হইতে যাঁহারা 'গ্রামার স্কুলে' যাইবেন তাঁহারা শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগী না হইলে যাইতে পারেন না। ইউনিভারসিটিতে পড়েন এমন মহিলার সংখ্যা ইংলণ্ডে খুবই কম। গ্রামার স্কুলে না যাইতে পারিলেও কলাবিদ্যা, সূচিশিক্ষা ও অন্যান্য গৃহস্থালী কর্ম শিখিবার বহু স্কুল আছে। কন্যারা আপন আপন রুচি-অনুযায়ী এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। যে সকল মেয়ে চাকরি করেন, তাঁহাদের জন্য রাত্রিতে শিক্ষালাভ করিবার ব্যবস্থা আছে। সরকারই সমুদয় শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন।

ভারতবর্ষের মাতাদের স্নেহ ও স্বার্থত্যাগের তুলনা হয় না। শিশুদের সব রকম সুবিধা দিবার জন্য তাঁহাদিগকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। এজন্য ভারতীয় শিশুরা নিজ নিজ মাতাকে সুখ ও শান্তির নীড়রূপে বুঝিতে শিখে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় অতিরিক্ত স্নেহ পাইয়া শিশু বহু বৎসর পর্যন্ত মাতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয় মায়েদের দেখিলাম, তাঁহারা নিজ শিশুর প্রতি মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া জীবন কাটাইতে পারেন না। যাবতীয় কর্ম এক হাতে সম্পন্ন করিতে হয়, এইজন্য প্রাতঃকালে শিশুর প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা শিশুদের ঘরে অথবা ঠেলাগাড়ীতে বসাইয়া দিয়া যান। শিশু আপনমনে খেলিতে থাকে। পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আসিলে মা আবার আসিয়া ভিজা কাপড় পরিবর্তন করিয়া আহার দিয়া যান। আহারের সময় ও দিনে তিনবার পোষাকপরিবর্তনের সময় ব্যতীত ইংরেজ শিশুরা মাতৃক্রোড়ে উঠিবার সুযোগ পায় না। মাতা দোকান, বাজার, অফিস, ব্যাঙ্ক যেখানেই যান শিশুকে ঠেলাগাড়ী করিয়া সঙ্গে লইতে হয়। শিশুকে লইয়া বাসে যাইবার জন্য ছোট আকৃতির ঠেলাগাড়ী পাওয়া যায়। ইয়োরোপের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শত সহস্র শিশু ঠেলাগাড়ী করিয়া মায়ের সহিত রাস্তায় ঘুরিতেছে। বৃষ্টি ও বরফেও মায়েরা শিশুকে লইয়া বাহির হইতে পশ্চাৎপদ হন না। হাঁটিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের পায়ে হাঁটিয়া মায়ের সহিত ঘুরিতে হয়। শিশুকাল

হইতেই এইভাবে লালিতপালিত হইয়া প্রতি শিশুই অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠে। আমার ল্যাণ্ডলেডির একটি ১৮ মাসের শিশু ছিল; এই শিশুটি একদিন আহার দেখিয়া ক্রন্দন করিলে ল্যাণ্ডলেডি খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে দুজনে খাইয়া ফেলিলেন। অবশ্য ঘটনাটি আমার কাছে খুব সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয় নাই, কিন্তু পরে দেখিলাম শিশুটি আর কোন দিনই কোনরূপ আহার পাইয়া ক্রন্দন করিত না। ওদেশে প্রতি শিশুই সন্ধ্যা ৬টা বাজিলে ঘুমাইতে যায়। ওখানে মায়েদের ঘুমপাড়ানী কোন গানের সুর নাই মায়েরা শিশুদের অন্ধকার ঘরে আপন বিছানাতে বসাইয়া দিয়া আসেন—শিশুটি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে। অল্পকিছুক্ষণ পরে শিশু ঘুমাইয়া পড়িলে মা শিশুর গায়ের লেপ ও বিছানা ঠিক করিয়া দিয়া আসেন। প্রতি নূতন মাতাকেই একা সন্তান পালন করিতে হয়, এজন্য শিশুপালন শিক্ষার কেন্দ্র প্রায় প্রতি পাড়াতেই আছে।

ভারতবর্ষের মাতা ও পিতা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হওয়াতে বিবাহের পূর্বে অধিকাংশ গৃহেই কন্যাদের বিশেষ কোনও কর্ম করিতে দেওয়া হয় না। মাতা যদি বা কিছু করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে পিতাকে বলিতে শোনা যায়—নিজের চাপ পড়িলে তো করিবেই, এখন হইতেই কেন মিথ্যা কষ্ট দিতেছ? ইহার ফলে আমাদের দেশে কন্যারা হইয়া উঠে আরামপ্রিয় ও অধিকাংশ কন্যারই শ্বশুর গৃহের প্রতি ভীতি জন্মায়। কন্যারূপে জন্ম লইলে গৃহকর্ম শিখিবেন না একথা এঁরা কল্পনাই করিতে পারেন না। শিশুকন্যার খেলনার সঙ্গে ইঁহারা কিনিয়া দেন ঘর ঝাড়িবার বুরুশ, ছোট বাজারের থলি, গাছ কাটিবার কাঁচি, পুতুল বহিয়া বেড়াইবার ঠেলাগাড়ী। ৪।৫ বৎসর বয়স হইতেই মেয়েরা মায়ের পাশে পাশে ছোটখাট কাজ করিতে সাহায্য করে। ইহার ফলে তাহারা হইয়া উঠে কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ।

আমরা—ভারতবর্ষের মেয়েরা বাস করি ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা, মাতা, পিতা, কাকা, জেঠা পিসী মাসীদের পরিবৃত হইয়া। কন্যা যখন শিশু থাকে তখন হইতেই দৃষ্টি পড়ে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার ঠাকুরমার খুঁটিনাটি আরামের দিকে। কাকা জেঠাদেরও অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হওয়ায় তাঁহাদেরও সুখসুবিধার দিকে ছোট মেয়েটির নজর কম থাকে না। এমনি ভাবে আপন অজ্ঞাতে সে হইয়া উঠে সেবাপরায়ণা। আমাদের ঘরে মেয়েরা কঠিন কর্ম করিতে অক্ষম হইলেও তাহাদের দৃষ্টি হইয়া উঠে প্রখর—ছোটখাট কর্ম দিয়া মানুষকে সাহায্য করিতে ইহারা সদাই আগ্রহান্বিত থাকে, কন্যাদের মধ্যে স্নেহ ও দয়ার ভাব দেখা যায় অতি মাত্রায়। ইয়োরোপীয় কন্যারা ঠিক আমাদের মতো পরিস্থিতির মধ্যে বাড়িয়া উঠেন না। এঁদের নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম এত বেশী থাকে যে তাহার ভারেই ইঁহারা ক্লান্ত। পার্শ্বে ফিরিয়া চাহিবার মত অবকাশ তাঁহাদের থাকে না। অবশ্য হাসপাতালে যখন এঁরা নার্সের কাজ লইয়া থাকেন তখন অতি নিপুণতার সহিত নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া চলেন, কিন্তু গৃহে অন্যের জন্য ব্যয় করিবার মত পর্যাপ্ত সময় ইঁহাদের থাকে না।

ভারতের কন্যারা পলিত হন বৃহৎ পরিবার মধ্যে, স্নেহময় পিতা, সেবাপরায়ণা মাতা থাকেন ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া। নিজের জন্য নিজেকে বড় বেশী চিন্তা করিতে হয় না, শিক্ষা দীক্ষা পোষাক পরিচ্ছদ বিবাহ সব ভারই স্বেচ্ছায় মাতাপিতা নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লন। ইহাতে কন্যারা হইয়া উঠেন পিতামাতার অনুরাগী ও নির্ভরশীল। বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের ভাইবোনের মধ্যে স্নেহের অভাব দেখা যায় না। আমরা বাড়িয়া উঠি প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মধ্যে, অতিথি-সেবা আমাদের প্রধান ধর্ম। অন্যকে একমুঠা চাল দিলে আমাদের অন্নাভাব হয় না। পার্শ্বে দেখি আমরা স্বার্থত্যাগী মাতা, এইজন্য ভারতবর্ষের কন্যারা বয়সের

দিক হইতে যত বাড়িতে থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে ত্যাগের আনন্দ। কিন্তু ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র দ্বীপটির মধ্যে দেখিয়াছি আহার্য বস্তুর মূল্য এত বেশী যে ইঁহারা প্রত্যেকে যদিও মাসিক ৩০০৲ টাকার অধিক বেতন পান তবু অন্যকে ডাকিয়া খাওয়াইবার মতো সচ্ছলতা ইঁহাদের থাকে না। শীতপ্রধান দেশে বাস করিবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদে ইঁহাদের ব্যয় হয় প্রচুর। পুত্র কন্যা ১৫ বৎসর বয়স্ক হইলে তাহাদের আপন মাতাপিতাকে অর্থ সাহায্য করিতে হয়। একজনের উপার্জনে ৩।৪ জনের বসিয়া খাইবার সুবিধা হয় না। ইহাতে সারা দেশটির মধ্যে পরিবার বলিতে বুঝায় স্বামী স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যা। অধিক আত্মীয় স্বজন একত্রে বাস করা ইঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। যাঁহার দুইটি সন্তান তিনি দ্বিতীয়টির জন্য সরকার হইতে কিছু সাহায্য পাইয়া থাকেন। ৫ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের শিক্ষার ভার সরকার গ্রহণ করেন। ১৫ বৎসরের পর হইতে ইহাদের সকলকেই উপার্জনের জন্য বাহির হইতে হয়। ২১ বৎসর বয়সে যুবক যুবতী স্বাধীন বলিয়া গণ্য হন। তখন তাঁহাদের পিতামাতার কাছে বাধ্যবাধকতা বলিয়া কিছু থাকে না। ওদেশে কন্যাদের বিবাহের পাত্র নিজেদেরই নির্ণয় করিতে হয়। আপন বাসস্থান ও সংসার চালাইবার মতো যখন সংগতি হয় কেবল মাত্র তখনই ইঁহারা বিবাহ করিতে পারেন। পিতা ধনী হইলেও বিবাহের ব্যয়-ভার তিনি বহন করিবেন না। পুত্র কন্যা দরিদ্র হইলেও ধনী পিতা তাহাদের বিশেষ সাহায্য করেন না। অল্প বয়স হইতেই পিছনে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া প্রত্যেকেই অতিশয় স্বাবলম্বী হইয়া উঠে। ইহাতে একটি দেশের অবস্থা ফিরিয়া যায় সত্য, কিন্তু পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় হয় না।

ভারতবর্ষে প্রাচুর্যও যেমন, আবার দারিদ্র্যেরও সীমা নাই, সুতরাং একই মানবকে আমরা বিভিন্ন-রূপে দেখিবার সুযোগ পাইয়া থাকি। আমরা অনুভব করিতে পারি যে, জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প। নিত্য নূতন ভোগোপকরণ আবিষ্কারের দ্বারা আমরা কতকগুলি মানুষকে সুখের শিখরে তুলিতে পারি বটে কিন্তু অবশিষ্ট আরও শত শত জনের মধ্যে আসে প্রচণ্ড অভাব। প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁরা পালিত হন তাঁহাদের মধ্যেও অনাবিল আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। তখনই চিন্তা আসে যে পার্থিব সুখই সত্য নহে। গাছতলায় আছে যে, তাহাকেও তো মাঝে মাঝে হাসিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে আমরা চিন্তা করিবারও অবকাশ পাই প্রচুর পরিমাণে। অতি অল্প আয়াসে আমরা শারীরিক কষ্ট দূর করিতে পারি। ইহ জগৎ ব্যতীত যে অন্য কিছু আছে, জাগতিক সুখই যথেষ্ট নহে, ইহা ভারতীয় নারীদের বহু পুরাতন কাল হইতে জানা। ভারতনারী জাগতিক সুখের ন্যায় পারলৌকিক সুখের জন্যও ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। অনেক সৎকর্ম ইঁহারা করেন পরজন্মকে সুখের করিয়া তুলিবার জন্য। এই জন্মটিই ভারতনারীর কাছে শেষ লক্ষ্য নহে। ইহা কেবল আগাইয়া চলিবার একটি পথমাত্র। পাশ্চাত্ত্য মহিলারা পরলোক লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমতালে চলিবার জন্য তাঁহাদিগকে দিনের অধিকাংশ সময়টি ব্যয় করিতে হয়। দিনশেষে ক্লান্ত মন লইয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কথা চিন্তা করিবার মতো ক্ষমতা আর অবশিষ্ট থাকে না। ইঁহারা রবিবার নিয়মমত গির্জায় যান কিন্তু গির্জার বাহিরে ধর্ম লইয়া বিশেষ মাতামাতি করেন না।

ভারতে ধর্ম যেমন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, পাশ্চাত্ত্যে তেমনি কর্মের প্রাধান্য বেশী। ভারতের ধর্ম ও পাশ্চাত্ত্যের কর্মের সমন্বয়ে যদি কোন জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে তবে মনে হয় সেটিই হইবে আদর্শ জীবন।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ

(তিন)

দেশে গিয়ে মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। কারও সঙ্গ ভাল লাগতো না। প্রায় বেশীর ভাগ সময় বাইরে একটা ঘরে চুপ করে বসে থাকতাম। এই অবস্থায় একদিন একটা ভীষণ রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেল আমার শরীরের উপর দিয়ে। পূর্বরাত্রে শ্রীশ্রীমাকে পরিষ্কারভাবে স্বপ্নে দেখেছিলাম। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ যেন মা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে বলছেন,—"মাভৈঃ।" শ্রীশ্রীমা তখন স্থূলশরীরে বর্তমান। পরদিন সকাল থেকে শুধুই ভেবেছিলাম মায়ের এ ভাবে 'মাভৈঃ' বলবার কারণ কি? আমার কি তবে কোন ভীষণ বিপদ আসবে? দুপুর বেলা ঐ দুর্ঘটনা। সেদিন শরীর থেকে এত রক্তপাত হয়েছিল যে আমি ক্রমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম। যাহোক প্রাণ রক্ষা পেল।

যথাসময়ে কলিকাতায় ফিরে এলাম। একদিন কি একটা উৎসবে মঠে গিয়েছি। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, আমার জনৈক বন্ধু দীক্ষা নিতে চান, আমি যেন তাঁকে নিয়ে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে যাই। এই সময়ে আরও একটি ভদ্রলোক জয়রামবাটীতে একই অভিপ্রায়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যেতে সম্মত হলাম এবং যথাসময়ে তিন বন্ধু জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করলাম। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর বাকী পথ আমরা হেঁটেই গিয়েছিলাম। সকাল ৯॥০টা আন্দাজ আমোদর নদী পার হয়ে অবশিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করার জন্য অগ্রসর হয়েছি, হঠাৎ আমার মনে একটা খেয়াল এলো, আমরা মা মা করে খুব চিৎকার করলাম এবং মায়ের উদ্দেশ্যে ডেকে বললাম—"মা, তোমার ছেলেরা আসছে। আমরা পিঠে খাবো, পিঠে তৈরী করে রেখো।"

জয়রামবাটী পৌছুলে জনৈক সাধু শ্রীশ্রীমার কাছে আমাদের পৌছাবার খবর পাঠালেন। আমরা হাত পা ধুয়ে ভিতরে মাকে প্রণাম করে এলাম। তারপর মুড়ি গুড় খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে তালপুকুরে স্নান করতে গেলাম। ফিরে এসে আমরা জনৈক মায়ের সেবককে অনুরোধ করলাম, যাতে তিনি গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে বন্ধুদ্বয়ের দীক্ষার কথা নিবেদন করেন। তিনি মার কাছে গিয়ে সকল কথা নিবেদন করতে মা বললেন,—"এদের এখন চলে যেতে বল, এবার এদের দীক্ষা হবে না। আমার শরীর এখন ভয়ানক অসুস্থ। এখন আমি দীক্ষা দিতে পারবো না।" সেবক বিনীত নিবেদন করলেন যে, পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ এঁদের পাঠিয়েছেন। মা কিন্তু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন,—"কৃষ্ণলাল পাঠিয়েছে, তো হয়েছে কি? আমার শরীর এত অসুস্থ তা সত্ত্বেও কি দীক্ষা দিতে হবে নাকি?" সেবক শ্রীশ্রীমার উক্তি শুনে ম্লানমুখে বাইরে এসে বললেন—"না, আপনাদের দীক্ষা এখন হবে না।" বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের কান্না দেখে আমারও কান্না এলো এবং মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। যাহোক খাবার ডাক পড়লে আমরা আস্তে আস্তে খেতে গেলাম। আমরা সাব্যস্ত করলাম খাবার পর শ্রীশ্রীমায়ের সেবককে আবার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট

পাঠাবো এবং তাঁকে আবার অনুনয় বিনয় করে দেখবো তিনি দীক্ষা দিতে রাজী হন কিনা। খেতে বসে প্রথমেই দেখলাম পাতে পিঠে পড়েছে। ইসারায় বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের থাবার আব্দার শ্রীশ্রীমার কাছে পৌঁছে গেছে। আমাদের খুব আনন্দ হল। পিঠে মুখে দেবার জন্য পাতে হাত দিয়েছি, এমন সময় আমার লোভী মনের ভিতর আর একটা চিন্তার উদয়! মনে হলো মা কতকগুলো শুকনো পিঠে কেন দিয়েছেন? সঙ্গে কি একটু দুধ জুটলো না? অন্তরে এই চিন্তা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘর হতে সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেদের শুকনো পিঠে কেন দিয়েছ? শীগ্‌গীর দুধ পাঠিয়ে দাও।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জন্য খানিকটা ঘন দুধ এসে গেল। আমার অন্তর এ ব্যাপারে আনন্দে ও হর্ষে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। এইতো আমাদের মা—আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা পূর্ণ করবার জন্য এত সজাগ—তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত দুঃখ দৈন্য নিজে থেকেই দূর করে আমাদের যাতে পারমার্থিক কল্যাণ হয় তারও ব্যবস্থা করবেন। আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে এলে মাকে বলতে শুনলাম,—"লোক আছে, তোমরা হাত মুখ ধুয়ে এস, তোমাদের এঁটো পরিষ্কার করতে হবে না।" হাত মুখ ধুয়ে আমরা বাইরের ঘরে গেলাম এবং সেবক মহারাজকে আবার শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষার কথা বলবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি বললেন, "আমি কিছুতেই একথা নিয়ে মার কাছে আবার যেতে পারবো না। তিনি তো সোজা আমাকে বলেই দিয়েছেন, আপনাদের দীক্ষা এখন হবে না।" বন্ধুরা এবার একেবারে নিরাশ হলেন এবং আবার কাঁদতে লাগলেন। Fools rush in where angels fear to tread (দেবদূতরাও যেখানে যেতে ভয় পান মূঢ়দের কিন্তু সেখানে যেতে কুণ্ঠা নেই) আমারও তখন এই অবস্থা। আমি প্রস্তাব করলাম আমি যদি একবার ভিতরে যাবার অনুমতি পাই তাহলে আমিই যাব এবং মাকে জোর করে ধরবো। আমার তখন মনে হতে লাগলো—মা তো মা, মাকে ধরবো, মার কাছে জোর করবো, আব্দার করবো, তাতে আবার ভয়টা কিসের? সেবক মহারাজের সঙ্গে কথা বলে আমি তো ভিতরে গেলাম। শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় এলেন এবং অতি মধুরস্বরে বললেন,—"বাবা, কিছু বলবে?" আমি বললাম,—"হ্যাঁ, মা।" তখন নিজে একটি আসন নিয়ে বসলেন, আমাকেও একটি আসন নিয়ে ওখানেই বসতে বললেন। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললাম —"মা, তুমি বলছো এঁদের দীক্ষা দেবে না?"

মা। —"হ্যাঁ বাবা, দেখছো না আমার শরীর বড় অসুস্থ, এখন আমি দীক্ষা দিতে পারবো না। কৃষ্ণলালের ভারী অন্যায় যখন তখন যাকে তাকে দীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এ শরীর আর অত জ্বালা সইতে পারছে না।"

আমি।—"মা, এরা যে বড় কাঁদছে। চোখের জলে জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে। কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে এদের নিয়ে এখানে আসতে বলেছিলেন। আর এরা আমাকে ট্রেনের খরচ দিয়ে এনেছে। আমিও তাই তোমাকে এদের দীক্ষার জন্য বলতে এলাম।"

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলবার সুযোগ আমার জীবনে আগে কখনও হয়নি। মা আবার বললেন,—"কি করি বাবা, শরীর যে বড় অসুস্থ।" আমি বললাম,—"মা, তুমি না দিলে কে আর দেবে?" মা হঠাৎ বললেন, "তা হলে তুমিও বলছ এদের দীক্ষা দিতে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ মা, নিশ্চয় বলছি।" মা তখন বললেন—"কিন্তু এদের দেহ যে অশুদ্ধ।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন—"আচ্ছা, এদের এখানে তিন রাত্রি বাস করতে বল। এখানে তিন রাত্রি

বাস করলে দেহ শুদ্ধ হয়ে যায়, কারণ এটা শিবের পুরী কিনা।" এই কথা বলে একটি আঙ্গুল দিয়ে চোখের সামনে একটি বৃত্তের আকারে ঘুরিয়ে দেখালেন। আমার মনে হল মা বলছেন, জয়রামবাটী গ্রামটি শিবের পুরী।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাইরে ছুটে এলাম। আসবার সময় মাকে যে প্রণাম করবো তাও ভুলে গেলাম। বাইরে এসে চেঁচিয়ে বন্ধুদের সব বললাম।

আজ দীর্ঘ ৩৪ বছর কেটে গেছে। আমি কিন্তু একদিনের জন্যও মনে ভাবতে পারিনি যে, শ্রীশ্রীমা আমার কথায় বন্ধুদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি যদি সত্যিসত্যিই দীক্ষা দিতে রাজী না হতেন, তাহলে আমি কোন্ ছার, হয়ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তাঁকে রাজী করাতে পারতেন না। তবে এই অনুকম্পা, এই অনুগ্রহ, এই করুণা, আমার পুরানো কোনও ক্ষতের উপর প্রলেপ দেবার জন্যই যেন এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এইভাবে নিষ্পন্ন করলেন। আমি ব্যাপারটি এই ভাবেই নিয়েছি।

আমরা কিন্তু তিন দিন সেই 'শিবপুরী'তে অশেষ আনন্দে কাটালাম। সেই অবস্থায় আমার মনে আছে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাকে প্রণাম করতে গেছি, মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি রকম ধ্যান জপ হচ্ছে?"

আমি বললাম,—"মা সুবিধে হচ্ছে না।" মা বললেন—"কেন সুবিধা হচ্ছে না, নিয়মিতভাবে বসতে চেষ্টা করো তা হলেই হবে। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করো, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।" আমি তখন মাকে বললাম—"মা ছেলেবেলায় যেদিন শহরের স্কুলে ভর্তি হই সেই দিন আমার এক সহপাঠীর উপর আমার এত টান হয় যে. এখন ধ্যান করতে চেষ্টা করলে তাঁর প্রতিমূর্তিই সামনে আসে। ইষ্ট চিন্তা করতে পারি না।" এক সেকেণ্ড মা চুপ করে থেকে বললেন,—"ও পূর্বজন্মে তোমার বড় আপন ছিল, তাই এ প্রকার হচ্ছে। তবে এসব থাকবে না।" এই বন্ধুটির চিন্তা প্রায় ৮ বছর ধরে আমার মনে এত বদ্ধমূল ছিল যে, আমি কিছুতেই মনের সঙ্গে লড়াই করেও এই চিন্তা দূর করতে পারতাম না। কিন্তু এই যে মা বললেন—'এসব থাকবে না' আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই চিন্তাটি চিরকালের মত আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল! স্বামীজী বলেছেন 'অবতার কপাললোচন' একথাটা মনের ভিতরে খুব জোরে রেখাপাত করেছিল।

যাহা হউক আমরা জয়রামবাটীতে তো তিন রাত্রি কাটালাম; চতুর্থ দিন সকালে বন্ধুদ্বয়ের দীক্ষা হলো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁদের দীক্ষা শেষ হয়ে গেলে মা আমাকেও ডাকতে বললেন। আমি ভিতরে ঢুকলাম।

মা আমাকে আচমন করতে আদেশ করে বললেন—"গায়ত্রীমন্ত্র জপ কর, তোমার ইষ্টমন্ত্র জপ কর।" আমি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলে তখন বলে উঠলেন—"একবার করলেই হবে।" ইষ্টমন্ত্রও তাঁর নির্দেশে একবারই জপ করলাম। তখন মা হঠাৎ আমার কাণে আবার নতুন বীজ সংযুক্ত করে মন্ত্র দিলেন। আমি এই প্রকারে নতুন মন্ত্র গ্রহণের জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মনে সন্দেহ হল—মা কি আমাকে আবার দ্বিতীয় বার দীক্ষা দিলেন? বললাম,—"মা তুমি তো আমাকে কৃপা করে আগেই দীক্ষা দিয়েছ, এখন আবার দীক্ষা দিলে কেন? আবার নতুন বীজ দিলে কেন?"

একটু থেমে মা বললেন,—"হ্যাঁ বাবা, তোমার দীক্ষা তো হয়ে গেছে তা এও করো, ওটাও করো। যেটা ভাল লাগে সেটাই করবে।" আবার একটু থেমে বললেন,—"ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। ভয় কি বাবা? যদি শরীর থাকতে না পাও, তাহলে দেহান্তে পাবে। তোমাকে আর আসতে হবে না, এই তোমার শেষ জন্ম। মরবার সময় ঠাকুর

আসবেন। আমি আসবো। আমার কোলে বসে মরবে। আমি এসে কোলে করে তোমকে নিয়ে যাবো।" মা যখন একটু একটু থেমে থেমে এসব কথা বলছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থা যে কি হচ্ছিল, তা বর্ণনা করবার আমার ভাষা নেই। মা এসব কথা যখন বলছিলেন তা যেন সাধারণ ভূমি থেকে নয়। তাঁর সর্বশরীরে একটা বিশেষ ভাবের খেলা হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে এত স্থির হয়ে যাচ্ছিলেন যেন ঠিক ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। করুণাময়ী, পতিতপাবনী মা তাঁর এই দীন পতিত সন্তানকে কতভাবে যে আশ্বাস দিতে চাচ্ছিলেন আর তা বলে যেন শেষ করতে পারছিলেন না। আবার একটু ভাবস্থ হলেন, চুপ করে রইলেন, তার পর আবার একটু উত্তেজিতভাবেই আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমিও ততক্ষণ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম। এক পা দু পা এগিয়ে এসে বললেন, "তোমাকে সব দিয়ে দেই, কেমন? তোমাকে সব দিয়ে দেই, জীবের যা কাম্য যার জন্য জন্ম জন্ম ঘুরে বেড়াচ্ছ সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিই? এই মুহূর্তে দিয়ে দেই?" যখন এসব কথা বলছিলেন— তাঁর সর্বশরীরে একটা বিশেষ উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। মাথার ঘোমটা পড়ে গেল। আমি তখন কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমার ভিতরেও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছিল; আমি হাত জোড় করে মাকে বল্লাম,—"মা, তুমি ইচ্ছে করলেই তো পার,—দিয়ে দাও না সব।" মা বললেন—"কেমন, এই মুহূর্তে তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দেই?" এই বলে তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথার উপরে স্থাপন করবার জন্য যেমন হাত বাড়ালেন তখন অমনি বলে উঠলেন,—"না, এখনই তোমাকে সব দেব না। তোমার জন্ম জন্মের সব খবর আমি জানি, তুমি তো জান না। জন্মে জন্মে কত কি সব করেছ তা তুমি তো জান না, আমি জানি। এখন সব দিয়ে দিলে কি বস্তু যে পাচ্ছ তা বুঝতে পারবে না, তার কদর করতে পারবে না। জন্মে জন্মে যা করেছ তার চৌদ্দ আনা খেয়ে নিলাম। দু আনা রইলো—ভোগ কর। সবই সময়ে পাবে তবে একটু ঘুরিয়ে দেব।" এই ঘুরিয়ে দেব কথাটা বলার সময় শ্রীশ্রীমা তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী সম্মুখে শূন্যে বৃত্তাকারে ঘুরালেন। আমি তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মা যেন সাধারণ রাজ্যে ফিরে এলেন, মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন, আমিও বাইরের ঘরে এলাম। একটা অদ্ভুত বিস্ময়, হর্ষ, পুলক এবং তৃপ্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল।

ভুল

ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

গোলাপ গরবে ভাবে—
"সুবাস আমার
আমোদিয়া দশ দিক
ছড়াবে এবার।"

বাতাস শুনিয়া কহে
গর্বিত গোলাপে—
"আমি ছাড়া গন্ধ তোর
বিলাইবে কে?"

পথিক আসিয়া সেথা
বলে হেসে হেসে—
"সুরভির দর শুধু
ঘ্রাণের পরশে।"

অন্তর্যামী কহিছেন—
"শোন গো সবাই,
আমি ছাড়া সুগন্ধের
কোন দাম নাই।"

শ্রীশ্রীমা*

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আজ কেবল বাংলায় নয়, ভারতে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মায়ের সন্তানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ এখানে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলে আমিও শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলিসহ প্রণাম অর্পণ করে নিজেকে ধন্য ও পবিত্র মনে করছি।

এ কথা সত্য, আমাদের অনেক সৌভাগ্য এবং অসীম পুণ্য বলেই আমাদের এই বাংলা দেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী। বাংলা দেশের ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুর এবং জয়রামবাটী আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হয়ে রইলো ঠাকুর ও শ্রীমার পুণ্য চরণস্পর্শে।

আজ হতে এক শত বৎসর আগে—বার শো বাট সালের আটই পৌষ—সুপবিত্র শঙ্খধ্বনির শব্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ক্ষুদ্র জয়রামবাটী গ্রাম। দাবদগ্ধ ধরণীর আকুল আহ্বানে ধ্যানের দেবীকে রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে নেমে আসতে হল এই ধরণীতে, এরই ধূলায় রাখলেন তাঁর অমল কমল চরণ দুখানি,—যে চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেও সন্তানের সাধ মেটে না, তার মনে হয়—ফুলের চেয়েও আরও কোমল, আরও সুন্দর, আরও পবিত্র বস্তু যদি সে মায়ের রাতুল চরণে অর্পণ করতে পারতো তবে বুঝি তার সাধ মিটতো।

মাকে আমরা পেয়েছি স্নেহময়ী মাতৃরূপে—যে মায়ের কাছে সন্তান অসঙ্কোচে সকল দুঃখবেদনা ব্যক্ত করতে পারে। মা পরম স্নেহে তাঁর সন্তানকে কোলে টেনে নিয়ে সকল ব্যথা ও দুঃখের গ্লানি মুছে দিয়েছেন; পথহারাকে পথ দেখিয়েছেন, ঘর-হারাকে ঘরের সন্ধান দিয়েছেন। নিজের জন্য কোনদিনই তিনি কিছু চান নি, পরের জন্য নিজেকে নিবেদন করে দিয়ে তিনি যেন সার্থকতা লাভ করেছেন—তাঁর প্রতি বাক্যে প্রতি কর্মে তাই ছিল এই নিঃস্বার্থ আত্মদানেরই আকৃতি। কেবল ধার্মিক নয়, কেবল সৎ নয়, তিনি ছিলেন সকলেরই মা, পাপী পুণ্যবান, সৎ বা অসৎ, সন্তাননির্বিশেষে ভালবেসে সকলকেই তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন, পদ্মহস্ত বুলিয়ে, সৎ উপদেশ দিয়ে তাদের দুঃখ-বেদনা বাহ্যিক ও মানসিক রিক্ততা দূর করে দিতে চেয়েছেন। জাতিতে মুসলমান—দুর্বৃত্ত ডাকাত আমজাদ যেমন তাঁর স্নেহমমতা পেয়ে ধন্য হয়েছে, শরৎ, লাটু, নরেন প্রভৃতি তাঁর ভক্তেরাও তেমনই স্নেহভালোবাসা পেয়ে পূর্ণ হয়েছে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকেই কোলে টেনে নিয়েছেন, কাউকে তফাতে রাখেন নি—এই তো মায়ের প্রকৃত পরিচয়।

বাংলার কবি তাই না বলেছেন—

"মা নাম কি সুধামাখা, জীবের যায় ক্ষুধা-তৃষা
জাতির বিচার নাই সে নামে,
মা মা ডাক এক সব ভাষায়—"

তাই না বিদেশীয়া মেয়ে ভগিনী নিবেদিতাও মাকে মা বলে ডেকে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন; মায়ের অপরিসীম স্নেহ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

মায়ের জীবনের মূলতত্ত্ব—মুক্তির চেয়ে ভক্তিই বড়। মুক্তি কামনা করে প্রত্যেকেই, কিন্তু মুক্তির উৎস যে ভক্তি তা থাকে কয়জনের,—কয়জন নিঃস্বার্থভাবে ভগবানকে ডাকতে পারে?

ঠাকুরকে তিনি দেখেছিলেন সর্বময় দেবতার

* গত ১০ই পৌষ, ১৩৬১, লক্ষ্মীপুর (গোবরডাঙ্গা) স্বামীজীসংঘে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ।

রূপে। ঠাকুরের চরণে তিনি ছিলেন নীরব একটি প্রার্থনা, তাই না ঠাকুরের আদেশ—ঠাকুরের বাণীরূপে নিজেকে ধারণা করে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের জীবনে তিনি ছিলেন উত্তরসাধিকা পরমা-প্রকৃতি সন্ন্যাসিনী, তাই না ঠাকুর একদিন তাঁকে পূজা করতে পেরেছিলেন, একটি ভক্তিপূর্ণ প্রণামে তাঁকে দেবীত্বে অভিষিক্ত করেছিলেন, সুপবিত্র মাতৃমন্ত্রে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

আমরা তাঁকে পেয়েছি সেই মাতৃরূপে—মহীয়সী গরীয়সী মা। জগতের সব জাতি সন্তানরূপে সেই মাকে মেনে নিয়েছে, সেই মায়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে, মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে।

ঠাকুরের জীবনে মায়ের আত্মোৎসর্গ করেছিল তাঁকে মহান্; মাকে বাদ দিয়ে তাই তাঁর চলে নি। মায়ের মহান্ ত্যাগ ঠাকুরকে করেছিল সার্থক, দিয়েছিল পরিপূর্ণ সিদ্ধি। আদর্শ গৃহিণী অথচ আদর্শ সন্ন্যাসিনীরূপে আমরা মাকে দেখতে পেয়েছি, তাই তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা ঠাকুরকে পূর্ণরূপে ধারণা করতে পারিনে।

আদর্শ নারী আমরা আমাদের পুরাণে দেখতে পেয়েছি। এই ভারতের মাটিতে তাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ত্যাগ, সাধনা, জ্ঞান প্রভৃতি দিয়ে ভারতকে বরেণ্য করে রেখেছেন। ইতিহাসের বুকে একদিনকার যে মহিমময় দৃপ্ত ভারতের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সে ভারত গঠিত হয়েছিল একা পুরুষের সাধনায়, জ্ঞানে প্রতিভায়, শৌর্যে বীর্যে নয়, তাতে নারীর মঙ্গলময় দান, একাগ্র সাধনা অর্ধেক ছিল, অতীতের সে ইতিহাস আজ সে প্রমাণই দিচ্ছে।

বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে সভ্যতার আওতায় আমাদের সে গৌরবময় ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল—নবালোকে বিভ্রান্ত নরনারী নিশ্চিত ধ্বংসের পথে দ্রুত ভেসে চলেছিল—এমনই সময় তাদের পথ নির্দেশ করতে এসেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। যুগে যুগে এমনই আলোড়ন-বিলোড়নের সন্ধিক্ষণে মহাপুরুষগণ জগতে এসেছেন দেশকে জাতিকে রক্ষা করতে, করেছেন আপ্রাণ সাধনা—যুগে যুগে তাঁদের ত্যাগশীলতা জয়যুক্ত হয়েছে। ঠাকুর এসেছিলেন তেমনই একক্ষণে। টেনে তুলেছেন পঙ্ক হতে তাঁর দেশবাসীকে, সত্যকার পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন—"চারদিকে লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে—তুমি এদের দেখবে।" পরমদেবতা পরমপুরুষের উপদেশ মা তাঁর তিরোধানের পর দীর্ঘকাল পালন করে গেছেন।

আজ আমাদের পরমকল্যাণময়ী মা না থাকলেও তাঁর বাণী আছে,—আজকের দিনে বাণীরূপা সেই মাকে স্মরণ করে আমরা প্রার্থনা করি—আশীর্বাদ কর চিরকল্যাণী মা, তোমার সন্তান যেন তোমার নির্দেশিত পথে চলতে পারে—পথ যেন না হারায়। ধ্রুবতারা তুমি সামনে থাকো, এই আমাদের—তোমার সন্তানদের চির কামনা।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

খ্রীঃ ১৯১৬ সালে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) এবং মহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দজী) সঙ্গে ৺কাশীধামে যাই। সেই সময়কার কয়েকটি স্মৃতিকথা গত মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েকটি স্মৃতি এখানে দেওয়া হল।

বাবুরাম মহারাজ একদিন সীতাপতি মহারাজের (স্বামী রাঘবানন্দ) সহিত আমাকে সোনাপুরায় পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের দর্শনের জন্য পাঠালেন। গিয়ে দেখলুম একটা ছোট বারান্দায় দড়ির খাটিয়ায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর সেবক পশুপতি আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললে; একটু পরেই উঠবেন। পাশেই সতরঞ্চি পাতা ছিল, বসলুম। লাটু মহারাজ বলে উঠলেন, "আমি ও সব 'লিখাপড়া জানা' ছেলেদের সঙ্গে কথা বলি না। যাও চলে যাও।" আমরা তো অবাক। পশুপতি ইঙ্গিত করে বলছে, 'উঠবেন না, বসুন' ও হাসছে। তার পর তাঁর অপর সেবক চারু এসে হঠাৎ বললে, "আরে এই যে সীতাপতি মহারাজ এসেছেন।" তার পর লাটু মহারাজকে সম্বোধন করে বললে, "হরিহর এসেছে, এ বাবুরাম মহারাজের সেবক।" আমি বললুম, "তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওঁকে দর্শন করবার জন্য।" লাটু মহারাজ মুড়ি দিয়েই বললেন, "আরে, প্রসাদ উসাদ কুছ দিয়া?" তার পর মুড়ি খুলে বলছেন, "বুঢ়া মানুষ কিনা, সেই জন্য একটু দুপুর বেলা ঘুমাই।" তারপর আমাদের সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মঠের, শ্রীশ্রীমহারাজের, মাষ্টার মশায়ের, বাবুরাম মহারাজের, মহাপুরুষজীর ইত্যাদি। বললেন, "আমি দুই এক রোজ বাদ বাবুরামের সাথে দেখা করতে যাব।"

সীতাপতি মহারাজ বললেন, "আমাদের, একটু ঠাকুরের কথা টথা শুনান।" বললেন, "আমি আর কি বলব, তোমরা 'লিখাপড়া জানা' ছেলে, আমি তো মূর্খ। আমি এই ৺বিশ্বনাথের পায়ের তলায় পড়ে আছি। তিনি দয়া করে দুটি খেতে দেন। বুঢ়া মানুষ, লোক দিয়ে সেবার বন্দোবস্ত কর দেতেহেঁ। দিন কাল বড়া খরাব, আগে দো আনায় একটা লোকের দুবেলা খোরাক হয়ে যেত, এখন এক বেলাও হয় না। বুঢ়া হয়ে গেছি, ঐ যে নরেন একটা কথা বলত, 'শরীর-ধারণ বিলম্বনা (বিড়ম্বন) মাত্র'—আমার ঐ কথাটা খুব আচ্ছা লাগে। শরীর ধারণ বিলম্বনা (বিড়ম্বন) মাত্র।"

তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলা হিন্দীতে কথা বলতে লাগলেন, 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'—ভর্তৃহরিজীনে কহা। এ সংসারে কি আর আছে? পরমহংসদেব বলতেন, 'আঁটি আর চামড়া।' এ সংসারে কারুর ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করা চলবে না, বস্ মহামায়া ঘের লেগা। শরণাগত হো কর্ পড় রহনা। কোন্ জানে কিস্ রোজ বিশ্বনাথজী-কী কৃপা হো জায়েগী। খালি শরণাগত রহো। লেকিন্ ডরো মত্, এক রোজ না এক রোজ কৃপা হো জায়েগী। পরমহংসদেব বলতেন, 'সাম তক্ পত্তা জরুর পড়েগী।' লেকিন্ ধীরজ তো চাহিয়ে।"

সীতাপতি মহারাজ।—মহারাজ, বিশ্বনাথ তো আপনাকে কৃপা করেছেন, তাঁকে আমাদের কথা একটু বলুন, যদি কৃপা হয়।"

লাটু মহারাজ।—হাঁ, হাঁ, কভী কভী কৃপা করতে হেঁ। লেকিন ইয়াদ রাখো, কৃপা লাভের জন্যে কুত্তেকা মাফিক্ পড়ে থাকতে হবে বাবা, তোমার খুশী মাফিক্ দর্শন হবে না, উনকা খুশী পর নির্ভর করতে হবে, অপনেকো ছোড় দেনা চাহিয়ে। তুমি তাঁকে চাও বা না চাও তাতে তাঁর কি? তুমি চাও তো তুম্হার মঙ্গল হবে, না চাও তো উনকা ক্যা, তুমকো মায়া ঘের লেগা।

আর একদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ নিজেই আমাদের সঙ্গে করে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে জিতেন মহারাজ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী), নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দজী), সীতাপতি মহারাজ, এবং খগেন মহারাজ (স্বামী শান্তানন্দজী)-ও ছিলেন। দেখলুম ঠিক

আগের বারের মতই দড়ির খাটিয়ায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। বাবুরাম মহারাজ দেখে বললেন "আরে পরমাত্মা উঠো উঠো।"

তিনি মুড়ি দিয়েই বলতে লাগলেন, "কাহে দিক্ করতে হো, কাল রাতমে বিলকুল নিদ্ নহী হুয়ী।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আরে জী, উঠো উঠো, হমলোগ জানতে হৈঁ, তুম ধ্যান করতে হো।"

(রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঘুমুচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বলেন, "এমন রাতটে ঘুমিয়ে কাটালি।" সেই থেকে লাটু মহারাজ আর রাত্রে ঘুমুতেন না, ধ্যান করে কাটাতেন, দিনেও মাত্র ঘুমের ভান করতেন, আসলে কিন্তু করতেন ধ্যান।) যাহোক তার পর তিনি উঠে পড়লেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি হল। পরে ছাতের থেকে ঘরে গিয়ে বসা হলো। তাঁরা দুজনে খাটে বসলেন, আমরা মেঝের সতরঞ্চিতে বসলুম। এ কথা সে কথার পর বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর আমাদের কেমন ভালবাসতেন বল দেখি ?"

বললেন, "আরে উ কহনেকী বাত নেহি। ঈশ্বরের ভালবাসা জীব কি করে বুঝবে ? ভাগবত শুনে আমরা বৃন্দাবনের গোপগোপীদের ভালবাসাই বুঝতে পারি, কিন্তু তিনি তাঁদের কিরূপ ভালবাসতেন, তা কি করে আমরা বুঝব, বই পড়ে শুনে তাঁর ভালবাসার আভাসও পাওয়া যায় না। গোপীরা অজ্ঞান হয়ে তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা বুঝতেও পারত না এ টান কিসের। লোহা জানেও না কেমন করে চুম্বক তাকে টানে।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "দেখ্ একবার তোরা! এমন ব্যাখ্যা কখনও শুনেছিস্। বেশ খতিয়ে নে, ঠাকুর যা বলেছিলেন।" (ঠাকুর লাটু মহারাজকে বর দিয়েছিলেন, তোর বই পড়তে হবে না, আপনাআপনি সমস্ত জ্ঞান ভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য তোর অধিগত হবে। এঁর অক্ষর পরিচয়ও ছিল না)।

অতঃপর প্রশ্ন হল, "ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"—শ্লোকটির মানে কি ? জ্ঞানীকে কি করে ভক্তি অভিভূত করে। [শ্লোকটি হচ্ছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।১০)

"যাঁরা সর্বগ্রন্থিমুক্ত, আত্মারাম, সেই মুনিরাও কোন কামনা না করে উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন, শ্রীহরির এমনি গুণ।"] লাটু মহারাজ বলতে লাগলেন, "জ্ঞানী না হলে ভগবান যে 'এক-ভক্তির' কথা বলেছেন, তা হবে কি করে ?" [গীতার শ্লোকটি হচ্ছে—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (গীতা, ৭।১৭)

"আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীর মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর আমি অতি প্রিয় কারণ আমি তার আত্মা, আত্মাপেক্ষা আর কি প্রিয় আছে ? এবং সে আমারও প্রিয়।] লাটু মহারাজ বললেন—একই বস্তু, আর সব অবস্তু, এর উপলব্ধি না হলে, একভক্তি হবে কি করে ? দ্বৈত জ্ঞান থাকতে 'একভক্তি' হয় না। জ্ঞানী তো ভেদ-বুদ্ধিতে ভগবানকে দেখে না, সে ভগবানকে নিজের আত্মা বলে জানে, কাজে কাজেই আত্মার চাইতে আর কি প্রিয় বস্তু থাকতে পারে ?"

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবুরাম মহারাজ আমাদের নিয়ে কেদার ঘাটে গেলেন। বললেন, "ঠাকুর

মণিকর্ণিকার ঘাটে ও এখানে অলৌকিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেছিলেন।" সন্ধ্যার গাম্ভীর্য, গঙ্গা, দীপমালা, আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টা, মহাপুরুষের ধ্যান অতি অপূর্ব বলে বোধ হতে লাগলো। আমরাও নিস্তব্ধচিত্তে জপ করতে লাগলুম।

৺কাশী থেকে বেলুড়ে ফেরবার দিন বাবুরাম মহারাজ বললেন, "চল্, পুষ্পদন্তেশ্বর দর্শন করে আসি। এঁর দর্শন করলে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরাদির নির্মাল্য মাড়ানর পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। পুষ্পদন্ত বলে এক গন্ধর্বরাজ রোজ গোপনে কাশীরাজের বাগান থেকে গভীর রাত্রে পুষ্প চয়ন কোরে ৺বিশ্বনাথের পূজা কোরত। রাজকুমারী রোজ ভোরে পুষ্প চয়ন করতে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর আগেই কে বাগানের সব চাইতে সেরা ফুলগুলি তুলে নিয়ে গিয়েছে। তিনি পিতার কাছে এ ব্যপার নিবেদন করলেন। রাজা পাহারা দিয়ে বাগান সারারাত ঘিরে রাখলেন, রাজকুমারীও গোপনে আড়িপেতে বসে রইলেন, দেখলেন শেষ রাত্রে এক অপরূপ গন্ধর্বরাজ পুষ্প চয়ন করছেন। তিনি শান্ত্রীদের ইঙ্গিত করতেই তারা তাঁকে চারি পাশ থেকে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করলে কিন্তু গন্ধর্বরাজ শূন্যমার্গে চলে গেলেন। রাজা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রোজই অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পুষ্পে পূজা হয়। তখন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ এক কাজ করুন, শিবনির্মাল্য বাগানে ছড়িয়ে রাখুন, পায়ে ঠেকলেই গন্ধর্বের বিভূতি নষ্ট হয়ে যাবে, সে তখন আপনার অধীনস্থ হবে।" রাত্রে গোপনে তাই করা হল। পুষ্পদন্ত গন্ধর্বরাজের, নিয়মিত পুষ্প চয়ন করতে এসে শিবনির্মাল্য বিল্বপত্রে পাদস্পর্শ হলো। আকাশমার্গে যেতে গিয়ে দেখেন তাঁর আকাশ-গমনশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে; কি হবে! এখ্‌নি তো রাজার শাস্ত্রীরা জাগ্রত হয়ে পড়বে। তিনি তখন একাগ্রমনে ভক্তির সহিত শিবস্তুতি করলেন। এই স্তবই হচ্ছে বিখ্যাত 'শিবমহিম্ন' স্তোত্র—

কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ
শিশুশশধর মৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্ দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥ ৩৪

"সর্বগন্ধর্বরাজ কুসুমদশন শিশুশশধরমৌলি দেবদেব মহাদেবের দাস। নির্মাল্য পাদস্পর্শ হেতু শিব রোষে নিজ মহিমা হতে ভ্রষ্ট হয়ে মহিমান্বিত এই দিব্যদিব্য স্তব করেন।" তাতে আবার তাঁর দিব্য বিভূতি ফিরে আসে। তিনি আবার শূন্যে অন্তর্হিত হলেন। যারা কোন বন্ধনে পড়, তারা এই স্তব পাঠ কোরলে বন্ধনমুক্ত হয়। এই স্তব খুব পাঠ করবি। ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের শ্লোকটিও এই স্তবে আছে;—ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি-মতং বৈষ্ণবমিতি—ইত্যাদি

মহিম্ন স্তোত্রের আর একটি শ্লোক একদিন পাঠ করতে করতে এমন ভাববিহ্বল হন যে পুঁথি ফেলে দিয়ে চিৎকার কোরে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো শিব! তোমার মহিমা কে জানবে বল'—চিৎকার ও কান্না শুনে দারোয়ান লোকজন সব ছুটে এসেছিল—অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং—এই শ্লোক।

একদিন ঠাকুর দেখলেন, ভুঁয়ে থেকে কুয়াসার মত কি একটা উঠছে, ক্রমে দেখলেন বিরাট শুভ্র জটাজূটযুক্ত মস্তক, জলদগম্ভীর স্বরে তাঁকে তিনবার বললেন 'ভাব মুখে থাক, ভাব মুখে থাক, ভাব মুখে থাক।'"

সমালোচনা

মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীগৌর-গোপাল বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত; প্রকাশক—প্রাচ্য ভারতী, ৩৮, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; পৃষ্ঠা ৩১৯; মূল্য—সুলভ সংস্করণ ৫৲ টাকা, শোভন সংস্করণ—৬৲ টাকা।

ভূমিকায় লেখক নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—স্বামী বিবেকানন্দের 'বিরাট বিপুল চরিত্র' নিয়ে রসসাহিত্য রচনা সম্ভব কিনা। তবে লেখক স্বীয় সাহিত্যসাধনা ও এই মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগবশতঃ যে প্রচেষ্টা করেছেন আমরাও তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ৯৮টি পরিচ্ছেদে স্বামীজীর সমগ্র জীবনীর আলেখ্য—বিভিন্ন বিচিত্র চিত্র আঁকা হয়েছে—একের পর এক, একটি চলচ্চিত্রের মত। ঘটনার পারম্পর্য দু' এক জায়গায় ওলট পালট হয়েছে, ঘটনার চেয়ে কল্পনার আশ্রয়ও অনেক জায়গায় গ্রহণ করা হয়েছে। হয়ত তা এরূপ রচনায় অপরিহার্য। উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যেকার কথাগুলি অবিকল রাখাই বাঞ্ছনীয়, নতুবা উদ্ধৃতিচিহ্ন না দিলেই ভাল। কথোপকথনও যথাযথ হওয়া উচিত। দুচারটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের অর্থ আমরা ঠিক বুঝলাম না, যথা—'সাংখ্যের ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর', 'আত্মার মধ্যেই পরমাত্মা আছেন', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈদান্তিক না হয়েও যেন বেদান্তাদির মূর্ত ভাষ্য', 'নরেন ঠিক গৃহীও নয়, আবার গৃহত্যাগীও নয়'। 'স্বামীজী বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী হলেও মূর্তিপূজাকেও ঈশ্বরলাভের সোপান বলে স্বীকার করতেন—যথারীতি যুক্তি সহযোগে।' কতকগুলি পুনঃপুনঃঘটিত বানানভুলের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:—'স্বতোচ্ছ্বাসিত' 'সত্ত্বা', 'বয়োকনিষ্ঠ' 'মহানত্ব'। কতকগুলি আঞ্চলিক শব্দের অর্থ আমরা প্রচলিত অভিধানে পেলাম না—'খুপোখুপি'—'টুই টুই'—'চহট্'। হিন্দী উক্তিগুলি শুদ্ধ হিন্দী হওয়াই উচিত—নতুবা তার বাংলাই যথেষ্ট।

আরো কয়েকটি ভুল দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন—সারদা ও সারদানন্দ এক ব্যক্তি নন, স্বামী শিবানন্দের নাম তারক, তারু নাম কখন কোথাও শোনা যায় নি। গোপাল বা স্বামী অদ্বৈতানন্দ মঠের সন্ন্যাসীই ছিলেন, সুরেন বাবু কর্তৃক নিয়োজিত 'বরাত খাটা'র ভৃত্য নয়। আরও ছোট খাটো ভুল এরকম অনেক আছে। লেখকের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে তিনি যেন প্রচলিত প্রামাণ্যগ্রন্থগুলির সাহায্য অধিকতরভাবে গ্রহণ করেন, তবেই তাঁর এই রচনা সার্থক সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

স্বামী নিরাময়ানন্দ

গীতা-ধ্যান—ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী-প্রণীত; মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১, মূল্য—১৷৹ টাকা।

শ্রীযুক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর 'গীতা-ধ্যান' বিরাট গীতাসাহিত্যে এক নূতন সংযোজন। গ্রন্থকার আর্যশাস্ত্রে ও পাশ্চাত্ত্যদর্শনে সুপণ্ডিত। তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে গীতার প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। গভীর আগ্রহের সহিত নূতন আলোর আশায় তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া লাভবান হইয়াছি।

গ্রন্থকার তাঁহার স্বল্পপরিসর গ্রন্থে গীতার মর্ম উদ্ধারের চেষ্টামাত্র করিয়াছেন, সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। গীতার আক্ষরিক ব্যাখ্যা তাহার ভাষ্য ও টীকাসকলে পাওয়া যায়। আক্ষরিক ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে যাহা দিয়াছেন, অন্যত্র তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

নিউইয়র্কে কোনও কলেজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে

বক্তৃতার প্রাক্‌কালে এক অধ্যাপক গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন "The Conception of God in your country is very cold. আপনাদের ভগবান নির্বিকার, অসঙ্গ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়। এমন প্রাণহীন ভগবানকে লইয়া জীবনে বা ধর্মে কোন কাজ হয় না।" গ্রন্থকার তখন গীতার প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিলে অধ্যাপক বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "চমৎকার"। গ্রন্থের প্রথমেই লেখক এই অধ্যায়ের মর্ম বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন "অর্জুনের বিষাদযোগ মানুষের চিরন্তন দুঃখের ছক।" যখন রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনে উদ্যত অর্জুনের মনে পারিবারিক স্নেহ প্রবল হইয়া প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের বিষাদে ব্যথিত হইয়া তাহার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। এ তো Cold ভগবানের কার্য নহে।

গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপের কথা আছে। একদিকে তিনি বিশ্বপ্রসবিতা, অন্যদিকে তিনি আমাদের "ধী"র প্রচোদয়িতা—বুদ্ধির উৎস। এই "ধী"র প্রচোদয়িতা ব্রহ্ম করুণার বশবর্তী হইয়া অর্জুনের মানসিক দ্বন্দ্বের নিরসন করিতেছেন। তখন তিনি বস্তুস্বহীন তত্ত্বমাত্র নহেন, তখন তিনি চৈত্যগুরু, তিনি শিক্ষক, করুণাময় পথপ্রদর্শক। গ্রন্থকার অনবদ্য ভাষায় এই কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে যিনি "তোত্র-বৈত্রৈকপাণি" উপদেষ্টা শিক্ষক, ক্ষণকাল পরে তিনি "জ্ঞান-মুদ্রাধারী গীতামৃত-দোহনকারী ভগবান্।" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "ভক্ত না আসা পর্যন্ত তিনি বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সত্তামাত্র ভগবান নহেন। ভক্ত কাছে দাঁড়াইলেই ভগবান আপনার ভগবৎস্বরূপটি খুঁজিয়া পান।" বিভু, সর্বত্র অনুস্যূত চিন্ময় ঈশ্বর কেন যে কেবল ভক্তেরই অনুভবগম্য, ভক্তিহীনের নিকট তিনি থাকা-না থাকার সমান, তাহার ব্যাখ্যা এইখানে। তাঁহাকে অনুভব করিতে হইলে তাঁহার কাছে নীরব হইতে হইবে, নীরব হইয়া তাঁহার কথার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার মুখে কথা ফুটিবে না। "আমি তোমার, আমি প্রপন্ন" এই বলিয়া তাঁহার স্মরণ লইতে হইবে, নতুবা তাঁহার কথা শোনা যাইবে না।

"সকৃদপি প্রপন্নায়, তবাস্মীতি চ যাচতে
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম।"

গীতা পড়িবার সময় অনেক সময় মনে হয়, যেন অর্জুনের প্রশ্নের সহিত তাহার উত্তরে ভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। গ্রন্থকার অর্জুনের প্রশ্নগুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহাদের উত্তরে ভগবান কি বলিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

একবার জ্ঞানের প্রশংসা, একবার কর্মের প্রয়োজনীয়তা শুনিয়া অর্জুনের মনে সংশয় জাগিয়াছিল—বাস্তবিক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, না কর্ম শ্রেষ্ঠ। গীতাপাঠকের মনে ভগবানের "ব্যামিশ্রেণৈব" বাক্যে সংশয় উদ্রিক্ত হয়। গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে ভগবান অর্জুনের বুঝিবার জন্য প্রথমে দুইটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন—জ্ঞানস্তম্ভ ও কর্মস্তম্ভ; তারপরে ভক্তিরূপ খিলান (arch) নির্মাণ করিয়া স্তম্ভ দুইটি সংযুক্ত করিয়াছেন। "অতুলনীয় কারুকার্যখচিত কর্ম ও জ্ঞানের স্তম্ভ-যুগলের উপরে ভক্তির বিচিত্র তোরণ।" জীবন-সংগ্রামে ইহাই গীতা-প্রদর্শিত প্রশস্ত রাজপথ। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমুচ্চয়ে গঠিত সুদৃঢ় সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে যুক্ততম সাধক-পথিক ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। জ্ঞানী হয় "সঙ্গবর্জিত," কর্মী হয় "মৎকর্মকৃৎ", ভক্ত হয় "মদ্ভক্ত।" তিনের সমুচ্চয়ে "মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ" হয় "যঃ স মামেতি, পাণ্ডব", এবং "ভজতি মাং সর্বভাবেন।" গীতা যে কেবল সন্ন্যাস-শাস্ত্র নহে, কেবল কর্ম-শাস্ত্র নহে, কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নহে, ইহা যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমুচ্চয়-

শাস্ত্র অতি নিপুণতা সহকারে গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শান্তিলাভের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন—জ্ঞান শান্তির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কিসের জ্ঞান? যিনি বাহিরে বিশ্বরূপ, অন্তরে যিনি ধী-শক্তির প্রচোদয়িতা, তিনি সর্বযজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, তিনি সর্বলোকমহেশ্বর, তিনি সর্বভূতের সুহৃদ্—এই জ্ঞান।

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥"

এইমাত্র উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার নিকট একটি সমস্যার সমাধান পাইব বলিয়া আশা করি। গীতায় সাংখ্য-দর্শনের সমস্ত মত গৃহীত হয় নাই, ইহা স্পষ্ট। প্রচলিত সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ তো পরিত্যক্ত হইয়াছেই, তাহার বন্ধ ও মুক্তিবাদও গৃহীত হয় নাই। সাংখ্য পুরুষের বন্ধ ও মুক্তি অস্বীকার করিয়া অচেতন প্রকৃতি-সৃষ্ট কিন্তু পুরুষের আলোকপ্রাপ্ত জীবেরই বন্ধ হয়, বলিয়াছেন। জীবের বন্ধমুক্তি বা মোক্ষের অর্থ সেই জীবের আত্যন্তিক বিনাশ। ইহা যে মৌলিক সাংখ্য মত নহে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। চরক-সংহিতায় যে সাংখ্যমত বর্ণিত আছে, তাহাতে অব্যক্তকে পুরুষ বলা হইয়াছে, মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রকৃতিকে "পুরুষাবর" বলা হইয়াছে। অব্যক্ত পুরুষ হইতে যে জীবরূপী পুরুষের উদ্ভব, তাহার পরিণাম সাংখ্যের মোক্ষ হইতে পারে না। মহর্ষি কপিল বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকৃত। প্রচলিত সাংখ্যে যাহাকে "মোক্ষ" বলা হইয়াছে, তাহা কপিলের মত মনে করা কঠিন। গীতায়ও সে মত গৃহীত হয় নাই। গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে গ্রন্থকারের নিকট এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রত্যাশায় রহিলাম।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বন্যা-সেবাকার্য— ১৯৫৪ সালের ৮ই আগষ্ট হইতে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং পূর্ব-পাকিস্তানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যে বন্যা-সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সাম্প্রতিকতম বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

দ্বারভাঙ্গা জেলার রসসেরা থানার মঙ্গলগড় এবং দেওধা কেন্দ্রে বিতরিত চাউল এবং গমের পরিমাণ—২৯০১ মণ; ডাল—২৬ মণ ৭ সের; লবণ—৭৫ মণ; তুলার কম্বল—১০৪০ খানি; কাপড়—১৩,৫৯০ খানি। সাহায্যপ্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা—৪৮,৭৫২; ঔষধ দেওয়া হইয়াছে ৩২০০ জনকে। এই হিসাব ১৩ই ডিসেম্বর, '৫৪ পর্যন্ত।

পূর্ণিয়া জেলার লাভা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্তী পারণপুর কেন্দ্রে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিতরিত চাউল ও গম—৪১৬ মণ ১১ সের; নূতন কাপড়—৫৯৩৭ খানি; নূতন কম্বল—১৮০০ খানি; গুঁড়া দুধ—২০০০ পাউণ্ড; দুধ—২৯ মণ ৮ সের; সাহায্যপ্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা—১৬,০৯৭; চাষের জন্য গম ও যবের বীজ দেওয়া হইয়াছে—৮৯৬ মণ ২৭ সের। ঔষধাদিও বিতরণ করা হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার রামসই, আমগুড়ি, বার্ণেস এবং ধরমপুর ইউনিয়নে ৩।১।৫৫ তারিখ পর্যন্ত বিতরিত চাউলের পরিমাণ—৭৭৫ মণ ২৮॥০ সের ডাল—৮ মণ ৫॥০ সের; লবণ—৩২ মণ ১৮॥০ সের; নূতন কাপড়—৩৬১৭ খানি; নূতন কম্বল—৮৭১ খানি, এলুমিনিয়ম বাসন—৮০০টি; চাষের জন্য বলদ—৬; কুইনিন ট্যাবলেট বিতরণ—৮৮০। সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা—৩১,৯৮০; স্বল্পবিত্তগণের জন্য কুটির নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

কুচবিহার কেন্দ্রে ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ পর্যন্ত

৯৩৫৪ সংখ্যক নরনারীর মধ্যে ৮,৪৫৪ খানি নূতন কাপড় এবং ১২৮৭টি নূতন কম্বল বিতরিত হইয়াছে। ৭টি নলকূপ বসানো হইয়া গিয়াছে আরও কতকগুলি সমাপ্তির মুখে। এই সেবাকার্য মাথাভাঙ্গা এলাকায় সম্প্রসারিত হইয়াছে।

আসামের লখীমপুর জেলার ঢোলা কেন্দ্রে (সাইখোয়াঘাট) ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত ২০,৬৭৩ নরনারীর মধ্যে ৬৪৪ মণ ৮ সের চাউল, ২৬ মণ ৩৩ সের গুঁড়া দুধ, ৫০৮ খানি নূতন বস্ত্র এবং বপনের জন্য ২৯৫ মণ বীজ বিতরিত হইয়াছে। চিকিৎসিতের সংখ্যা—৬৯৩।

গৌহাটির সন্নিকটে পলাশবাড়ী কেন্দ্রে ১৭ই অক্টোবর, ৫৪ হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ৩৪২৯ দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১১৫ মণ ৩৪ সের চাউল এবং ২১৫ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্বপাকিস্তানের ঢাকা, কলমা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র হইতে ২৩শে নভেম্বর, ৫৪ পর্যন্ত ২৪,৮৮৪ নরনারীকে ১২০ মণ ১৪ সের চাউল, ৩৪ মণ ৩৮ সের ডাল, ৯ মণ ২ সের লবণ, ৮ মণ ৫ সের সরিষার তৈল, ৭ মণ ৩৬ সের মশলা ২৯৯ মণ ১২ সের জ্বালানি কাঠ ও কয়লা, ৩৭৫ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ৯৮৭ খানি নূতন কাপড় এবং ২৪৫৲ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১লা মাঘ শনিবার (১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫) যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৩ তম জন্মোৎসব বেলুড় মঠে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে ও স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরে বিশেষ পূজা হোমাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। নাটমন্দিরে কঠোপনিষৎ পাঠ, কালীকীর্তন এবং স্বামীজীর ঘরে ভজন-সঙ্গীত কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ ছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় চারি সহস্র নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে মঠের বিস্তীর্ণ মাঠে স্বামী ওঁকারানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি মহতী জনসভায় স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ (হিন্দীতে) এবং অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার (ইংরেজীতে)। সভাপতি মহারাজও হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন।

তমলুক এবং বালিয়াটি (ঢাকা) শাখাকেন্দ্রদ্বয়ে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের সংবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগামী জন্মতিথি—আগামী ১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০ তম পুণ্যাবির্ভাব-তিথি সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, কীর্তনাদি সহ উদ্‌যাপিত হইবে। 'সাধারণ উৎসব' অনুষ্ঠিত হইবে ১৫ই ফাল্গুন, রবিবার (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫)।

স্বামী ভদ্রানন্দের দেহত্যাগ—আমরা গভীর মনোবেদনার সহিত জানাইতেছি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ভদ্রানন্দজী গত ১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৫) সকাল ৭-২০ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে ক্যান্সার রোগে ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি খ্রীঃ ১৯১৯ সালে প্রথম কনখল সেবাশ্রমে যোগদান এবং ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্মিরূপে থাকাকালীন শান্ত নিরভিমান অমায়িক চরিত্রের জন্য ভদ্রানন্দজী সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের অভয়চরণে তাঁহার দেহমুক্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী-শতবার্ষিকী সংবাদ

দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী একটি সপ্ত-দিবসীয়

কার্যক্রম সহ অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমপ্রাঙ্গণে এবং শহরের কয়েকটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নারী-ভক্তদের সম্মেলনও ছিল উৎসবসূচীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ।

বোম্বাই, রামকৃষ্ণ আশ্রম সমাপ্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত করেন ১১ই নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। কর্মসূচীর মধ্যে শহরের এবং বিভিন্ন উপকণ্ঠে পৃথক পৃথক সভা, ছাত্রসভা, মহিলা-সম্মেলন, সঙ্গীত-উৎসব প্রভৃতি উল্লেখনীয়।

বৃন্দাবন ও মথুরায় ৫দিনব্যাপী (২৬শে হইতে ৩০শে নভেম্বর) জয়ন্তী-উৎসব স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। প্রথম দিন প্রাতে লক্ষ্মণ শহিদ স্মারকভবনে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা ও শাস্ত্রপাঠ, দ্বিপ্রহরে সংস্কৃত-শিক্ষার্থি-সম্মেলনে দেবভাষায় বক্তৃতা ও বিতর্কপ্রতিযোগিতা, অপরাহ্নে শ্রীমায়ের সুসজ্জিত আলেখ্য সহকারে মনোরম শোভাযাত্রার নগরী-পরিক্রমা এবং সন্ধ্যায় ধর্মসম্বন্ধীয় আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হইলে সমস্ত দিনের কার্যসূচীর সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মথুরাস্থিত চম্পা অগ্রওয়াল কলেজ ও কিশোরী রমন কলেজে দুইটি সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রী কে এন্ গর্গ এবং শ্রীদীননাথ ভার্গব। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী অকুণ্ঠানন্দ, শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী। মহিলাসভার সভানেত্রী হন ভারতের সহ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী এম্ চন্দ্রশেখর এবং শ্রীমতী গীতাবাঈ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দেন। রাত্রে সাধারণ সভার সভাপতি ছিলেন হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রী এন্ সি চ্যাটার্জি, এম্ পি। তৃতীয় দিন সভা-সমিতি ও সঙ্গীতসম্মেলন এবং চতুর্থ দিন বালকবালিকাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কারবিতরণ, কবি-সম্মেলন ও নারায়ণসেবা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী উপস্থিত ছিলেন।

দেরাদুনে শ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসব বিশেষ উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপন করা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় কিষণপুর আশ্রমে সারাদিন ধরিয়া বিশেষ পূজা, হোম চণ্ডীপাঠ, ও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯শে ডিসেম্বর স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ সাধারণ সভার কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। স্বামী অকুণ্ঠানন্দ, অধ্যাপক জে এন্ দে, অধ্যাপক জি পি শুক্ল, ভগিনী সুজাতা দেবী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনের বিভিন্ন দিক বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে আলোচনা করেন।

কালাডি (ত্রিবাঙ্কুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব বিগত ১৬ই হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ দিন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতফেরী, শোভাযাত্রা, ভজন, পূজার্চনা, আরতি, ললিতাসহস্রনাম ও দেবীভাগবত-পাঠ, হরিকথা, যন্ত্রসঙ্গীত এবং 'সারদা-বিজয়ম্' নাটকাভিনয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রথম, তৃতীয় ও শেষ দিবসের শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনের আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন কুমারী শ্রীদেবী এম্-এ, কুমারী সরোজিনী এম্-এ, শ্রীমতী সুমতি এম্-এ, শ্রীকৃষ্ণকুমার এম্-এ, স্বামী আগমানন্দ, স্বামী মেধসানন্দ, শ্রীমতী এন্ গোবিন্দ পাণিকর, কুমারী রাধা তাপী এম্-এ, এবং আরও অনেকে। শঙ্কর কলেজে এবং ছাত্রাবাসেও শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

চেরাপুঞ্জী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। শেল্লা, নঙ্‌ওয়ার মুস্‌টো, নঙ্গস্টেঙ্গ, সোহ্‌বার শিলং প্রভৃতি দূরাঞ্চলের বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। আসামের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর ইহাতে বিশেষ অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালেখ্য-প্রদর্শনীর ও শিল্প-বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন, ছাত্রাবাস-বিস্তৃতির ভিত্তিস্থাপন, পুরস্কার-বিতরণ এবং সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ, ও শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। শ্রীমায়ের চরিতাবলম্বনে খাসী ভাষায় রচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সাড়া আনে। আলোকচিত্র-সহযোগে স্বামী প্রণবাত্মানন্দের বক্তৃতা ও খাসী যাত্রাভিনয় সমবেত জনমণ্ডলীর প্রচুর আনন্দবর্ধন করে।

বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গত ১৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, রামায়ণগান, পালাকীর্তন ও যাত্রা প্রভৃতি কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল। ১৭ই অগ্রহায়ণ স্বামী সত্যকামানন্দের নেতৃত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীসরলকুমার দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমনীন্দ্রলাল চক্রবর্তী, জনাব সিরাজুল ইসলাম্ ও স্বামী যোগস্থানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরের দিন অধ্যাপিকা মনোরমা গুহের সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা সভায় ভাষণ দেন বেগম রোসেনারা, শ্রীমতী রেণু সেনগুপ্তা ও আরও কয়েকজন বক্তা।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, গত ৩০শে অগ্রহায়ণ ও ১লা পৌষ সমাপ্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, হোম, কুমারী-পূজা, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, ভজন, কীর্তন ও রামায়ণগান উক্ত দুই দিবসের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। উভয় দিনই বৈকালে জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়।

ঢাকায় ৩০শে অগ্রহায়ণ হইতে ৪ দিনব্যাপী কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন এক জনসভার পরিচালনা করেন বেগম শামসুর নাহার। বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা নূরজাহান মুরশেদ, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী নমিতা বসু, শ্রীমতী পুষ্প কুমারী এবং শ্রীমতী আঙ্গার ভিঙ্ক (জনৈক ওলন্দাজ ভক্ত)। আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমমতা গুপ্তা, শ্রীমনীষা গুপ্তা, সারওয়ারী আমেদ এবং পুষ্পকুমারী। অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ দিন যাত্রার আয়োজন হইয়াছিল।

নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, জব্বলপুর, বুলদানা এবং লেহেগাঁও (অমরাবতী জেলা)—এই স্থানগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী আনন্দের সহিত সুসমাপ্ত হইয়াছে। শেষোক্ত স্থানের উৎসবে পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি গ্রামের জনগণও সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮ই অগ্রহায়ণ হইতে এক সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। উৎসবের প্রথম দিবস শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হোম, জীবনী-আলোচনা এবং শিল্প-বিভাগ এবং শিক্ষা-বিভাগ হইতে ২টি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রায় ৬ শত ভক্ত মহিলা এবং দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমার সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা রামকৃষ্ণ-মিশন সারদাপীঠ-পরিচালিত কামারপুকুরের চলচ্চিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার-পরিচালিত শিক্ষামূলক চিত্রও দেখান হয়। তৃতীয় দিন শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারের সভানেত্রীত্বে প্রাক্তন-ছাত্রীসম্মেলন এবং উহার পর প্রাক্তন ছাত্রীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্য-নাট্য ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' এবং 'ভূশণ্ডীর মাঠ' কৌতুক-নাট্য অভিনীত হয়। চতুর্থ দিন বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি

মহিলাসভা আহূত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। প্রায় আট শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম দিন রবিবার সকাল ৭টা হইতে ৮টা একটি মনোজ্ঞ ছোটদের আসর বসে। ৮॥টা হইতে ১১টা পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর বালিকাদের মধ্যে "শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী" বিষয়ের উপর একটি বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা ৫॥ টার সময় নৃত্যে 'চণ্ডী', 'রাণী ভবানী' নাটক এবং মূকাভিনয়ে শ্রীশ্রীমার জীবনী অভিনীত হয়। শেষ দিন দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের ব্রজবাসী সঙ্ঘের বালিকাদের কীর্তন হয় এবং শ্রীশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক শ্রীযুক্তা আভা দেবী স্বরচিত সঙ্গীতের সাহায্যে আলোচনা করেন। সহস্রাধিক মহিলা উহাতে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

(১) **ভারতকল্যাণ**—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঙ্কলন ; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)। মূল্য—২৲ টাকা, ছাত্রসংস্করণ—১॥৹ টাকা।

(২) **The Ramakrishna movement—its ideal and activities.**—By Swami Tejasananda. প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) মূল্য—২৲ টাকা।

(৩) **Worship of Sri Ramakrishna**—By Swami Suddhasattwananda. Price—Re 1/. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras—4.

(৪) **শ্রীশ্রীসারদাদেবী**—হিন্দী সংক্ষিপ্ত জীবনী, অধ্যাপক শ্রী সুঃ রামচন্দ্র, এম্-এ লিখিত মূল্য—১৲ টাকা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বনারস—১।

(৫) **শ্রীমাঁ সারদাদেবী**—'The Holy Mother'—নামক ইংরেজী পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদক—পণ্ডিত জয়রাম মিশ্র, এম্-এ, এম্-এড, সাহিত্যরত্ন। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ। মূল্য—৸৹ আনা।

বিবিধ সংবাদ

বারাসতে অনুষ্ঠান—পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থানে ২৪ পরগণা জেলার বারাসত (শেঠপুকুর)-স্থিত 'শিবানন্দ ধামে' পূজা, ভজন সঙ্গীত, রামনামসংকীর্তন, শাস্ত্রপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, জনসভা প্রভৃতির ভিতর দিয়া ২০শে ডিসেম্বর ও ২রা জানুয়ারী দুই দিন বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমোক্ত দিন বৈকালে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। সাধারণ উৎসবের দিন (২রা জানুয়ারী) প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী শিবানন্দজীর তিনখানি প্রতিকৃতি সিংহাসনোপরি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করিয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা বারাসত শহরের প্রধান রাস্তা ও অঞ্চলগুলি পরিক্রমা করিয়াছিল। অপরাহ্ণে বহু শত নরনারীর উপস্থিতিতে স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী সংশুদ্ধানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাপুরুষজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

নাটাগড় (২৪ পরগণা) পল্লীর উৎসাহী কতিপয় ব্যক্তির ব্যবস্থাপনায় গত ১লা ও ২রা মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্মোৎসব বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আহূত দুইটি জনসভায় বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর জীবনের নানা দিক ও কর্মধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে—পানিহাটি পৌরপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শ্রীশিশির-কুমার মিত্র এবং ঝালকাঠি (বরিশাল) স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১লা মাঘ স্বামীজীর জন্মতিথি বিশেষ উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্বামীজীর একটি সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া নগরপ্রদক্ষিণ এবং তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বৃহৎ জনসভায় স্থানীয় বিভিন্ন বক্তার ভাষণ অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

পরলোকে রায় বাহাদুর হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়—গত ৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৫) ৬৫ বৎসর বয়সে রায়বাহাদুর হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন আন্তরিক বন্ধু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর একটি বিশিষ্ট অঙ্গের অভাব ঘটিল। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হৃষী বাবু ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে বস্ত্রশিল্পে বিশেষ শিক্ষালাভান্তে অধ্যবসায়, সততা এবং কর্মদক্ষতা-গুণে সরকারের (এবং কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও) বিভিন্ন সম্মানজনক পদে নিযুক্ত থাকিয়া কৃতিত্ব ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ-কালের সংযোগ। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং স্বামী শিবানন্দজী এবং স্বামী সারদানন্দজীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মঠ ও মিশনের বহুবিধ কাজে হৃষী বাবু অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সাধুভক্তি, বিনয় ও চরিত্রমাধুর্য সত্যই অতি প্রশংসনীয় ছিল। কিছুকাল পূর্বে বৈষয়িক কার্যে ভুবনেশ্বর গিয়া সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে উঠেন। পূর্বোক্ত তারিখে শেষরাত্রে বিশেষ কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা বোধ না করিয়া সজ্ঞানে সাধুগণের সান্নিধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে পরলোকগতের বাঞ্ছিত সদ্‌গতি কামনা করি।

পরলোকে গোরাচাঁদ রায়—কলিকাতা বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরবাটীর একনিষ্ঠ সেবক ভক্ত গোরাচাঁদ রায় গত ৩রা জানুয়ারী সোমবার রাত্রি তিন ঘটিকায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় আটমাস যাবৎ অসুখে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। মধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য গোরাচাঁদ বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল প্রয়াণে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরবাটীর অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—১৯৪৪ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি সাধ্যমত জনহিতকর কার্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ এতদঞ্চলে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ১৯৫৩ সালে আশ্রম কর্তৃক দুইটি পাঠাগার, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইয়াছে। পাঠাগার দুইটির পুস্তক সংখ্যা ১৮৫৯। ৬খানি দৈনিক, ৯খানি মাসিক ও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা লওয়া

হয়। উক্ত বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩৪৭৮ জন আর্তনারায়ণ চিকিৎসালাভ করিয়াছেন। এই বৎসরও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা ঈশা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হয়। প্রতি শনিবার রামনামসংকীর্তন এবং রবিবার উপনিষৎ আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পুণা শহরে অনুষ্ঠান—পুণার ধ্রাঁগদ্ধ্রা রাজবাড়ীতে ২রা ডিসেম্বর (১৬ই অগ্রহায়ণ) অপরাহ্ণে মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত ও রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের কতিপয় রাজন্য-পরিবারের মহিলাবৃন্দকর্তৃক শ্রীশ্রীসারদামাতার শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পারিপাট্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। একটি রৌপ্য-সিংহাসনে সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ ও মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত শ্রীশ্রীমায়ের রঙ্গীণ প্রতিকৃতির সম্মুখে সভার প্রারম্ভে ধ্রাঁগদ্ধ্রা রাজ পরিবার মণ্ডলী কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র সহকারে শ্রীমঙ্গলাচরণ গীত হয়। তাহার পর শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন রাজকুমারী (মিরাজ সিনিয়র) মঙ্গলারাজে (ইংরেজীতে), ইন্দোর মহারাজের ভগিনী শ্রীমন্ত শকুন্তলা বাঈসাহেব (হিন্দীতে) এবং বেলুড় মঠের স্বামী ভবেশানন্দ (হিন্দীতে); শ্রীমতী মায়া গাঙ্গুলী অতি মধুর কণ্ঠে কয়েকটি হিন্দী গান গাহিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করেন। সভার শান্ত পরিবেশের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য আবির্ভাব সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন।

উৎসবান্তে সমবেত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পল্লীবঙ্গে অনুষ্ঠান—নিম্নোক্ত স্থানসমূহে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে বিশদ বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

(১) ভদ্রকালী (২) বারদ্রোণ (২৪ পরগণা) (৩) লক্ষ্মীপুর স্বামীজী সংঘ (২৪ পরগণা) (৪) বিক্রমপুর সারেঙ্গা (বাঁকুড়া) (৫) রাধানগর (ঢাকা) (৬) তিরোল পল্লীমঙ্গল সমিতি (হুগলী) (৭) খেপুত (মেদিনীপুর) (৮) কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (৯) নিউ ব্যারাকপুর কলোনি (২৪ পরগণা) (১০) কোন্নগর (১১) শেওড়াফুলি (হুগলী) (১২) লালগড় (মেদিনীপুর) (১৩) কৈলাসহর (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (১৪) কাটোয়া।

আমেদাবাদে অনুষ্ঠান—গুজরাত শ্রীশ্রী-সারদামণি-শতাব্দী-মহোৎসবসমিতির উদ্যোগে গত ৫ই, ৬ই এবং ৭ই নভেম্বর 'গুজরাত, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ নারী সাংস্কৃতিক সম্মিলন' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ভারত লোকসভার স্পীকার শ্রীগণেশ বাসুদেব মবলঙ্কার। দ্বিতীয় দিন 'কলা ও গৃহশিল্প-প্রদর্শনী'র দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন লোকপ্রিয় চিত্রশিল্পী শ্রীরবিশঙ্কর রাবল। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মহা-মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ভাগবতানন্দজী।

রাজস্থানে অনুষ্ঠান—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে রাজস্থানের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল:—উদয়পুর (চারটি সভা), শিকর, জয়পুর (দুইটি সভা), আজমীর (দুইটি সভা), হটুণ্ডী।

কটক ও রাজকণিকায় অনুষ্ঠান—ওড়িশার রাজকণিকায় স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় গত ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর। কটকে উৎসব নিষ্পন্ন হয় পরবর্তী দুই দিন—৬ই ও ৭ই নভেম্বর। প্রথম দিন শোভাযাত্রা, পূজা-হোম এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, তথা শহরের বিভিন্ন কীর্তনীয়াদল কর্তৃক গভীর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন ও ভজন কর্মসূচীকে প্রাণবন্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয় দিন প্রাতে প্রাবীণা সাহিত্যিকা শ্রীমতী সুখলতা রাওয়ের নেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভায় প্রধান অতিথি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অপরাহ্ণে প্রায় চারি হাজার নরনারী ও ছাত্রছাত্রীর সমাবেশযুক্ত অপর একটি সভার উদ্বোধন করেন ওড়িশার প্রধান বিচারপতি শ্রীলিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী। বক্তা ছিলেন উপমন্ত্রী শ্রীভৈরবচন্দ্র মহান্তি, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীচিন্তামণি আচার্য এবং শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

উদ্বোধন

চাহিবার মতো চাওয়া

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে
নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ ॥

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাদ্বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবত্তোষদয়াক্ষমার্জব-
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ ॥.

—শ্রীশঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি—৭৯, ৮২

[সাধন-জীবন আরামের জীবন নহে। সত্যলাভের জন্য চাই অবিচলিত নিষ্ঠা, দৃঢ় প্রযত্ন, ঐকান্তিক ব্যাকুলতা। সামান্য সদিচ্ছা, লোকদেখানো যৎকিঞ্চিৎ অনুরাগ, গতানুগতিক বিক্ষিপ্ত কিছু চেষ্টা—এগুলি ধর্মের 'বিলাস' হইতে পারে, কিন্তু ধর্মকে বাস্তব, জীবন্ত, কল্যাণময় অনুভূতির পর্যায়ে আনিবার পক্ষে নিশ্চিতই পর্যাপ্ত নহে। চাহিবার মতো চাহিতে হইবে, চলিবার মতো চলিতে হইবে, বহু ত্যাগ, বহু কষ্ট, বহু পরিশ্রম স্বেচ্ছায় বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—তবেই আমরা পরমশ্রেয়কে লাভ করিতে পারিব, সর্বতোব্যাপ্ত অজ্ঞানতিমির বিদীর্ণ করিয়া স্বয়ংপ্রভ চৈতন্যালোকে অন্তর-বাহির উদ্ভাসিত করিতে পারিব।]

এমন অনেক মুমুক্ষু আছেন যাঁহারা সংসার-সাগর অতিক্রমের উদ্যোগী, কিন্তু তাঁহারা আদর্শকে যথাযথ ভালবাসিতে পারেন নাই; তাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্য ভাসা-ভাসা, অধ্যবসায় শিথিল, অভ্যাস পদে পদে খণ্ডিত। ভোগবাসনারূপ হিংস্র হাঙ্গর এইরূপ অমনোযোগী সাধককে যে কোন মুহূর্তে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া থাকে, নিষ্ঠুর গ্রাসে কণ্ঠ ধরিয়া মোক্ষাভিমুখী গতি হইতে সবেগে তাঁহাকে ফিরাইয়া মাঝ-দরিয়ায় ডুবাইয়া মারে।

অতএব হে মুক্তিপথগামী সাধক, সাবধান! বাস্তবিকই যদি আধি-ব্যাধি-শোক-মোহ-ভয়-বিকীর্ণ শতধা সঙ্কুচিত এই ক্ষুদ্র দেহবদ্ধ জীবন হইতে জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নিত্যশুদ্ধ, জ্ঞানভাস্বর আত্মসত্যে অনন্ত মুক্তির অভিলাষ তোমার জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বিষয়কে বিষের ন্যায় অতিদূরে রাখিতে শিখ; অতি আগ্রহে সর্বদা অমৃতের ন্যায় সমাদর কর সন্তোষ, সকলের প্রতি সহানুভূতি; অপরের দোষ বড় করিয়া না দেখিয়া সাধিয়া চল ক্ষমা, অনবরত নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া চরিত্রে বিকাশ কর সরলতা (আর্জব); ইন্দ্রিয়লালসায় দেহ-মনকে চঞ্চল না করিয়া অভ্যাস কর মনঃস্থৈর্য (প্রশান্তি) এবং সংযম (দান্তি)।

কথাপ্রসঙ্গে

"আবার এস"

ধর্মের গ্লানি দূর করিতে তিনি নরদেহে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-প্রভায় অনেক অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, অনেক অনাচার-অত্যাচার বন্ধ হইয়া অনেকের অনেক চোখের জল মুছিয়া গিয়াছিল, অনেক মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঐতিহাসিক সত্য। অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই, কল্পনার দূরবীক্ষণ পশ্চাতে অভিমুখ করিয়া ভাবুক বলিতেছেন, কবি গাহিতেছেন, হায়রে, সেই অরুণকিরণদীপ্ত মঙ্গল উষায় কেন জন্মগ্রহণ করি নাই, সেই ভগবদাবির্ভাব-লক্ষিত পুণ্য দিনগুলিতে যদি জীবনযাপন করিবার সৌভাগ্য হইত তাহা হইলে কতই না শক্তি, কতই না শান্তি লাভ করিতে পারিতাম। অভাগা আমি, তাই জন্মিয়াছি প্রখর মার্তণ্ডতাপবিধুর রুদ্র মধ্যাহ্নে—কেবলই দাহ, কেবলই অস্থিরতা, দুর্বার পিপাসা, মর্মান্তিক অশান্তি, ঘোর বিভীষিকা। ভগবান্, আর যে পারি না, সংসার যে ধ্বংস হয়; পরিত্রাতা, তুমি আবার এস।

* * *

ভগবানের কানে যদি এই ভাবুকতা পৌঁছিয়া থাকে তো তিনি ইহার কি প্রত্যুত্তর দিবেন? বলিবেন, না, আমি আসিব না। আসিলেই তোমাদের সন্তাপ দূর হইবে না, সমস্যা মিটিবে না। যখন আসিয়াছিলাম কয়জন তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছিলে? যখন চলিয়া গেলাম তোমাদিগকে তো রিক্ত করিয়া যাই নাই, বহু শতাব্দীর প্রেরণা, পথনির্দেশ তোমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা কি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলে? তোমরা কি আমার আসিবার সার্থকতা বুঝিলে, আমার কথা শুনিলে, আমার আচরণ অনুসরণ করিলে? না, আমি আসিব না। উহার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা অনেক সময়ে যত না ভাবি, বলি তাহার দশগুণ, আবার যাহা ভাবি, করি তাহার একশত অংশ। করাটাই কিন্তু আসল কথা। এই আসলের ভাণ্ডার আমাদের মর্মান্তিকভাবে শূন্য। আমরা ঘোর অলস, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর, দাম্ভিক। নিজেদের দুর্বলতা নিষ্ক্রিয়তা ঢাকিতে যাই ভগবানের প্রতি সারহীন ভালবাসার কথা গাথিয়া। যেন তিনি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া আমাদিগকে ঠেলিয়া না তুলিয়া দিলে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবার উপায় নাই। আমাদের খেতখামার, দোকানপাট, ঘরসংসার, আফিসআদালত এ সকলেরই জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারি, কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টির জন্য শ্রীভগবানের কল্যাণকর বাণীগুলি অনুসরণ করিবার সময় আমরা যেন একান্তই শক্তিহীন, ভগবান্ আসিয়া আমাদের হাতে মোয়া না ধরিয়া দিলে আমরা নিরুপায়।

* * *

"আবার এস"—আত্মবিশ্বাসহীন, ভগবানেও বিশ্বাসহীন, কর্মশক্তিহীন কাপুরুষের উক্তি। উহার পশ্চাতে আছে শুধু সামান্য সাময়িক উচ্ছ্বাস, শুধু সংশয়, তামসিকতা। ভগবানকে আবাহন করিবার শক্তি সকলের থাকে না। গঙ্গাজল তুলসী দিয়া 'এস' 'এস' হুঙ্কার ছাড়িয়া ভগবানকে শ্রীচৈতন্য-দেহে যিনি মর্ত্যে আনিয়াছিলেন সেই পুরুষসত্তম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হাটে বাটে দেখা যায় না।

শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা—"আবার এস" নয়, "হৃদয়ে এস"। তুমি যে একবার আসিয়াছ সেই আবির্ভাবই

আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত। আমরা যেন তোমার আগমনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, আমাদের জড়তা, মূঢ়তা, স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়া; চিন্তায়, বাক্যে, কার্যে তোমার বাণী প্রতিফলিত করিতে অকুণ্ঠিত প্রযত্ন আনিয়া। তুমি যে আসিয়াছ তাহা তো একদিনের জন্য নয়, যে দীপ্তি রাখিয়া গিয়াছ তাহা তো পাঁচদিনে ঢাকা পড়িবার জন্য নয়। তাই, তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন তোমার আসাকে আমার চিনিয়া লওয়া, তোমার আলোককে আমার ঘরে প্রবেশ করানো।

বাস্তব মুক্তি

সতর বৎসর পূর্বে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সার আর্থার এডিংটন যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আলোচ্য ছিল এডিংটনের বিশেষ গবেষণার বিষয়—'ক্রম-প্রসরণশীল ব্রহ্মাণ্ড' (The Expanding universe)। অধ্যাপক, ছাত্র এবং বহু শিক্ষিত জনসাধারণও শ্রোতৃমণ্ডলীরূপে হল ভর্তি করিয়া বসিয়া আছেন, প্রত্যেকেরই মুখে চোখে প্রখর ঔৎসুক্য। এডিংটন বক্তৃতা করিয়া মৃদুহাস্যে প্রথমেই বলিলেন, আপনারা আমার কথা শুনিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি খুব খুশী, কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহার অধিকাংশই আপনাদের বোধগম্য হইবে না। শ্রোতৃগণও হাসিলেন, কিন্তু সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের আধঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা শুনিলেন, কাহারও ঘুম পাইল না, যাইবার সময় কাহারও মুখ দিয়া 'বুঝিলাম না' বলিয়া ক্ষোভ বাহির হইল না। সকলেরই চিত্তে বরং এই আত্মপ্রসাদই জন্মিয়াছিল যে এতবড় একজন মনীষীর মুখ দিয়া তাঁহার বিশ্বালোড়নকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা শোনা গেল।

'ক্রমপ্রসরণশীল ব্রহ্মাণ্ড'কে বুঝি বা না বুঝি, উহার তথ্য যে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' আলোচিত হইয়াছে এই বিশ্বাসই ঐ বিষয়বস্তুর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আনে। পক্ষান্তরে রাম-শ্যাম-যদু-মধু যখন অনেক সময়ে অনেক নূতন কথা শুনাইতে চান এবং আমরা বুঝি না তখন শ্রদ্ধা লইয়া ঘরে ফিরি না। বলি, আজগুবী—কল্পনার সূতা দিয়া বোনা। জানি, রাম-শ্যাম-যদু-মধু কোন পর্যবেক্ষিত তথ্যের উপর দাঁড়ান নাই। মানুষের মনে বাস্তবতা—যথার্থ ঘটিয়া-থাকার উপর একটি অব্যক্ত মমতা আছে। কল্পনাকে সে ভালবাসে বটে, কিন্তু সত্যকে সে সর্বহৃদয় দিয়া সম্মান করে। কল্পনা সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, সত্যকে সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না।

ধর্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা যাহাকে মুক্তি বলি উহা লইয়া অনেক লেখা হইয়াছে, অনেক বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে কিন্তু অনেক সময়েই উহা আমাদের হৃদয়ে সত্যের মর্যাদা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। প্রাচীনরা বড় বেশী সন্দেহ প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু উত্তরকালে মুক্তির ধারণায় বহুবিধ জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ঢুকিয়া উহাকে একটি দার্শনিক বিলাসমাত্ররূপে পরিণত করিয়াছে। অনেক সমালোচকের অনেক ব্যঙ্গও যে উহাকে শুনিতে হয় নাই তাহাও নহে। অথচ আমাদের দেশে মুক্তিকে বলা হইয়া থাকে পরম পুরুষার্থ—মানুষের সর্বাপেক্ষা সমাদরণীয় বস্তু, বৃহত্তম সার্থকতম প্রয়োজন! যাঁহারা এতবড় একটা ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা কি জগৎ ও জীবনের কিছুই দেখেন নাই? শুধু আকাশের দিকে চাহিয়া, কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া সকল কালের জন্য মানুষকে ধোঁকা দিয়া গেলেন?

না—তাঁহাদের দোষ নাই। তাঁহারা জগৎ ও জীবনকে যথার্থই ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। বন্ধন ও মুক্তি দুটিই তাঁহাদের দৃষ্টিতে

ছিল তথ্য (fact), কল্পনা নয়। কিন্তু চোখে দেখা তথ্যও যে অনেক সময়ে অতি-বুদ্ধিমানদের কবলে পড়িয়া দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকায় পরিণত হইতে পারে ইহার উদাহারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে বহু আছে। পরমপুরুষার্থটির ঐ দশাই ঘটিয়াছিল—একটি নিঃসন্দিগ্ধ বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্য ঢাকা পড়িল বাক্যের আড়ম্বরে, যাহা পরম, চরম, সর্বজনীন তাহা লাভ করিল অনাদর উপহাস, একদেশিতা।

মানুষ বাহির ও ভিতর দুইটা লইয়াই ঘর করে। নিজের দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের কত কিছু সে দেখে, অনুভব করে—মাটি, জল, আলো, বাতাস, কত শত বস্তু, কত শত প্রাণী, কত ঘটনা, অসংখ্য আকৃতি, অজস্র পরিবর্তন। এই সব লইয়া তাহার বহির্বিশ্ব—তাহার ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ। এই জগৎকে সে বোঝে, আরও বুঝিতে চায়; পায়, আরও পাইতে চায়। এই জগৎই তাহার 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের' ক্ষেত্র। কিন্তু ভিতরের দিকেও তাহাকে চাহিতে হয়, তাহার মনের চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ—এগুলিও অহরহ নানা ছন্দে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। এগুলির সহিত তাহার জীবনের লেনদেন তো কম নয়।

এ গুলি তবে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হইবে না কেন? অন্তর্বিশ্বের বিজ্ঞান প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল—উপনিষদে, সাংখ্যে ও যোগশাস্ত্রে। পাশ্চাত্ত্যজগতে এই গবেষণা মাত্র অর্ধ শতাব্দীর কিছু বেশীকাল আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্‌গণকে এখনও বহু পথ চলিতে হইবে। অন্তর্জগতের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি যাহা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের নিকট এডিংটনের 'ক্রমপ্রসরণশীল ব্রহ্মাণ্ড'র ন্যায়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। তবে এডিংটনকে তাঁহারা 'বৈজ্ঞানিকে'র মর্যাদা দেন—আমাদের দেশের যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, কণাদ প্রভৃতিকে other-worldly (ইহকালবিমুখ) বলিয়া অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদের কাছে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া আমাদেরও অনেকে ঐ ধরণের মনোভাব পোষণ করি!

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুটির প্রতিই যখন মানুষ সমভাবে মনোযোগ দেয়, তখন সে নিজের পরিচয় পাইতে আরম্ভ করে। সে দেখে দুই জগৎই তাহাকে একই প্রকারে আন্দোলিত করিতেছে। একবার আকর্ষণ, আর একবার বিকর্ষণ; একবার সঙ্কোচ, আর একবার বিস্তার। বহির্জগৎ কত ভাবে ডাকিতেছে, কিন্তু যখন আগানো শুরু করা গেল, অমনি পথ অবরুদ্ধ। প্রাণ চাহে সব ডাকে সাড়া দিতে, সব কিছুকে অধিকার করিতে. কিন্তু মানুষ দেখে, প্রকৃতির নিয়ম এমনিভাবে বাঁধা যে সামান্যই সাড়া দিতে পারা যায়, অল্পই তাহার নিজের কবলে আনা ঘটে। অন্তর্জগতেও এই দ্বন্দ্ব। মানুষ ভাল-বাসিতে চায়, কিছুটা পারে, আবার ঘৃণা আসিয়া চিত্ত দখল করিয়া বসে। আশার সহিত নৈরাশ্য, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধের পাশাপাশি অসুন্দরের কালিমা। দুই জগতেই বিপুল বৃহত্ত্বের আহ্বান, দুই জগতেই নির্মম ক্ষুদ্রতার নিপীড়ন।

বুকে হাত দিয়া বলিতে পার কি এই ওঠা-নামা, হাসা-কাঁদা—এই আলো ছায়া কখনও তোমার সম্মুখে আসে নাই? নিত্য তোমার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে নাই? উহা শুধু কবিকল্পনা? মনগড়া কথা? যদি না পার, তবে কেন এই সদা-প্রত্যক্ষ বাস্তবতার কথা শুনিতে ভয় পাও, বলিলে চোখ রাঙ্গাও? আন্তর ও বহির্জগতের এই বাস্তব তথ্যকেই বেদান্তে বলা হইয়াছিল—'মায়া'। আজগুবী কোন ধারণা নয়, নিত্য-পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। জানি, এই সত্যের উপর বহু শতাব্দী ধরিয়া কল্পনার অনেক তুলি বুলানো হইয়াছে, যাহার ফলে মূল সত্যটিই ঢাকা পড়িয়াছে।

তাই তো আজ আমাদের দেশেও বহু বিদগ্ধ জন 'ধৃক্কং দেহি' বলিয়া 'মায়াবাদী'গণকে অনবরত সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতেছেন !

অন্তর্বিশ্বে 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' আরও চালাইয়া গেলে মানুষ 'মায়া' হইতে 'মুক্তি'কেও আবিষ্কার করিতে পারে—কল্পিত মুক্তি নয়, বাস্তব মুক্তি। ঐ যে অন্ধকারের পাশে কিছুটা আলোক ঝিকিমিকি করিতে দেখিয়াছিলাম, ব্যথার মাঝখানে আনন্দের আহ্বান শুনিয়াছিলাম, ঐ যে সঙ্কোচসত্ত্বেও বিস্তারের স্বপ্ন, পরাজয়-পরিবেষ্টিত বিজয়ের আশা—উহারা কোথায় দাঁড়াইয়া দীপ জ্বালিতেছে, নিশান উড়াইতেছে, গান গাহিতেছে ? বাহিরে না ভিতরে ? এক জায়গায় না বহু স্থানে ? উপনিষদের সিদ্ধান্ত—আমারই নিজের আত্মায়। সেই আত্মা ভিতরেও নয় বাহিরেও নয়, আবার—ভিতরেও বটে, বাহিরেও বটে। উহা দেশকাল দ্বারা আবদ্ধ নয়—উহাকেই অবলম্বন করিয়া দেশকাল অবস্থিত। উহা তাই এক জায়গায়, আবার বহু জায়গায়—তথা কোন জায়গাতেই নয়—নিজতেই নিজ। মানুষের ভিতরে বাহিরে যত দীপ্তি আত্মারই সেই দীপ্তি, যত আকর্ষণ আত্মারই সেই আকর্ষণ, যত শক্তি আত্মারই সেই শক্তি। আত্মাতেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব—সেই ব্যক্তিত্বই তাহার নিজের সত্য, বিশ্বের সত্য। আত্মাকে জানিলে সব জানা হয়, আত্মাকে পাইলে সব পাওয়া হয়। এই দেহেই, এই জীবনেই আত্মাকে জানা যায়, পাওয়া যায়।

জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত বাড়াইয়া যাওয়াই যদি বিজ্ঞানের চিরন্তন প্রেরণা হয় তবে শুধু বাহিরের জ্ঞান লইয়াই বসিয়া থাকিব কেন ? নিজের মনকে বুদ্ধিকে, অনুরাগ উল্লাসকে, নিজের অহংকার ব্যক্তিত্বকেও বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার বিশ্লেষণ করিব না কেন ? একদিন ভারতবর্ষে তাহাই করা হইয়াছিল। ভিতর-বাহির দুটিকে অন্বেষণ করিয়া দুটিকে একসঙ্গে চিরিয়া ফাড়িয়া দুয়ের মধ্য হইতে আত্মাকে মানব-সত্যকে টানিয়া বাহির করা হইয়াছিল। মানুষের এই সত্য মানুষের বহির্বিশ্ব ও অন্তর্জগৎ হইতে বিযুক্ত একটি আকাশকুসুম নয়। এই সত্য মানুষের ভিতর-বাহিরে অনুস্যূত, ভিতর-বাহিরের বিধারক, সত্তা, আলোক, আনন্দ।

এই সত্যের সংপ্রাপ্তির নামই উপনিষদ্ দিয়াছেন মুক্তি। উহার বিজ্ঞান—আত্মবিদ্যাকে মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে 'সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা'। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মুক্তিকে যে পরম পুরুষার্থ—সেরা অন্বেষণের বিষয় মনে করা হইত, উহা কি অন্যায় ? ভাবুকতা ? মানুষ জন্মিয়া অবধি মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন প্রতিপদক্ষেপে যে আলোক-আঁধারের, বিকাশ-সঙ্কোচের দ্বন্দ্ব বহিয়া চলে সেই দ্বন্দ্বের রহস্য যে বিজ্ঞান ভেদ করিয়া দেয় সে বিজ্ঞান নিশ্চিতই মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান। ঐ বিজ্ঞানের সামর্থ্যে মানুষ বিপুলভাবে শক্তিমান হয়, অসীম বৃহত্ত্ব লাভ করে।

নিজকে-আবিষ্কার-করা নিজের-মধ্যে-বিশ্বকে-দেখা বিশ্বের-ভিতর-নিজেকে-জানা মানুষ সমাজের বাজে খরচ নয়, সমাজের প্রকৃত মূলধন। একটি এইরূপ মানুষ অনেক শতাব্দী ধরিয়া মানবসমাজে সত্য, মৈত্রী, উদারতা, শান্তির প্রেরণা দিয়া চলেন, সমাজকে সর্বজনীন কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দেন।

মুক্তি অতএব, একটি অলস শব্দ মাত্র নয়। শুধু বুড়া-বুড়ী দিগকেই উহা শুনাইবার কথা নয়। হৃদয়ে যাহাদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, চিত্ত যাহাদের কুসংস্কার-মুক্ত, বুদ্ধি যাহাদের বাগাড়ম্বরের ভারে বাঁকিয়া যায় নাই, সত্যকে জানিবার স্পৃহা যাহাদের ভাসা ভাসা নয় এমন লোকরাই তো মুক্তির কথা শুনিবে, মুক্তির বার্তা বুঝিবে, মুক্তির স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিবে। এমন ব্যক্তি যে কোন দেশে থাকিতে পারেন, যে কোন বয়সের হইতে পারেন, পুরুষ হইতে পারেন, নারী হইতে

পারেন, হিন্দু হইতে পারেন, মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শী-ইহুদী হইতে পারেন। মানুষের আত্মার কোন জাতি নাই, লিঙ্গ নাই, সমাজ নাই, ধর্ম নাই।

সকলেই কিছু অধ্যাপক এডিংটনকে বুঝিবার স্পর্ধা রাখে না, কিন্তু তাঁহার গবেষণাকে সত্যের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত এমন লোকের অভাব নাই। এমন লোকের অভাব সমাজে একান্ত ভাবে দেখা দিলে বিজ্ঞানের ঘটে অপমৃত্যু- যেমন গেলিলিওর যুগে ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। মুক্তি বস্তুটিকেও সমাজের হাজার হাজার নরনারী একসঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিবে এমন সুদিন আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত সেই শ্রোতৃমণ্ডলার মতো আলোচ্য মুক্তি-বিষয়টির উপর বাস্তবতার সম্মান আমরা দিতে পারি। ইহাও কম কথা নয়। সেই সম্মানের দ্বারা আমরা আত্মবিজ্ঞানের পরিবেশকে জীবন্ত রাখিব—আত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন, সমাদর ও প্রচারের সহায়তা করিব। বর্তমান বিশ্বে মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তাহার নিজের সম্যক্ পরিচয়।

ভ্রান্ত নেতৃত্ব

গত ২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) নূতন দিল্লীতে 'হরিজন' বংশোদ্ভূত ধর্মগুরু গুরু রবিদাসের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চরিত্রের পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ সেবানিষ্ঠা এবং গভীর ভগবৎপ্রেমের জন্য এই সন্তপুরুষ শুধু হরিজনগণের নয়, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেরও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইহাই ঐতিহ্য। যথার্থ ঈশ্বরভক্তের জাতিকুল কেহ দেখিতে যায় না। সমাজের দিক দিয়া অতি নীচ বংশে জন্মিয়াও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের গৌরবে ব্রাহ্মণেরও অধিক সম্মান ও পূজা লাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তির উদাহরণ সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্বত্রই রহিয়াছে। ইঁহাদের কেহ মারামারি করিয়া 'অধিকার দাবি করিতে যান নাই, তাঁহাদের সমুন্নত ব্যক্তিত্বের নিকট সমাজ নিজেই অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সত্যটি আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। উপর্যুক্ত জয়ন্তীসভায় বহু সহস্র 'হরিজন' আসিয়াছিলেন, বর্ণহিন্দুরাও আসিয়াছিলেন। সন্ত রবিদাসের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে যত না আলোচনা শোনা গেল তাহার দশগুণ উঠিল সরকার ও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার। হরিজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া ডাঃ আম্বেদকার বলিলেন,—"অতীতে যে সব বন্ধন আমাদের বেঁধে রেখেছে তা সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। এর একটি উপায় হচ্ছে আমাদের বর্তমান ধর্ম (হিন্দুধর্ম) ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করা।" হিন্দুসমাজের অনুন্নত জনগণের জন্য মহাত্মা গান্ধী এবং তৎপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ কম ভাবেন নাই। মহাত্মা গান্ধী হরিজনদিগের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে কর্তব্যবোধ ও সেবার ভাব জাগাইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত কি নিরলস উদ্যম করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু স্বামীজী বা গান্ধীজী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণই অনুন্নত জনগণের অধিকারলাভের পন্থা বলিয়া স্বপ্নেও কখনও ভাবিতে পারেন নাই। বর্তমানে ভারতসরকার এবং দায়িত্বশীল উচ্চবর্ণীয়গণ উত্তরোত্তরই অনুন্নত জনগণের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য অবহিত হইতেছেন এবং কাজও করিতেছেন। অতীতে নিম্নজাতীয়গণের প্রতি যে অবহেলা ও অত্যাচার হইয়াছে তাহার সমর্থন কেহই করে না। বর্তমান হিন্দুসমাজ পুরাতন দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্ত যে করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাও সুস্পষ্ট। কিন্তু ইত্যবসরে হরিজনদের যাঁহারা নেতা সাজিয়া বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ দিয়া পূর্বোক্তপ্রকার দায়িত্বহীন উত্তেজনা-বাক্য যত কম বাহির হয় ততই ভাল। ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কিছুকাল পূর্বে এইরূপ একজন নেতার গালিগালাজের উত্তরে বলিয়াছিলেন

যে, বর্তমান ভারতে হরিজনগণ নিজেরা ছাড়া হরিজনগণকে কেহ আর খাটো মনে করে না। কথাটি খুবই ঠিক। আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ সকলেই এক অখণ্ড হিন্দুসমাজের অংশ—এই সত্যটিকে দিন দিন বাস্তব করিয়া তোলা—নিষ্ফল আক্রোশ, বিদ্বেষ-মূলক সমালোচনা এবং ধ্বংসাত্মক কাজের পথ দিয়া নয়, পারস্পরিক সম্প্রীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গী যে নেতার থাকিবে না তাঁহার নেতৃত্ব ভ্রান্ত। তিনি 'হরিজন' দিগের যথার্থ কল্যাণ করিতে পারিবেন না।

নূতন জাতিভেদ

একদিকে আচার্য বিনোবা ভাবে ভূমিদান শ্রমদান সম্পত্তিদান জীবনদানের আবেদন জানাইতেছেন, বক্তৃতামঞ্চে দিনের পর দিন নানা জনের মুখে শ্রেণীহীন জাতিহীন শোষণহীন সমাজের আদর্শের কথা শোনা যাইতেছে—অপর দিকে নয়া দিল্লীর বুকের উপর রাষ্ট্রেরই আওতায় নূতন জাতি-প্রথা গভীর ভিতের উপর খাড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। ব্রহ্মণ-শূদ্র-বৈশ্যাদির বর্ণবিভাগ নয়—'দুহাজার' 'একহাজার' 'পাঁচশত' 'আড়াইশত' 'একশত' ইত্যাদ্যাকার উপার্জন-কেন্দ্রিক জাতিভেদ। হিন্দুসমাজের নানা জাতি উপজাতির মধ্যে হৃদয়ের মিলের এবং পারস্পরিক সহানুভূতি, সাহায্যের কোন বাধা নাই; কিন্তু এই নূতন জাতিভেদ এক এক মানবগোষ্ঠীকে দশহাত-উচ্চ দৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরের মধ্যে একেবারেই অবরুদ্ধ রাখিতেছে। 'দুহাজারী' সব সময়েই 'দুহাজারী'—আফিসে, রাস্তায়, হাটবাজারে, আমোদভবনে, গৃহেও। নিম্নতর রোজগারীর সহিত মেশা, কথাবলা তাঁহার 'অধর্ম'। একহাজারীদের কাছে পাঁচশতীয়ারা 'অচ্ছুৎ'। একশতীয়ারা পাঁচশতীয়াদের বক্র হাসির পাত্র। কর্তাদের এই 'প্রেস্টিজ' গৃহিণীদের, তথা তাঁহাদের পুত্রকন্যাদেরও ভিতর স্বাভাবিক নিয়মেই সংক্রামিত হইতেছে। এক এক পর্যায়ের অফিসারগণের স্ত্রীপুত্রকন্যা শুধু সেই পর্যায়ভুক্ত অফিসারের স্ত্রীপুত্রকন্যার সহিত সংযোগ রাখেন। বাঙলা দেশের (এবং ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যেও) পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ঘোষ-বোস-মিত্র-পাড়া, কুমোরপাড়া, কলুপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি এক এক বৃত্তির লোকের আবাসস্থলের বিভাগ আছে—কিন্তু সেখানে এক পাড়ার লোকের আর এক পাড়ার লোকের সহিত কথাবার্তা লেনদেনে বাধা নাই। ব্রাহ্মণের ছেলের কলুমাসী থাকে, কুম্ভকার গৃহিণীর 'বামুনদিদি' ভূরি ভূরি মিলে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে টাকার মাপকাঠি দিয়া সৃষ্ট হাজার হাজার ফ্ল্যাট পরিশোভিত 'পাড়া' গুলির অবস্থা অন্যরূপ। 'বিনয় নগরে'র বিনীত কেরাণীশ্রেণী মানীকুল-অধ্যুষিত 'মান নগরে'র দিকে চাহিয়াই থাকিতে পারেন, বাক্যের বা মনের বা হৃদয়ের কোন সংযোগের কথা ভাবিতে পারেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, হিন্দুসমাজের জাতিভেদের অনেক নিন্দা শোনা যায় কিন্তু ডলারের মাপকাঠিতে জাতিভেদ আরও ভীষণ। আর্থিক বৈষম্য কিছু না কিছু সমাজে থাকিবার যুক্তি আছে, উহা থাকিবেও কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া হৃদয়ের বৈষম্য যদি বাড়িতে থাকে, তাহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়। বিষবৃক্ষের মূল সময় থাকিতে উপড়াইয়া ফেলা ভাল।

সহ অবস্থিতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমরা মানুষ তাই করি মোরা ব্যথার স্তন্য পান,—
এই জগতের যুগের যুগের দান।
মোদের বেদনা বুঝিবে না কেউ
বুকের কূপেতে সাগরের ঢেউ
আগত বিগত অনাগত দুখে
প্রাণ করে আনচান।

চূর্ণ করিয়া এনে দেয় হাতে যুগের যুগের হীরা
কালের যোগানো দারুণ মর্মপীড়া।
ভগ্ন প্রাসাদ ভাঙা মন্দির
দেখায় দেখিয়া ঝরে আঁখিনীর
দেখি মানুষের নৃশংসতা ও
দেবতার অপমান।

যায় না তীর্থ কলুষিত করা, দেবতা যায় না ভাঙা,—
রক্তে ধরণী করা যায় নাক রাঙা।
বুঝি তা, তবুও কমে না তো ব্যথা,
সেই হা হুতাশ সেই ব্যাকুলতা।
এক হয়ে যায় ভবিষ্যৎ আর
অতীত বর্তমান।

বর্বরতাকে সহায় চাহি না ধর্মে করিতে বড়,
সে শুধু ধর্মে করে দুর্বলতর।
হউক দীর্ঘ প্রবলের দিন—
শোধিতে তারেই হবে পাপঋণ,
প্রতি শ্বাস তার নাভিশ্বাসকে
করিতেছে আহ্বান।

থাকিতে হইবে বসুধার সাথে পাতায়ে কুটুম্বিতা,
সকলেই ভাই, সকলে হইবে মিতা।
বিষাক্ত অপকীর্তিকে আর—
জিয়াইয়া রাখা কিবা দরকার?
সব হিংসা ও প্রতিহিংসার
হয়ে যাক অবসান।

ফিরাইয়া দাও অপরের যাহা, আপনার যাহা লহ,
অপহরণের পরিণাম দুঃসহ।
অত্যাচারকে চিরস্থায়ী যে—
করিবে—দম্ভে মনে ভাবে নিজে
তাহাদের দিন শেষ হয়ে আসে!—
জাগ্রত ভগবান্!

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথা*

আইডা আনসেল

(মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এক রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজীর হোম্ অব ট্রুথে (Home of truth) ভাষণ দেবার কথা ছিল। তিনি তাঁর কয়েকটি বন্ধুকে বললেন, "বক্তৃতা শুনতে এসো, আজ আমি বক্তৃতা হলে কয়েকটি বোমা ছুঁড়বো—সেখানে গেলে বেশ আমোদ উপভোগ করবে আর তাতে তোমাদের মঙ্গলও কিছু হবে।" বক্তৃতাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। স্বামীজী যেন সকলের সব সংশয় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। আমাদের সম্বন্ধে তাঁর কিরূপ ধারণা সেকথা তিনি খুব সরল ও তেজঃপূর্ণ ভাষায় অকপটে বললেন। তাঁর বাণীর মর্ম গ্রহণ করলে ও সেই ভাবে কাজ করলে আমাদের যে কল্যাণ হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য—আর আমার মনে হয়, আমরা সকলেই তাঁর সে বাণী হৃদয়ঙ্গম করতেও পেরেছিলাম।—চরিত্রের বিশুদ্ধতার উপর জোর দিয়ে তিনি বললেন যে, মানুষের মনকে সুদৃঢ় করতে হলে পবিত্রতার একান্ত প্রয়োজন। সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়ের পক্ষেই এটা প্রযোজ্য। তিনি একটি হিন্দু যুবকের কথা তুললেন। ছেলেটি মাত্র কিছুদিন আগে আমেরিকায় এসেছিল এবং স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছিল। একদিন সে স্বামীজীকে বলে যে, ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণা নিশ্চয়ই ভুল, কারণ এখানকার ডাক্তাররা সে ধারণার বিপরীত উপদেশ তাকে দিয়েছেন। উত্তরে স্বামীজী তাকে বলেন, "তুমি ভারতে ফিরে যাও এবং তোমার পূর্বপুরুষগণ যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে চরিত্রের নির্মলতা রক্ষা

* Vedanta and the west (May-June, 1954) পত্রিকার সৌজন্যে। অনুবাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার।

করবার জন্যে অভ্যাস করে এসেছেন, তাঁদের কথা শোন—তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ কর।" তারপর স্বামীজী ছেলেটিকে ঐ ধরণের উপদেশ দেওয়ার জন্যে আমেরিকান ডাক্তারদের তীব্র সমালোচনা করতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামীজী ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে লিখিত স্বর্গ ও নরকের নানা ধারণার বিষয় বলছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের নরকের কথা আমাদের বুঝিয়ে বললেন। কোন কোন ভক্ত, তাঁর বক্তৃতার পর প্রায়ই তাঁকে কখনও সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর লিটল্ ইটালী পল্লীতে মিঃ লুই জুল-এর (Louis Juhl) রেস্তোরাঁতে কিম্বা শহরের উত্তর দিককার কোন কাফেতে নিয়ে যেত। অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করত তাঁর মেজাজ ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর এবং সেই অনুযায়ী হয় গরম গরম কিছু খাবার কিম্বা ঠাণ্ডা আইসক্রীম, যেটির প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন, সেই ব্যবস্থা তারা করত। যেদিন আমাদের স্বর্গ ও নরকের কথা হচ্ছিল, সেদিন রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। স্বামীজী তাঁর ওভারকোটের ভেতর কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "এইটাই যদি নরক না হয়, তাহলে নরক যে কি তাত আমি জানি না।" কিন্তু সেই রকম দুর্দান্ত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তিনি আইসক্রীমই পছন্দ করে নিলেন ও খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। কাফে থেকে বেরবার সময়, হঠাৎ কাফের সেবিকা আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে, টেলিফোন ধরতে চলে গেল। মেয়েটিকে ডেকে সহাস্যে বললেন, "বেশী দেরি কোরো না—নইলে তুমি ফিরে এসে কেবল একতাল চকলেট আইসক্রীম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।"

আর একদিনের ঘটনা, একটি হোটেলের পরিচারিকা খাবার পরিবেশনে ভুল করে স্বামীজীকে আইসক্রীম সোডা এনে দিয়েছিল। ঐ জিনিসটি তাঁর পছন্দ হল না। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা বদ্‌লে দিতে পারবে কিনা। স্বামীজীর কথামত যখন সে আইসক্রীম সোডাটি বদ্‌লাতে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ক্রুদ্ধ ম্যানেজারের দিকে। তাই দেখে তিনি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন "তুমি যদি ঐ মেয়েটিকে বকাবকি কর, তাহলে তোমার এখানে যত আইসক্রীম সোডা আছে, আমি সমস্ত খেয়ে ফেলব।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করতে এসে রয়েছেন। ৩০শে মার্চ (১৯০০ খ্রীঃ) স্বামীজী লিখলেন, "পরের সপ্তাহে আমি চিকাগো যাব।" কিন্তু তার পরেও তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। ২৩শে এপ্রিল তিনি মেরী হেলকে (Mary Hale) লিখলেন, "আমার আজকেই রওনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার উঁচু রেড্‌উড গাছের ছায়াঘেরা একটি ক্যাম্পে যাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে আরও তিন চার দিন যাওয়া স্থগিত রাখলাম।" কিন্তু পরে যা ঘটল, তাতে তাঁর 'তিন চার দিনে'র জায়গায় 'তিন চার সপ্তাহ' বললেই বোধহয় ভাল হত, কেননা তিনি ২৬শে মের আগে বে (Bay) অঞ্চল ছেড়ে যাননি।

মিঃ জুল (Mr Juhl) ছিলেন পূর্বোক্ত ক্যাম্পটির সত্ত্বাধিকারী। তিনি মিস্ বেলকে (Miss Bell) গরমের ছুটিটি তাঁর ঐ ক্যাম্পে কাটাবার জন্যে অনুরোধ করেন। মিস্ বেল তাঁর সঙ্গে স্বামীজীকে সেখানে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন ও সেই সঙ্গে মিসেস্ রুরব্যাক্ (Mrs Eloise Roorbach) ও আমাকেও যাবার জন্যে বিশেষ করে বললেন। পুরনো কয়েকখানা চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে, স্বামীজী টার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত ছিলেন; তারপর বে-র অপর দিকে অ্যালামেডা (Alameda) তে কয়েকদিন কাটিয়ে ২রা মে রেড্‌উড্ ক্যাম্পে এসে পৌঁছান।

স্বামীজী আসবার কয়েকদিন আগেই আমি, মিস্ বেল এবং মিসেস্ রুরব্যাক্ ২২শে এপ্রিল ওখানে পৌছেছিলাম। মিঃ জুলের এই ক্যাম্পটির নাম আর্ভিং শিবির (Camp Irving)। ওর অবস্থিতি ছিল স্যানফ্রান্সিস্‌কোর কয়েক মাইল উত্তরে ম্যারিন কাউন্টি (Marin County) তে। একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে নদীর বাঁক, তার মাঝে ক্যাম্পের ফালি জমিটুকু। এই জমির একদিকে গোলাকারে ঘন ঘন কয়েকটি গাছ ছিল, সেই স্থানটি আমরা সাধনভজনের জায়গা হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমাদের ক্লাসও বসত ওখানে। জমির অপর দিকে ছিল আমাদের রাঁধবার জায়গা —সাজ সরঞ্জাম হিসাবে ছিল গাছের নীচে একটি ষ্টোভ, একটি ট্রাঙ্কে রাঁধবার জিনিসপত্র, একটি রুক্ষ কাঠের টেবিল, তার দুপাশে দুটি বেঞ্চ, ডিসগুলি রাখবার জন্যে গাছের গায়ে কয়েকটি তাক্। প্যান প্রভৃতি টাঙ্গিয়ে রাখবার জন্যে গাছের গায়ে কতকগুলো পেরেক পোঁতা ছিল। একদিকে সাংসারিক ও অপরদিকে আধ্যাত্মিক এই দুরকম আয়োজনের মাঝের জায়গাটুকুতে ছিল ৪টি তাঁবু ও আগুন জ্বালবার জন্যে কিছু ফাঁকা জায়গা।

স্বামীজী যখন অ্যালমেডা থেকে ক্যাম্পে এসে পৌছলেন, তাঁর সঙ্গে অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে শ্রীমতী শান্তিও এসেছিল। এই ক্যাম্পে আসার আগে শান্তির মনের ভিতর একটি বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। একসঙ্গে দুটি বাসনা তার মনে হাজির হয়ে যেন তার মনটাকে ছিন্নভিন্ন করে তোলে। একটি, স্বামীজীর সঙ্গে ক্যাম্পে যাবার প্রবল আকর্ষণ—আর একটি, প্রায় তিন মাস নিজের মেয়ের সঙ্গে দেখা না হবার পর লস্ এঞ্জেলিস্-এ গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা। স্বামীজী তাকে বললেন, "তুমি লস্ এঞ্জেলিসে এখন যেও না, আমার সঙ্গে ক্যাম্পে চলো, ধ্যানধারণা শিখবে।" অ্যালামেডা থেকে ক্যাম্প আর্ভিংএ যেতে গেলে, দুবার ফেরি জাহাজে পার হতে হয়—একবার স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে পৌছাবার আগে বে• পার হবার সময়, আর একবার ঐ শহরের উত্তর থেকে ম্যারিন কাউন্টিতে যাবার সময়। অ্যালামেডাতে যাত্রীদের জাহাজের জেটিতে নিয়ে যাবার জন্যে দুটি পাশাপাশি রেলের পথ আছে—একটি Broad gauge এ, অপরটি Narrow gauge এ। স্বামীজী শান্তিকে নিয়ে প্রথম গাড়ীটি ধরতে না পেরে দ্বিতীয়টিতে গেলেন। গাড়ীতে বসে তারা পরামর্শ করছেন, কোথায় তাঁরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া করবেন— স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর জাহাজে কিম্বা ঐ শহর থেকে পুনরায় যে ষ্টীমার নিতে হবে সেখানে। হঠাৎ তাঁদের খেয়াল হল যে, যে গাড়ীতে তাঁরা বসে আছেন সেটাতে কোন ইঞ্জিন জোড়া নেই অর্থাৎ সে গাড়ী আর যাবে না! তখন কি আর করবেন, অগত্যা তাঁরা অ্যালামেডার 'হোম্ অব ট্রুথে'র বাসায় ফিরে এলেন ও সেইখানেই খাওয়াদাওয়া সারলেন। স্বামীজী শান্তিকে বললেন, "আমরা গাড়ী ধরতে পারলাম না কেন জান? কারণ তোমার মনটি লস্ এঞ্জেলেস্-এ পড়েছিল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনই শক্তি নেই যা মানুষকে তার মনের বিরুদ্ধে টানতে পারে।"

শান্তি আমায় বলেছিল, স্বামীজীর বইগুলি দুবছর ধরে পড়বার পর কেমন করে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে লস্ এঞ্জেলিস্-এ এসে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা শুনতে পায়। তখনই সে স্বামীজীর কাজে সাহায্য করতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। তারপর একটি সমিতি গঠন করে শান্তি তার প্রথম সম্পাদিকা হল। ব্লান্কার্ড হল (Blanchard Hall), হোম্ অব ট্রুথ (Los Angeles Home of Truth), শেক্সপীয়র ক্লাব (Shakespeare club of Pasodena) প্রভৃতি জায়গায় বক্তৃতা দেওয়া চলতে লাগল। স্বামীজী তখন মিসেস্ ব্লড্‌গেট (Mrs S. K.

Blodgett) এর বাড়ীতে থাকতেন। তিনি দক্ষিণ প্যাসাডেনাতে শান্তি ও তার অন্য দুই বোনের আতিথ্যও কিছুদিন গ্রহণ করেছিলেন। এই দু'বোনের একজনের নাম মিসেস্ ক্যারি মিড্ উইকফ (Mrs. Carrie Mead Wyekoff) যিনি পরে তাঁর হলিউডের বাড়িটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় বেদান্ত সোসাইটির জন্যে দান করেছিলেন। দ্বিতীয় বোনটির নাম হেলেন মিড্ (Halen Mead) যিনি লস্ এঞ্জেলিস্-এ স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা শর্ট হ্যাণ্ডে লিখে নিয়েছিলেন। স্বামীজী ওকল্যাণ্ডে যাবার সময় বলেন, "তোমরা তিন বোন চিরজীবনের জন্যে আমার মনের অংশ বিশেষ হয়ে রইলে।"

যখন স্বামীজী ওকল্যাণ্ডের গির্জায় (Unitarian Church) বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলেন, তখন তিনি শান্তিকে বললেন, "যদি তুমি আমার সঙ্গে ক্যাম্পে যেতে চাও, তাহলে দেখ যেন কোন বাধা তোমায় না আবার আটকায়।" যাহোক শেষ পর্যন্ত শান্তি স্যানফ্রান্সিস্কো হয়ে আরভিং ক্যাম্পে এসে পৌছল। সেখানে স্বামীজীর যত্ন ও আরামের জন্যেই সে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে থাকৃত। একদিন সকালের ক্লাসের সময় স্বামীজী দেখলেন, শান্তি রান্নার জায়গায় খাবার তৈরি করতেই ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আজ ধ্যান করতে যাবে না?" সে বললে, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই—কিন্তু আগে এই সুরুয়াটা সিদ্ধ করে নিই, তারপর আমি যাচ্ছি।"

স্বামীজী বললেন, "যাক্, কোন ক্ষতি নেই—আমাদের প্রভু (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন, সেবার জন্য ধ্যান করাও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।"

আমার সুদীর্ঘ জীবনে দুটি রাত্রির কথা কখনও ভুলতে পারব না। তার মধ্যে যে কোন একটির চিন্তাই আমার কাছে সর্বপ্রকার গ্লানির প্রতিষেধক। ওদের মধ্যে একটি হচ্ছে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমের প্রথম রাতটি, যে বিষয়ে আমি আগেই লিখেছি।* অপরটি হল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে স্বামীজীর সঙ্গে "এই আর্ভিং শিবিরের প্রথম রাতটি। আমি চোখ বুঁজলেই আজও স্পষ্ট দেখতে পাই, পাতলা অন্ধকারের মধ্যে স্বামীজী রয়েছেন দাঁড়িয়ে, তাঁর মাথার উপর প্রতিপদের চাঁদ, আর সামনে আগুনের জ্বলন্ত কাঠটি থেকে মাঝে মাঝে ঠিকরে পড়ছে ফুলকি। কয়েকমাস ধরে অনেক বক্তৃতাদি দেবার দরুণ তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখানে পৌছে তাঁকে বেশ প্রসন্ন মনে হল। বললেন, "দেখ, আমাদের জীবনটা যেন হঠাৎ একদিন অজানার অরণ্যে শেষ হয়ে যায়, ঠিক যেমন একদিন এর আরম্ভও হয়েছিল ঐরূপ অরণ্যে। কিন্তু এই দুই অবস্থার মাঝে থেকে যায় একটা বিরাট অভিজ্ঞতার জগৎ।" তারপর অন্য অন্য দু' একটি কথাবার্তার পর যখন আমরা আমাদের নিয়মিত ধ্যান আরম্ভ করতে যাব, এমন সময় তিনি বললেন, "তোমরা যে-কোন একটা বিষয় বস্তুর উপর ধ্যান আরম্ভ করতে পার, কিন্তু আমি ধ্যান করব সিংহের হৃদয়টি, কেননা এতে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়।" সেই রাত্রিতে স্বামীজীর কাছে বসে ধ্যান করে কি যে অপার শক্তি অনুভব করেছিলাম তা কখনও বুঝিয়ে বলা যায় না।

পরদিন, সমস্ত দিনটি ধরে বৃষ্টি পড়ল। সকালে প্রাতরাশের পর স্বামীজী একটি খাটের উপর বসে, গায়ে জ্বর থাকা সত্ত্বেও, অনেক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেন। রাত্রে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এতই খারাপ দাঁড়ায় যে, তিনি একটি উইল পর্যন্ত করে ফেললেন। ওর মর্ম ছিল এই যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের উপর সবকিছুর ভার রইল। শান্তি ও কল্যাণী তাঁর সেবার ভার নিয়েছিল।

* উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৬১ দ্রষ্টব্য।

আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভেতরই ভিজতে ভিজতে শান্তি স্বামীজীর তাঁবুর উপর এক টুকরা ক্যাম্বিশ চাপিয়ে দিয়ে জল রোধ করবার চেষ্টা করছে। মিস্ বেল ও আমি ছিলাম ঠিক সামনের তাঁবুতে। ওখান থেকে আমি এ দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম।

তার পরদিন শনিবার, তাই মিস্ বেল ও আমাকে স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে যেতে হল। পরদিন রবিবার বিকাল বেলায় যখন আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম, তখন স্বামীজী অনেক ভাল হয়ে উঠেছেন। স্বামীজীকে বিশ্রাম নেবার জন্যেই এই ক্যাম্পে আনা হয়েছিল, কিন্তু তা হলে কি হয়, তিনি রোজই প্রাতরাশের পর খাটের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গল্প বলতেন ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি আমাদের তাঁর অন্তরের গভীর আশার কথা বলেছিলেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, পরস্পরের মধ্যে সুষ্ঠুতর সংযোগ ও সমাদর হোক এবং ফলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হোক। কেম্পিসের (Thomas à Kempis) প্রতি তাঁর কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল সে কথাও তিনি আমাদের বলেছিলেন। বললেন, মাত্র দুটি বই, গীতা ও কেম্পিসের 'ঈশানুসরণ' (Imitation of Christ) হাতে নিয়ে কেমন ভাবে তিনি সারা ভারতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। মনে পড়ে, স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে একটি বক্তৃতা তিনি করেছিলেন 'ঈশানুসরণ' থেকে একটি বাণী দিয়ে—

"Silence all teachers, silence all books; do Thou only speak unto my soul." (সব গুরুরা চুপ করুন, সব বই বন্ধ হোক, প্রভু, শুধু তুমিই আমার আত্মার কাছে কথা বল।)

সকাল বেলায় কথাবার্তা ও ধ্যানের পর স্বামীজী রান্নায় সাহায্য করতেন, কখনও কখনও আবার নিজেও রান্না করতেন। তিনি আমাদের জন্যে তরকারি তৈরী করে, ভারতে কিভাবে মসলা বাটা হয়, তা আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তাঁর তাঁবুতে মাটিতে বসে, মাঝখানে একটু গর্তওয়ালা একখানা পাথর কোলের উপর রাখতেন, তারপর একটা একটু লম্বা ধরণের বেশ পরিষ্কার পাথর দিয়ে তিনি মসলাগুলি এমন সুন্দরভাবে গুঁড়া করতেন, যা আমরা আমাদের পদ্ধতিতে কোন দিনই পারব না। স্বামীজী বাটা মসলা দিয়ে তরকারি তৈরী করলে ভয়ানক ঝাল হত, আমরা খেতেই পারতাম না। তিনি কিন্তু সেই তরকারি খেতেন, উপরন্তু সেটাকে আরও বেশী ঝাল করবার জন্যে আলাদা করে তার সঙ্গে লাল লাল লঙ্কাও বেশ আরাম করে খেতেন। তাঁর এই লঙ্কা খাওয়াটাও বেশ মজার ব্যাপার ছিল। তিনি তাঁর মাথাটা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে দিতেন, তারপর লঙ্কাটি হাতে নিয়ে, তাঁর হাতখানি মুখের উপর কয়েকবার ঘুরিয়ে সেটা মুখের ভিতর ফেলে দিতেন। একদিন আমার হাতে একটা লঙ্কা দিয়ে বললেন, "খেয়ে ফেল—এতে তোমার উপকার হবে।" তখন স্বামীজী যদি কাউকে বিষও হাতে তুলে দিতেন, সে তাও খেতে দ্বিধাবোধ করত না; তাই আমি তাঁর কথামত কাজ করলাম—তারপর আমার যা অবস্থা হল তা বলবার নয়, আর তাই দেখে তাঁর সে কি আমোদ! সারা বিকাল ধরে তিনি মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কিগো—তোমার পেটের ভেতরের উনানটা জলছে কেমন?" তিনি একদিন আমাদের জন্যে চিনি থেকে পাটালি তৈরী করে বুঝিয়ে বললেন যে, সে জিনিসটা কত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ, কেননা সেটা ফোটাতে ফোটাতে চিনির সমস্ত ময়লাগুলো বার করে ফেলে দেওয়া যায়।

আমাদের আহারের সময়টায় বেশ হাসিখুশী হত, কোন রকম লৌকিকতা থাকত না, এবং থাকত স্বামীজীর অফুরন্ত হাস্যকৌতুক ও অনেক রকম গল্প।

শান্তি কিছুদিন আলাস্কাতে (Alaska) ছিল— সেখানে সে খাওয়া সম্বন্ধে খুব কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়েছিল। তার উদ্বেগহীন স্বভাব ও বাঁধাধরা লৌকিকতা গ্রাহ্য না করার ভাবটি স্বামীজী পছন্দ করতেন। একদিন সকালে প্রাতরাশের সময় তিনি এসে শান্তির থালা থেকে একটু খাবার নিয়ে খেতে খেতে বললেন, "আমাদের দুজনের একই থালা থেকে খাওয়া যেন বেশী মানায়, কেননা আমরা দুজনেই তো দুটি ভবঘুরে।"

স্বামীজীর দৃষ্টি থেকে কোন জিনিসই এড়িয়ে যেত না। একদিন প্রাতরাশের সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যে মেক্সিকান্ বা আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান্ ছেলেটি আমাদের ওখানে কাজ করছিল সে একদৃষ্টে আমাদের খাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি ছেলেটিকে পরে কাছে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে, সে অনুযোগ করলো যে তাকে কফি দেওয়া হয়নি। তারপর বললে, "Black man likes coffee ; White man likes coffee ; Red man likes coffee." (কালো আদমী কফি ভালবাসে, সাদা চামড়ার লোক কফি ভালবাসে, লাল চামড়ার লোক কফি ভালবাসে।) তার কথা ও বলার ভঙ্গীতে স্বামীজী খুব আমোদ বোধ করলেন ও তাকে কফি দিতে বললেন। সমস্ত দিন ধরে তিনি ছেলেটির ঐ কথাগুলি বারবার আবৃত্তি করেছিলেন আর হেসেছিলেন।

বিকেল বেলায় আমরা লম্বা বেড়াতাম। সারাদিনের রুটিন ও আনন্দোপভোগ চরমসীমায় এসে পৌছাত সন্ধ্যাবেলায় আগুনের ধারে বসে স্বামীজীর কথাবার্তা-শ্রবণে ও তার পরবর্তী ধ্যানাভ্যাসে। প্রথমে তিনি আমাদের গল্প বলতেন, পরে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ধ্যান করবার উপযোগী কিছু বিষয় ঠিক করে দিতেন যেমন, "আমি নির্ভয় ও সুদৃঢ়"। তারপর সুললিত স্বরে আবৃত্তি করতেন। একদিন সকালে তিনি 'নির্বিশেষ সত্য, একত্ব মুক্তি' সম্বন্ধে বলে আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ধ্যানের বিষয় ছিল, 'সর্বসত্তা-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ আমি।' গাম্ভীর্যপূর্ণ ও কর্মতৎপরতাভরা সকাল বেলা, আমোদআহ্লাদে ভরা দুপুর'বলা ও মহান্ ভূমার ভাবে ভরা সন্ধ্যাবেলা, এমনিভাবে আমাদের দিনগুলি খুব তাড়াতাড়িই কেটে যেতে লাগল।

মিস্ বেল যখন আমাকে তাঁর ক্যাম্প আরভিং-এ এসে গরমের সময়টা কাটিয়ে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে তখন আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল যে, প্রতি শনিবার সকালে আমি স্যানফ্রান্সিস্কোতে গিয়ে দুপুরবেলা ছাত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষা দেব ও রবিবারে তাঁর বক্তৃতার বিবরণ শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিয়ে বিকালে ক্যাম্পে ফিরে আসব। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে মিস্ বেল কোন কারণে শুক্রবার বিকালে একাই শহরে চলে গেলেন ও বলে গেলেন, শনিবারে আমিও যেন তাঁর অনুসরণ করি। কথামত শনিবারে আমি যখন গাড়ী ধরতে যাচ্ছি স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি যাচ্ছ?" আমি দুঃখিতস্বরেই বললাম, "আমায় যেতেই হবে স্বামীজী, আমায় সেখানে সঙ্গীত-শিক্ষা দিতে হয়।" আমার কথা শুনে স্বামীজী বললেন, "তবে যাও— ৫ লক্ষ ডলার রোজগার করে আমায় পাঠিয়ে দিও, ভারতে আমার কাজের জন্যে।" তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করে চড়া সিঁড়ি বেয়ে রেল লাইনের ধার পর্যন্ত এলেন এবং হাত নাড়িয়ে গাড়ী থামালেন। (এখানে কোন ষ্টেশন ছিল না, প্রয়োজনে সঙ্কেত করলে গাড়ী থামত।) স্বামীজীর চলার ভঙ্গী ছিল চমৎকার। তাঁর চোখদুটি সব সময়ই ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে থাকত। কেউ কেউ বলেছিল যে তিনি টেলিগ্রাফের খুঁটির নীচে কিছুই দেখতেন না। যখন ইঞ্জিনটি আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে, শুনতে পেলাম ফায়ারম্যান ড্রাইভারকে বলছে, "আরে,

এই sky pilot (আকাশের চালক) টি কে হে ?" আমি এরকম ভাবের কথা এর আগে কখনও শুনিনি, তাই হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছি, এ কথার মানেটা কি হল ? অনেক পরে বুঝতে পারলাম যে, এর মানে নিশ্চয়ই 'আধ্যাত্মিক নেতা।' যে কোন লোক স্বামীজীকে দেখিলেই তিনি যে একজন 'মহান্ নেতা' এইটাই তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত।

প্রতি সপ্তাহের শেষে যে আমাকে শহরে যেতে হত তার জন্যে পরে বরাবর আমি মনোবেদনা অনুভব করেছি, কেননা তার কিছুদিন পরেই স্বামীজী ক্যাম্প আরভিং ছেড়ে চলে যান। তাঁর ভারতের কাজের জন্যে যদিও আজ পর্যন্ত আমি ৫ লক্ষ ডলার যোগাড় করতে পারিনি, কিন্তু ছেলেমানুষের মতো আজও আমি আশা করি যে, কোন না কোন অলৌকিক উপায়ে একদিন হয়ত তা পূর্ণ হয়ে যেতেও পারে, কেননা স্বামী তুরীয়ানন্দ বহু বার বলেছিলেন, জগদম্বা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।

স্বামীজী ঠিক যে কবে ক্যাম্প আরভিং ছেড়ে গিয়েছিলেন তা আমার মনে নেই, তবে কয়েকখানা চিঠিপত্র থেকে এইটুকু জানা যায় যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে তিনি স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে ডাক্তার লোগান (Dr. M. H. Logan) এর বাড়ীতে তাঁর পরিচর্যায় ছিলেন। এই সময় তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন গীতা-সম্বন্ধে। লস্-এঞ্জেলিস থেকে ১০ই জুন তিনি লিখেছিলেন, "আমি কয়েক দিনের ভিতরই চিকাগো রওনা হব।" এও জানা যায় যে ১১ই জুলাই তিনি নিউইয়র্কে ছিলেন। (ক্রমশঃ)

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ

স্বামী প্রেমেশানন্দ

(১)

বাল্যকালে শুনিতাম, পুরোহিত অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ করিলে যজমানের সর্বনাশ হয়; রাবণের পুরোহিত নিত্য বিশুদ্ধভাবে চণ্ডীপাঠ করিতেন বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র কিছুতেই রাবণকে পরাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না; হনুমান্ মাছি হইয়া গাছের ছালে লেখা চণ্ডীর দুই একটা অক্ষর চাটিয়া তুলিয়া ফেলেন; তখন, পুরোহিতের চণ্ডীপাঠে ভুল হওয়াতে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হন।

সংস্কৃতি-সাম্য রক্ষার পক্ষে, উচ্চারণ-সাম্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। সেইজন্য, সংস্কৃতভাষাভাষীদের উচ্চারণশুদ্ধি-বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি ছিল। অক্ষরগুলির উচ্চারণ তো সুনির্দিষ্ট ছিলই; তাহার উপর গুরুমুখে শুনিয়া শিখিতে হইত বলিয়া, মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, দেবভাষা একভাবেই উচ্চারিত হইত।

বাল্যকাল হইতে না শুনিলে কোনও ভাষাই, সেই ভাষাভাষীর ন্যায় উচ্চারণ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণে, বেদাধ্যয়নে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য হইয়াছিল। বিশেষ শিক্ষাহীন লোকের মুখে, সামান্যভাবে শ্রুত শ্রুতি উপহাসের মত শুনায়; তাই ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের বেদ উচ্চারণ সম্বন্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন।

(২)

প্রাচীনরীতি অনুসারে, বাঙ্গালী যাজকব্রাহ্মণগণ, অধ্যাপকের নিকট চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের আবৃত্তি শিক্ষা করিতেন এবং সর্বদাই, বিশেষজ্ঞদের মুখে

শাস্ত্রপাঠ-শ্রবণের সুযোগ পাইতেন। দীর্ঘ স্বর এবং ছন্দ ও যতি সম্বন্ধে, তাঁহাদের বঙ্গীয়-উচ্চারণ-সম্মত জ্ঞান ছিল। তাই বাঙ্গালী শ্রোতাদের নিকট, পুরোহিতদের চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ শ্রুতিকটু হইত না।

বর্তমান শিক্ষাবিভ্রাটে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু 'পাশ-ফেল' নিয়া ব্যস্ত; আর টোলের পণ্ডিত মহাশয়গণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় কিং-কর্তব্য-বিমূঢ়। সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন-সম্বন্ধে সমাজ সচেতন নহে, উচ্চারণশুদ্ধি-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই কাহারও মনে উঠে না। অনাদরে ও অবজ্ঞায় সংস্কৃতভাষার পাঠ আবৃত্তি অতি অশ্রাব্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিলাম, "অনাশ্রিত কর্মফঅলং" (অনাশ্রিতঃ কর্মফলং) শুনিলাম,—"যা দেবী সর্ব-ভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিইতা" (সংস্থিতা)। প্রায়ই, বাঙ্গালীদের মুখে সংস্কৃত উচ্চারণ এইরূপ বিকট আকার ধারণ করে। না শিখিলে কোনও ভাষার উচ্চারণই শ্রুতিমধুর হয় না। যাহারা আনাড়ি বাঙালী গায়কের মুখে হিন্দীগান এবং হিন্দুস্থানীদের মুখে বাংলা বাক্যালাপ শুনিয়াছেন তাঁহারা এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন।

একস্থানে জনৈক উচ্চশিক্ষিত অত্যন্ত সুপুরুষ আসামী ভদ্রলোক এস্রাজ বাজাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করেন। তিনি খুব সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আমাদের অনুরোধে মধুর কণ্ঠে একটি মনোহর রবীন্দ্র সঙ্গীত তিনি গাহিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্বের ঘটনা হইলেও, এখনও আমাদের স্পষ্ট স্মরণ আছে, আসামী উচ্চারণে বঙ্গ সঙ্গীতের বীভৎস ধ্বনি শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে আমাদিগকে গলদ্-ঘর্ম হইতে হইয়াছিল। বাণীর সঙ্গে ধ্বনির যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা সর্বজনবিদিত সত্য।

(৩)

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায়, লেখা হয় একরূপ, কিন্তু পড়া হয় অন্যরূপ। সংস্কৃত ভাষায় তাহা একেবারেই নাই; যাহা লিখিব, তাহাই পড়িতে হয়। বাংলা উচ্চারণ-অনুসারে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখলেই আমাদের লিখন ও উচ্চারণের পার্থক্য বুঝা যাইবে। শ্রীশ্রীগীতার ১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটি লিখিতেছি।

দ্রিশ্‌টাতু পাণ্ডবানিকং বুঢ় দুর্জোধন স্তদা।
আচার্জ (কিংবা আচাইর্জ) মুপশঙ্গইম্য (বা শঙ্গম্য)
রাজা বচনমব্রবিৎ॥

আমরা প্রায় এইরূপই পড়িয়া থাকি, অর্থাৎ লেখার সঙ্গে পড়ার মিল নাই। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত উচ্চারণ প্রকাশ করিতে হইলে, নিম্নলিখিতরূপ হইবে:—

দৃষ্‌টোআতু পাণ্ডওআ নিইকং ব্যূউঢং
দুর্‌য়োধনস্তদা।
আচার্‌ইয়মুপসঙ্গম্‌ইয় রাজা ওচনমব্রউইৎ॥

এইরূপ লিখিলে সংস্কৃত উচ্চারণ কতকটা ঠিক হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক অক্ষর সম্বন্ধে অবহিত ন হইলে শুদ্ধ উচ্চারণ অসম্ভব।

(৪)

বর্ণের উচ্চারণ

স্বরবর্ণ

আমরা হ্রস্ব ইকার এবং তাহার দীর্ঘ, দীর্ঘ ঈকার বলিয়া থাকি; উকার, ঋ কার ও ৯ কার সম্বন্ধেও তাহাই করি। কিন্তু অকার ও আকারের মধ্যে কোনটি কার হ্রস্ব এবং কোনটি কার দীর্ঘ তাহা না ভাবিয়া 'স্বরের অ, স্বরের আ' এইরূপে পড়িয়া থাকি, যেন দুইটি স্বতন্ত্র অক্ষর। ইহাতেই বুঝা যায়, আমাদের উচ্চারণে কিছু ভ্রম আছে। প্রকৃত পক্ষে, রাগযন্ত্রের আদিস্থান কণ্ঠ হইতে অনায়াসে উচ্চারিত "অ" এই একটি ধ্বনির একগুণ ও দ্বিগুণই এই অক্ষর দুটি। লিখিবার পূর্বে, শুধু

ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণ করিলে স্বরবর্ণগুলি এইরূপ হইবে :—

আ, আআ। ই, ইই। উ, উউ। র্, রর্। ল্, লল্। এএ, আই। ওও, আউ।

ব্যঞ্জন বর্ণ

আমাদের মুখে, মহাপ্রাণবর্ণগুলি মৃদু, কখন অতিমৃদু, অথবা বা অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। ণ, ষ, অন্তঃস্থ ব, এই তিন বর্ণের উচ্চারণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। দন্ত্য স, তালব্য শয়ের ন্যায় উচ্চারিত হয়, শুধু ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত হইলে, স্থল বিশেষে, দন্ত্য উচ্চারণ হইয়া থাকে। অন্তঃস্থ 'য' প্রায়শঃ বর্গীয় 'জ' রূপে উচ্চারিত হয়, কখন বা অকারের মত হইয়া পড়ে।

বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের পর, একটি হ যুক্ত করিলেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অনায়াসে পাওয়া যায়, যেমন আমরা ইংরেজীতে লিখিয়া থাকি। যথা :—ক্+হ=খ। ড্+হ=ঢ। ইত্যাদি।

'ণ' এর উচ্চারণ অনেকটা ড়ঁ এর ন্যায়। অন্তঃস্থ য=ইয়, ইংরেজি 'ওয়াই' এর ন্যায়। অন্তঃস্থ ব=উঅ, ইংরেজি 'ডব্লিউ'র ন্যায়। 'স'টি ঠিক ইংরেজি 'এস' এর ন্যায় সর্বত্র। য, তালুর উপরে, যেখানে জিব ঠেকাইয়া ট-বর্গ উচ্চারিত হয়, ঠিক সেখানে জিব ঠেকাইয়া 'শ' এর মত শব্দ করিলে মূর্দ্ধণ্য ষ হইবে।

আমরা অনেক বর্ণের উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়াছি ; তাই, 'ঈ' লিখিয়া দীর্ঘ উচ্চারণ না করিয়া, তার নাম দেই দীর্ঘ ই। অন্যদেশীয় লোকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেও আমাদের কানে বাজে। মাসিক পত্রিকায় পড়িলাম, জনৈক হিন্দীভাষী, রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায়, আমাদের মত "রবিন্দ্র" না বলিয়া "রবি-ইন্দ্র" বলায় হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আমরা লিখি 'ণ', কিন্তু দন্ত্য উচ্চারণ করিয়া তাহার নাম দিই মূর্দ্ধণ্য ন। যেমন, রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য বলিলাম, "ইনি অমুক দেশের রাজা", অর্থাৎ রাজা ছিলেন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আটপৌরে ভাষা ; আমরা স্বদেশীকে বুঝাইবার জন্য যা খুশি বলিতে পারি ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শুধু বাঙ্গালীর ভাষা নহে, তাহা সর্বজন-বোধগম্য করিবার জন্য, সাবধান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

(৫)

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে, জনৈক ব্রাহ্মণ, কাশীধামে দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। সম্ভবতঃ দেশের লোকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তিনি একদিন সর্বসমক্ষে সামবেদ আবৃত্তি করেন। আমরা তখন নিতান্ত শিশু, বড়দের বলাবলি করিতে শুনিয়াছিলাম, "লোকটি কুলীর মত উচ্চারণ করে।" গ্রামের বাঙালীরা তখন হিন্দুস্থানীদিগকে কুলীরূপেই জানিত। আমরা তো হিন্দুস্থানীকে বলি 'মেড়ো', বিহারীকে বলি 'ছাতুখোর', উড়িয়াদের বলি 'মেড়া', আসামীদের বলি 'ভূত'। কিন্তু এখন আর ইংরেজদের প্রচারিত ভেদনীতি নিয়া থাকিলে চলিবে না, নিখিল ভারতের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য সর্ববিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬)

আর একটি শ্লোক আমাদের যতদূর সাধ্য বিশুদ্ধ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি।

নাহিকাশ্চিৎ কৃষাড়ঁামাপি জাআতু তিষ্ঠাত্ইয়া কার্মাকৃৎ।
কাআর্ইয়াতে হিয়াবাশাঃ কার্মা
সার্বাঃ প্রকৃর্তিজৈগু্ড়ৈঁঃ॥ গীতা ৩।৫

হ্রস্বআকারটি আমাদের কানে বড়ই খারাপ শোনায়। কিন্তু উপায় নাই ; যে যাহা, তাহাকে তাহাই বলিতে হইবে। কিছুকাল অভ্যাস করিলে আবার তাহা ভালই লাগিবে এবং অকারটি উড়িয়াভাইদের মুখে উচ্চারিত আকারের ন্যায় বিশ্রী শুনাইবে।

সমগ্র ভারতে সংস্কৃতভাষা-চর্চ্চার জন্য বাঙালী

জাতির সুখ্যাতি আছে; আবার উচ্চারণদোষের জন্য কুখ্যাতিও আছে। শুনিয়াছিলাম, জার্মাণীর বিখ্যাত সংস্কৃতভাষাবিদ্ পণ্ডিত পল-ডয়সন যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন বাঙালী পণ্ডিতদের মুখে 'জইশ্‌শ-কইশ্‌শ' প্রভৃতি উচ্চারণ শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বাঙালী সুধীগণ সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন, শুনিতে পাই। কলিকাতায় কোনও কোনও সংস্কৃতের অধ্যাপক নাকি উচ্চারণ সংশোধনের চেষ্টাও করিতেছেন। এখন সমগ্র ভারতের সঙ্গে স্বর মিলাইবার সুযোগ উপস্থিত। আমাদের দীর্ঘকালের আত্মবিস্মৃতি, সজাতি-সগোত্র-স্বধর্মী-স্বজনদের সঙ্গে ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্য, সক্ষম বিজ্ঞজনগণ সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন, এখনও কি এইরূপ আশা করিতে পারি না?

এই তথ্যটি সম্বন্ধে এখন শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেরই বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য যে, সংস্কৃত ভাষাই ভারতীয় সংস্কৃতির কোষাগার-স্বরূপ, এই বিশাল ভারতবর্ষের ঐক্য রক্ষার নিমিত্ত এই ভাষার ব্যাপক অনুশীলন ও উচ্চারণ-বিশুদ্ধি একান্তই অপরিহার্য। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিচালকগণ, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক-গণ, ধর্মসম্প্রদায়সমূহের কর্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া উদ্যোগ করিলে, ইহা অনায়াসেই সাধিত হইবে।

পণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মন দিলি যবে তোর শ্যামলে দান,
তারে আমার বলিস্ কেন তবে?
তুমি যে-প্রাণে বিরাজো, প্রাণের প্রাণ,
আমি-আমি সে-পরাণে কেন রবে?

এত ভাবনা কান্না কেন বা হায়!
সব চায় যে সঁপিতে—শুধু সে পায়।
রীতি জানে না প্রেমের যে-অভাজন
বধুঁ বরিবে কেমনে বল্ ভবে?

সব বেচাকেনা ভয় দে রে বিদায়
তনু মন ধন ঢেলে দে রাঙা পায়।
হ'য়ে ভিখারিণী কেন পাতিস হাত?
ডালি উজাড়ি' নিঃস্ব হ'তে হবে।

বলে মীরা: "শোন্ কথা রে উদাসী!
তুই কাটিলি না আজো মায়াফাঁসি!
যদি শির অঞ্জলি দিতে না সাধ,
প্রেম-সাধনা সাধিয়া কী বা হবে?

বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, এম্-এ, কাব্যতীর্থ

ভারতীয় দর্শনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। আস্তিক শব্দের অর্থ যাহারা বেদ বা শ্রুতিসমূহকে বিশ্বাস করে, আর নাস্তিক শব্দের অর্থ তাহার বিপরীত অর্থাৎ যাহারা বেদ বিশ্বাস করে না। নাস্তিক দর্শন তিনখানি, যেমন—চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন আর আস্তিক দর্শন ছয়খানি, যেমন—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা

এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। আস্তিক দর্শনগুলির সকলের শেষে যেমন বেদান্তের নাম করা হয়ে থাকে তেমনই সকল দার্শনিক মতের পর্যবসান হয়েছে এই বেদান্তমতে। বেদান্তই সকল দার্শনিক মতের সমন্বয় সাধন করেছে। আর এই কারণেই ভারতীয় জীবনের ওপর, ভারতীয় ধর্মের বা হিন্দুধর্মের ওপর বেদান্তেরই প্রভাব সমধিক।

বেদান্ত শব্দের দ্বারা কি বুঝিয়ে থাকে তা প্রথমতঃ জানা দরকার। বেদান্ত শব্দের অর্থ বলতে গিয়ে সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর "বেদান্তসার" নামক গ্রন্থে বলেছেন—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।" এর অর্থ বুঝতে হলে উপনিষদ্ শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। উপনিষদ্ শব্দের ব্যুৎপত্তি—উপ-নি-সদ্+ক্বিপ্। 'উপ' এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য। প্রাণিমাত্রেরই তার নিজের আত্মার সহিতই সর্বাপেক্ষা সামীপ্য আছে। সুতরাং এই উপসর্গটির দ্বারা প্রত্যগাত্মকেই বোঝান হয়েছে। তারপর 'নি' এই উপসর্গটির নিশ্চয় অর্থ। আর সদ্ ধাতুর অর্থ অবসাদন বা নাশ। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। সুতরাং উপনিষদ্ শব্দের ফলিত অর্থ দাঁড়ায়—যা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিশ্চিতরূপে নাশ করে। ব্রহ্মবিদ্যাই এ কার্যে সমর্থ ব'লে উপনিষদ্ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাই বুঝিয়ে থাকে। ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য, অর্থাৎ একমাত্র শ্রুতির সাহায্যেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে থাকে। উপনিষৎসমূহই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণস্বরূপ। এই উপনিষৎরূপ প্রমাণই বেদান্ত। সঙ্গে সঙ্গে বাদরায়ণ-প্রণীত সূত্রসমূহও ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সহায়তা করে থাকে বলে তাকেও বেদান্ত বলা হয়। এইরূপ ভাষ্য, বার্তিক, টীকা প্রভৃতি গ্রন্থকেও বেদান্ত বলা হয়ে থাকে।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বহু প্রকারভেদ থাকলেও প্রধানতঃ বেদান্ত বলতে অদ্বৈতবেদান্তকেই বুঝিয়ে থাকে এবং এই প্রবন্ধে আমিও হিন্দুধর্মের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তের কি সম্বন্ধ তা' দেখাতে চেষ্টা করব।

সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের মূল কথা একটি প্রাচীন শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ আছে।

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রন্থের মধ্যে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমি তাকেই শ্লোকার্ধের দ্বারা বলব। তা' এই—ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা আর জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু হলেও মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হয় এবং তাকেও সৎ বলেই বোধ হয়। এই প্রপঞ্চের মধ্যে যে সত্তা দেখা যায় তা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সত্তা, স্ফুরণ ও আনন্দ এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ ও নাম-রূপ জগতের বা মায়ার রূপ। অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥ আমরা যে-কোন বস্তুকে যখন জানি তখন তাকে সৎ (existent) বলেই জানি। জ্ঞান পরোক্ষ হোক্ অথবা অপরোক্ষ হোক্ তার বিষয়কে আমরা সৎ বলেই জানি। এই সত্তা সকল বস্তুর মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। সুতরাং সদ্রূপ ব্রহ্মও সর্বত্রই বিরাজমান। ব্রহ্মের সর্বত্র সত্তা প্রমাণ করার জন্য বেদান্তিগণ বহু যুক্তির অবতারণা করেছেন, কিন্তু সে সকল এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আরও, বেদান্তের মতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হলেও অবিদ্যাবশতঃ তার মধ্যে "অহং, মম" বা "আমি, আমার" এই রকম অভিমান হয়।

যাই হোক্, সর্বত্র ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি করার কথাই বেদান্তের অসাধারণত্ব। আমিই পরব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান বলে আমিই সর্বত্র বিরাজমান ঐরকম চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আসবে। তার ফলে আর কারও প্রতি ঘৃণাও আসবে না। ঈশোপনিষদে এই কথাই রয়েছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

এই মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন—"সর্বা হি ঘৃণা আত্মনোঽন্যৎ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি।" তার অর্থ—নিজ হতে ভিন্ন অপর বস্তুতে কোন দোষ দেখলেই ঘৃণা জন্মায়। কিন্তু যে সর্বত্রই আত্মদর্শন করবে, তার আর কি করে ঘৃণা জন্মাতে পারে? এই বেদান্তের উচ্চ আদর্শের উপর ভিত্তি করেই শ্লোক রচিত হয়েছে—

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

আরও, হিন্দুরা তাদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে এই বেদান্তের আদর্শকে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে আসছে এর যথার্থতা। কেবলমাত্র একটা উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেই হিন্দু বিরত হয়নি, সেই অদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করেছে। তাই দেখা যায় যে, তর্পণের সময়ে হিন্দু আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্তের তৃপ্তি কামনা করে, পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ, সপ্তদ্বীপনিবাসী প্রাণিবর্গের তৃপ্তি-কামনায় হিন্দু তর্পণের সময় তিলজল প্রদান করে। তাই তর্পণ-মন্ত্র হচ্ছে—

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

নারায়ণের নমস্কার করার সময় হিন্দু জগতেরই হিতকামনা করে, তার নিজের বা নিজ পরিবার বা দেশের লোকের হিতকামনাই তার একমাত্র কাম্য নয়। তাই সে বলে থাকে—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শুধু তাই নয়, অতীত ও ভবিষ্যৎ সর্বত্রই সেই পরমপুরুষ বিরাজমান। তাঁকে ছেড়ে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—কারও অস্তিত্বই থাকতে পারে না। তাই পুরুষসূক্তে (ঋক্ সং ৮।৪।১৭, শুক্লযজুঃ সং ৩১ অধ্যায়) আছে—"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্" ইত্যাদি।

এই বেদান্তের উচ্চ আদর্শ হিন্দুর জীবনকে এতই প্রভাবান্বিত করেছে যে, হিন্দু সকলেরই সুখ কামনা করে, সকলেরই মঙ্গল কামনা করে, সকলের আরোগ্য কামনা করে এবং কেউ যাতে দুঃখ না পায় সেরূপ কামনা করে। কেবল নিজের হিতকামনা করলে যে সে হিত স্থায়ী হতে পারে না—এ'কথা রূঢ় সত্য হলেও আমাদের মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে আমরা সহজে বুঝতে পারি না, বারবার বাধা পেয়ে এই দৃষ্টি খোলে। তাই অন্য ধর্মাবলম্বীরা যখন কেবল স্বধর্মাবলম্বীর কল্যাণ কামনা করেই তৃপ্ত হয় হিন্দুর কাম্য, সেখানে—

সর্বেঽপি সুখিনঃ সন্তু
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

এইভাবে উদাহরণ দিতে হলে তা শেষ হওয়াই কঠিন। সুতরাং আর বেশী উদাহরণ বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপন্যাসে আগ্রহশীল না হয়ে বেদান্তের উচ্চ চিন্তার ফলে আমাদের নিজের দেশ ও সমাজ ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে কিনা এ'কথা একবার চিন্তা করে দেখব।

অনেকের মতে, বেদান্তের চিন্তা উচ্চ ও চরম উৎকর্ষশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক্ থেকে চিন্তা করলে এই আদর্শ উপকারক তো নয়ই প্রত্যুত ক্ষতিকর। এই মতের স্বপক্ষে তাঁরা বলে থাকেন যে, অদ্বৈত বেদান্তের একজন প্রধান আচার্য শঙ্করাচার্য যখন অদ্বৈতবাদ ভারতের সর্বত্র প্রচার করলেন ঠিক তার পরেই হল ভারতবর্ষ পরাধীন। এই পরাধীনতার জন্য দায়ী শঙ্করের জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ। সুতরাং আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে এই অদ্বৈতবাদের যথেষ্ট

মূল্য থাকলেও ঐহিক জগতে তা' নিতান্তই অকেজো।

এই রকম অভিযোগ দিয়ে থাকলেও এই অভিযোগ যে নিতান্তই নিঃসার তা' একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। প্রথমতঃ, অদ্বৈতবেদান্ত হিন্দুধর্মের বিভিন্নমতের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে হিন্দুধর্মকে আত্মকলহ থেকে রক্ষা করেছে। দ্বিতীয়তঃ, পরমতসহিষ্ণুতার কথা প্রচার ক'রে পরধর্মাবলম্বীর সঙ্গে হিন্দুকে অকারণ যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হতে দেয়নি। তৃতীয়তঃ, প্রাতিভাসিক রজ্জুসর্পের ও পারমার্থিক ব্রহ্মের মধ্যবর্তী ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার ক'রে ঐহিক উন্নতির যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে তা' স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

প্রথমতঃ, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে এই অদ্বৈতবাদ। যে সম্প্রদায় যে পথে যাকেই উপাসনা করুক না কেন সেই উপাসনা শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মতেই পর্যবসিত হবে। কারণ ব্রহ্ম সর্বত্রই বিদ্যমান, কেবল তাঁর বিবিধ অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। এই কথা পুষ্পদন্ত মহিম্নঃ স্তোত্রে বলেছেন—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

তিনবেদ (অথর্ববেদ অন্য তিনটি বেদের মন্ত্রসংকলন ভিন্ন আর কিছুই নয়, সুতরাং তাকে গণনা করা হয়নি), সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের লোকেরা কোন একটিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে এবং কোন একটিকে হিতকর মনে করে। রুচির বিচিত্রতাবশতঃ লোকে বিভিন্ন ঋজু, কুটিল পথ অবলম্বন করলেও সকল নদীর যেমন লক্ষ্যস্থল সমুদ্র তেমনই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই একমাত্র লক্ষ্যস্থল তুমিই অর্থাৎ পরমেশ্বর।

দ্বিতীয়তঃ, পরমতসহিষ্ণুতা হিন্দুসংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। অপর ধর্মাবলম্বীর ওপর অত্যাচার করা হিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ। অপরের রাজ্যজয়ও হিন্দু কখনও করেনি। ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দু আদর্শ বহু ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলেও হিন্দু তাদের ওপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করতে উদ্‌গ্রীব হয়নি। ভারতবর্ষেই মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতিরা হিন্দুর মন্দির ইত্যাদি ধ্বংস করলেও হিন্দু কখনও অপর ধর্মাবলম্বীর উপাসনাস্থলে আঘাত করেনি, উপরন্তু তাদের উপাসনায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে, সেই রকমই আচরণ করে এসেছে, রাজকোষের অর্থ দিয়ে মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণও করে দিয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করা বেদান্তের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পারমার্থিক তত্ত্বলাভের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাবহারিক জগতে উন্নতিলাভের যে যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে এ' কথা বেদান্তী একদিনের জন্যও ভোলেনি, উপরন্তু ব্যাবহারিক জগতে তাকে যে বাঁচার মত বাঁচতে হবে সেই কথাই সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ব্যাবহারিক জগতে উন্নতিলাভ করার বিশেষ আবশ্যকতা আচার্য শঙ্কর তাঁর নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আচার্য শঙ্কর মাত্র ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং তাঁর এই স্বল্পকাল স্থায়ী জীবন কর্মমুখর ছিল। ৮ বৎসর বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই মাত্র ৪ বৎসর ছিল তাঁর অধ্যয়ন-কাল। তারপর ৪ বছর তিনি অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনায় ব্যতীত করেন। আর তাঁর অবশিষ্ট জীবন অর্থাৎ সমগ্র জীবনের অর্ধেক সময় তিনি যাপন করেন সংগঠনের সুমহৎ কাজে। তিনি যে প্রতিকূলতার ও আদর্শবাদের সংঘর্ষের মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন তা' আলোচনা করলে বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। কর্মবাদ-প্রচারের দিক্ দিয়ে যাঁরা দিক্‌পাল তাঁদেরকে বাদযুদ্ধে

পরাজিত করলেন। বিভিন্ন স্থানে শৈব, কাপালিক, শাক্ত, ভৈরব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল দুর্নীতি ও অসদাচার জন্মেছিল তিনি তাঁর অপনয়ন ক'রে অগ্রসর হতে থাকলেন দিগ্বিজয়ে। মনে রাখতে হবে যে, তখন তিনি যানবাহনের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করেননি এবং পদব্রজেই আসিন্ধুহিমাচল সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। শুধু পরিভ্রমণই নয়। এক একটি স্থানে তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন ক'রে গেছেন। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে যে চারটি মঠ আজ আমরা দেখে থাকি তা' এই অদ্বৈতাচার্যেরই অক্ষয় কীর্তি উদ্‌ঘোষিত করছে। উত্তরে বদরিধামে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ। শঙ্করাচার্য সকলের জন্যই নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেননি। মানসিক অবস্থা ও যোগ্যতার কথা বিবেচনা ক'রে তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব করেই তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোত্রাদি রচনা করেছেন যা আজ পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

অদ্বৈতবাদের সঙ্গে যে কর্মময় জগতের কোন বিরোধ নেই, উপরন্তু কর্মময় জগতে কর্মের মধ্য দিয়েই পরমার্থ লাভ করা যায় তা' প্রত্যেক অদ্বৈতাচার্যের জীবনের মধ্য দিয়েই প্রতিপাদিত। ব্যবহারিক উন্নতির কথা তাঁরা কোনদিনই বিস্মৃত হননি। স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্রের উন্নতি তাঁদের চিরদিনই কাম্য ছিল। তাই সুরেশ্বরাচার্য (শঙ্করের সাক্ষাৎশিষ্য, শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ, বৃহদারণ্যক-ভাষ্যবার্তিকরচয়িতা) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ব্যবহারাধ্যায়ের ওপর বালক্রীড়া নামক টীকা লিখেছিলেন। ঐ অধ্যায়ে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থাই আলোচিত হয়েছে।

তারপর "পঞ্চদশী" নামক অদ্বৈতবাদের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্যারণ্য মুনির কথা উল্লেখ করছি। বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ ছিলেন। অথচ বিদ্যারণ্যই গৃহস্থাশ্রমে মাধবাচার্য নামে বিজয়নগর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন অতি কঠোর হস্তেই করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে সৈন্য পরিচালনাও করতে হয়েছিল। কোঙ্কন দেশের রাজধানী গোয়া (গোবা) যখন তুরুস্কের অধীনে ছিল তখন মাধবাচার্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে সমগ্র গোয়া ঘিরে ফেলেছিলেন। যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন এবং সেই স্থানের লোকেদের আবার সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সপ্তনাথ প্রভৃতি দেবতাগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর তিনি সেই স্থানটি ব্রাহ্মণদিগকে দান করে দিয়েছিলেন। সেই দানপত্রের কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি –

অশান্তবিশ্রান্তযশাঃ স মন্ত্রী দিশো বিজেতুং
মহতা বলেন।
গোবাভিধাং কোঙ্কনরাজধানীমন্যেন মন্যেহরুণ-
দর্ণবেন ॥
প্রতিষ্ঠিতাংস্তত্রতুরুষ্কসংঘানুৎসাদ্য দোষ্ণা
ভুবনৈকবীরঃ।
উন্মূলিতানামকরোৎ প্রতিষ্ঠাং শ্রীসপ্তনাথাদি-
সুধাভুজাং যঃ ॥

আরও এই মাধবাচার্য পরাশর সংহিতার টীকাও লিখেছিলেন এবং কালনিরূপণের জন্য কালমাধব নামে গ্রন্থও লিখেছিলেন। পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির সুপ্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরা প্রণয়ন করেন; ইহাতে ব্যবহারশাস্ত্রের বহুবিষয় নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে।

ইতিহাসে আলোচনা করলে আরও শতসহস্র উদাহরণ পাওয়া যায় যে, যাঁরা ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাঁরাই আবার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আবার তাঁদের অনেকে রাজনীতি শাস্ত্রেও অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বকালে

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতে তিনি বেশ পারঙ্গতই ছিলেন। এই বিদুরের নীতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। আবার এই বিদুরই ছিলেন ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন বিদুরের উপদেশে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'বিদুর, তুমি আমাকে পরা বিদ্যার উপদেশ কর'। তখন বিদুর বলেছিলেন যে, ভগবান্ সনৎকুমার সেই অধ্যাত্মবিদ্যার কথা বলবেন। তাতে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—'তুমি কি তোমার অজ্ঞতার জন্যই বলছ না?' বিদুর বলেছিলেন—'আমি শূদ্রার গর্ভে জাত সুতরাং সেই অধ্যাত্মবিদ্যা বলতে সাহস করি না। কিন্তু সনৎকুমার যা বলবেন তা' সবই আমার জানা আছে।'

শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে।
কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতীমহম্॥

(মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব, ৪১।৫)

তারপর এই সনৎকুমারের কথাও বলা দরকার। তিনি ব্রহ্মবিদ্যার আকর। ইনিই নারদকে উপদেশ করেন। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ)। এই সনৎকুমারই আবার স্কন্দ নামে অভিহিত। ছান্দোগ্য উপনিষদেই আছে—"তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।" (ছা. উ, ৭।২৬।২)। ইনি একদিকে যেমন ব্রহ্মবিৎ অপরদিকে ঠিক তেমনই যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী। ইনিই আবার দেবসেনাপতি। ইনি ধনুর্বেদ সম্পূর্ণরূপে জানতেন এবং সকল শস্ত্র ও শাস্ত্র তাঁর অধিগত ছিল। এই কথাই মহাভারতে আছে—

ধনুর্বেদশ্চতুষ্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ।
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্বাণী চ কেবলা॥

(শল্যপর্ব, ৪৪।২২)

আবার ব্রহ্মবিৎ নারদও রাজনীতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত শাস্ত্রের নাম পৈশুনতন্ত্র। কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে আমাত্যোৎপত্তি প্রকরণে পিশুনের মতের উল্লেখ করেছেন (ত্রিবান্দ্রম সং ৪২ পৃঃ)।

পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে যখন বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন তখন মোক্ষধর্ম তার মধ্যে একটি বিষয় ছিল। এই ভীষ্মই যে আবার বীরাগ্রগণ্য তা' নতুন করে বলার কোন প্রয়োজনই নেই। আবার এই ভীষ্মই ছিলেন অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর অপর নাম ছিল কৌণপদন্ত। আর এই নামেই কৌটিল্য ভীষ্মের মত উদ্ধৃত করেছেন তাঁর অর্থশাস্ত্রে। (অমাত্যোৎপত্তি প্রকরণ, ৪২ পৃঃ)।

শুক্রাচার্য অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ হলেও নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তা' ঔশনস স্মৃতি বলে পরিচিত।

ভরদ্বাজের শিষ্য কণিক অধ্যাত্মশাস্ত্রবেত্তা হলেও তিনি ছিলেন একজন চরম কূটনীতিক। তাঁর রচিত কণিকনীতির কথা মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে।

দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র ভরদ্বাজও ছিলেন একজন ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্। আর তিনি যে অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তা' বলাই বাহুল্য।

ব্রহ্মবিৎ অগস্ত্য ঋষি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন এবং তিনিই রামচন্দ্রকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করেন।

বশিষ্ঠও যুদ্ধবিদ্যায় সুকৌশলী ছিলেন তা' বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয়েছিল তার থেকেই জানতে পারা যায়। বিশ্বামিত্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—

ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রং মে নিষূদিতম্॥

ব্রহ্মবিৎ ঋষি নরনারায়ণও যে যুদ্ধবিদ্যায় নিষ্ণাত ছিলেন তা' জানতে পারা যায় দম্ভোদ্ভব রাজার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী থেকে। নরনারায়ণ প্রথমে আশ্রমে যুদ্ধ করতে রাজী হননি, কিন্তু দম্ভোদ্ভব অতিশয় দাম্ভিকতার সঙ্গে যখন এগিয়ে এল, তখন তিনি কয়েকটি কুশ (ইষিকা) রাজা ও তার সৈন্যদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাতেই তারা বিশেষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল কারণ কাঁটাগুলো একেবারে চোখেমুখে গিয়ে বিঁধেছিল।

বৃহস্পতির ভাই সংবর্তও যে ব্রহ্মবিৎ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধকৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা' মরুত্ত রাজার যজ্ঞের কাহিনী থেকেই জানা যায়।

এইভাবে আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অদ্বৈতবাদ কখনও ব্যাবহারিক জগতের বিরোধী নয় এবং অদ্বৈতবাদের প্রভাবে মানুষ কখনও ক্লীবতা প্রাপ্ত হয় না; উপরন্তু দেশের ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার ও নিজের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সকলের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করতে পারলে যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয় তার ফলে অন্যায় অবিচার ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচার তখন অসহ্য হয়ে ওঠে। মন তখন কারুণ্যপূর্ণ হয়। তখন আমিই জগৎ, জগৎই আমি এ রকম জ্ঞান হয় ব'লে এবং অন্যের সঙ্গে আমার কোন ভেদ নেই এরকম বুদ্ধি আসে ব'লে সকলেরই মঙ্গল, সুখ ও আনন্দই কাম্য হয়।

এখন দুটি বিষয়ে স্বভাবতঃই শঙ্কা আসতে পারে। প্রথমতঃ, অদ্বৈতবাদের এই উচ্চ আদর্শই যদি ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম মেনে নিয়ে থাকবে তা'হলে হিন্দুদের মধ্যেই যে অস্পৃশ্যতা ও পরস্পর বিবাদ দেখা গিয়েছে তার কারণ কি? এবং এই অস্পৃশ্যতা ও পরস্পর বিবাদই প্রমাণ করবে যে, হিন্দু এই উচ্চ আদর্শে নিজের জীবন যাপিত করেনি। দ্বিতীয় শঙ্কা—ব্যাবহারিক জগৎকে যখন অদ্বৈতবাদী মিথ্যা বলেছেন তখন মিথ্যা জগতে সৎকর্ম করেই বা লাভ কি, আর মিথ্যার কবলে না পড়ে সোজাসুজি এই জগতের সঙ্গে যতটা পারা যায় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রথমটির উত্তর এই যে, ভারতীয় জীবন ও হিন্দুধর্মের উৎপত্তি যে কবে হয়েছিল তা' কেউ বলে দিতে পারে না। এই সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে স্খলন খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং এই যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গিয়েছে তাকেই সুস্থ অবস্থা বলে মেনে না নিয়ে অসুস্থ অবস্থা বলেই ধরে নেওয়া উচিত। আর এই অস্পৃশ্যতাই বা কতদিনের? যত অধঃপতন তার বেশীর ভাগই দেখা গিয়েছে পরাধীন ভারতে। ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন তার মধ্যে এই ক্ষতিকর মনোভাব জন্মায় নি। যে দেশ পরাধীন হয়, তার সদ্‌বৃত্তিগুলোকেও সেই দেশ খুব তাড়াতাড়ি হারাতে থাকে। আর আমাদের ভারতবর্ষের বেলায়ও এর অন্যথা হয়নি। বর্তমানে অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি অনেক কমে গেলেও তার ভয়াবহতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং এর পূর্বে যে এই অস্পৃশ্যতা ও পরস্পর সৌহার্দের অভাব আরও বেশী পরিমাণে ছিল তাও কেউ স্বীকার না করে পারবে না। শূদ্রের প্রতি দুর্ব্যবহার করাটা যেন ভারতের সংস্কৃতির একটা অনপনেয় কলঙ্কস্বরূপ বলে অনেকে মনে করেন এবং তার উদাহরণ ও প্রমাণ দিয়ে থাকেন পুরুষসূক্তের মন্ত্রাংশকে—"পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।" কিন্তু এ যুক্তি কত নিঃসার তা একটু সমীক্ষা করলেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। একই বিরাট পুরুষের অঙ্গস্বরূপ বলে কল্পনা করা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে, তবে প্রশ্ন যে, শূদ্র পা থেকে জন্মেছে, এ' কথা বলাতেই তো তাদের প্রতি ঘৃণার পরিচয় পাওয়া যায়। তার উত্তর—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে এক এক বর্ণের উৎপত্তি দেখাতে গেলে কাউকে তো পায়ের থেকে উৎপন্ন বলতেই হবে। তারপর পায়ের থেকে উৎপন্ন বলেই কি দোষের হবে? ভূমিও তো বিরাট পুরুষের পায়ের থেকে জন্মেছিলেন, তাতে কি ধরিত্রীর প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা সূচিত হয়? "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের পরেই তো রয়েছে—

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥

হিন্দু তো চিরকাল ধরিত্রীকে পূজাই করে এসেছে। তারপর শূদ্রের প্রতি ঘৃণা বা অন্ত্যজ ও সংকর জাতির প্রতি ঘৃণাটাও হচ্ছে অত্যন্ত পরবর্তী কালের ব্যাপার। রামায়ণ মহাভারত আলোচনা করলে দেখা যায়—সমাজে এঁদের প্রতিও যথেষ্ট সম্মান ও উচ্চপদ দেওয়া হয়েছে। শূদ্রাগর্ভজাত পারসব বিদুর তো ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী এবং কুরু ও পাণ্ডবদের সকলে ও এমনকি কৃষ্ণও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এ উদাহরণ মহাভারতে স্পষ্ট-ভাবে পাওয়া যায়।

তারপর মেধাতিথি প্রভৃতি প্রাচীন স্মার্ত পণ্ডিতরাও এঁদের সমাজে উপযুক্ত স্থানই দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরাধীন ভারতের স্মার্ত পণ্ডিতেরা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণমনা হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছালেন যে কেউ বললেন—এরা বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্থান পাবে না, এরা মানুষ জাতি ইত্যাদি। "সংকর" বলতে অবশ্য আমি এখানে প্রতিলোমসংকর বোঝাতে চেয়েছি। অনুলোমসংকর যে বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্থান পাবে এ বিষয়ে কোন স্মার্ত পণ্ডিতেরই দ্বিমত নেই।

শূদ্রের বেদে অধিকার নেই বলে শূদ্রকে অত্যন্ত ঘৃণা করা হোত যেমন নিগ্রো বা রেডইণ্ডিয়ানদের করা হয়ে থাকে এই রকমই বর্তমান সময়ে অনেকের ধারণা। কিন্তু যাঁরা হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় রাখেন তাঁরা এ' কথা বলবেন না।

চার বর্ণের এক একটি বিশিষ্ট কাজ থাকলেও এক বর্ণের হিন্দু অন্য বর্ণের কাজ করতে পারবে, কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাজ করতে পারে না, আর শূদ্র ব্রাহ্মণের কাজ করতে পারে না। এই কথাই নারদ ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

উৎকৃষ্টং বাপকৃষ্টং বা তয়োঃ কর্ম ন বিদ্যতে।
মধ্যমে কর্মণী হিত্বা সর্বসাধারণে হি তে॥
(নারদধর্মশাস্ত্র, ঋণাদান প্রথম বিবাদপদের ৫৪ শ্লোক)

শূদ্র ক্ষত্রিয়ের কাজও করতে পারত অর্থাৎ রাজাও হতে পারত। শূদ্র ব্যবসায়ীও হতে পারে। রাজা হওয়া ও ব্যবসায়ী হওয়ার গৌরবকে নিশ্চয়ই বর্তমান সময়ে অন্ততঃ কেউ ছোট কাজ বলবেন না। নিষাদ বা পারসব গুহকও তো রাজা হয়েছিলেন। সে কথা তো রামায়ণেই আছে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতি এই নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তা পড়লে সত্যিই নিতান্ত বিস্মিত হতে হয়। তারপর, শূদ্রের স্বাভাবিক কাজ ছিল শিল্প। আজ তো আমরা শিল্পকেই শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করি, আর তার জন্য বহু দেশে ও বিদেশেও গমন করে থাকি। শিল্পকর্মকে কোন-রূপে হীন কর্ম বলা যেতে পারে না। আরও ব্রাহ্মণেরা যদি শূদ্রকে ঘৃণাই করবেন তবে তাদের কন্যাকে বিবাহ করতেন কি? বিবাহ করলে স্ত্রীর পিতা পূজ্য হন। সে অনুসারে শূদ্রা কন্যার পিতা ব্রাহ্মণেরও পূজ্য হতেন। আরও, মহাভারতে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক যে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম করবেন তার ফলভাগী শূদ্রও হবে, কারণ শূদ্র শিল্পকর্ম না করলে ত্রৈবর্ণিকের যজ্ঞই সম্পন্ন হবে না। আরও কথা, শূদ্রের যে যজ্ঞে মোটেই অধিকার ছিল না এমন কথাও বলা যায় না। বেদেও নিষাদের রৌদ্রী ইষ্টিতে অধিকার আছে এরকম বলা হয়েছে। "এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ"। "এতয়া" কথার অর্থ—"রৌদ্র্যা ইষ্ট্যা"। আরও বলা যেতে পারে যে, শূদ্রের ভগবানের শ্রীচরণ থেকে জন্ম হয়েছিল বলে শূদ্রই পরম ভাগ্যবান্। হিন্দুর কাছে ভগবানের শ্রীচরণই পূজ্য, শ্রীমস্তক নয়। হিন্দু আজও বিনীত প্রার্থনা জানায় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে, শ্রীমস্তকে নয়; আশীর্বাদও কামনা করে শ্রীচরণের। পূতসলিলা সুরধুনীরও উৎপত্তি হয়েছিল শ্রীভগবানের চরণকমল থেকে।

শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল পায়ের থেকে সুতরাং শূদ্র হিন্দুর চক্ষে ঘৃণিত ও অবহেলিত এ'রকম চিন্তা

এসেছে পাশ্চাত্ত্য কুশিক্ষা ও অপপ্রচারের ফলে। দুঃখের বিষয়, আজ ভারতীয়েরাও এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতকে বিনা বিচারে, নিজের ঐতিহ্যের দিকে একবার দৃক্‌পাত না ক'রে, নির্লজ্জের মত জেনে নিতে চলেছে। এই অপপ্রচার ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে আজ ভারতীয় শিক্ষিত সমাজকে দাঁড়িয়ে বলতে হবে—আমাদের ঐতিহ্য আছে, তার অনুশীলন করে আমরা দেখেছি, দেখছি এবং দেখব। আর তারপর সমগ্র পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করতে হবে হিন্দুর চিন্তার উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব।

দ্বিতীয় শঙ্কাটি হচ্ছে মিথ্যা জগতে সৎকর্ম করে লাভ কি ? সকলই তো মিথ্যা। মিথ্যা কর্ম ক'রে কি পরমার্থ সত্যে পৌঁছান যায় ? তার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদী কখনও জগৎকে তুচ্ছ শশ-বিষাণের মত বলে মনে করেননি। জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা আছে। যতদিন ব্যবহার আছে ততদিন এই ব্যাবহারিক জগৎ সত্যই বটে। এখানে বলা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদী ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করেছেন—প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক। প্রতিভাস বা প্রত্যক্ষের কাল পর্যন্তই যার স্থায়িত্ব, প্রতিভাসের পরে আর যার কোন অস্তিত্ব নেই তাকেই বলে প্রাতিভাসিক সৎ যেমন রজ্জুতে সর্প। আর পরব্রহ্মের উপলব্ধির পূর্ব পর্যন্ত যার স্থায়িত্ব আছে তাকে বলে ব্যাবহারিক সৎ, যেমন, ঘটপটাদি বস্তু। আর যার কোন বিনাশ নেই, কোন অবস্থায় কোন কালেই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে না অর্থাৎ সর্বথা অবাধ্যই পারমার্থিক সৎ, যেমন ব্রহ্ম। সুতরাং যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। অতএব ব্যবহারের উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত সৎকর্মেরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে।

সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি আসবে তার দ্বারাই তো পুরুষ ব্রহ্মতত্ত্ব শিখবার অধিকারী হবে। মলিন চিত্তে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করা যায় না, তার জন্য চাই নিষ্কলুষ চিত্ত। আর তা' কর্মের দ্বারাই সম্ভবপর। অবশ্য কর্ম যে করতেই হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অনেকে কর্ম না করেও পূর্বজন্মার্জিত সৎকর্মবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণতঃ, সৎকর্মের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি করার উপায় সর্বত্র সুপরিচিত।

তারপর যা কিছু মিথ্যা হবে, তাই পরিত্যাগ করতে হবে—ঐ কথা বলার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। মিথ্যা অনেক সময়ে সত্যেও পৌঁছে দিতে পারে। তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা সকলেই তো ছোট অবস্থা থেকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা কেমন ক'রে লেখে শিখে আসছি। '১' লেখার পর আমরা বলে থাকি এইটা এক। কিন্তু একটু চিন্তার কথা যে, যেটিকে আমরা 'এক' বলছি সেইটিই কি বস্তুতঃ এক সংখ্যা ? তা' তো নয়, কারণ বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক সংখ্যাকেই বিভিন্ন প্রকারে লেখা হয়ে থাকে। তার সবগুলিই সত্যি হতে পারে না। যাকে আমরা 'এক' সংখ্যা বলে থাকি, তা' মিথ্যা। কিন্তু সেই মিথ্যা 'একে'র সাহায্যে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ও বড় বড় অঙ্ক তো করে যাচ্ছি। ব্যাবহারিক জীবনে তো তার দ্বারাই বহু উপকৃত হচ্ছি। সেই মিথ্যা সংখ্যার থেকে আমরা ইচ্ছা করলে এখন গণিতের সাহায্যে বহু অসাধ্য সাধন করতে পারি। এখানে বসে বোমা ছুড়লে তিন মাইল দূরে লক্ষ্যকে ধূলিসাৎ করতে পারি। সুতরাং মিথ্যা হওয়াটাই খুব দোষের নয়। মিথ্যার দ্বারা যে সত্য লাভ হয় না এ'কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না। আর এই কথাই ভর্তৃহরি বলেছেন—

উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥

বালকদের শিক্ষার জন্য অনেক উপায়ের উদ্ভাবন করা হয়। বালক সেই মিথ্যা পথে থেকে পরে

তার মাধ্যমেই সত্য লাভ করতে পারে। সুতরাং মিথ্যার দ্বারা যে কোন কাজই হবে না একথা বলা অত্যন্ত ভুল।

এইভাবে শঙ্কা আরও বহু আসতে পারে এবং তার সমাধানও অদ্বৈতবাদীরা দিয়ে এসেছেন। এই প্রবন্ধের আকার অনেক বড় হয়ে পড়ে বলে সে সকল আলোচনা আর করা গেল না। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও যে সকল যুক্তি ও উদাহরণের উপন্যাস করা হয়েছে তার দ্বারা এটুকু অবশ্যই স্পষ্ট হবে যে, হিন্দুর জীবনযাত্রা ও ধর্ম্ম্য আচরণের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্তের প্রভাব অপরিসীম; আর এই অদ্বৈতবেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই হিন্দুধর্ম এত মহিমামণ্ডিত হতে পেরেছে, পৃথিবীর কাছে শ্রেষ্ঠ উচ্চতম আসন পেয়েছে। আর আজ পর্যন্ত যাঁদের প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম এত গৌরবান্বিত আসন লাভ করেছে তাঁরাও কিন্তু এই অদ্বৈত-মতাবলম্বী। প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতমতের মধ্যে ভারতীয় জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। অদ্বৈতমতকে বাদ দিলে ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিন্দুধর্মের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

কবীর বাণী

("সাঈ কে সঙ্গত সাসুর আঈ"—বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

স্বামীর সহিত শ্বশুর-আলয়ে
এসেছিনু আমি সুখে,
তাঁহার সঙ্গ না পাইনু হায়
বুক না রাখিনু বুকে।
যৌবন যায় স্বপনের মতো—
কথা না ফুটিল মুখে॥

সখী-সহচরী মঙ্গল-গীতি
গেয়েছিল সাথে সাথে,
দুঃখসুখের কত হরিদ্রা
ঢালিল আমার মাথে।
বিবাহ-অন্তে পতিরে ছাড়িয়া
ফিরিতে হইল একা।
পরিজন পথে দেন সান্ত্বনা
কতই করুণামাখা।

কহিছে কবীর, পৌছিব আজ
স্বামীর ভবন-দ্বারে,
তুরী বাজাইয়া তাঁহারে লইয়া
উতরিব পরপারে!

দুর্জয়

শ্রীগণেশ লাল ওয়ানী

নহি ভীরু, নাহি করি শোক ;
দুর্দিনে বহিব তব শঙ্খ ;
চক্ষে মম স্বর্গের আলোক,
বক্ষে দুঃসাহস,
আমি নির্ভয়, নিঃশঙ্ক।

যত মিথ্যা, যত অপূর্ণ
প্রচণ্ডতম দম্ভ,
যত বাধা, যত বন্ধ করি চূর্ণ ;
ধূলিতলে
ধূলি করি অবলম্ব।

আমি নিঃশ্রেয়স্‌ নিঃসংশয়,
কঠিন আঘাতে নির্ভিন্ন ;
আমি দুরন্ত দুর্জয়
বহ্নিসমান
প্রোজ্জ্বল, অক্লিন্ন।

দুর্গমপথযাত্রী
মরুপর্বত আমি লঙ্ঘি ;
প্রলয়ঙ্কর হোক্‌ রাত্রি
পদতলে দলি মৃত্যু
আমি অপরিচিতের চিরসঙ্গী।

ভগীরথ ও ভাগীরথী

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

পতিতপাবনী গঙ্গা ভাগীরথী। ভাগীরথীর উৎপত্তিসম্বন্ধে নানা ভৌগোলিক তথ্য বা বৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল্য কম নয়, তবু ধর্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারীর প্রাণ তাতে যেন তৃপ্তিলাভ করে না। একটি পুণ্যনাম গঙ্গাস্নানের সঙ্গেসঙ্গেই মনে পড়ে যায়। পরমতাপস ভগীরথ। তাঁর গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত হিন্দুচিত্তে একটি চিরনূতন কাহিনী।

কে ছিলেন এই মহাপ্রাণ ভগীরথ, কেন তিনি গঙ্গা-আনয়নে ব্রতী হয়েছিলেন, কিরূপ তাঁর তপস্যা? ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের কিঞ্চিৎ পরিচিতির থেকে প্রশ্নগুলির উত্তর আরম্ভ করতে হবে।

সূর্যবংশতিলক প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজ সগরের পরম গুণবতী দুই রাজ্ঞী—প্রথমা কশ্যপমুনি-দুহিতা সুমতি, দ্বিতীয়া বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনী। সন্তানলাভের আশায় তাঁরা সমাধিস্থ গুরু ঔর্ব ঋষির আরাধনা করলেন। ঋষিপ্রবর মহীয়সী মহিলাদ্বয়ের সাধনায় প্রীত হয়ে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন কেশিনী একটি মাত্র বংশধর পুত্র এবং সুমতি ষাট হাজার পুত্র প্রার্থনা করলে মহর্ষি 'তথাস্তু' বলে আশীর্বাদ দিলেন। ঋষি-বাক্য কখনও নিষ্ফল হয় না। তাই যথাসময়ে সুমতির অসমঞ্জ নামে এক পুত্র এবং কেশিনীর ষাট হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করল। বাল্যকাল থেকেই অসমঞ্জ উন্মার্গগামী হয়ে চলতে লাগল বিপথে। পিতা ভাবলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো চরিত্রেরও পরিবর্তন হবে। কিন্তু তা আর হল না। প্রাক্তন

কর্মচক্রের কুটিল আবর্তে অসমঞ্জের উন্মার্গগামিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এদিকে ষাট হাজার কুমারও জ্যেষ্ঠের চরিত্রই অনুসরণ করে চলেছে, বালকমাত্রই যে অনুকরণপ্রিয়। এতগুলি বালক উচ্ছৃঙ্খল—পৃথিবীতে মহা অনর্থের সৃষ্টি! মুনিঋষিদের যজ্ঞাদি কার্যে বিঘ্ন ঘটছে। দেবতারাও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন—জগৎ বুঝি ধ্বংস হয়! কি করা যায়—উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে পুরুষোত্তমের অংশভূত শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি জগৎপাবন ভগবান্ কপিল ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, "ভগবন্! আর্তজনের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ। এই সগরতনয়গণের অত্যাচারে জগদ্বাসী উৎপীড়িত, বিক্ষুব্ধ। আপনার কৃপা ব্যতীত জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" জ্ঞানের নিধান ভগবান্ কপিলদেব প্রার্থনারত ব্যথিত ত্রিদিববাসীদের সান্ত্বনা দেন—"কিছুদিনের মধ্যেই অনর্থকারী সগরপুত্রগণ বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। অহংকার পতনেরই হেতু।"

ইত্যবসরে সসাগরা-ধরণীপতি সগর মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট উপায়ে সর্ববেদময় শ্রীহরির আরাধনা সহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। অশ্ব সংরক্ষণের ভার পড়ল ষষ্টি সহস্র দুর্দমনীয় পুত্রের উপর। এদিকে ইন্দ্রত্বলোপভয়ে ভীত দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করে লুকিয়ে রাখলেন ভূগর্ভে সকলের অলক্ষিতে। অশ্বান্বেষণরত পুত্রেরা অশ্বপদচিহ্ন-দর্শনে বুঝলেন, অশ্ব পৃথিবীর বিবরে রক্ষিত। তখন প্রত্যেকে এক এক যোজন করে বসুধাতল খনন করে পাতালে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন, অশ্ব ইতস্ততঃ বিচরণশীল। অনতিদূরে ভগবান্ কপিল ঋষি—শরৎকালে মেঘনির্মুক্ত আকাশে সূর্যের মতো সর্বদিকে প্রভাবিস্তার করে যোগাসনে সমাসীন। অস্ত্রধারী সগরপুত্রগণ কপিলদেবকে অশ্বাপহারী, যজ্ঞবিঘ্নকারী ভেবে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। ঋষিবর ঈষৎপরিবর্তিতলোচনে কটাক্ষপাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তেজোবহ্নি নির্গত হল। উদ্ধত সগরপুত্রেরা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। যেন দীপালির শিখায় পতঙ্গকুলের বিনাশ!

মহীপতি সগর সমস্ত পুত্রের ভস্মমাত্রে পরিণতি জেনে বিষণ্ণচিত্তে পাঠালেন অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্‌কে অশ্ব আনতে। যজ্ঞ তো অসম্পূর্ণ থাকতে পারে না। অংশুমান্ ভগবান্ কপিলঋষির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যুক্তকরে ভক্তিনম্রচিত্তে স্তব করলে ঋষিবর বললেন, "বৎস, তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট। বর প্রার্থনা কর। এই তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় পশু, তাঁর কাছে নিয়ে যাও, যজ্ঞ সুসম্পন্ন হোক।" অংশুমান্ ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত স্বর্গলাভের অযোগ্য দুষ্কৃতকারী পিতৃপুরুষগণের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যে বর চাইলেন। প্রসন্ন কপিলদেব আশিস্ দেন, "তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনয়ন করবে। সেই পবিত্র গঙ্গাবারির স্পর্শে সগরপুত্রগণের মুক্তিলাভ হবে। গঙ্গাজল ভিন্ন এদের সদ্‌গতি সম্ভব নয়। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গত জলের কি অপার মহিমা! অভিলাষপূর্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করলে যে মুক্তি সম্ভব—শুধু তাই নয়, অনিচ্ছাকৃতভাবেও এর সংস্পর্শে আসলে এবং মৃত ব্যক্তির অস্থি ইত্যাদি গঙ্গাপ্রাপ্ত হলেও সদ্য মুক্তিলাভ হতে পারে।"

মহারাজ সগর অশ্ব প্রাপ্ত হয়ে যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করলেন। যজ্ঞশেষে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও বন্ধনমুক্ত রাজর্ষি অংশুমানের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে গুরূপদিষ্ট যোগপথে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হলেন।

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া।
কালং মহান্তং নাশক্নোত্ততঃ কালেন সংস্থিতঃ॥
দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেয়িবান্।
ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৯।১,২

গঙ্গা-আনয়ন-বাসনায় অংশুমান্ সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করলেও সমর্থ হননি, কালবশে তাঁর মৃত্যু হয়। অংশুমানের পুত্র প্রবলপরাক্রান্ত দিলীপ পিতার মতো তপস্যা করলেন—তিনিও অদৃষ্টদোষে অকৃতকার্য হলেন। এই দিলীপের পুত্রই মহাভাগ ভগীরথ, যিনি গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে এনেছিলেন এবং যাঁর নামেই গঙ্গার নাম ভাগীরথী।

ভগীরথ ছিলেন শ্রীমান্, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাক্ অসূয়াশূন্য এবং লোকের নয়ন ও মনের আনন্দবর্ধন। পূর্বপিতামহগণের নিদারুণ পরিণতির কথা শুনে তাঁর চিত্ত ব্যথায় ভরে গেল। ষষ্টি সহস্র করুণকণ্ঠের আকুল আকূতি যেন অন্তরের অন্তঃকর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে! "ভগীরথ, ওঠ, তপস্যা দ্বারা গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যধামে নিয়ে এস। আমাদের উদ্ধার কর, তুমিই আমাদের যোগ্য বংশধর।"

সচিবগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে প্রাণের আহ্বানে সাড়া দিলেন ভগীরথ—সুদূর হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন তপস্যায়। পিছনে পড়ে রইল অতুল ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য, পরিজন। বৃহত্তর প্রয়োজনে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ দূরে চলে গেল। পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করতেই হবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন। অনন্ত সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ এই শরীর—যদি যায়ই—ক্ষতি কি?

ভগীরথ হিমালয়ের গোকর্ণ নামক স্থানে তপস্যায় ব্রতী হলেন। একদিন নয়, দুদিন নয়—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কালসাগরের স্রোতে বিলীন হয়ে যায়—ভ্রূক্ষেপ নেই। অবিশ্রান্তভাবে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক দেহমনঃপ্রাণ নিয়োগ করে সুকঠোর তপস্যা চলেছে। এমনি করে সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেল। ত্রিলোক-বিস্ময়কর তপস্যা দর্শনে প্রসন্ন ভগবান্ প্রজাপতি ভগীরথের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আনন্দে পুলকিততনু ভগীরথ করজোড়ে বলে উঠলেন—

যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ॥
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেবং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ॥

রামায়ণ—১।৪২।১৮,১৯

"হে ভগবন্, যদি আমার তপস্যার কোনও ফলসম্ভাবনা থাকে, তবে সগরসন্তানগণ আমার কাছ থেকে যাতে জলগণ্ডূষ প্রাপ্ত হন, তার উপায় করে দিন। তাঁদের দেহভস্ম গঙ্গাজলে সিক্ত হলে তাঁরা স্বর্গগমনে সমর্থ হবেন।" তারপর অপুত্রক ভগীরথ ইক্ষ্বাকুকুল যেন লুপ্ত না হয়—এই প্রার্থনা করলেন। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা মধুরবচনে বললেন, "হে ইক্ষ্বাকুকুল-প্রদীপ! তোমার মনোরথ অপূর্ণ থাকবে না। গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হবেন। তাঁর বেগধারণের জন্যে দেবাদিদেব মহাদেবকে নিয়োজিত কর। তিনি ব্যতীত কে আর অমিতশক্তিময়ী গঙ্গার বেগধারণে সমর্থ?"

প্রজাপতির অন্তর্ধানের পর ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক সম্বৎসরকাল কৈলাসে মহেশ্বরের আরাধনায় তাঁর কৃপা লাভ করেন। "হে মহাবাহো, আমি তোমারই জন্যে শৈলরাজনন্দিনী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করব। গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ থেকে নিপতিত হতে বল।"—বললেন দেবাদিদেব।

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করে মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার ধ্যান করতে লাগলেন। আবার তপস্যার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলে উঠল। ভগীরথের দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ গ্রহণ-শক্তিও অন্তর্হিত। একমাত্র তন্মনস্কভাবে পতিতপাবনী গঙ্গার চিন্তা। তাঁর মনমধুপ মাতৃভাবে বিভোর। আকাশে বাতাসে আধ্যাত্মিকতার তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী আবির্ভূতা হয়ে ভগীরথকে সম্বোধন করলেন। ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে এল। "তোমার পরম তপস্যায় আমি প্রীত। তোমার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্যে আমি পৃথিবীতে

অবতরণ করব কিন্তু মনুষ্যেরা আমাতে পাপ প্রক্ষালন করবে, সেই পাপ থেকে কিরূপে আমি মুক্ত হব ?"—গঙ্গাদেবীর এই কথাগুলি ভগীরথের শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, "মাতঃ, সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ লোকপাবন। তাঁরা নিজ নিজ অঙ্গসঙ্গদ্বারা ঐ পাপ হরণ করবেন। কারণ তাঁদের অন্তরে পাপহারী শ্রীহরি নিত্য বিরাজমান।"

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৯।৬

সহসা গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হল। সুরতরঙ্গিনী বিচ্যুত হতে চলেছেন। সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে। দিক্‌সকল প্রসন্ন ও জ্যোতিরুদ্ভাসিত। শিবসমক্ষে ভগীরথ ধ্যাননিমগ্ন। গঙ্গা শিবশিরে নিপতিত হলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, উরগ, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষগণ সকৌতুকে গঙ্গাবতরণ দর্শন করতে লাগলেন। পরমদুর্ধর্ষা গঙ্গার পতনসময়ে চিন্তা এল—তিনি প্রবল প্রবাহে শঙ্করকে নিয়ে ভূতলে প্রবেশ করবেন। সর্বজ্ঞ ধূর্জটি এই অভিপ্রায় জেনে হিমালয়সদৃশ আপন জটাজাল মধ্যে গঙ্গাকে তিরোহিতা করলেন। সম্বৎসরকাল যাবৎ গঙ্গা শিবমস্তকে ভ্রাম্যমানা।

"তত্র সংবৎসরং পূর্ণং বভ্রাম পরিমোহিতা।
গঙ্গা শিরসি দেবস্য বিস্মৃতা বেগবাহিনী॥"
বাল্মীকিরামায়ণ,—আদিকাণ্ড ৪৫ সর্গ।

বহু চেষ্টাতেও গঙ্গা মুক্ত হলেন না। ভগীরথ পড়লেন বিষম সমস্যায়। এত তপস্যা সবই বুঝি ব্যর্থ! নিরুপায় হয়ে তিনি গঙ্গাধরের স্তব করতে থাকেন। প্রাণের ডাকে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, আর আশুতোষের হৃদয় গলবে না ? ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তের আকুল প্রার্থনায় গঙ্গাকে জটা থেকে নিষ্কাশিত করলেন। গঙ্গা হিমালয়ের দুর্গম গুহামধ্যে প্রবেশ করে আবার বদ্ধই হয়ে গেলেন। রাজা নিতান্ত দুঃখিত। দেবী বললেন, "যদি মহাহস্তী ঐরাবত দন্তাঘাতে গুহমুখাবৃত শিলা ভেদ করে, তবেই নির্গমন সম্ভব।" ভগীরথ গঙ্গাবাক্য জ্ঞাপন করায় ঐরাবত উত্তর দেয়, গঙ্গা যদি তাকে আলিঙ্গন করেন তবে সে বহির্গমনের উপায় করে দিতে পারে। ঐরাবতের দুরভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে দেবী বলেন,—"বেগ সহ্য করতে পারলে নিশ্চয়ই মহাগজের মনস্কামনা অপূর্ণ থাকবে না।" তখন সেই নির্বোধ গজরাজ যেখানে গঙ্গা অবরুদ্ধা ছিলেন, সেই স্থান তীক্ষ্ণ দশন দ্বারা বিদীর্ণ করল। অমনি স্রোতস্বতী ঘোরতর বেগে নির্গতা হয়ে ঐরাবতকে প্রথম তরঙ্গে দশ যোজন, দ্বিতীয়ে শত যোজন, তৃতীয়ে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন। অনিবার্য ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গাঘাতে মহাহস্তী মৃতপ্রায় হল।

গঙ্গা বিন্দু সরোবরে পতিত হলেন। এখানেই রৌপ্যমালাকারা সপ্তধারার উৎপত্তি। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী—তিনটি প্রবাহ পূর্বদিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু—তিনটি পশ্চিমে এবং অবশিষ্ট ধারাটি ভগীরথের অনুগামিনী।

মহামতি কৃত্তিবাস-প্রণীত বঙ্গীয় রামায়ণে চারটি ধারার উল্লেখ আছে :

"বসু নামে গঙ্গা গেল পূরব সাগরে।
ভদ্রা নামেতে গঙ্গা গেলেন উত্তরে॥
শ্বেতা নামে গঙ্গা গেলেন পশ্চিম সাগরে।
পড়িলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে॥"

তরলতরঙ্গিনী ভগীরথকে বললেন, "হে মহারাজ, কোন্ দিকে কিভাবে আমার গতি হবে নির্দেশ কর।"

দিব্যরথে আরোহণ করে রাজর্ষি অগ্রে অগ্রে মধুর শঙ্খধ্বনি সহকারে গমন করতে লাগলেন। কী সুন্দর সে দৃশ্য! গঙ্গা ছলছল কলকল শব্দে ধাবিত হচ্ছেন। দেবর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ—সকলেই দর্শনেচ্ছু। দেবগণ অশ্বে, গজে, শিবিকায় কেহ বা বিমানে। তাঁদের ভূষণকিরণে গগনমণ্ডল

সমুদ্ভাসিত। আকাশ নির্মেঘ। চঞ্চল ভুজঙ্গ, মীন, শিশুমার প্রভৃতি বিদ্যুৎ-আকারে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—পাণ্ডুবর্ণ ফেনরাশি খণ্ড খণ্ড হয়ে গমনের বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময়ে গঙ্গার গতি কোথাও দ্রুত, কুটিল, কোথাও আয়ত, নত, কোথাওবা অত্যন্ত বেগবতী। ভূমণ্ডলে সুরধুনীর সে অপূর্ব শোভা!

তখন ঐ পবিত্র জল দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিগণ স্পর্শ করলেন। যারা পাপপ্রভাবে ঊর্ধ্ব থেকে অধোদেশে নিপতিত হয়েছিল, পবিত্র গঙ্গাবারিস্পর্শে তারাও আজ মুক্ত। দর্শকের নয়ন সার্থক—স্নাতকদের শরীর মন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

এইরূপে ভগীরথের অনুগমনরতা ত্রিলোকপাবনী যজ্ঞরত জহ্নুমনির যজ্ঞক্ষেত্রে সবেগে প্রবিষ্ট হলেন। যজ্ঞস্থল প্লাবিত—উপকরণ লণ্ডভণ্ড। রোষাবিষ্ট মুনিবর যোগবলে সমস্ত জল নিঃশেষে পান করলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষিকুল সাতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত। সকলের সমবেত স্তুতিবাদে মহাত্মা জহ্নু নিজের কর্ণবিবর দিয়ে গঙ্গাকে নিষ্কাশিত করলেন।*

তখন থেকে গঙ্গা জাহ্নবী বা জহ্নুকন্যা নামে খ্যাত। তরঙ্গিনী আবার উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত ভঙ্গিমায় নৃত্য করতে করতে ভগীরথের অনুগামিনী। অবশেষে রসাতলে প্রবেশ করে ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের ভস্মরাশি ভাসিয়ে দিলেন।

"শতমুখী রূপ ধরি সাগর সঙ্গম করি,
মুক্ত কৈলা সগর-সন্তান॥"

—ভারতচন্দ্র

ষাটহাজার সগরসন্তানের ব্রহ্মশাপজাতপাপ-বিনাশ ও দিব্যকলেবরে চিরসুখময় অক্ষয়-স্বর্গপ্রাপ্তি পুণ্যশ্লোক ভগীরথের অতুলনীয় তপঃ-প্রভাবেই সম্ভব হল। যতদিন চন্দ্রসূর্য উদিত হবে, যতদিন সাগরের জল বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেব ও মানব কণ্ঠে তাঁর অনুপম কীর্তিগাথা গীত হবে। কীর্তির্যস্য স জীবতি। কীর্তিমানই যে জীবিত। স্বর্গমর্ত্যপাতাল ত্রিলোকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা ত্রিপথগা হলেন—ত্রিদিবে যিনি মন্দাকিনী পৃথিবীতে তিনি ভাগীরথী আর রসাতলে ভোগবতী। সার্থক ভগীরথের তপস্যা, সার্থক মন্দাকিনীর মর্ত্যে আগমন ও তাঁর ভাগীরথী নাম!

তারপর লোকপিতামহ প্রজাপতির আদেশে ভগীরথ পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি তর্পণাদি করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এতকাল পরে নরনাথকে দর্শন করে প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা রইল না, সমস্ত শোক ও দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত হল।

ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল গঙ্গার তীরে জনপদ, বিকাশ হল সভ্যতার। গাঙ্গেয় সভ্যতা আজ সমগ্র পৃথিবীর গর্বের বস্তু। গঙ্গার উর্বর পলিমাটিতে কৃষি—বক্ষে বাণিজ্যতরণী। তীরে তীর্থরাজি—মুনিঋষিদের অসংখ্য আশ্রম—জপতপসাধনভজন। কাব্যসাহিত্যদর্শনের পুরিপুষ্টি এই পুণ্যময়ী ভাগীরথীকে কেন্দ্র করেই। উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী হৃষীকেশ, প্রয়াগ, ত্রিবেণী—এসব কতো গৌরবের তা আজও ভক্তমণ্ডলী উপলব্ধি করেন।

ব্যাসবাল্মীকিশঙ্করাচার্য থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের মনীষীরাও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন নানাভাবে। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন দেখুন—

"হিন্দুর সঙ্গে মায়ের একি সম্বন্ধ। কুসংস্কার কি? হবে! গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূরদূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন ক'রে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু

* পদ্মপুরাণমতে জহ্নুমুনি কুশাগ্রদ্বারা জঠর ভেদ করে গঙ্গাকে পুনর্বার নির্গত করেন:

"বিভেদ জঠরং বিপ্র! কুশাগ্রেণ তপোনিধিঃ॥
নির্গতা তেন মার্গেণ জাহ্নবীতি পরিশ্রুতা॥"

—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড,—১৬শ অধ্যায়

কৃত্তিবাস কিন্তু জানুভেদের কথা লিখেছেন:

"দক্ষিণ জানু চিরিলেন মুনি যেই ক্ষণে।
জানু দিয়া গঙ্গা বাহির হইলা সেই স্থানে॥"

পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলো বারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্ত্য জন-স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রাজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস্, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম সব লুপ্ত হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্ হর্', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর্ হর্ হর্ !!'"

একটি সুপ্রচলিত শ্লোকের অনুসরণ করে বলি—শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলনিঃসৃত শিবমস্তকে প্রবাহিত পাপহারী গঙ্গাবারির স্পর্শে যুগ যুগ ধরে অগণিত মানব পবিত্র হয়েছে, আজ এই গঙ্গাজল আমারও শরীর মন বিশুদ্ধ করুক।

গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥

সাঁওতালী সমাজ-জীবন

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এ-এ

বাংলাদেশে সাঁওতালদের আবাসভূমি হল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ এবং আংশিক ভাবে আরও কয়েকটি জেলা। এছাড়া ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ এবং বিহারের মুঙ্গের, মানভূম, হাজারীবাগ, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, এবং ভাগলপুর হচ্ছে সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল। আমরা যদি ইতিহাস আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, আমাদের এই ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-পূর্ব যুগে যে সব জাতি বসবাস করত তাদের মধ্যে মুণ্ডা, খাড়িয়া, বীরহড়, হো, এবং সাঁওতালদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়। এই সব জাতির মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। সাঁওতালদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। পিতা হল সাঁওতালী সমাজে গৃহের কর্তা। সাঁওতালী ছেলেমেয়েদের পিতৃভক্তি দেখলে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয় এবং পিতৃপূজাকে এরা ধর্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলে মনে করে থাকে। পুত্রের জন্মের পর সাঁওতালরা 'ছাটিয়ার' নামক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পিতার হাতে একটা তেলের বাটি থাকে। সে বাটি থেকে তেল নিয়ে গাত্রমর্দন করলে জ্ঞাতিদের নাকি অশৌচান্ত হয়। সাঁওতালী সমাজে পুত্র সন্তানরা পিতার গোত্রের অধিকারী হয় এবং পিতার সাথে বসবাস করে। পুত্রসন্তানের উপর মাতার কোন আইনগত অধিকার নেই এবং পিতা হল সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক। পিতার কর্তৃত্বাধীনে গোষ্ঠী গড়ে উঠে। শবদাহের আগে জ্যেষ্ঠ ছেলে পিতার মুখাগ্নি করবার অধিকারী। জন্ম, মৃত্যু কিম্বা বিয়ের সময়ে জ্ঞাতিরা আত্মীয় বাড়ীতে উপহার পাঠায়। সাধারণতঃ কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, 'হাঁড়িয়া' মদ ইত্যাদি প্রেরিত হয়। বলা হয়েছে, গৃহস্বামীর ব্যয়ভার কমাবার জন্য এই প্রকার পাঠাবার ব্যবস্থা

হয়ে থাকে। আত্মীয়তা-সম্বন্ধে সাঁওতালরা কতকগুলো আইন অনুসরণ করে চলে। বিশেষকরে ময়ূরভঞ্জের সাঁওতালী সমাজে পিতামাতার স্থান অতি উচ্চে, ভাইবোনের মধ্যে মমতার সম্বন্ধ খুবই নিবিড়। এছাড়া স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করে চলে। সাঁওতালী সমাজে বড় শ্যালিকা খুব সম্মানার্হা। শোনা যায়, বসন্ত উৎসবের সময়ে যখন পরস্পর পরস্পরের জল ছোড়াছুড়ি করে, তখন যদি বড় শ্যালিকার উপর এক ফোঁটা জল পড়ে তাহলে অপরাধীকে সামাজিক আইন অনুসারে বিচার করা হয়। সাঁওতালী সমাজে কর্তা হল জ্যাঠা অথবা কাকা। আবার এদের অবর্তমানে মামার হাতে গৃহের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়। বরের পিতা যদি জীবিত না থাকে, তাহলে বিয়ের সময়ে মামা কিছু উপহার লাভ করে। এই উপহারকে "মামা-পণ" বলা হয়। বাড়ীর জামাই পূজা-পার্বণে পশুবলি দিয়ে থাকে, বিয়ের সময়ে কনেকে যে ঝুড়িতে বসান হয় মামাকে সে ঝুড়ি ধরে থাকতে হয়। বৈবাহিক এবং বৈবাহিকা পরস্পর পরস্পরকে ঠাট্টা করতে পারে না। বিবাহ গণ্ডীর দিক থেকে সাঁওতালী সমাজ দুভাগে বিভক্ত, যথা জাতিয়া-পেড়া এবং বন্ধু-পেড়া। সাঁওতালদের মধ্যে মুরমু নামক একটা উপজাতি আছে। প্রায় সব মুরমুরাই জাতিয়া-পেড়া বা এক-গোত্রীয়। এছাড়া অন্যান্য সাঁওতালরা হচ্ছে বন্ধু-পেড়া। অর্থাৎ এরা মরমুদের সাথে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করবার যোগ্য। সাঁওতালী সমাজে গোত্রসম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। সমগোত্রের কেউ যদি মারা যায়, তাহলে সাঁওতালদের অশৌচ হয়। তাছাড়া যদি কেউ এক গোত্রে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে তার সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত এবং শুদ্ধিকরণ হয়, অর্থাৎ এক গোত্রে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়; গোত্রের বাইরে টুডু ও বেসরা কিম্বা কিস্কু ও মারাণ্ডিদের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুরমুদের সাথে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করবার যোগ্য সাঁওতালদের মধ্যে মাসতুতো ভাইবোন কিম্বা মামাতো ভাইবোনদের বিয়ে একেবারে অচল। সাঁওতালী সমাজে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে দেবরের বিয়ের রীতি আছে; এই বিয়েকে সাঁওতালরা 'ধাউলিয়া সাগাই' বলে।

অদিতি

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ-ডি

মানুষের মন সীমার বাঁধনে বাঁধা, তাই অসীমের কল্পনা তাহার পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু তথাপি উপলব্ধির এক পরম শুভক্ষণে মানুষ সেই অনন্তের আভাস পাইয়া ধন্য হয়। অসীমের আনন্দরূপ মানুষের চিত্তে ক্ষণিকের জন্য ঝলক দিয়া যায়।

আমাদের বৈদিক পিতামহেরা এই অনন্তকে অদিতির মাঝেই ধরিতে চাহিয়াছিলেন।

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥
(ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০)

ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পনাকুশল কবি ঋষি গোতম রাহুগণ এই মন্ত্রে অদিতির স্তব করিলেন :—যাহা বদ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা বিভক্ত তাহা দিতি। অদিতি

অবন্ধনা, সীমাহীনা ও অবিভক্তা। তাই মাথার উপরে যে নিঃসীম দ্যুলোক অদিতি দেবী তাহারই প্রকাশ। চোখে পতিত যে আকাশ সেই অন্তরীক্ষ অদিতির মহিমা—অদিতি পরমা প্রকৃতি—জগন্মাতা। তিনিই বিশ্বপিতা, তিনিই পুত্র। জগতে যত কিছু জ্যোতি, যত কিছু দ্যুতি সকলই সেই জ্যোতির্ময়ীর বিভূতি, সমস্ত মানুষলোকেই সেই মহতী জননীর প্রতিষ্ঠা। যাহা কিছু জগতে জাত, সকলই তাঁহার আলো—যাহা কিছু ভাবী কালে জন্মিবে সকলই তাঁহার শক্তির লীলাবিচ্ছুরণ।

কঠোপনিষৎ এই মহান্ আদর্শকে নূতন ভাষায় বলিয়াছেন—

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত
এতদ্বৈ তৎ॥
(কঠ-উঃ, ২।১।৭)

অদিতি সর্বদেবতাময়ী, তিনি হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন। ভূতসকলের সহিত উৎপন্ন হইয়া তিনি সর্বত্র বিরাজিত। হৃদয়াকাশের অন্তর্নিহিতা এই মহিমময়ী দেবীকে যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।

অদিতি তাই ব্রহ্মময়ী—আত্ম-স্বরূপা। তত্ত্বরাগিণী এই পরমা দেবীর প্রতি কোনও বিশেষ সূক্ত ঋগ্বেদে নাই। তথাপি এক শত চল্লিশের অধিকবার নানা-মন্ত্রে সাধারণতঃ অন্য দেবতাদের স্তুতির সহিত তাঁকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন সর্বত্র তিনি বিশেষ দেবীরূপে স্তুত হন নাই—কোথাও কোথাও অন্য দেবতার মাত্র বিশেষণরূপে অদিতি কথার ব্যবহার হইয়াছে। যেমন গৃৎসমদের অগ্নিস্তবে—

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা
ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা
বসুপতে সরস্বতী॥

যে দাতা তাহার হৃদয় প্রশস্ত হয়, তাহার নিকট অগ্নি অদিতিরূপে প্রকাশিত হন, অগ্নি বেদবাক্যে বর্ধিত হন, কারণ তিনি হোতা ও ভারতী—অগ্নি শক্তিদান করেন, কারণ তিনিই শতহিমা ইলা, অগ্নিই বৃত্রহননকারী, তিনিই বসুপতি—ধনের অধিপতি—তিনিই জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী।

অনন্ত অসীমের তিনি দ্যোতক—তাঁহার রূপ তাই বিশেষ নয়, অভিব্যক্ত নয়, প্রকাশিত নয়। রহস্যময়ী তিনি দেবী—তিনি পরম পূর্ণতার অধিষ্ঠাত্রী, তাই গৃৎসমদ প্রার্থনা করেন—'অবতু দেব্যদিতিরনর্বা।'—তিনি অনর্বা—অখণ্ডনীয়া—পরিপূর্ণা। তিনি ধ্রুবা ও অপরিবর্তনীয়া—তিনি মহতী, তিনি পাপহীনা। বন্ধনরজ্জুভীত শুনঃশেফ কাতর অন্তরে প্রার্থনা করেন—

অথ বয়মাদিত্য ব্রতে তব অনাগসো অদিতয়ে স্যাম।

জীবন হইতে যখন মায়া ও মোহের নাগপাশ খুলিয়া পড়িবে তখন হে বরুণ, হে পরমপ্রিয় আদিত্য! তোমার মঙ্গলময় কর্মে পাপহীন হইয়া আমরা অদিতির চরণে আত্ম-সমর্পণ করিব।

দশম মণ্ডলে পৃথিবী, দ্যৌ ও অদিতির উপাসনা আছে—

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং
সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা
স্বস্তয়ে॥ ১০।৬৩।১০

যে পৃথিবী আমাদের দেন পরম প্রতিরক্ষা, আপদে বিপদে যিনি ধরিত্রী, সুখে দুঃখে যিনি পালয়িত্রী সেই জননী পৃথিবীকে স্মরণ করি। পাপহীন অতুলনীয় দ্যৌ—ধূলি যাহার স্পর্শ পায় না—সেই দ্যৌকে নমস্কার করি। প্রণতি জানাই অদিতিকে যিনি আনেন কল্যাণ—যিনি সুপথের সহায়—যিনি দেন পরম নিরাপদ আশ্রয়। স্বস্তির জন্য আমরা দিব্য তরণী অদিতির আশ্রয় গ্রহণ করিব—যে তরণী

হইতে ছিদ্রপথে জল পড়ে না—সেই নির্ভরযোগ্যা দৈবী নৌকা, আমাদিগকে তাহার দাঁড়ের বলে কল্যাণের পরাকাষ্ঠায় লইয়া যাইবে।

ঋষি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করেন—

অদিতির্নো দিবা পশুমদিতির্নক্তমদ্বয়াঃ।
অদিতি পাত্বংহসঃ সদাবৃধা॥
উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যা গমৎ।
সা শন্তাতি ময়স্করদপ স্রিধঃ॥

(ঋগ্বেদ, ৮।১৮।৬,৭)

অদিতি অদ্বিতীয়া ও অতুলনীয়া। দিনে ও রাত্রে তুমি আমাদের পশুপাল রক্ষা কর। অদিতি, তুমি মানুষকে সতত বিবর্ধন ও পুষ্টির পথে নিয়া ও চলিয়াছ। তুমি আমাদিগকে শোক, দুঃখ, পাপ ও মালিন্য হইতে রক্ষা কর।

প্রতিদিন এই প্রার্থনাই যেন আমাদের কণ্ঠে জাগে—হে অদিতি, তুমি আমাদের হৃদয়ের মাঝে আবির্ভূত হও। তুমি শরণাগতপালিকা, তুমি এস আমাদের সান্নিধ্যে এস। তুমি আমাদিগকে কল্যাণ ও সৌভাগ্য দাও। পরমপ্রীতিময়ী—পরমস্নেহময়ী দেবী, আমাদিগের যত কছু শত্রু ও অনিষ্টকারী আছে তাহাদিগকে দূর কর।

অদিতি ধৃতাবরী ও ঋতবৃধা। বসিষ্ঠের প্রার্থনায় পাই—

অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু
মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো দেবস্য
শ্লোকং সবিতুর্মনামহে॥

(ঐ—৭।৮২।১০)

হে স্বরাট্ ইন্দ্র, হে সম্রাট্ বরুণ, মিত্র ও অর্যমা, দাও আমাদের পরম গৌরব, দাও আমাদের নিবিড় ও নিভৃত আশ্রয় যাহা সর্বব্যাপক, আমরা মনন করি অদিতির পরম জ্যোতি—যাহা কল্যাণ ও সত্যের আশ্রয় ও উদ্বোধক, মনন করি সবিতার স্তুতি। উভয়েই তাঁহারা ঋতকে পরিবর্ধন করেন।

অদিতি ধীরা ও স্থিরা অথচ তিনি গতির জনয়িত্রী, তিনি গতি-স্বরূপা। বামদেব অগ্নির স্তবে বলিতেছেন—

কথা শর্ধায মরুতামৃতায় কথা সূরে বৃহতে
পৃচ্ছ্যমানঃ।
প্রতি ব্রবোঽদিতয়ে তুরায় সাধা দিবো
জাতবেদাশ্চিকিত্বান্॥

(ঐ—৪।৩।৮)

হে অগ্নি, ঋতপথে চলেন মরুদ্গণ, সেই ঋতবান দলকে তুমি কি কথা বলিব; যখন সূর্য প্রশ্ন করিবেন, তখন কি উত্তর দিবে, যখন ত্বরিত-গতি অদিতি জানিতে চাহিবেন তখন কি বলিবে? হে জ্ঞানবান্, হে ধীমান্ অগ্নি, তুমি জাতবেদা, তুমি দেবতার দিব্য কার্য সাধন কর।

অদিতি সর্বতাতি—তিনি সর্বব্যাপিকা, তাই তাঁহাকে বরণ করি, তাই বলি,—উরুব্যথা অদিতিঃ শ্রোতু মে হবম্। হে বহু ব্যাপিকা, হে সীমাহীন, তুমি আমাদের অন্তরের উচ্ছল স্তব গ্রহণ কর।

কিন্তু অদিতি সর্বোপরি জননী। বিপৎসাগরে নিমজ্জমান ভক্তগণকে তিনি আপন বাৎসল্যরসের অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া পরম মহিমাময় অধ্যাত্ম জীবনে অহ্বান করেন। দুর্গতিনাশিনী তিনি দুর্গা, তাই দুর্গমে তিনি পালয়িত্রী, অবণ্যে তিনি শরণ। সর্বত্র তিনি শর্মদায়িনী—পুষ্টিকারিণী ও তুষ্টিদায়িনী।

কিন্তু তিনি তো কেবল জীবধাত্রী নন, তিনি দেবমাতা, দিব্যজন্ম ও দেবতত্ত্বে আরোহণ তাঁহার অসীম কৃপায় ঘটে।

তা মাতা বিশ্ববেদসাসুর্যায় প্রমহসা।
মহী জজানাদিতিঃ ঋতাবরী॥

(ঐ—৮।২৫।৩)

অদিতি পৃথিবীর যে মহৎ ঋত তাহা অনুসরণ করিয়া মহিমাময়ী হইয়া মিত্র ও বরুণের জন্ম দেন। মিত্র ও বরুণ পরম অসুর, তাহাদের মাহাত্ম্য সুদূর প্রসারী,

তাহাদের বিশ্বব্যাপক গৌবব—তাহারা সর্ব ধন ও সম্পদের অধিকারী।

শুনঃশেফ অদিতির যে স্তব করেন তাহাতে বলেন সেই করুণাময়ী মাতা মুক্তির মূল কারণ। সেই চমৎকার প্রার্থনাটি এই—

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু
দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাত্ পিতরং
চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥
(ঐ—১।২৪।১)

আমি মায়াপাশে আবদ্ধ, এই যন্ত্রণাময় বন্ধন মুক্তির জন্য কোন্ দেবতার চারু নাম উচ্চারণ করিব। কোন্ অমৃতদাতা দেবতার শোভন নাম মনন করিব? কোন দেবতা আমাকে মহীয়সী দেবী অদিতির সহিত সম্মেলন করিবেন? কোন্ দেবতার আশিসে আমি অমৃত হইয়া পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিতে পারিব, সেই দ্যাবাপৃথিবীর গোপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব?

দীর্ঘতমা অদিতির আহ্বান করেন। তিনি ধেনুস্বরূপা, দুগ্ধামৃত তাঁহারই দান। সেই অমৃত পানে আমরা অমর হই। বিশ্বদেবতারা অদিতির পরম দ্যুতিময় ধাম হইতেই পৃথিবীতে আগমন করেন এবং মনুষ্যলোককে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করেন। দেবতাদের জ্যোতি ও দ্যুতি মাতা অদিতির চিন্ময় মহিমারই অভিব্যক্তি।

ত্রিতঋষি দর্শনচিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অদিতির মাহাত্ম্য বলিতেছেন—

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্ন-
দিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি
বৃষভশ্চ ধেনুঃ॥
(ঐ—১০।৫।৭)

অগ্নি ছিলেন না, তাই অব্যক্ত তিনি অসৎ, আবার যখন প্রকাশিত হন তখন তিনি সৎ—সেই অগ্নি পরম ব্যোমে অবস্থান করেন—তিনি অনন্ত অদিতির কোলে দক্ষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই ঋতের প্রথমজাত পুত্র, তিনিই জীবনদাতা বৃষভ।

দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে বৃহস্পতি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ছন্দে দেবতাদের জন্মকথা গাহিতেছেন—ফলে ভাবীকালে যখন এই সূক্ত পঠিত হইবে, তখন মানুষেরা দেবতাদিগকে দেখিতে পাইবে। কর্মকার যেমন হাপরে আগুন জ্বালিয়া ধাতু গলায় তেমনই ভাবে ব্রহ্মণস্পতি দেবতাদের সৃষ্টি করিলেন।—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইল, অব্যক্ত হইতে দেবতা ব্যক্ত হইল। পরে আশা জন্মগ্রহণ করিল—আশা হইতে উত্তানপাদ জন্মিল। উত্তানপাদ হইতে ভূলোক জাগিল—ভূলোক হইতে আশার উৎপত্তি হইল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করিল—আবার দক্ষ হইতেই অদিতির উদ্ভব। হে দক্ষ, অদিতি তোমার দুহিতা হইয়া জন্মলাভ করিল। ভদ্র ও অমৃতবান্ধব দেবতারা সকলেই অদিতির সন্তান। সেই মহা সলিলে দেবতারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া বিরাজমান ছিলেন। তখন তাঁহাদের নৃত্যপর চরণ হইতে তীব্ররেণু সকল উত্থিত হইল। দেবতারা যতিদের মত তপস্যার প্রভাবে যখন বিশ্বভুবন আচ্ছাদন করিলেন, তখন সমুদ্রবক্ষে লুক্কায়িত সূর্যকে তাঁহারা প্রকাশ করিলেন। অদিতির অষ্ট পুত্র—তাহার মধ্য হইতে মার্তণ্ডকে রাখিয়া সপ্ত পুত্র লইয়া তিনি সুরলোকে চলিয়া গেলেন। সেই অতি পূর্বকালে অদিতি সপ্ত পুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। মার্তণ্ড জীবের জন্মাদি ঘটাইবার জন্য বিশ্বে রহিয়া গেলেন।

আদিত্য-জননী অদিতি মহাকাশ। সেই মহাকাশেই সৌরমণ্ডলের জন্ম। তাহা হইতেই এই বিশ্বসৃষ্টির লীলাপ্রবাহ। ইহা সত্য কিনা তাহা জানি না, তবে কবিত্ব-সৌরভে, চিন্তার বিপুলতায়, কল্পনার প্রবাহে এই সূক্ত অতুলনীয়।

বামদেব অগ্নির স্তবে একই সূক্তে দিতি ও অদিতির উল্লেখ করিয়াছেন—

চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্বি বিদ্বাং পৃষ্ঠেব বীতা
বৃজিনা ব মর্ত্যান্।
রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিং চ
রাস্বাদিতিমুরুষ্য ॥ ৪।২।১১

অগ্নি জাতবেদা—তিনি সব জানেন। জ্ঞাতা তিনি মানুষের চিত্ত ও অচিত্তকে, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে, জ্ঞান ও অজ্ঞানকে ভাল করিয়া জানুন। দক্ষ বিক্রেতা যেমন অশ্বপৃষ্ঠের ঋজুতা ও বক্রতা ভালভাবে উপলব্ধি করেন, পরমাত্মা অগ্নিও তেমনিভাবে মানুষের বুদ্ধি ও বোধহীনতাকে উপলব্ধি করুন। আমরা পারমার্থিক ধন ও ঐহিক ধনের জন্য—সুন্দর ও কীর্তিমান্ অপত্যের জন্য আমারা দিতি ও অদিতির শরণ করি —দিতি দান করেন না, অদিতি করেন—দিতি ক্ষর, অদিতি অক্ষর। আমরা তাই অদিতির আশ্রয়ে ধন্য হইব।

জননী অদিতি তাই পরম পরিপূর্ণতার প্রতিমা। যে পূর্ণতা যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগে একই থাকে সেই অনন্ত অসীমতার ব্যাপ্তি আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করুক। বেদের অমৃতবিদ্যা আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন চোখ খুলিয়া দিক—আমরা তখন সত্যের প্রকট রূপ দেখি। পূষা যেন হিরণ্ময় পাত্র দিয়া সত্যের আবরণ সৃষ্টি না করেন।

অদিতি আবর্তিত হইতেছেন—পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে আপাতপ্রতীয়মানভাবে, তাই তিনি বাধাহীন গতিতে চলিয়াছেন—ত্বরিতযাত্রাকারিণী দেবী অদিতি তাই ধ্রুবা, কারণ তাঁহার গতিমুখ কখনই পরিবর্তিত হয় না।

অদিতি রসময়ী ও মধুময়ী। সোমপানে যে আনন্দ তাহা অদিতি। শ্যেনপক্ষী সোমকে আনয়ন করেন। সেই সোমরসপানে আমরা অদিতি আনন্দ পাই। অদিতির আরাধনায় তাই অমৃতত্বের শেষ সীমায় আমরা উপস্থিত হই।

বৈদিক পিতামহেরা ছিলেন জীবনবাদী ও আনন্দবাদী। কর্মের ছন্দে ছন্দিত তাঁহাদের জীবন প্রতিনিয়ত আনন্দে গানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—সেই আনন্দরসের বন্যায় তাঁহাদের মানস অসীমের সাযুজ্য লাভ করে—অদিতিকে বরণ করিয়া, মনন করিয়া তাঁহারা অদিতিই হইয়া যান।

বসিষ্ঠের প্রার্থনায় তাই শেষ করি ঃ—

ধ্রুবাসুত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎ পাশং
বরুণো মুমোচৎ।
অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাৎ যূয়ং পাতস্বস্তিভিঃ
সদা নঃ ॥ ৭।৮৮।৭

এই ধ্রুবা ক্ষিতিতলে আমরা যতক্ষণ বাস করি, যতক্ষণ জননী অদিতির কৃপাকণা যাচ্ঞা করি, ততক্ষণ বরুণ আমাদের জীবনের মায়াপাশ মোচন করুন। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের জীবনের সমস্ত কামনাকে কল্যাণ, স্বস্তিতে ও পূর্ণতায় সমৃদ্ধ কর।

"পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার উপাদানসমূহ হিন্দুদিগের শান্ত সমাহিত গুণাবলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে—যাহারা জগতের পূর্বাপর যে কোন মানুষ অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

যুগ-যাত্রী

শ্রীমতী আভা দেব

তমিস্রার আবরণে স্তব্ধ রাত্রি। আকাশের বুকে
অগণিত নক্ষত্রের জ্যোতি—
চেয়ে দেখি ঘুমহারা চোখে, ভুলে যাই আনমনে
জীবনের তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি
অস্পষ্ট ইঙ্গিতে কার, ভেসে চলে যায় মন
সুদূরের কোন্ ডাক শুনে ;
পাই সেই সত্যের সন্ধান, এতদিন যাহা
খুঁজিলাম স্বপ্নতন্তু বুনে।
এই আমি, এতো নয় এ আমির সব পরিচয়—
আদি আর অন্ত কেবা জানে ?
জীবন-সরণি বেয়ে, পান্থসম এতো শুধু চলা
অনাগত সম্মুখের পানে।

আদিম প্রভাতে কোন্, কে বলিবে কবে জন্ম নিল
এক আত্মা পৃথিবীর বুকে ;
জীবনের নানা অভিনয়ে দিন গেল বয়ে তার
কিছু সুখে আর কিছু দুখে।
সেই নাট্যে পড়ে যবনিকা পুনর্বার হয় শুরু
অন্য এক নাটকের পালা ;
নব নব রূপান্তরে একই আত্মা চলিতেছে যেন
ভরে নিতে জনমের ডালা।
যুগ হতে যুগান্তর অতিক্রমি যাত্রী একদিন
হয়তো বা যাবে সেথা চলি
জ্যোতির্ময় জন্মহীন পদে নিবেদিত হবে তার
সর্বশেষ প্রাণের অঞ্জলি।

জম্বু-কুমার

(জৈন কথা)

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

প্রাচীনকালে রাজগৃহ নামক এক নগর ছিল। এই নগরে ঋষভদত্ত নামক একজন অতি ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ধারিণী দেবীর গর্ভে জম্বুকুমারের জন্ম হয়। জম্বু শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র। বাল্যকালে ধনী শ্রেষ্ঠীর পুত্রের উপযুক্তরূপে জম্বু পালিত ও নানাবিদ্যায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি যৌবনদশায় উপনীত হইলেন। কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জম্বুর চিত্ত ভোগবিলাস হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। তিনি ধনী সন্তান-সুলভ নানাপ্রকার বিষয়ভোগ হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

এ সময়ে নির্গ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য, ভগবান্ মহাবীরের স্বহস্ত-দীক্ষিত, পঞ্চম গণধর শ্রীসুধর্ম রাজগৃহে আসিয়া নগরের উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। জম্বুকুমার আচার্য সুধর্ম স্বামীর নিকট যাইতে ও তাঁহার উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিলেন। জম্বুর পিতামাতা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্রের গৃহত্যাগের আশঙ্কায় তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং ইহার প্রতিরোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৈরাগ্যের প্রতিকারস্বরূপ তাঁহারা কুমারের পরিণয় দেওয়ার মানসে নগরের আটজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর আটজন অত্যন্ত সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও উদ্‌গত-যৌবনা কন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহের পূর্বেই তাঁহারা কন্যাগণের মাতাপিতাকে কুমারের বৈরাগ্যের কথা জানাইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন

যে, যদি কন্যারা নিজেদের প্রভাবে কুমারের উদাসীনতা নষ্ট করিতে না পারে ও কুমার যদি সংসার পরিত্যাগ করে তবে তাঁহাদিগকে উপালম্ভ দিতে পারিবেন না।

যাহা হউক জম্বুকুমারের সহিত আটজন কন্যার একসঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর কন্যাগণ তাঁহাদের প্রত্যেকের পিতৃগৃহ হইতে প্রাপ্ত যৌতুক আট আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা সহ আসিয়া জম্বুকুমারের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ সৌন্দর্য, যৌবনোদ্‌ভাসিত কমনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নয়নাভিরাম রূপসজ্জা যে কোন যুবকের ক্ষণমধ্যে মনোহরণ করিত, কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যরসে সিক্তমন জম্বুকুমার যুবতীগণের কটাক্ষে ও সৌন্দর্যে বা প্রচুর ধনরাশির চাকচিক্যে বিন্দুমাত্রও মোহগ্রস্ত হইলেন না। তিনি আচার্য শ্রীসুধর্মস্বামীর নিকট স্ত্রীজাতির অঙ্গস্পর্শ না করিবার যে কঠোর নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নিয়ম বিস্মৃত হন নাই। ধীরস্থিরভাবে সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া জম্বুকুমার স্ত্রীগণকে বলিতে লাগিলেন—"আমার জীবনে গতকল্যই যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। গতকল্য নগরের বাহির হইতে আমি যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথিপার্শ্বে একস্থানে রাজকুমারগণ লৌহগোলক নিক্ষেপ করিয়া শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি পথ দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ একটি ভারী গোলক ঠিক আমার সম্মুখে পতিত হইল। আমি তো অতি সামান্যের জন্য বাঁচিয়া গেলাম। আর অল্পমাত্রও অগ্রসর হইয়া থাকিলে গোলক আমার মস্তকে পড়িত এবং আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। এই ঘটনার পর আমি জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব চিন্তা করিতে করিতে শ্রীসুধর্মস্বামীর নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যতক্ষণ জীবন আছে ইহার সদুপযোগ করিব। বিবাহ করিতে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু মাতাপিতার আগ্রহবশে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইল।"

কন্যাগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সমুদ্রশ্রী বলিয়া উঠিলেন, "এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে দেবানুপ্রিয় দীর্ঘায়ু লইয়া জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

সমুদ্রশ্রীর কথার উত্তরে কুমার বলিলেন—"আমি মৃত্যু বা অপঘাতের দ্বারা অল্পমাত্রও ভীত নই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন জীবন আছে, যতদিন শরীরে কর্ম করিবার শক্তি আছে ততদিন ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মহিত, পরাহত, বিশ্বহিত করিবার প্রয়াস করা উচিত। দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য-জীবনকে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। যখন হইতে শ্রীসুধর্ম-স্বামীর দর্শন পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, তাঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, বিশ্বহিতে উৎসর্গীকৃত জীবনের আদর্শ আমার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে, তখন হইতেই আমি আমার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছি, ভোগে বিলাসে আমার বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই, ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবনের অমৃতরসে অবগাহন করিবার অভীপ্সা আমাকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে।"

সমুদ্রশ্রী প্রত্যুত্তর করিলেন—"দেবানুপ্রিয়র কথা ঠিক, কিন্তু বক নামক বুদ্ধিহীন কৃষকের ন্যায় আপনাকে পরে পশ্চাত্তাপ না করিতে হয়। দেবানুপ্রিয় কি বকের দৃষ্টান্ত শুনিয়াছেন?" কুমার সস্মিতমুখে শ্রবণ করেন নাই জানাইলে সমুদ্রশ্রী বলিতে লাগিলেন—"বক নামক এক কৃষক ছিল। তাহার সামান্য কয় বিঘা অনুর্বর জমি ছিল, তাহাতে কোদোর ন্যায় নিকৃষ্ট ধান্যই হইত। তাহাই আহার করিয়া সে দিন কাটাইত। একদিন সে অন্যগ্রামে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গমন করিল। আত্মীয়টি তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া গমের

রুটি ও গুড় খাইতে দিল। বক কখনও এরূপ আহার পায় নাই, সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। এই নূতন খাদ্যে সে এত মোহিত হইয়াছিল যে, সেই আত্মীয়ের নিকট গম ও আখের উৎপাদন-প্রণালী জানিয়া লইল। বক বাড়ীতে আসিয়া কোদো-লাগান ক্ষেত চষিয়া তাহাতে নূতন করিয়া গম ও আখ লাগাইল, কিন্তু জমি অনুর্বরতার জন্য ও উপযুক্ত জলাভাবে গম ও আখ উৎপন্ন হইল না। বুদ্ধিহীন কৃষক নিজকৃত্যের জন্য পশ্চাত্তাপ করিয়া অনাহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেইরূপ আপনাকেও বর্তমানে প্রাপ্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিযা পরলোকের অধিকতর সুখের লালসায় 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট' না হইতে হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

সমুদ্রশ্রীর কথায় জম্বুকুমার ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "তোমরা কি বিন্ধ্যাটবীর কাকের কথা শ্রবণ কর নাই, যে আহারে তীব্র লোলুপ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল? একদা বিন্ধ্যাচলে এক নদীর তটে এক হস্তী মরিয়া পড়িয়া গেল। একটি কাক আসিয়া মনের সুখে সেই হস্তীর উপর বসিয়া তাহার মাংস খাইতে লাগিল এবং মনে করিতে লাগিল যে, এই বৃহৎ হস্তীটির মাংস সে চিরকাল ধরিয়া খাইতে থাকিবে। ইতিমধ্যে নদীতে ভীষণ বন্যা আসিয়া উভয় কূল প্লাবিত করিয়া হস্তীটিকে ভাসাইয়া লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। কাক আহারে এত আসক্ত হইয়াছিল যে, সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সমুদ্রে হাঙ্গরাদি আসিয়া যখন হস্তীর দেহকে টানিয়া জলমগ্ন করিল. তখন মূর্খ কাক মধ্যসমুদ্রে আশ্রয়ের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপ যাহারা বিষয়ভোগে তীব্র আসক্তিশীল, তাহারা কাকের ন্যায় সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া ঘোর দুঃখ প্রাপ্ত হয়।"

এইরূপে আটজন নবোঢ়া স্ত্রীর সহিত জম্বু-কুমারের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে চলিতে গভীর রাত্রি হইয়া গেল। এই সময় হঠাৎ এক আগন্তুক আসিয়া কুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিল। কুমার ইহাকে চিনিতে পারিলেন—পাঁচ শত চোরের সর্দার প্রভব। বিবাহের রাত্রিতে বহু যৌতুক আসিয়াছে মনে করিয়া প্রভব কয়েকজন অনুচরসহ গোপনে জম্বু-কুমারের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং গুপ্তভাবে থাকিয়া কুমার ও সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীগণের কথা শুনিতে শুনিতে এত তন্ময় হইয়াছিল যে, চুরি করিবার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

প্রভব ছিল ক্ষত্রিয়কুমার। কোনপ্রকার ঔদ্ধত্যের জন্য ইহার পিতা ইহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত হইয়া প্রভব তস্করবৃত্তি অবলম্বন করে এবং ক্রমে পাঁচশত জন তস্কর ইহার দলে যোগ দেয়। প্রভবের ভয়ে জনগণ সদা সশঙ্ক থাকিত।

প্রভবকে দেখিয়া কুমার বলিলেন "এই সমস্ত ধন তুমি যদৃচ্ছা লইয়া যাইতে পার, তোমাকে কেহ বাধা দিবে না, ইহাতে আমার কোনপ্রকার আসক্তি নাই। রাত্রি-প্রভাতে আমাকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইবে।" এতক্ষণ কুমারের কথা শুনিতে শুনিতে প্রভব তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কুমারের এই উক্তিতে সে গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিল—"আপনি যখন এই সমস্ত ধনসম্পত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন যদিও আমি হীন কার্য করিতেছি তথাপি আমি এত নীচ নহি যে, এই সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুট করিব। আপনাদের পরস্পরের মধ্যে এতক্ষণ যে কথা হইতেছিল তাহা আমি গুপ্তভাবে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছি, আপনার বৈরাগ্যের প্রভাবে আমার মনের কালিমা দূর হইয়াছে। আজ হইতে এই ঘৃণিত কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মাত্র ইহাই নহে, আপনার পবিত্র সংস্পর্শে আমার হৃদয়ও

বৈরাগ্যরসে সিঞ্চিত হইয়াছে, আমিও আপনার সহিত ভগবান্ সুধর্মস্বামীর নিকট শ্রমণ-দীক্ষা গ্রহণ করিব।"

পরদিন প্রাতঃকালে জম্বুকুমার, তাঁহার পিতা-মাতা, তাঁহার আটজন স্ত্রী, স্ত্রীগণের পিতামাতা, প্রভব ও তাঁহার দলের পাঁচশত তস্কর সকলে আচার্য সুধর্মস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। সুধর্মস্বামীর নির্বাণ-প্রাপ্তির পর আর্য জম্বুস্বামী সমস্ত নির্গ্রন্থ (জৈন) সংঘের নেতা হইলেন। তিনি কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ৮০ বৎসর বয়সে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করেন। ইঁহার পরে আর্য প্রভবস্বামী সংঘের নেতা হইলেন।

মান্দার হিল

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরাকাল ইতিহাসের কোন্ ছিন্ন পত্রে হারাইয়া গিয়াছে, তাহা এখন মৌলিক গবেষণার বিষয় বস্তু; কিন্তু পুরাকাহিনী আজও বাঁচিয়া আছে, সাহিত্যের আসরে—রূপকথায়। কাহিনীর সত্যতা যদিও সন্দেহের বস্তু, তবুও উহার বাস্তব সমাবেশ মনে রেখাপাত করে। তাই মন্দার পর্বত তাহার কঠিন দেহে দেবাসুর-কর্তৃক সমুদ্রমন্থনের সময়কার মন্থন-রজ্জুর চিহ্ন লইয়া মৌনভাষায় কালের পথিককে আহ্বান জানাইতেছে, মর্মবাণী পাষাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে "আমি অতীত, আমি পুরাতন।"

মন্দার পর্বত দেওঘর হইতে ৮০ মাইল দূরে বন্‌সিয়ায় নামিয়া যাইতে হয়। তথা হইতে পর্বতের দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। দেওঘর হইতে ভাগলপুর পর্যন্ত নিয়মিত বাস-সার্ভিস্ রহিয়াছে, সেইজন্য যাইতে অসুবিধা হয় না। দেওঘর হইতে মুসাফিরের যাত্রা শুরু হইল। শিবগঙ্গার ধার দিয়া বাস চলিয়াছে, শহরের সীমানা ছাড়াইয়া সর্পিল রাঙ্গা মাটির পথে। পথের দুই পার্শ্বেই পাহাড়গুলি নির্বাক্ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের কোলে গ্রামটির নাম বক্সীগঞ্জ। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আরও কিছুদূর আসিবার পর দুমকা ভাগলপুরগামী পথ পড়িল। চমৎকার পিচ্ দেওয়া রাস্তা। স্থানটি সাঁওতাল পরগণার এক অংশ। এখানকার দৃশ্য সত্যই সুন্দর। একদিকে শ্যামল শৈলশ্রেণী, অপরদিকে গৈরিক মালভূমি। অনেকগুলি শীর্ণ-কায়া নদী পথে পড়িল। নির্ঝরিণীগুলি গিরিগাত্র হইতে বাহির হইয়া, চপল বালিকার মত বনানীর মাঝে লুকোচুরি খেলিতে হঠাৎ ধরা পড়িয়া স্মিতহাস্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তারপর উপলখণ্ডে বাধা পাইয়া ধীরগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া মালভূমির মাঝে আপন পথ বাছিয়া লইয়াছে। নদী-বিধৌত হওয়ায় মালভূমি উবর হইয়াছে। মাঠের মধ্য দিয়া সরু আলপথ, আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। অপর পারে পাতায় ঢাকা ক্ষীণ পথরেখা, শাল ও মহুয়ার ঘন ছায়ায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। শৈলশ্রেণীকে প্রকৃতি নিপুণ হস্তে রঙ্গের আলপনা দিয়া সজীব করিয়া তুলিয়াছে; তাই লুব্ধ পথিকের দৃষ্টি বার বার এ পথে আকৃষ্ট হইয়াছে; তাহাদের ব্যাকুল বেদনা গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে "হে অরণ্য, কথা কও!"

পথের মাঝে অনেকগুলি গঞ্জ পড়িল। প্রায় ৬ ঘণ্টায় ৮০ মাইল অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে বন্‌সিয়ায় আসিয়া নামিলাম। নিকটেই ধর্মশালা। উহারই প্রশস্ত দালানে স্থান সংকুলান হইল। স্নানাহার-পর্ব সমাপন করিতেই বৃষ্টি নামিল। পর্বতারোহণের আশা সেদিনকার মত পরিত্যাগ

করিতে হইল। অপরাহ্ণ বেলায় জল থামিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। গ্রাম্য পথ। সব জলটুকু তখনও নালার পথে নামিয়া যায় নাই। মাঠের এপাশে ওপাশে তখনও জল জমিয়া আছে। ভিজা ঘাস হইতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ ছাড়িতেছে। ঝোপের ধারে ব্যাং মনের আনন্দে ডাকিতেছে। মনে হইল বাংলা দেশেরই কোন এক পল্লীতে রহিয়াছি। বেড়াইতে বেড়াইতে পুরান ষ্টেশনে আসিয়া পড়িলাম। যুদ্ধের পূর্বে ভাগলপুর—মান্দার হিল সেক্সনের ইহা প্রান্তসীমা ছিল। প্রয়োজনের তাগিদে লাইন উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমানে সেইজন্য মান্দার হিল যাওয়া ব্যয়সাধ্য। রেল উঠিয়া যাওয়ায় ভাগলপুর হইতে বন্‌সিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ মাইলে নিয়মিত বাস-সার্ভিস চলে। আশা করা যাইতেছে, বর্তমান বৎসরে লাইনটি পুনরায় চালু করা হইবে। এখান হইতে পর্বতটি বেশ সুন্দর দেখা যায়। চারিদিকে সমতল স্থান। তাহার মধ্যে পর্বত, সত্যই মন্থন-দণ্ডের মত দাঁড়াইয়া আছে। দিনান্তের সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তারই ক্ষীণ রেখা মন্দিরের শীর্ষে লাগিয়াছে।

সন্ধ্যা-ছায়ায় ধূসর পর্বত আরও ধূসর হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের পথে আবার ফিরিয়া আসিলাম। চারিদিকে দীপালোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের এক অংশে বাজার; উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্সের আলোতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। নিতান্তই গ্রাম্য বাজার। যুদ্ধের পূর্বে ইহা আরও উন্নত ছিল। লাইন উঠিয়া যাওয়ায় শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ফিরিবার পথে শ্রীমধুসূদন-মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে গেলাম; ধর্মশালা খুব নিকটেই। যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখি সমগ্র দালানটি কলকাকলীতে মুখরিত। একদল গ্রামাঞ্চলের যাত্রী বিগ্রহদর্শনে ও পুণ্যসঞ্চয়ে আসিয়াছে।

রাতের তন্দ্রা নামিয়াছে। ঘুমন্ত পুরীর উপর, চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ মোহবিস্তার করিয়াছে। সহযাত্রীদের সকলেই এখনও জাগিয়া আছে। আনন্দে মশগুল। সুখ কি তাহার সীমা নির্দেশ করা কঠিন, কিন্তু ইহাদের দেখিলে মনে হয় সত্যই ইহারা সুখী। হায় সভ্যতা, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তুমি ইজ্‌মের মোহে সারল্য বিসর্জন দিয়াছ, তাই আজ শান্তির মুখোশ পরিয়া এ্যাটম্‌ বোমার স্বপ্ন দেখিতেছে।

দীর্ঘ রাত্রি অবসান হইয়া আসিয়াছে। শ্রীমধুসূদন-মন্দিরে প্রভাতী আরতি হইতেছে। তাহারই সুমধুর ধ্বনি তরঙ্গায়িত হইয়া আসিতেছে। পূবের আকাশ একটু একটু করিয়া ফর্সা হইয়া আসিতেছে, তাহারই রং আমগাছের মাথায় লাগিয়াছে। প্রভাতেই পর্বতারোহণ সমাপন করিতে হইবে, তাই মাঠের পথে পা বাড়াইলাম।

মাঠের মধ্য দিয়া পথ। প্রায় ২০ মিনিট হাঁটিবার পর পর্বতের সানুদেশে উপনীত হইলাম। একটু উঠিলেই 'পাপহরণ কুণ্ড'। বৃষ্টির জল পাহাড়ের খাদে জমিয়া কুণ্ডটির সৃষ্টি করিয়াছে। সরসীর স্বচ্ছ জল দর্পণের মতো সমস্ত পর্বতের প্রতিবিম্বটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। পাপ পুণ্য নীতিশাস্ত্রের ভাষা; চাতুর্মাত্রিক জগতে যদিও ইহার কোন স্থান নাই, তবুও এই স্থানে আসিলে মনে দেবভাবের উদয় হয়। হ্রদের ধারে ছোট ছোট ঝোপের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিলাম। কিছুদূর উঠিবার পর পর্বতের বন্ধুর অংশটি পাইলাম। এখানে বন নাই, রুক্ষ মূর্তি, মেখলাতে বন্ধনরজ্জুর মালা। ইহাই পূর্বোক্ত বন্ধন-চিহ্ন। একহাত পরিমাণ চওড়া দাগ পর্বতের চারিপাশে ঘিরিয়া আছে। শরীরের কোন স্থানে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পরে খুলিয়া দিলে যেমন দাগ পড়ে এ দাগ সেই রকম। যদিও মাঝে মাঝে শিলা ক্ষয়িত হইয়াছে, তবুও চিহ্নটি বেশ বুঝা যায়। ওপাশে বনের দিকটা দেখা সম্ভব নয়; এত খাড়াই যে,

গড়াইয়া পড়ার সম্ভাবনা। এদিকে পাথর কাটিয়া সিঁড়ি করা হইয়াছে। পুরাকাহিনীকে যদিও ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে চাই না, কারণ বিজ্ঞানের যুক্তিতর্কে উহার সত্যতা ম্লান হইয়া আসে, তবুও ইহার ভূতাত্ত্বিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ক্রমশঃ চড়াই উৎরাই করিয়া ঠিক মধ্যস্থলে শঙ্খকুণ্ডে আসিলাম। এখানেও ঠিক পাপহরণ কুণ্ডের মত পাহাড়ের খাদে জল জমিয়া আছে। কুণ্ডের ধারে পাহাড়ের মাথায় সাধুদের আশ্রম। ধার দিয়া পথ, পাহাড় কাটিয়া করা হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক উঠিবার পর শীর্ষে শ্রীমধুসূদনের মন্দির পাইলাম। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ। বর্তমানে এখানে বিগ্রহ নাই। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে স্থানান্তরিত বিগ্রহ, পাদদেশে স্থাপন করা হইয়াছে। এখন সেইখানেই পূজা হয়। কেবল চরণচিহ্ন দুইটি শীর্ষের মন্দিরে নিত্য পূজিত হয়।

ফিরিবার পথে দেখিলাম আকাশ-গঙ্গা ও মধুকৈটভের মূর্তি। পাহাড়ের একটি গুহা জলে ভর্তি। জলের গতি রহিয়াছে। বাহির হইতে উৎস দেখা যায় না। পাহাড়ের ভিতর দিয়াই স্রোতস্বিনী আগম নিগম পথ করিয়া লইয়াছে। ইহাই আকাশ-গঙ্গা। ইহারই পার্শ্বে পর্বতে খোদিত মধুকৈটভের মূর্তি। পাহাড় কাটিয়া একটি প্রকাণ্ড মুখ করা হইয়াছে। শিল্পবোধ যদিও কিছুই নাই, তবুও দেখিবার ধৈর্য থাকে। এখানে অনেকগুলি গুহা আছে। সবগুলিতেই সন্ন্যাসীরা বাস করেন দেখিলাম। পর্বতের উচ্চতা খুব বেশী নয়; অনুমান হাজার ফুট হইবে, তাই আরোহণ ও অবরোহণ খুব আনন্দজনক।

ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমধুসূদনকে একবার দর্শন করিতে গেলাম। সোনার বিষ্ণুমূর্তি। লক্ষ্মী পাশেই রহিয়াছেন। এখানে ঠাকুরের নিত্য ভোগের বন্দোবস্ত আছে। তাহার জন্য অনেক সেবাইত আছে। মন্দিরের চত্বরে দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ আছে। পৌষমাসের সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে, তখন দূর দূরান্তর হইতে ভক্তের আগমনে দেবতার গৃহ প্রাঙ্গণ ভরিয়া যায়।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

খ্রীঃ ১৯১৫ সাল। ভাদ্র মাস, গঙ্গা কানায় কানায়। শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এখন যেখানে মন্দির তার সামনে গঙ্গার ধারে বাঁধান একটা জায়গায় একটা কলকে ফুলের ঝোপ ছিল। সেখানে বসে গীতা পাঠ করছি। প্রায় বেলা দুটো তিনটে। সেই পাঠ সাঙ্গ হল, হঠাৎ শুনতে পেলুম একজন বলছে, "মহারাজ আপনি দুলছেন কেন? প্রভু তো বলছেন, 'হে জীব স্থির হও।'" পেছনে চেয়ে দেখি এক কৌপীন ও সামান্য সাদা বহির্বাসে আচ্ছাদিত একজন সাধু করজোড়ে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি এদিকে কেন এলেন?" বললেন, "দেখলুম পাঠ করছেন, দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে বেশ ভাল লাগলো, তাই বসে পড়লুম, গঙ্গার ধারে ব্রহ্মচারীর মুখে গীতা শোনা কত ভাগ্যে হয়।" আমি বললুম, "আমার ওটা বড় খারাপ অভ্যাস, পাঠ বা চিন্তা করবার সময় ওটা অজ্ঞাতসারে হয়ে পড়ে। অথচ এও বেশ বুঝি অঙ্গমেজয়ত্ব যোগের অন্তরায়।" বললেন, "আপনি দুলছেন, আমি চোখ বুজে শুনছি, কিন্তু আমার মনটাও দুলে দুলে উঠছে। সেই জন্য

কথার ভাবের মধ্যে ভগবানও যেন দুলে দুলে উঠছেন, যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি আমার শরীরের দিকে নজর দিচ্ছেন কেন?" তিনি বললেন, "মহারাজ, আমিও চোখ বুজে শুনছি, 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্', কিন্তু মনটা কেন জানি না দুলে উঠে অর্থবোধের বাধা সৃষ্টি করছে, অর্থে স্থির হতে দিচ্ছে না।" আমি বললুম, "হাঁ ঠিক বলেছেন, প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর চাঞ্চল্য সর্বত্রই তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্দ্রিয়দের না জানা সত্ত্বেও তারা মনে এসে আঘাত দেয়। যাঁদের মন খুব শান্ত ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারায় অভ্যস্ত তাঁরা সেটা বুঝতে পারেন। ধ্যানীর চিত্তে বাইরের যাবতীয় ছোট বড় সূক্ষ্ম ঘটনা ধরা পড়ে। কিন্তু আমি আজ খুব উপকৃত, আমার অঙ্গমেজয়ত্ব যেমন আপনার চিত্তের প্রত্যেকতানতার বাধা সৃষ্টি করেছে, তেমনি আপনার চিত্তের আন্তরিকতা, গভীরতা ও প্রেম আমার পাঠে এক অপূর্ব তন্ময়তা এনে দিয়েছে।" তিনি বললেন, "দেখুন, আমারও দোষ আছে, আমি এখনও উপাধি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ জিনিসটি নিতে পারি না, কারণ দেখুন তত্ত্বের সঙ্গে তার বাহক দেহটির কম্পনও আমার চিত্তে আঘাত করছে।" আমি বললুম, "উপাধি একেবারে বাদ দিতে পারলে তো হয়েই গেল। চলুন আপনাকে এখানকার মঠাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাই।"

যখন ফিরে মঠে এলুম, তখন বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে বসে, জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথাবার্তা হচ্ছিল তোমাদের?" আমি সব বললুম। তিনি বললেন, "ভাল জিনিস সকলের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা ভাল। সাধুটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "বাবাজি, উপাধি গেলে তো আর কোন গোলই থাকে না। তখন—'অন্তর্বহির্যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।' জল থেকে দুধ বার কোরে নেওয়া এক পরমহংসেরাই পারেন।"

* * * * *

একদিন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দকে আমি ও শচীন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) জিজ্ঞাসা করলুম, "ধ্যান জপ কোরে কিছু অনুভূতি হলে সাধনে আরও উৎসাহ হয়।" বললেন, "ধরে থাকতে হয়, খুঁটি ধরে ঘুরতে হয়, সন্ধ্যানাগাৎ পাতা সকলেরই পড়বে। ছাড়িস নি ও ঠিক ঠাকুর কোরে নেবেন। বুড়ো গোপাল দা বলতেন, 'ঠাকুরের কাছে প্রথম বার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেন লোকে এঁকে মহাপুরুষ বলে।' দ্বিতীয় বারও তাই হলো। আর যাবে না ঠিক করলে; শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে যখন তৃতীয় বার গেল, তখন ঠাকুর তাকে ধরলেন (বাবুরাম মহারাজ এই কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বলেন)। আর যাবি কোথায়? গোপাল দা বলত, 'তারপর থেকে দিন রাত কেবল ঠাকুরের কথা মনে হতো, বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কি একটা ব্যথা, চেষ্টা কোরেও ঠাকুরের মুখ ভুলতে পারতুম না।' এই ভাবে তাঁর কৃপার প্রতীক্ষা কোরে থাকতে হয়—যেদিন ধরবেন সেদিন বুঝতে পারবি। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, কিন্তু সে ছাড়বার জো নেই। যদি বা সে ভাবটা চলে যায়, তখন আবার সেই আকুলি বিকুলি অবস্থার জন্যই মানুষের বিরহবোধ হয়, তাঁকে না পাওয়ার যন্ত্রণার স্মৃতিটাতেই খুব আনন্দ।"

পরবর্তীকালের মিসটিকদের গ্রন্থ পড়ে বুঝেছি, "ঠাকুরের ধরাটাই" হচ্ছে, জীবে হোলিগোষ্ট বা পবিত্রাত্মার অবতরণ—অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর যাকে বলতেন "প্রেম হয়েছে"। তিনি যখন জীবকে টানেন, তখন জীবে সেটা লাভ, স্পিরিট, প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, আকর্ষণ রূপে প্রকাশ পায়।

আর একবার পাশ্চাত্য, বৈশ্যজাতির ব্যবহার ও আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচার সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। বললেন, "ঠাকুর এবার ভেঙে চুরমার কোরে গড়বেন। বুড়ো গোপাল দা দেহ রাখবার আগে ঠাকুরকে দেখলেন, গদা কাঁধে গদাধর। গোপাল দা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাঁধে গদা কেন?' ঠাকুর বললেন, 'আমি গদাধর, এবার এই রকমই, সব ভেঙে চুরে নতুন কোরে গড়ব'।"

* * * * *

গোলাপ মা উদ্বোধনে দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্বে আমাকে ডেকে একদিন বললেন, "দেখ হরিহর, আমার বোধ হয় দেহ আর থাকবে না, কেবলই দেখছি একটা গৈরিক রুদ্রাক্ষপরা, ত্রিশূল-ধরা একটা মেয়ে আমার শরীর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তখন যেন দেহটা মড়ার মত পড়ে থাকে।"

গোলাপ মা বলতেন, "কোন একটা বিপদ আপদ বা শক্ত অবস্থা এলেই মা ঠাকরুণ খুব জ্ঞানীর মত ব্যবহার করতেন। ঠাকুরের অসুখের সময় তিনি ৺বাবা তারকনাথে ধর্ণা দিলেন, শুনতে পেলেন কতকগুলো হাঁড়ি ভাঙার শব্দ অর্থাৎ দেহ যাওয়া মানে পঞ্চকোষরূপ হাঁড়ি ভেঙে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়—তার মধ্যে যা ছিল তা তেমনই রইল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো, 'কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী'।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "পঞ্চকোষ ভেঙে গেলে তো তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হলেন, তা হলে 'লীলা-শরীরের' কথা যে শোনা যায়, সেটা কি?" বল্লেন, "সচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, তবে দিব্য-শরীর নির্মাণ কোরে ভক্ত সঙ্গে লীলা করেন।"

তারপর আবার বলতে লাগলেন, "সেই সময় তিনি একবার স্বপ্ন দেখলেন, মা কালী ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে কেন?' ঠাকুরের গলার ঘা দেখিয়ে বললেন, 'বড় ব্যথা তাই'। ঠাকুর দেহ রাখলে মা কেঁদেছিলেন, 'মা তুমি কোথায় গেলে?' রাসবেহারীকে একবার বল্লেন, 'এ দুনিয়া স্বপ্নবৎ। ভাব লীলা টিলা সব স্বপ্নবৎ, আমার সঙ্গে কথা বলছ এও স্বপ্নে। একমাত্র ঠাকুরই সত্য।' যে যেমন ঘরের তাকে তেমনি কথা বলেন, আমাকে কিন্তু ঠাকুর বলেছিলেন, 'শ্যাম জ্ঞানই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জগৎ খেলা, লীলা সব সত্য।

"ঠাকুরের দেহরক্ষার পর অস্থিরক্ষা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে গোল বাধল, মা বললেন, 'দেখ গোলাপ কি কাণ্ড! অমন সুন্দর দিব্য মানুষ চলে গেল, তার সঙ্গে খোঁজ নেই, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।"

আমিও আমার এক গুরু ভাইয়ের কাছে শুনেছি, তিনি মাকে কাশীতে বলেছিলেন, "নির্বাণ চাইনে মা, তা হলে তোমায় পাব না।" মা শুনে বল্লেন, "এমন বোকা! নির্বাণই যে ঠাকুরের স্বরূপ।"

* * * * *

১৯১৬ খ্রীঃ সেবার কাশীতে থাকাকালে মহাপুরুষ মহারাজের সহিত বাবুরাম মহারাজ রোজ বৈকালে নানাস্থানে বেড়াতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের গৈবীর জল খাওয়াবার জন্য নিয়ে যেতেন। প্রথমদিন যখন সেখানে আমরা যাই, সঙ্গে জিতেন মহারাজও (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী) ছিলেন।

সেখানে মহাপুরুষ মহারাজের এক প্রাচীন সন্ন্যাসী বন্ধুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি দ্বাদশ বর্ষ মৌনী ছিলেন, কথা জড়িয়ে গেছে। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তাঁর বিবরণ শুনে বাবুরাম মহারাজ সেই মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সব কৃচ্ছ্রতার দ্বারা বস্তু দর্শনের কোন সহায়তা হয় কি?" তিনি বল্লেন, "কুছ নেই! প্রারব্ধ মেঁ কুছ দুঃখ্ থা, উসকো খণ্ডন হো গয়া।"

বাবুরাম মহারাজ ফের তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতকাল তপস্যা করলেন, বস্তুব কিছু উপলব্ধি হয়েছে তো?"

বললেন, হাঁ পরমাত্মাকী কৃপাসে কুছ হুয়া, লেকিন্ ইস্ কৃচ্ছ্রতাসে কুছ নহী মিলা। জৌন্‌লোগ বিভূতিকামী লোককামী হ্যায় উন্ লোগোঁকো ইস্‌সে ফয়দা হো সক্তা।"

তখন শীতকাল। তাঁর পায় বাত হয়েছে, সেই জন্য পায়জামা পরে রয়েছেন।

একদিন বাবুরাম মহারাজ আমায় এবং আরও কয়েকজন সাধুকে সঙ্গে করে শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরু শ্রীশ্রীতোতাপুরী মহারাজের গুরুভাই শ্রীমৎ চামেলী পুরীর সহিত দেখা করবার জন্য তাঁর আশ্রমে গেলেন। একটা ছোট একতলা বাড়ী, সামনের আমগাছটায় একটা দোলনা, বসে দোল খাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে বলছেন, "শিব কেদার, গৌরী কেদার।" আমরা পদধূলি নেওয়ার পর, বাবুরাম মহারাজ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দেখলুম সর্দি হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কৌড়ি অস্‌পতালসে* আতো হো?"

বাবুরাম মহারাজ সে কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মাজী! পন্থ ক্যা হ্যায় বাতাইয়ে?"

চামেলী পুরী বললেন, "তু তো পন্থ জানতে হো, তেরা গুরু হি উদ্দেশ্য ঔর পন্থা ভি হ্যায়।"

বাবুরাম মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপকো ঔর বড়ে গুরু মহারাজকো (শ্রীশ্রীতোতা-পুরীজীর) কিতনে রোজ তপস্যাকে বাদ বিশ্বনাথজীকী কৃপা হুই থী?

বললেন, চালিস বরস নিরবচ্ছিন্ন সাধন করতে করতে তোতাজীকা নির্বিকল্প মিল গয়া। লেকিন বহত্তর বরিস কঠোর তপস্যাকে বাদ ৺মায়ীজীনে মুঝকো কৃপা করকে দর্শন দিহিন্।"

বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "হামারা গুরু মহারাজকো তো হরবখত ৺মায়ীজীকো দর্শন মিলতা থা, আপকা আভি উনকো দর্শন মিলতি?" বল্লেন, "কভি কভি ইঁহাহি ঘুমতি ফিরতি।" তারপর অন্য যাত্রী আসছে দেখে কাশীর হালচাল, খাওয়াদাওয়ার কথা উঠলো—আগে খুব সস্তা গণ্ডা ছিল, হালচাল আজ কাল বড় খারাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর বাবুরাম মহারাজ ও আমরা সকলে বিদায় নিলুম। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "কৃপানিদান কৃপা রাখিয়ে।" চামেলী পুরী বললেন, "শুন এক বাত হ্যায়, শরীর মে কুছ সর্দ লগা হুয়া, জেরা সে আদ্রক্ আউর নিমক কিসিকা পাশ ভেজ দেনা।" মহাপুরুষ মহারাজ শুনে স্বামী কালিকানন্দকে কয়েক দিনের জন্য তাঁর সেবার জন্য পাঠালেন। বাবুরাম মহারাজ দুচার দিন বিকালে আমাকে একবার করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলতেন, যদি কিছু দরকার হয়। সেখানে গেলেই আমাকে বলতেন, "ঝুলাঠো তো ঠেল।"

---

* কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থানীয় হিন্দুস্থানীগণের নিকট কৌড়ি অস্‌পতাল বলিয়া পরিচিত।

সর্বভারতীয় মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

ডক্টর রমা চৌধুরী

(সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতি)

বিগত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতায় শ্রীশ্রীজননী সারদামণি দেবীর জন্মশত-বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। বিগত ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমায়ের নারীভক্তগোষ্ঠীর এক নিখিল ভারতীয় সম্মেলনও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উভয় সম্মেলনের মধ্যে ফলতঃ একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এপ্রিলের নারীভক্ত-সম্মেলনে তাঁরাই বিশেষ করে প্রতিনিধিরূপে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত ও ব্রহ্মদেশ থেকে এসেছিলেন যাঁদের হৃদয়তন্ত্রীতে মাতৃভক্তির সুরই নিয়ত বাজে—জননীর যাঁরা একান্তই অনুগত ভক্ত। ডিসেম্বরের সম্মেলন মাতৃবৎসর উদ্‌যাপনের সর্বশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত—এই সম্মেলন আকারে ও পরিকল্পনায় কেবল বৃহত্তর নহে—হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় দিক থেকেই মাতৃদেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত না হয়েও শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে বরণীয় যাঁরা—তাঁদেরই সম্মেলন। তবে মাতৃদেবীর স্মৃতিশতবার্ষিকী সম্পর্কে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত বলে—নিয়ন্ত্রণের ভারও যেমন গ্রহণ করেছিলেন নারীরা, তেমনই সভায় পৌরোহিত্য ও বক্তৃতাদিতেও বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন নারীরাই। কেবল তাই নয়, সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসারে আলোচ্য বিষয়গুলিও নির্দিষ্ট হয়েছিল—তজ্জন্য, যথাক্রমে ধর্ম ও দর্শনে নারী, সমাজে নারীর স্থান, সাহিত্য-বিজ্ঞানে নারীর দান, শিক্ষাপদ্ধতিতে নারীশিক্ষার স্থান, নগরে ও পল্লীতে নারী-স্বাস্থ্য, নারীদের শিল্পকলা, শিল্পমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—প্রভৃতিই ছিল আলোচ্য বিষয়। কেবল স্বদেশের নয়—বিদেশীয় বহু কৃতী মহিলা—আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, চীন দেশীয়া অনেকেই—এ সম্মেলনে যোগদান করে সভায় নিখিল বিশ্ব পরিবেশ সংস্থাপন করেন এবং জননীর জীবন-মাহাত্ম্যের বিশ্বব্যাপিত্ব প্রকটিত করেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও বিশেষ করে ছাত্রীরা এই সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশনে জননীর জীবনাদর্শ-সম্বন্ধে আলোচনা-তৎপর হয়ে স্বকীয় জীবনে জননীর জীবনাদর্শের অনুভূতি উদ্‌ঘোষিত করেন এবং দেশের ভবিষ্যমঙ্গলের মূর্ত সূচনা সর্বজনহৃদয়ে উদ্রিক্ত করেন।

এই সম্মেলনে দিল্লী, মাদ্রাজ, কটক, পাটনা, ত্রিবেন্দ্রাম, বোম্বাই, নাগপুর, পুনা, কাশী, কুর্গ, ত্রিচূড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেড় শতাধিক নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন। ভারত সরকারও এঁদের যাতায়াতের বিষয়ে বিবিধ সুবিধা প্রদান করে আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ, সহসভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ, বিভিন্ন দিবসে পৌরোহিত্যের ভারগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি মনীষী ডক্টর যদুনাথ সরকার, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ, ডক্টর শ্রীমতী কমলাবাঈ দেশপাণ্ডে, জাপানের কলিকাতাস্থ রাজদূত শ্রীযুক্ত কসুয়া, ডক্টর শিবরাম মূর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দিবসে সম্মেলনের কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান ও বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য সকলকেই মুগ্ধ করেছে—সেটি হচ্ছে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা,

সকলের একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা, অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা। একদিকে কলিকাতা ইনষ্টিটিউট হলের মত বিপুল সভাগৃহে যেমন তিলধারণের স্থান থাকতো না —দিনের পর দিন পূর্ণ ছয় দিন— তদুপরি সকাল ও বিকাল, তেমনি একটি সূচি-পতনের শব্দও যেন শোনা যেতো—জনসাধারণ ও ভক্তমণ্ডলী সমবেতভাবে এমনি থাকতেন অবহিত, পূর্ণ নিস্তব্ধ। সকলে যেন একমন একপ্রাণ হয়ে— বিভিন্ন শরীরে একই আত্মার মূর্ত প্রতীকরূপে সভাগৃহ পূর্ণ করে, একই পরমাজননীর ধ্যানে চির-নিমগ্ন থাকতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একজন শ্রোতাও কক্ষত্যাগ যেন করতেন না। কতদিকে তো কত উচ্চাঙ্গের গুরু বিষয়ের সভা হয়—কোথাও তো এই ভক্তিবিনিবেদন পরিদৃষ্ট হয় না, কোথাও তো জগজ্জননীর এমনি অপূর্ব অশরীরী আবির্ভাব সমগ্র মানবমনকে এমনি করে একই তানে, একই সুরে করে অকৃষ্ট করে রাখতে পারে না। এ কোন্ ঐশী শক্তি—যা ঐ কয়দিন বিরাট জনসমুদ্রকে মন্ত্রমুগ্ধ, সমমনঃপ্রাণ করে রেখেছিল ?

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। ভারতসন্তান প্রত্যেক নারীকে আদ্যাশক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে স্বতঃই স্থান দেয়— এখনও পর্যন্ত এই সোনার ভারতের তথাকথিত নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাধারণও যে কোনও নারীকে দেখলে "মা" "মা" বলে অকাতরে সসম্ভ্রমে নির্মল সম্বোধন বিজ্ঞাপিত করে। ভারতবর্ষ ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও বিবাদ করেছে, কিন্তু মাতৃদেবী যে শ্রেষ্ঠ গুরু, আরাধ্যতমা সম্পদ—এই বিষয়ে বিবাদ করার কথা দূরে থাকুক, কোনও দ্বিন সন্দেহমাত্র প্রকাশ করেনি। এই মহনীয় মাতৃজাতি যখন সমাজের দৃষ্টিতে কালক্রমে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বীয় কক্ষচ্যুত হলেন—স্বয়ং জগজ্জননী আবির্ভূতা হলেন মাতৃরূপে, জননী সারদার কায়পরিগ্রহ করে। নিজে স্বয়ং অব-গুণ্ঠনবতী লজ্জাপটাবৃতা থেকে নিগূঢ় সাধনায় সর্বসিদ্ধা হয়ে জগজ্জনকে কি অপূর্ব শিক্ষাই না তিনি দিয়ে গেছেন! নিজে স্বামীর ছায়ারূপে থেকে কি মহিমময় আত্মসত্তাই না জননী লুক্কায়িত করে রেখেছিলেন। তাঁর মূর্ত শরীরে তপস্যার ফলে ভারতীয় নারীসমাজ আজ দিকে দিকে কতই অভ্যুন্নতি লাভ করছে। সে কয়দিন কলিকাতার চল্লিশ লক্ষ নর-নারী, শুধু কলিকাতার নয়—নিখিল বঙ্গদেশের ও অখিল ভারতের কোটী কোটী মানব অতন্দ্রিত নেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত চিত্তে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলের ঐ সভাকক্ষের সহস্রাধিক নরনারীতে যেন তপোমগ্ন ও ধ্যানাবিষ্ট হয়েছিলেন—তাই ঐ বিরাট জনতা এমনি শান্ত সমাহিত ধ্যানাবস্থিত হওয়ার চারুতম সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিল। তাই বিগত একবৎসরব্যাপী জননীর সেবায় ধন্য তাঁর ভক্ত ও সেবকমণ্ডলী নিখিল বিশ্বে ভক্তিমন্দাকিনীর এমনি একটী অপূর্ব আনন্দহিল্লোল, ধ্যানকল্লোল সংপ্রেরণে সমর্থ হয়েছেন। জননীর অবর্ণনীয় মহিমা প্রতিটি হৃদয়কে ফুল্লতম বিকাশে ধন্য করুক—আজ এই প্রার্থনা।

সমালোচনা

সাংখ্য ও যোগ (পরিচয় ও সাধনা)— শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত; প্রকাশক— শ্রীমৎ সুপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, কপিল মঠ, মধুপুর (এস্ পি); পৃষ্ঠা ২২৬+॥০; মূল্য—৩৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা দার্শনিক সাহিত্যে একটি নূতন সংযোজন। গ্রন্থকার উচ্চ রাজকীয় পদ হইতে অবসর লইয়া দার্শনিক আলোচনায় নিবিষ্ট আছেন। উক্ত গ্রন্থ তাঁহার অধ্যয়ন ও সাধনার ফল। গ্রন্থের

প্রথম ভাগে সাংখ্যদর্শন এবং দ্বিতীয় ভাগে যোগ-দর্শন বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন ভাগে ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকার ৬৮টি কারিকা এবং যোগ-দর্শন ভাগে চারি অধ্যায়ে মহর্ষি পতঞ্জলির সূত্রগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রচলিত ভাষ্য ও টীকা অনুসারে কারিকা ও সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল ও স্বচ্ছ, এবং ব্যাখ্যা-প্রণালী সুন্দর। যাঁহারা অল্পের মধ্যে সাংখ্য ও যোগদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থে সাংখ্য ও যোগদর্শনের কাল নির্ণয়ের জন্য গন্থকার কোনও চেষ্টা করেন নাই। কোন্ উৎস হইতে উক্ত দুই দর্শন উদ্‌ভূত হইয়াছিল তাহার আলোচনাও গ্রন্থকার করেন নাই। কোনও সমালোচনাও গ্রন্থে নাই।

ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় ও সাংখ্যসূত্রে যে ছবি বিবৃত আছে, তাহাই মহর্ষি কপিলের দর্শন বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু এ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গীতায় যে সাংখ্যের কথা আছে, তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য নহে। চরকসংহিতার প্রথমে যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের এক রূপ। চরকসংহিতায় অব্যক্তকে আত্মা ও একস্থলে পরমাত্মাও বলা হইয়াছে। সুতরাং অব্যক্ত হইতে উদ্‌ভূত মহৎ, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি এই মতে অচেতন নহে, চেতন পদার্থ। মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের বর্ণনা একাধিক স্থলে আছে। অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে (৪০ অধ্যায়ে) মহত্তত্ত্বকে পুরাতন পরমপুরুষ বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ "ক্ষিতিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ, অহংকার"কে তাঁহারই অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি বলা হইয়াছে। অথচ ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় ঈশ্বরের উল্লেখমাত্র নাই এবং সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বর প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলা হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের অধিকাংশই যে ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত, কপিলসূত্র নহে ইহা অনেকে মনে করেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যের ভূমিকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥

অর্থাৎ "জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশাস্ত্র কালকবলিত। ইহার আলোচনা প্রায় লুপ্ত; কণামাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি বাক্যামৃত দ্বারা পুনরায় তাহার কলেবর পূর্ণ করিব।" এই 'বাক্যামৃত' বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্যই হউক অথবা তদ্‌রচিত সূত্রাবলীই হউক, সাংখ্যদর্শন যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বৌদ্ধ প্রভাবেই যে মহর্ষি কপিলের দর্শন নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার কারণ আছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ৫।১০ সূত্রে যে বলা হইয়াছে "প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন" তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক (পরমহংসদেব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন) তাহার আনুমানিক ও শাব্দ প্রমাণ যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজে বিশ্বাসী ও ভক্ত। তিনি এই অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে অসঙ্গতির অভাব নাই। এই নিরীশ্বর দর্শনকে আস্তিকদর্শন বলিবারও সঙ্গত কারণ নাই। কেননা যে ঈশ্বরের কথায় উপনিষৎসকল পূর্ণ, তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলা, আর বেদের প্রমাণ অস্বীকার করা একই কথা।

পাতঞ্জল সূত্রাবলীর এক নাম সাংখ্যপ্রবচন সূত্র। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত, এবং তাহা সেশ্বরসাংখ্য নামে পরিচিত। পাতঞ্জল-দর্শনের সহিত ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ও সাংখ্যসূত্রের সর্বত্র মিল নাই। এই সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন সাংখ্যদর্শন পড়িবার সময়ে মনে উদিত হয়। ভাষ্যকার ও

টীকাকারগণ এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সর্বত্র সন্তোষজনক মনে হয় না। স্বল্পপরিসর গ্রন্থে গ্রন্থকার সে সকল প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারেন নাই। তাহা সত্ত্বেও নূতন শিক্ষার্থিগণ এই গ্রন্থপাঠে যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—শ্রীতারকচন্দ্র রায়

Advaita Vedanta and Modern Physics—By Srimat Puragra Parampanthi. Published by Sri Jogiraj Basu "Viraj", Dr. Basu's Road, Dibrugarh, Assam. Pp. 138. Price Rs. 3/- :—

বেদান্ত অপৌরুষেয়। তার বাণীও শাশ্বত। যুগে যুগে তার সত্যনিষ্ঠ ও স্বর্ণোজ্জ্বল বাণী বিভিন্ন তত্ত্ব ও বাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়েছে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানসন্ধিৎসু মনেও তার ব্যতিক্রম নেই। এই পুস্তকটি অজ্ঞেয়-শক্তি-সম্ভূত-জড়বাদে বিশ্বাসী বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বেদান্তের যুক্তিবত্তার রহস্যোদ্ঘাটনের একটি প্রশস্ত প্রয়াস। এই জন্য গ্রন্থকার পরমপন্থীজী বিশেষ করে বেদান্তের বিশ্ব-জন্মরহস্য-বাদটিকে আইনষ্টাইন্, এডিংটন, জীনস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানস্বরীদের উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে উহা যে একান্ত বিজ্ঞান-সম্মত তা দেখিয়েছেন। পুস্তকটি সুখপাঠ্য, অনুসন্ধিৎসা-পোষক এবং বিষয়বস্তু-পরিবেশনে এক নূতন আস্বাদন যোগায়। তবে বেদান্ত ও বিজ্ঞান বিচার কেবলমাত্র উক্তিধৃত না হ'য়ে যতদূর সম্ভব উদাহরণ-মুখী হওয়াই যুক্তিযুক্ত,—এ পুস্তকে তাহার অভাব বৈদান্তিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়কেই হতাশ করেছে। সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ পুস্তকাদির গড্ডালিকা-প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্রগতি এই নবজাত পুস্তকটিকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

National Political Economy of Bharatiya Samajik Republic—By Service and Goodwill Mission, Published by Sri Nilmadhab Gangooli, 4 Santosh Mitra Square, Calcutta--12. Price Rs. 7/8-

৩৫৯ পৃষ্ঠার এই ইংরেজী পুস্তকখানি ষোলটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানান রীতিবাদ, সনাতন ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান ও কংগ্রেসী আদর্শের পটভূমিকায়, আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল প্রভৃতি অনেকেরই আহ্বান আছে। কি পন্থা অবলম্বন করলে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে আবার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক রাস্তা ও কাল্পনিক চিত্র আঁকা আছে, দেখা গেল। বহুস্থানে বিষয়বস্তুর সংজ্ঞানির্দেশ ও ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে অনেক-গুলি উক্তি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :—

"The scope of religion is limited and that of democracy is unlimited". "Democracy gives rise to internationalism whereas religion cannot" ; "Each human personality is the outcome of environmental causes" ; "The intellectual leadership is the embodiment of secularism that is purely Indian" প্রভৃতি। তাছাড়া secularism ভাল এবং ভারতের পক্ষে তা গ্রহণ করা ভালই হয়েছে এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—"Secularism that is to say humanism" প্রভৃতি। এ শুনলে মনে হয়, তিনি ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানে দেবত্বের ছোঁয়াচ পছন্দ করেন না। কিন্তু তিনিই আবার এক জায়গায় "হরিজন" কে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন—"Harijan—God in man." তা

ছাড়াও আছে—"It is high time that we should try to revive our tradition and establish organisation to help our womenfolk to reconquer their lost glory and make every house a *paradise* where life will be *Satyam, Shivam and Sunderam.*" আবার "Humanity and Divinity are one" এও লিখেছেন। এই ভাবে প্রয়োজনানুযায়ী কোথাও ঈশ্বরত্বকে অর্ধ-চন্দ্রপ্রদান আবার কোথাও রত্নসিংহাসন-দান সুধীজন সমর্থন করবেন কি? শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছেন, "He (Sri Aravinda) was the real intellectual heir of Vivekananda" অথচ সেই বিবেকানন্দজীই ভারতীয় সমাজনীতি সম্পূর্ণভাবে God-intoxicated করতে বলেছেন। তাছাড়া লেখকের "Neo-Vedantism of Vivekananda" এবং Neo-Vedantism মানে "power of the soul and its essential union with God" লেখক ছাড়া অপরের পক্ষে উপলব্ধি করা শক্ত। সংজ্ঞা ও তথ্যনির্ণয় প্রসঙ্গেও "By state is meant nation and nationalism"; "Geological causes have produced the globe"; "To impart knowledge is the task of education"; "The essence of education is information" প্রভৃতি উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। অবশ্য মনগড়া সংজ্ঞার নজীর দেখিয়ে যদি কেউ কিছু বলে তাহ'লে কিছু বলবার থাকে না। তবে তারও একটা বিশেষ গণ্ডী থাকা চাই।

—ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৺অধরচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, তারা লাইব্রেরী, ১০৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৪৫৬+১৬০; মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীধরস্বামী কৃত 'সুবোধিনী' টীকা এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'সারার্থ-বর্ষিণী' টীকা-যুক্ত আলোচ্য পুস্তকখানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ টীকায় যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ কি এবং সাধক কি ভাবে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তি-ভাবে এইরূপ সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ অন্যত্র দুর্লভ, তাই ভক্তমাত্রেরই এই টীকাখানি পরম প্রিয়। স্বর্গত সম্পাদক ৺অধরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রভূত অর্থব্যয়ে বহু হস্তলিখিত টীকা সংগ্রহ করিয়া সুষ্ঠু পাঠোদ্ধার পূর্বক প্রায় পনর বৎসর পূর্বে ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর শ্রীপুরাণদাস অষ্টতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের মূল শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ বেশ ভাবানুগ ও সাবলীল হইয়াছে। সুন্দর মুদ্রণ ও প্রচ্ছদবিশিষ্ট গ্রন্থখানি পণ্ডিত ও ভক্ত-সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক—রমেন চৌধুরী-প্রণীত; প্রকাশক—বিশ্বজিৎ সেন, বি. সেন য্যাণ্ড কোং, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২

পৃষ্ঠা—১৩৫; মূল্য—৩৷৹ আনা।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে মহিলা সাহিত্যিকগণের অবদান কি তাহার ধারাবাহিক পরিচয় এই বইটিতে সুন্দরভাবে উপস্থিত করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠক-পাঠিকাগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা

দেবী প্রমুখ ১৯ জন মহিলা-সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সাহিত্য-কীর্তি চিত্তাকর্ষক ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মচরিতের কথা বাঙালীমাত্রেরই সমাদরণীয়। বাঙালীর সংস্কৃতি-গৌরব ও জাতীয়তাবোধকে পরিপুষ্ট করিতে পুস্তকটি প্রচুর সহায়তা করিবে; এই তথ্যপূর্ণ মূল্যবান্ গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার হউক ইহাই প্রার্থনা। আশা করি পুস্তকের সঙ্কলিত দ্বিতীয় পর্বও লেখক অচিরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কাশ্মীরে সেবা ও ধর্মপ্রচার—কাশ্মীরের বহুসংখ্যক বন্ধু এবং ভক্তের আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গত ১৩ই মে, ১৯৫৪ শ্রীনগরে একটি শাখাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দুঃস্থ ও পীড়িতগণকে ঔষধপথ্যাদি দ্বারা সহায়তা এবং জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তের উদার সার্বভৌমিক ভাব প্রচারই এই কেন্দ্রের কর্মসূচী। বর্তমানে একটি ভাড়াটে বাড়িতে আশ্রমটি স্থাপিত। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ মাসের এ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীতে ১২,০১৮ জন রোগীকে (নূতন সংখ্যা—৩৮৮৩) চিকিৎসা করা হইয়াছে। দরিদ্র ও রুগ্ন শিশুদের মধ্যে ৫৮০০টি মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট এবং ১৭৫০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছিল। লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা ছিল ৪৩৯, ৮৭টি বই বাহিরে পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকার সংখ্যা ছিল ১৪। এই সাত মাসে ৫৪টি ধর্মবিষয়ক ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপূজা এবং ধ্যানধারণার জন্য আশ্রমে একটি ঠাকুরঘর আছে। আগ্রহশীল ভক্তেরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। গত ১৯শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী-অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ এবং শ্রীমতী সুকন্যা বধেবায়ার, শ্রীমতী শকুন্তলা আম্মা, পীর হিসামুদ্দীন ডাঃ এস্ এন্ পেশিন, এবং অধ্যাপক এস্ এল্ পণ্ডিত।

কনখল কেন্দ্রের সেবাকার্য—কনখল (হরিদ্বার) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৩ সালের মুদ্রিত কার্য-বিবরণী আমরা কয়েকমাস পূর্বে পাইয়াছি। আলোচ্যবর্ষে সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে ১৭৪৭ জন (গড়ে দৈনিক ৩৪টি রোগিশয্যা অধিকৃত ছিল) এবং বহির্বিভাগে ৬৫,৭১৯ জন (নূতন—২২,০০৪ ; পুরাতন—৪৩,৭১৫) রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ৫৮ জন দরিদ্রস্থানীয় অধিবাসীকে শীতবস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীতে রক্তাদি পরীক্ষার সংখ্যা ছিল ১৩৯৮। সেবাশ্রমে একটি পুস্তকাগার আছে, রোগীরা ইহার ব্যবহার করিতে পারেন। আলোচ্য বর্ষে পুস্তক ও পত্রিকাদির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১৮৯ এবং ২২। স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী-উৎসবে ৩০০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে রচনা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাহায্যে ১৫০০০ গ্যালনের জলের ট্যাঙ্ক ও অনুসঙ্গী জলের পাইপ, ভূগর্ভস্থ ড্রেন, স্নানাগার এবং উন্নত ধরণের পায়খানা প্রভৃতির নির্মাণকার্যের অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।

দিল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-জয়ন্তী—গত ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নূতন দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের উদ্যোগে দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৫ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীর বিনয়নগর এলাকায় আহূত সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ), স্বামী জপানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং শ্রীমতী সীতাবাঈ। ১১ই ফেব্রুয়ারী উৎসবের আয়োজন হয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে। দিল্লীর 'বৈদিক সমাজম্'এর কয়েকজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে আবৃত্তি করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের ছাত্রীগণ কর্তৃক প্রারম্ভিক এবং মিরান্দা হাউসের (দিল্লীর অন্যতম স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়) বিদ্যার্থিনীগণ কর্তৃক সমাপ্তি সঙ্গীত গীত হয়। কয়েকজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ ও আবৃত্তি করেন (এই অংশগুলি মুদ্রিত কাগজে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হয়)। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং দিল্লীর বিভিন্ন কলেজের শত শত ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে সোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী নূতন দিল্লীর লোদি কলোনীতে আয়োজিত একটি সভার নেতৃত্ব করেন স্বামী জপানন্দজী। বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী লক্ষ্মীভট, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ দিন ধরিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে দিল্লীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের প্রায় দুই সহস্র ছাত্রছাত্রীর স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী হইতে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী ছিল—'ছাত্রদিবস'। এই উপলক্ষ্যে বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আহূত একটি সভা পরিচালনা করেন ভারতলোকসভার সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী এন্ মেনন্। বক্তা ছিলেন ২ জন ছাত্র এবং ৪ জন ছাত্রী॥ সভানেত্রীর উদ্দীপনাময় ভাষণ সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আর্যব্যায়ামশালার ব্যায়াম-বীরগণ নানাপ্রকার শারীরিক শক্তিক্রীড়া প্রদর্শনে সমবেত সকলকে মুগ্ধ করেন। সভান্তে কেন্দ্রীয় শিক্ষাধিকার কর্তৃক কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভার নেতৃত্ব করেন কাশ্মীর ও জম্মুর সর্দার-ই-রিয়াসত্ যুবরাজ শ্রীকরণ সিং। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর নানাদিক লইয়া ভাষণ দেন ডক্টর ভি কে আর ভি রাও (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক-প্রধান), স্বামী জপানন্দজী এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। সভারম্ভে নয়াদিল্লীর 'বৈদিক সমাজম্' বেদপাঠ এবং লেডি আরুইন স্কুলের বাঙালী ছাত্রীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে' সুললিত স্বরে গান করেন। সভাপতি সর্দার-ই-রিয়াসত্ প্রথমে ইংরেজীতে এবং পরে হিন্দীতে যুগাচার্য স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া সুচিন্তিত ভাষণ দেন। আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্র-ছাত্রীগণকে সভাপতির হাত দিয়া প্রায় দুইশত পুরস্কার পুস্তক বিতরণ করা হয়। ঐ দিন রাত ৯৷৷৹ টায় অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও এই দিনকার অনুষ্ঠানের বক্তৃতাগুলি হইতে নির্বাচিত অংশ বেতারে প্রচার করিয়াছিলেন।

করিমগঞ্জে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী—এই উৎসবের আয়োজন হয় ২৬শে কার্তিক (১২ই নভেম্বর, ১৯৫৪) হইতে ২৯শে কার্তিক পর্যন্ত। অর্ধমাইল-দীর্ঘ একটি শোভাযাত্রা, বিশেষপূজা পাঠ হোমাদি, আলোচনাসভা, পদকীর্তন, মহিলাসভা

ছায়াচিত্রে বক্তৃতা কর্মসূচীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত করিয়াছিল। বিভিন্ন ভাষণে অংশ গ্রহণ করেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্য-মনীষী ও বক্তা আচার্য শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, শ্রীমতী মিলনশশী মজুমদার, শ্রীমতী প্রভাবতী সাহা, শ্রীমতী মাধুরী মজুমদার ও কুমারী আরতি আদিত্য ও শ্রীধর্মদাস দত্ত। একদিন অন্যূন ১২ হাজার দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্তগণকে বসাইয়া খিচুড়ি, ডালনা, টক ও পায়স প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীরাধারমণ দাস বাবাজী এবং কলিকাতার শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন দিন তাঁহাদের সুললিত কীর্তনগানে সকলকে তৃপ্তি দেন।

সিংহলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সেবা—সিংহল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের (প্রধান কেন্দ্র—কলম্বো) ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে এই শাখা কেন্দ্রটির বহুমুখী কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: ১৯৫২ সালের ৮ই ডিসেম্বর কাতারাগামায় শ্রীমায়ের শতবর্ষপূর্তিদিবসে ছাত্রাবাস ও সংস্কৃতিভবনের ভিত্তিস্থাপন, ১৯৫৩ সালের ১২ই জুলাই সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীডাডলি সেনানায়েক কর্তৃক ধর্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন, ওয়েলাওয়াটের ৪৪ ও ৪৩তম রাস্তার যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সড়ক নামকরণ, কলম্বো আশ্রমে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন। বাটিকালোয়া, জাফনা, ত্রিনকোমালী ও বাদুল্লা জেলায় প্রথম শ্রেণীর উচ্চ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক ২৪টি শিক্ষায়তনে সর্বতোমুখী বিকাশের সুযোগলাভ করিয়া মোট ৬৯৫৮ জন (৪,৩৩৩ বিদ্যার্থী ও ২,৬২৫ বিদ্যার্থিনী) অধ্যয়ন করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-পূজা, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, বিজয়া দশমী, খ্রীষ্ট-জন্মোৎসব, মহাশিবরাত্রি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

পরলোকে আইডা আনসেল—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের বেদান্তপ্রচারকার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিশিষ্ট মহিলাভক্ত আইডা আনসেল গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫৫) ৭৮ বৎসর বয়সে স্বল্পকালস্থায়ী পক্ষাঘাত রোগে দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া বেদান্তসমিতির 'বিবেকানন্দ হোম্'-এ দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৭ বৎসর যাবৎ তিনি এই আশ্রমেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এই চারজন সাক্ষাৎশিষ্যের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার নাম দেন 'উজ্জ্বলা'।

আইডা আনসেলের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় বোষ্টনে। পরে তিনি প্যাসিফিক উপকূলে আসিয়া স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে এবং লস্‌এঞ্জেলিস শহরে দীর্ঘকাল ষ্টেনোগ্রাফারের কাজ করেন। তাঁহার লিপিবদ্ধ স্বামী তুরীয়ানন্দের এবং স্বামী বিবেকানন্দের মনোজ্ঞ স্মৃতিকথা 'Vedanta and the West' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (উদ্বোধনে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে)। স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড নোটও তিনি লইয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গৃহীত ঐ নোটগুলিকে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বামীজীর বিস্তারিত বক্তৃতার আকারে রূপান্তরিত করিতেছিলেন। 'Vedanta and the West এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রকাশের জন্য তিনি স্বামীজীর এইরূপ ১৩টি অপ্রকাশিত বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এগুলি এই মহীয়সী মহিলার জীবনের বহুমূল্য কীর্তি সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর অষ্টম ভাগে আইডা আনসেলের প্রস্তুত স্বামীজীর ৪টি বক্তৃতা (পূর্বোক্ত ১৩টি ছাড়া) মুদ্রিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে

আইডা আনসেল ছিলেন অতি সরল ও অমায়িক প্রকৃতির নারী। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁহার কর্মোত্তম ছিল অদ্ভুত। সুদীর্ঘ ৭৮ বৎসরের জীবনে সংগৃহীত নানাবিধ পুস্তক, ফটোগ্রাফ, চিঠি-পত্র এবং অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নাদি দ্বারা ভর্তি তাঁহার ক্ষুদ্র বাসকক্ষটি একটি প্রদর্শশালার ন্যায় দেখাইত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন —"তুমি যা চাও তাই পেতে পার। যদি ভোগ-সুখ চাও তো তাই আসবে, আর যদি 'মা'কে চাও তো তাঁকেই পাবে।" পক্ষাঘাতের আক্রমণে অজ্ঞান হইবার পূর্বে আইডা আনসেলের মুখ দিয়া উচ্চারিত শেষ শব্দ শোনা গিয়াছিল—'মা'।

জগদম্বা আত্মনিবেদিতা কন্যাকে পরাশান্তি দান করুন—ইহাই প্রার্থনা। ওম্ শান্তিঃ।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তী উৎসব—গত ১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম পুণ্যাবির্ভাব তিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শত শত নরনারী মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৭ হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষ্যে মন্দিরে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্-আবৃত্তি, রামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ এবং কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্তন-ভজন এবং বিশেষপূজা হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে মঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধনার মধ্য দিয়া প্রাচীনের সহিত নবীনের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ভাবধারার সহিত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার একটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। হৃদয়ের আনন্দই এই উপলব্ধির মূল উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মন আনন্দের দিকে উধাও হইয়াছিল। তিনি ভারতের সনাতন ধারা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেও ইহার মধ্যে যুগোপযোগী ভাবধারারও স্থান ছিল। তাঁহার শিক্ষা ও বাণীর মধ্যে ভারতের প্রাচীন ধারা এবং নবীনের ইঙ্গিত দুই-ই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্মকে পরিহার করেন নাই, কিংবা গৃহস্থকে সন্ন্যাসী সাজিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, নিষ্কামভাবে ভগবান্‌কে লাভ করার জন্য যে কর্ম তাহাই যথার্থ কর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে মানুষ আজ নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী হিন্দীতে বলেন, রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জনসাধারণের উদ্দেশে উহা জীবনে রূপায়িত করার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীও বক্তৃতা করেন।

রাত্রিতে মন্দিরে দশমহাবিদ্যার পূজা হয়। শেষরাত্রে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী ৯ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং ৩২ জন ব্রতীকে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য দান করেন।

দুই দিন পরে, রবিবারে (১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ৫৫) মঠে সাধারণ মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ঐ দিন সারাদিনে বেলুড় মঠে প্রায় পাঁচ লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়। কলিকাতা ও সহরতলী ছাড়াও দূরদূরান্ত হইতে আগত আবালবৃদ্ধ নরনারী ঠাকুর-দর্শনের নিমিত্ত মন্দিরে ভিড় করে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাহারা ঠাকুর দর্শন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। সারাদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কালীকীর্তন ও অন্যান্য ধর্মসঙ্গীত গীত হয়। রাত্রিতে যথারীতি বাজি পোড়ান হইয়াছিল।

উদ্বোধন

বুদ্ধের অবস্থা

যত্থ চ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি
ন তত্থ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন পকাসতি
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি
যদা চ অত্তনা বেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো
অথ রূপা অরূপা চ সুখদুক্খা পমুচ্চতি তি ॥

—উদান, ভদ্দিয়বগ্গো

দিবা তপতি আদিচ্চো রত্তিমাভাতি চন্দিমা।
সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো।
অথ সব্বমহোরত্তং বুদ্ধো তপতি তেজসা ॥

—ধম্মপদং, ব্রাহ্মণবগ্গো

[ভগবান বুদ্ধ একসময়ে আত্মস্থ হইয়া বোধি-অবস্থার নির্দেশক এই গাথাটি উচ্চারণ করিতেছিলেন। সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে যে পরমা শান্তি অনুভূত হয় মানুষের প্রচলিত কোন শব্দ দ্বারা তাহা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আমাদের নিত্যপরিদৃষ্ট সংসারের কোন মান দ্বারাই সেই চরমকাম্য বোধি-সম্পদের মূল্য নিরূপণ করা যায় না।]

যখন মুনি বা প্রজ্ঞাবান্ ব্রাহ্মণ ধ্যানের দ্বারা সমাধি উপলব্ধি করেন তখন রূপ অরূপ সুখ দুঃখ সমস্তই লোপ পায়। সকলপ্রকার বহির্বিষয়নিরুদ্ধ সেই মহানিঃসঙ্গতায় ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু যাইতে পারে না, তথায় চন্দ্র আদিত্য বা নক্ষত্র কিছুই কিরণ দেয় না—কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না উহা অন্ধকার। লৌকিক জ্যোতি নাই বটে, কিন্তু বোধির আলোকে উহা চির-ভাস্বর।

[মানুষের জানা যত জ্যোতি উহাদের তুলনায় বুদ্ধের জ্ঞানালোকের পার্থক্য কী বিপুল !]

সূর্য প্রকাশ পান দিনে, চন্দ্র-কিরণের প্রভা আমরা দেখিতে পাই রাত্রিতে। মহাবীর ক্ষত্রিয়ের শৌর্য বিকীর্ণ হয় যখন তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হন, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া উঠে যখন তিনি ধ্যানতদ্গত। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহার প্রজ্ঞাজ্যোতিতে কি দিবা, কি রাত্রি সর্বদা সমানভাবে দীপ্তিমান থাকেন।

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষে

১লা বৈশাখ বাঙালীর নূতন বৎসরের প্রথম দিন, চতুষ্পার্শ্বের পুঞ্জীভূত দুঃখ-দৈন্য-নৈরাশ্য সত্ত্বেও নূতনের আহ্বানে আনন্দে সাড়া দিবার দিন, ক্লান্ত উদ্যমকে সযত্নে উদ্বুদ্ধ করিয়া নবীন উৎসাহে পথ চলিতে প্রস্তুত হইবার দিন। এই পুণ্যদিনে বাঙলার এবং বাঙলার বাহিরের সকল বঙ্গসন্তানের সহিত সমবেতভাবে আমরা জগদীশ্বরের করুণা ভিক্ষা করি। বাঙালী সবল হউক, বাঙালী এক হউক, বাঙালী স্বপ্রতিষ্ঠ হউক। যে জাতির ভিতর বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীভগবান দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছেন—শুধু ভাবুক বাঙালীর মনগড়া অলস কল্পনা-দৃষ্টিতে নয়, সমসাময়িক ইতিহাসের প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনা-পারম্পর্যের প্রখর বিচারে—সেই জাতির অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির মূল্য অপরিসীম। সাময়িক বিপর্যয় সেই শক্তিকে আংশিক আবৃত করিতে পারে, কিন্তু বিনাশ করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের বাঙলায় সত্য-প্রেম-সমন্বয়ের যে অমিত সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা নববর্ষের প্রথম দিনে বাঙালীর বিশেষ করিয়া স্মরণ করিবার। এই স্মরণে আসিবে আত্মবিশ্বাস, সাহস, সম্মুখযাত্রার উৎসাহ। দশ দিকের বিপদ বাঙালীকে আজ যদি কাটাইয়া উঠিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হইতে হইবে। বাহিরের সাহায্যের দিকে বেশী না চাহিয়া নিজের জীবনী-শক্তির দিকে তাকাইতে হইবে। ভগবান যে আমাদেরই মাটিতে আসিয়াছিলেন, আমাদেরই ভাষায় কথা বলিয়া আমাদিগের মধ্যে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া কাজ করিয়া আমাদিগকেই তাঁহার যুগব্রত সংসাধনের সহায়ক নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা কি শুধু আকস্মিক ঘটনা? নিশ্চিতই নয়। বাঙালীর মন, হৃদয়াবেগ, বুদ্ধিকে আধার করিবার তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল—অপরিহার্য প্রয়োজন। এখনও আছে। সেইজন্যই বাঙালীকে বাঁচিতে হইবে, চলিতে হইবে, বাড়িতে হইবে। আজিকার বাঙালীর সম্মুখে দায়িত্ব অতি বৃহৎ। কাহারও সেই দায়িত্বকে পাশ কাটাইলে চলিবে না। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, পুরুষ-নারী—বঙ্গমাতার প্রত্যেক সন্তানের বাঙালীর সামগ্রিক জীবনের সংরক্ষণ ও পরিপ্রসারে কিছু না কিছু দিবার আছে। প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত মিলিতে হইবে, প্রত্যেকের ব্যথা বুঝিতে হইবে, প্রত্যেককে সাহায্য করিতে হইবে। নিজের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া নিজের ঘরটি গুছাইয়া লইয়া নিরাপদ কোণে আত্মগুপ্তি—এই পথে চাতুর্য থাকিতে পারে কিন্তু মহত্ত্ব নাই। আজ চাই প্রচণ্ড আত্মত্যাগ, বিপুল কর্মোদ্যম, অটল সহিষ্ণুতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর জন্য এই সঙ্কল্প রাখিয়া গিয়াছেন—"উঠ মা, হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।" এই সঙ্কল্পকে মনঃপ্রাণে গ্রহণ করিয়া বাস্তবকর্মে রূপায়িত করিবার প্রয়োজন—আজ বঙ্কিমের কাল হইতে সত্তর বৎসর পরেও যেন অনেক বেশী উপস্থিত হইয়াছে, যদিও বঙ্কিমের সময় ভারত বৈদেশিক শাসনভারে প্রপীড়িত ছিল, এখন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে।

বৈশাখী পূর্ণিমা স্মরণে

ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম।

আগামী ২২শে বৈশাখ (৬ই মে, শুক্রবার) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার পুণ্য জন্ম, বোধি-লাভ এবং মহাপরিনির্বাণের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিবার দিন। তাঁহার চরিত্রজ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া একদা ভারতবর্ষের ইতিহাস সহস্র বৎসর

ধরিয়া বিস্ময়করভাবে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিল—ধর্মে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজিক কল্যাণে, রাজনৈতিক শক্তিমত্তায়। পরে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল—কিন্তু বুদ্ধ নন। বুদ্ধ ভারত-মানসে চিরদিন জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন এবং থাকিবেন। বুদ্ধের সম্মান হিন্দুভারত রাম কৃষ্ণ পরশুরামের সহিত একই পর্যায়ে দিয়াছে এবং দিবে। ধর্ম যদি কোন গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহার বিশুদ্ধ কল্যাণকর রূপ ঢাকা পড়ে, অধর্ম তখন ধর্মের সাজে লোককে প্রতারণা করে। সেই প্রতারণা হইতে সমাজ সহজে নিষ্কৃতি পায় না, বিপুল জনসঙ্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বঞ্চিত, নিপীড়িত, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চলে। অবশেষে একদিন ভগবান মুখ তুলিয়া চান, মানুষের মধ্যে নামিয়া আসেন পরিত্রাতা। এইরূপই আসিয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার পথভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ্যের অত্যাচার হইতে দুর্গত ভারতীয় জনগণকে উদ্ধার করিবার জন্য। উদ্ধার করিয়াছিলেন পৌরোহিত্য ও শাস্ত্রজটিলতা হইতে নির্মুক্ত সাম্য-মৈত্রী-সুনীতিপ্রতিষ্ঠ উদার সদ্ধর্ম প্রচার দ্বারা। হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মকে প্রত্যাখ্যান করিলেও ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্মকে অনাদর করে নাই। তথাগতের সদ্ধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত মিশিয়া আছে এবং বরাবরই থাকিবে।

আচার্য শঙ্করের উদ্দেশ্যে

শ্রীজহরলাল নেহরু তাঁহার 'বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন (৪৪ অধ্যায়) "…সে যুগের অনেক সম্রাট্ আর তাদের কীর্তিকাহিনীর উল্লেখ করা হল। এরা সবাই বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এমন এক অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল যাঁর কাছে সম্রাট্দের কীর্তি তুচ্ছ। এঁর নাম শঙ্করাচার্য। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ওঁর জন্ম হয়েছিল। ইনি ভারতীয় জীবনধারায় এক যুগান্তর আনয়ন করলেন। * * * শঙ্করাচার্যের কৃতিত্ব অসাধারণ। বৌদ্ধধর্ম প্রায় অন্তর্হিত হল ভারতবর্ষ থেকে। সমস্ত দেশে হিন্দুধর্ম ও সেই সঙ্গে শৈব-ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হল। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য এবং অন্যান্য বই ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করল দেশে। তিনি কেবল যে ব্রাহ্মণশ্রেণীর গুরু হয়ে দাঁড়ালেন তা নয়, জনসাধারণের চিত্তও জয় করলেন। শুধু মানসিক ক্ষমতা আর বিচারশক্তির জোরে কারও পক্ষে নেতা হওয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের মন জয় করা এবং ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ অসাধারণ ব্যাপার!"

আগামী ১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৫-মঙ্গলবার) বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথি আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব দিবস। আমাদের সর্বহৃদয়ের শ্রদ্ধা এই লোকোত্তর মহাপুরুষের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতেছি। শ্রীজহরলাল নেহরু আচার্যের পাণ্ডিত্য ও বিচার-ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই দুইটিই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রচনার প্রধান কথা নয়। শঙ্কর প্রধানতঃ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। 'করামলকবৎ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে' প্রত্যক্ষানুভূতির এই জীবন্ত প্রেরণাই তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার উক্তিগুলি শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তম্ভিত করে না, হৃদয়কে গভীর-ভাবে স্পর্শ করে। তাঁহার দর্শন—অদ্বৈতবাদ একদেশী দর্শন নয়। উহাই যথার্থ সমন্বয়ধর্মী দর্শন। সব কিছুকেই উহা স্বীকার করে, শ্রদ্ধা করে, ব্যবহার করে কিন্তু সব কিছুর উপরে পরম ও চরম সত্যের সন্ধান দেয়—ঐ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর যথার্থ মূল্য নির্ণয় করে। শঙ্কর শুধু জ্ঞানী ছিলেন না, দুর্লভতম পরাভক্তি তাঁহার সমগ্র আধ্যাত্মিক চরিত্রকে মধুর ও সরস করিয়াছিল। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক স্তবস্তোত্রাদির মধ্যে যে ব্যাকুল ভগবদ্ অনুরাগ লক্ষিত হয় উহা ভক্তপাঠকের নিকট একটি শাশ্বত উদ্দীপনা লইয়া আসে। আবার ব্রহ্মের

সর্বাবরণমুক্ত অদ্বৈতভাবকে দিবালোকের মতো সর্বদা অনুভব করিতেন বলিয়া শঙ্করাচার্য যেখানে ভক্ত—সেখানে তিনি উদারতম ভক্ত। হিন্দুর সগুণ এবং সাকার সাধনার বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি ও বিগ্রহের প্রত্যেকটিকেই তিনি সম্মান দিয়া গিয়াছেন। যেমন শিবের, দুর্গার স্তোত্র লিখিয়াছেন তেমনি বিষ্ণুর নিকট মিনতিভরে জানাইয়াছেন, "হে নাথ—অদ্বৈতজ্ঞানের উদয়ে তোমাতে আমাতে ভেদ চলিয়া যায় বটে কিন্তু ইহা তো সত্য যে, সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কখনও সমুদ্র নয—তুমি আমি তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও চিরদিন বলিব—প্রভু তোমারই আমি, আমার কিছু তুমি নও।"* আবার "সজলজলদশ্যামলতনু সরোজাক্ষ গোপীগণপরিবৃত" কৃষ্ণের মানসপূজনস্তোত্র-রচয়িতা শঙ্করকে কে না বলিবে তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদধন্য একজন পরম বৈষ্ণব? তেমনি শঙ্কর রচনা করিয়াছেন গঙ্গার স্তোত্র, লিখিয়াছেন বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য।

আচার্য শঙ্কর হিন্দুধর্মের সামগ্রিক অভ্যুত্থান ও সুপ্রতিষ্ঠার জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার ঋণ হিন্দুভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন

গত ৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ৫৫) হইতে ১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ, ৫৫) কলিকাতা মহম্মদ-আলী পার্কে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। একপক্ষব্যাপী সম্মেলনের কর্মসূচীর মধ্যে বাঙলার নানাবিধ সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, কথকতা, গীতাভিনয়, কীর্তন প্রভৃতির যেমন আয়োজন ছিল সেইরূপ উহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট মনীষীদের মনোজ্ঞ আলোচনা ও বক্তৃতা। বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি মমতা ও গৌরববোধ উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে ঐ ধরণের সম্মেলন যে প্রচুর প্রেরণা ও সহায়তা আনিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তৃবর্গকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্বশান্তি ও ভারত

মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (I. N. F. S.; ৬ই মার্চের অমৃতবাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত) যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিয়া বিশ্ব-শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ কথা আজ কাহারও বুঝিতে বাকী নাই যে, পূর্বে ও পশ্চিমে ঘনায়মান সংগ্রামের আশঙ্কা যদি বাস্তবিকই সত্য হয় এবং আণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগসহ একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে ব্যাপক ধ্বংস সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। রাসেল লিখিতেছেন—"ভাবিয়া দেখুন, ঐ যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই কি ঘটনা ঘটিতে পারে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন এবং মস্কো সম্ভবতঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ককেসাস তৈলখনির তৈলসঞ্চয়ের অনেকখানি আগুনে জ্বলিতে থাকিবে এবং রাশিয়া ও পশ্চিম ইয়োরোপ উভয়ত্রই যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। আণবিক বোমা হইতে যে সব লোক বাঁচিয়া যাইবে তাহাদের কিন্তু খাবার থাকিবে না, উপবাস করিয়া কাটাইতে হইবে। নিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেন্টের পরিবর্তে আসিবে অরাজক অত্যাচার। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য যেমন ভাঙিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছিল তেমনই আজ-কালকার সব বড় বড় রাজ্যগুলিই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কম্যুনিজম্ এবং বর্তমান পুঁজিবাদ দুই-ই বিলয় পাইবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইয়োরোপ, রাশিয়া এবং চীন—ইহারা সকলেই বিপুল দুঃখকষ্ট ভোগ করিবে এবং ঐ যুদ্ধের ফলে

* সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥
—ষট্‌পদী স্তোত্র, ৩

ইহাদের আকাঙ্ক্ষিত কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না।"

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সংশয় না থাকিলেও গভর্ণমেণ্টসমূহ এবং জনসাধারণও যুদ্ধ বাধানোর চিন্তা ও কথা চালাইয়া যাইতেছেন কেন? রাসেল বলেন—পাশ্চাত্য জাতিগুলির পক্ষে ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা আশঙ্কা করেন যুদ্ধের নিষ্ফলতার কথা বলিতে গেলে অপর পক্ষ ভাবিবে তাঁহাদের পরাজয় বা তোষণের মনোবৃত্তি আসিয়া গেছে। কম্যুনিষ্ট দেশসমূহের সক্রিয় রাজনৈতিক মতবাদিগণেরও এই ধরণের আশঙ্কা সম্ভবতঃ রহিয়াছে। দুই পক্ষেরই যেন ধারণা, হয় যুদ্ধ অথবা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—এই দুইটি পথ ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু আছে। রাসেলের মতে তাহা হইতেছে **উভয়পক্ষেরই** যুদ্ধ-বিগ্রহের চরম নিষ্ফলতাকে **স্বীকার।**

এইখানেই নিরপেক্ষ জাতিসমূহের মস্ত বড় কাজ করিবার আছে। নিরপেক্ষ জাতিগুলির সুবিধা দুইটি; প্রথম—তাঁহারা যখন যুদ্ধ-পন্থার ভয়াবহতা ও ব্যর্থতার কথা বলিবেন তখন ভয়বশে আনুগত্য-স্বীকারের সন্দেহ উঠিবে না; দ্বিতীয়—কোন বিশেষ পক্ষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা উভয় পক্ষকেই সমানভাবে সত্য কথা বলিতে পারিবেন। অনেকগুলি নিরপেক্ষ জাতি একজোটে এই যুদ্ধপরিহারের কাজ করিতে পারেন কিন্তু তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই; শুধু ভারত ও সুইডেন সমবেত বা পৃথক্‌ভাবে আগাইয়া আসিলে চলিবে। যুদ্ধ বাধিলে নিরপেক্ষ জাতিগুলির উপর কি কি অনিষ্ট ফল আসিতে পারে তাহার বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য রাসেল একটি 'কমিশন' নিয়োগের কথা বলিয়াছেন। এই কমিশনে বেশী লোক জটলা করিবার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ লইয়া এই কমিশন কাজ করিবেন। সামরিক, সামুদ্রিক এবং বৈমানিক বিশেষজ্ঞগণ, প্রথম শ্রেণীর একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী, এক এক জন জীবাণুতত্ত্ববিৎ, অর্থনীতিজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধুরন্ধর—এই সকল সভ্য ঐ কমিশনে থাকিবেন। কমিশন তাঁহাদের অনুসন্ধান শেষ হইলে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং বিশ্বযুদ্ধে যে সকল জাতির লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা উহাদের প্রত্যেকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এই সকল জাতির নিকট রিপোর্টটি সম্বন্ধে মন্তব্য চাহিতে হইবে। রাসেল বিশ্বাস করেন, রিপোর্টের সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রত্যেক জাতিই একমত হইতে বাধ্য। কমিশন প্রত্যেক জাতির মতামত অপর জাতিসমূহকে জানাইয়া দিবেন। রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েরই সন্দেহ আছে যে, অপর পক্ষ আন্তরিকভাবে যুদ্ধে অলিপ্ত থাকা চাহে না। রাসেলের বিশ্বাস, উপরোক্ত নিরপেক্ষ কমিশনের রিপোর্টের সহিত উভয় পক্ষ যদি একমত হইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের পারস্পরিক সন্দেহ অনেকটা কমিয়া আসিবে।

প্রবলপরাক্রান্ত রণোন্মুখ জাতিগুলির সম্মুখে ঐরূপ শান্তির দৌত্য করিবার সাহস অনেক 'নিরপেক্ষ' জাতিরই থাকিবে না—কিন্তু ভারতবর্ষের উপর রাসেলের প্রভূত বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত অহিংসামন্ত্র ভারতীয় জাতির চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে এবং ভারত যদি আজ যুদ্ধ-পন্থার ভয়াবহতা এবং নিষ্ফলতা জগতের কাছে সক্ষমভাবে তুলিয়া ধরিতে পারে তাহা হইলেই মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির যথার্থ সম্মান দেখানো হইবে এবং তাহা দ্বারা জাতিপুঞ্জের নিকট ভারতবর্ষের নৈতিক গৌরবও বৃদ্ধি পাইবে।

যুদ্ধের পথ যে নিষ্ফল, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের ইহা মানিয়া লওয়া প্রথম ধাপ মাত্র। তারপর উঠিবে বিবাদ মিটাইবার জন্য পারস্পরিক আলোচনা। রাসেল লিখিতেছেন, এই আলোচনার ফলে সমাধান কি আকার গ্রহণ করিবে তাহার কোন ইঙ্গিত

দিতে তিনি সাহসী নন। তবে এক পক্ষের কতকগুলি দাবিদাওয়া ত্যাগকে যদি সেই পক্ষ 'অপমান' এবং অপর পক্ষ 'বিজয়' বলিয়া মনে না করে তাহা হইলে কোন সমস্যাই অপূরণীয় নয়। সহজ সত্যটি এই যে, কম্যুনিষ্ট এবং অ-কম্যুনিষ্ট বিশ্ব একই সঙ্গে বাঁচিতে বা মরিতে পারে। অপর কোন বিকল্প নাই। যখন উভয় পক্ষ এই সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবে, তখন আশা হয় যে, উভয়েই মৃত্যুর চেয়ে বাঁচিয়া থাকাকেই বরণ করিয়া লইবে।

মনীষী বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল ভারতকে শান্তিস্থাপনের যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন ভারত তাহা বহুপূর্বেই আরম্ভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যখন জাপান চীনকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন তিনি জাপানী কবি নগুচিকে যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগের সদুপদেশপূর্ণ একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু নগুচি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে হিটলার যখন ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তখন মহাত্মা গান্ধীও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য শান্তির দৌত্যের (যদিও ভারত তখন পরাধীন এবং বিশ্বের দরবারে তাঁহার রাজনৈতিক সম্মান কিছুই নয়) প্রেরণাতে হিটলারকে যুদ্ধপথের নিষ্ফলতা খ্যাপন করিয়া তাঁহার সেই বিখ্যাত পত্রটি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 'নগ্ন ফকীরের' ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল? শুধু অবজ্ঞা ও উপহাস নয় কি? ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কিছুকাল হইতে দেশে এবং বিদেশেও সহ-অস্তিত্বের কথা বলিয়া আসিয়াছেন এবং বলিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীও আণবিক অস্ত্র পরিহারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট দুইবার মর্মস্পর্শী আবেদন করিয়াছেন। ১৩ই মার্চ মাদ্রাজে ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড্ অ্যাফেয়ার্স-এর উদ্যোগে একটি সভায় তিনি বলিয়াছেন—

"সোভিয়েট রিপাব্লিক্ যখন আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের উপর একটি সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত আছে তখন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারী অব ষ্টেট্স্ মিঃ ফষ্টার ডালেসের ন্যায় আমরা (ভারতবর্ষ) বলিতে পারি না যে, রাশিয়াকে আমরা বিশ্বাস করি না। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী কোন জাতিরই থাকা উচিত নয়। বিশ্বাস চাই। সন্ধিপত্রের উপর এবং উহার স্বাক্ষরকারী মানুষের উপর আস্থাস্থাপন করিতে হইবে। সন্ধি যদি ভাঙ্গেই তখন ভগবানের উপর বিশ্বাস আনিতে হইবে।"

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ভারত নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতেছে এবং ইহা বড় বড় পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির মনে কিছু কিছু প্রভাবও যে বিস্তার করিতেছে না তাহাও নয়। তবে যুদ্ধের রাস্তায় চলিব না, শান্তির রাস্তায় চলিব এই দৃঢ় সঙ্কল্প শক্তিপ্রমত্ত জাতিগুলি তখনই লইতে পারিবে যখন তাহাদের সমগ্র জীবন-দর্শনে একটি আমূল পরিবর্তন আসিবে। উহা মানুষের প্রতি একটি নূতন মূল্যবোধ হইতেই আসিতে পারে, পারস্পরিক প্যাক্ট্ দ্বারা নয়। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শন পার্থিব ভোগসুখৈকলক্ষ্য—উহাতে মানুষের মূল্য শুধু একটি স্বার্থসাধক যন্ত্রের মূল্য। মানুষের কোন আত্মিক মূল্য নাই—তাহার কোন ভূতও নাই ভবিষ্যৎও নাই—নিতান্তই সে শক্তিমানের সাময়িক প্রয়োজনের একটি কলবিশেষ। পাশ্চাত্ত্যের মানুষকে এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে—মানুষের যথার্থ পরিচয়—তাহার আত্মিক সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। তবেই সে মানুষকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে, ভালবাসিতে শিখিবে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বৃহত্তর মানবকল্যাণের জন্য সানন্দে ত্যাগ করিতে শিখিবে। উক্ত অন্বেষণের বিজ্ঞানও পাশ্চাত্ত্যকে লাভ করিতে হইবে ভারতবর্ষের নিকটেই, বিশ্বহিতৈকলক্ষ্য ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের বাণী ও জীবনাদর্শ হইতেই। বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠায়

ভারতবর্ষের এই ভাবী সার্থকতম অবদানের কথা মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল জানেন না, তাঁহার জানিবার কথাও নয়। স্বামী বিবেকানন্দ ষাট বৎসর পূর্বে ইহা পাশ্চাত্ত্যে বলিয়া আসিয়াছিলেন, স্বদেশবাসিগণকেও ডাকিয়া এই মহাকর্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন।

ভারতীয় বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্য

ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা বর্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ (Physicist)। ভারতবর্ষে আণবিক গবেষণার তিনিই প্রধান পরিচালক। গত জানুয়ারী মাসের শেষে ডক্টর ভাবা নিউইয়র্কে একটি বক্তৃতায় ভারতে আণবিক গবেষণার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "ভারতবর্ষে বিদ্যানুশীলনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ব্রাহ্মণগণ যে সারাদিন আসনপিঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন উহা শুধু অলসভাবে বসিয়া থাকা নয়, তাঁহাদের মন তখন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এই গভীর মননের অভ্যাস তাঁহারা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ইদানীন্তন বংশধরগণ যখন ঐ মনন পদার্থবিদ্যায় নিয়োগ করেন, তখন অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।"

আমাদের জাতীয় বিদ্যানুরাগের ঐতিহ্যের প্রতি গৌরববোধ দেশের অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিতের ক্ষেত্রেই আশানুরূপ জাগ্রত নয়। ইহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার গভীর রেখাপাত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরও জাতীয় শিক্ষাসংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধার এই কলঙ্করেখা মুছিয়া যায় নাই বা সহজে যাইবে না। ডক্টর ভাবার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখিয়া আনন্দ হইল। দেশের তরুণগণ এই বৈজ্ঞানিকপ্রবরের দৃষ্টিভঙ্গী অনুকরণ করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত বক্তৃতায় ডক্টর ভাবা আরও বলিয়াছেন—

"আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ আণবিক শক্তিকেন্দ্র চালু করা চলিবে আশা করা যায়। স্বাভাবিক ইউরেনিয়মকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করিয়া এই কেন্দ্রটি বৈজ্ঞানিক-শক্তি-বিরল রাজপুতানায় স্থাপিত হইবে। ঐ কেন্দ্র হইতে যেমন প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হইবে তেমনি আণবিক বোমার উপাদান প্লুটোনিয়মও পাওয়া যাইবে। তবে এই প্লুটোনিয়ম দ্বারা ভারতবর্ষ যে কখনো ঐ মারাত্মক বোমা তৈয়ারী করিবে না—ইহা সুনিশ্চিত। সমস্ত প্লুটোনিয়মই কাজে লাগানো হইবে ভারতবর্ষের প্রচুর থোরিয়াম খনিজকে ইয়ুরেনিয়ম-২৩৩এ পরিনয়নান্তর আণবিক শক্তির জ্বালানিরূপে ব্যবহারে।"

মানুষের সুখশান্তি ও কল্যাণের জন্য আণবিক বিদ্যার প্রয়োগের এই পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া ডক্টর ভাবা ভারতে বিদ্যাচর্চার সনাতন আদর্শই প্রকট করিয়াছেন। যে বিদ্যা দ্বারা সকল মানুষের হিত ও সুখ হয় ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে তাহারই সম্মান দেওয়া হইত। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান সব কিছুরই একটা মানব-কল্যাণমূলক লক্ষ্য গোড়া হইতেই বাঁধা থাকিত। গবেষকগণ এই লক্ষ্যরূপ 'ধর্ম' হইতে কখনো বিচ্যুত হইতেন না।

বলিষ্ঠ ভাষা

মাঘ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (প্রসঙ্গকথা) 'কৃত্রিম, ঢঙসর্বস্ব, মুদ্রাদোষদুষ্ট' আধুনিক এক শ্রেণীর বাংলা ভাষার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের খুব ভাল লাগিল।

"সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের কোন এক দ্বিধান্বিত মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কথ্য-ভঙ্গি মিশিয়ে এই এক কৃত্রিম ভাষারীতির সূত্রপাত করেছিলেন, তারপর থেকে বাংলাসাহিত্যে এ ভাষার একটানা অভিযান চলেইছে। গদ্যে ঢঙ ক'রে কথা বলার রেওয়াজ আর ঘুচল না। * * * যতদিন না বাংলা গদ্য এই ভঙ্গির কবল থেকে

মুক্ত হয় ততদিন বাংলা গদ্য আংশিক খণ্ডিত হয়েই থাকবে। বাংলা গদ্যকে গভীর চিন্তন-মননের উপযোগী বাহন করতে হলে তার এখনকার কথায়-কথায়-এলানো ভাব দূর করতে হবে।"

সমালোচক যে ভাষা-শৈলীতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন উহার একটি মাদকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ ঘটে যখন ঐ মাদকতা বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণকে আচ্ছন্ন করে এবং ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক ধাপগুলি না মাড়াইয়াই তাহারা নিজেরা ঐ ধরণের ভাষায় তাহাদের রচনাদি লিখিতে উদ্যত হয়। ইহার ফলে শুধু যে তাহারা বলিষ্ঠ ভাষা আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা হারায় তাহা নয়, পদ ও অর্থের সঙ্গতিপূর্ণ সহজভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার শক্তিও অর্জন করিতে পারে না।

ধর্মাশ্রম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তোমাদেরে করি দণ্ডবৎ
তোমরা গড়েছ হেথা নূতন জগৎ।
শোক-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুনিপীড়িত সংসার জীবনে
কর্মচক্রে অন্ধবৎ ঘুরি আবর্তনে
কোথাও ত নাই শান্তি, নাহিক বিশ্রাম।
বাসনার নাই ক্ষান্তি নাহিক বিরাম।
সুর দিয়া, ছন্দ দিয়া, স্বপ্ন দিয়া করেছে রচনা
ধর্মের ভুবনখানি তোমাদের মধুর কল্পনা।
আছে রস, আছে ভক্তি আছে সেথা অগাধ বিশ্বাস
শিশুর সারল্য আছে। কাব্যে, গীতে হৃদয়বিলাস,
আছে শান্তি, সান্ত্বনা, আশ্বাস।

কর্মের ঘর্মের ক্লেদ হেথা নাহি পশে,
হেথা লোকে যশে নয় তৃপ্ত হয় রসে,
স্বল্পে তুষ্টি হেথায় সম্বল
মানুষের ধর্মবুদ্ধি যোগাইছে হেথা অন্নজল।
পুষ্প ধূপ দীপ দূর্বা শঙ্খ ঘণ্টা নিয়ে সারাবেলা
হেথা চলে পূজাপূজা খেলা,
খেলায় পূজায় কোন নাহিক তফাৎ
লীলাময় তোমাদের ভুবনের নাথ।

ব্রজরাখালের মত খেলা করি তারে ঘেরি ঘেরি
লভিতেছ দিব্যানন্দ, হিংসা হয় হেরি।
জানি না মিলে কি মুক্তি এ লীলাভুবনে,
জানি শুধু এ ভুবন শান্তি দিতে পারে আর্তজনে।
শান্তিই বা মিলিবে কোথায়?
তোমরা ডাকিছ বন্ধু—শান্তি চাস্, আয় ছুটে আয়।

ললিতবিস্তর হইতে*

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম্-এ
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স'

সেই ভগবান অরহৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার—

'ললিতবিস্তর' একখানি লালিত্যপূর্ণ ও সবিস্তারে বর্ণিত বুদ্ধদেবের জীবনী-গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রারম্ভেই উল্লেখ আছে—'অথ শ্রীললিতবিস্তরম্ নাম মহাপুরাণম্' গ্রন্থটিকে মহাপুরাণ বলা হয়েছে। এতে সমগ্র জীবনী নাই, জন্ম হতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট্ কনিষ্কের সময় এই বইটি ভাঙা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী ও প্রথম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের বিরাট বিবর্তন ঘটে। সম্রাট্ অশোকের সময়ের মূল থেরবাদ ধর্ম সম্রাট্ কনিষ্কের সময় দুটি বিভিন্ন মতবাদে, মহাযান ও হীনযানে বিভক্ত হয়। থেরবাদ-ভুক্ত মূল পালিক ঘটনাবলী মহাযান-অন্তর্গত, ললিতবিস্তরে দেব নাগ যক্ষ গন্ধর্ব অসুর গরুড় শক্র লোকপাল পরিবৃত হয়ে পৌরাণিক আকার ধারণ করে। তখন সুদূর চীন থেকে গ্রীস ও তিব্বত থেকে সিংহল পর্যন্ত সদ্ধর্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত। মহাযানীয় বুধগণ সহজেই ধারণা করলেন বুদ্ধদেব বিরাট্। তাঁর চরিত্র দেবমানবের অতীত। তাঁর চিন্তা ও পূজায় মানবের সব অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তিনি যাবতীয় সদ্‌গুণে সিদ্ধিলাভ করে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছেন। ক্ষান্তি, বীর্য, প্রজ্ঞা, ত্যাগ, মৈত্রী ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জীবের মঙ্গলের জন্য অনেক জন্ম ধরে ব্রত এবং তপ আচরণ করেছেন। জগৎকে ত্রাণ করার জন্য সুমহান্ নির্বাণ প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষায় নিজের রাজ্য ধন পুত্র পরিবার এমন কি নিজের শির পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। সাধারণের কাছে বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ উভয়েই লোকাতীত ও সর্বলোক-পূজিত দেবতারূপে গণ্য হলেন। পালির সাধারণ উক্তিগুলি সেই জন্যই বোধ হয় সবিস্তারে ললিত-বিস্তরে পৌরাণিক আকারে উল্লিখিত হয়েছে।

আজ আমরা ললিতবিস্তর থেকে বুদ্ধদেবের অভিনিষ্ক্রামণের বা গৃহত্যাগের পূর্বের কথা কিছু পাঠ করব। এই মহাপুরুষের সারা জীবনই ছিল ত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ। এই ত্যাগের মহিমাই হিমালয় কীর্তন করছেন; ঋষিরাও তাই প্রচার করেছেন। ললিতবিস্তরে সেই শাশ্বত বাণীর কথাই বলা হয়েছে। মূল পালিতে সাধারণভাবে বুদ্ধদেব

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে

বলছেন, "হে ভিক্ষুগণ ; আমি অতি সুকুমার ছিলাম এবং অত্যন্ত বিলাসিতার মধ্যে পালিত হয়েছিলাম। রাজপ্রাসাদে আমার তৃপ্তির জন্য তিনটি পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল একটি নীল, একটি লাল ও একটি শ্বেত পদ্মের। কাশীর বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র ব্যবহার করতাম না। পরিধেয় কাশীর বস্ত্র, গাত্রাবরণ কাশীর বস্ত্র ও উত্তরীয় কাশীর বস্ত্রের ছিল। আমার মাথার উপর সব সময়েই শ্বেতছত্র ধরা থাকত যেন আমায় শীত তাপ শিশির বা ধূলি স্পর্শ না করে। আমার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, একটি শীতকালের, একটি গ্রীষ্মকালের ও একটি বর্ষাকালের উপযুক্ত ক'রে। হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাকালের চার মাস আমি প্রাসাদ থেকে নামতাম না ; নর্তকীরা গানবাজনায় আমায় প্রফুল্ল রাখত। অন্য সমস্ত ধনীর গৃহে ভৃত্যদের যেমন তুষকণাপূর্ণ পর্যুষিত অন্ন দেওয়া হত, আমার পিতৃগৃহে অতি যত্নের সঙ্গে দাসদাসীদিগকে মাংসে সুসিদ্ধ ভাত দেওয়া হত। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হলেও মানুষ জরাব্যাধি ও মরণশীল এবং আমিও তাদের অন্তর্ভূত এই ভেবে আমার সমস্ত আভিজাত্যের অহংকার চলে গিয়েছিল। ভাবতাম—কি আশ্চর্য, মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের জন্য কেন গর্ব করে, এবং গর্বে মত্ত হয়ে অনেক রকম পাপাচরণ করে! অভয়প্রদ ঋষিত্ব পাবার জন্য মনে মনে অভিনিষ্ক্রামণের সঙ্কল্প করতাম।"

ললিতবিস্তরে বোধিসত্ত্বের অন্তঃপুরে অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইতি হি ভিক্ষব আত্মরত হর্ষমুদীরয়ন্ত আগতা আসন্ বোধিসত্ত্বস্যান্তঃপুর-মধ্যগত-স্যানেকৈ দেবনাগযক্ষগন্ধর্বাসুর গরুড় মহোরগ-শক্রব্রহ্মালোকপালা যে বোধিসত্ত্বস্য পূজাকর্মণে উৎসুক্যমাপত্সন্তে স্ম"—হে ভিক্ষুগণ, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বোধিসত্ত্বের অন্তঃপুরে এলেন অনেক দেব নাগ যক্ষ গন্ধর্ব সুর গরুড় মহোরগ শক্র লোকপাল প্রভৃতি। তাঁরা বোধিসত্ত্বের পূজাক্রিয়াতে ব্যস্ত হলেন। "সর্বত্র বোধিসত্ত্ব নিত্যকালং কালজ্ঞো ভবতি কালবেদী"—বোধিসত্ত্ব সর্বস্থলে এবং সব সময়ে কালজ্ঞ, কি কাজ করতে হবে জানেন এবং কালবেদী অর্থে তাঁকে কোন কাজের কথা স্মরণ করাবার প্রয়োজন নাই। "অথ চ পুনর্ভিক্ষবো ধর্মতা প্রতিলব্ধ এব চরমভাবিকানাং বোধিসত্ত্বানাং যদবশ্যং দশদিক লোকধাতুস্থিতৈঃ বুদ্ধৈঃ সর্বভগবদ্ভিঃ অন্তঃপুর-মধ্যগত। সংগীতি-তূর্যনির্ণাদিতৈঃ এবংভি এবংরূপৈঃ ধর্মমুখৈঃ সংচোদিতব্যা ভবন্তি তত্রেদমুচ্যতে"—পুনরায় কিন্তু ভিক্ষুগণ, যাঁরা সর্বশেষ বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ যাঁরা আর পুনর্জন্ম গ্রহণ না কোরে নির্বাণে গত হবেন, তাঁদের সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম যে, তাঁরা যখন অন্তঃপুরে থাকবেন তখন দশদিকে অবস্থিত ঋষি-বুদ্ধগণ সংগীত-বাদ্য ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের অভিনিষ্ক্রামণের জন্য উদ্বোধিত করবেন। এই জন্যই বলা হয়েছে :—

যে সত্ত্বাগ্রা দশদিক্ লোকে
তেষু বিশেষাৎ তত্র রতি তুরিয়ৈঃ।
গাথা গীতা ইমরতি মধুরা
সংচোদন্তী নরবর প্রবরং॥

যে সমস্ত মহান্ ঋষি দশ দিকে অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষতঃ গীত-বাদ্যে পারদর্শী, তাঁরা শ্রেষ্ঠ নরবরের চিত্ত উদ্বোধিত করার জন্য এই মনোহারিণী গাথা সঙ্গীত করতে লাগলেন :—

পূর্বিতুভ্যং অয়ু কৃতু প্রাণিধী
দৃষ্ট্বা সত্ত্বান্ দুঃখ শত ভরিতাং।
লেনং ত্রানং জগনিজ শরণে
ভেষ্যো নাথো হিত কুরু পরমং॥

পূর্বে শত দুঃখে কাতর জীবকুলকে দেখে আপনি এই প্রণিধী করেছিলেন যে, আপনার যাঁরা শরণ নেবেন তাঁদের আশ্রয় দেবেন ও ত্রাণ করবেন।

হে নাথ, আপনি এই পরম হিত সাধন করুন ও প্রভাসিত হন।

সাধো বীরা স্মর চরি পুরিমাং
যাতে আসীৎ জগহিত প্রণিধী।
কালো বেলা অয়ু তব সময়ো
নিষ্ক্রম্যাহী ঋষিবর প্রবরা॥

হে সাধু, হে বীর, আপনার সেই জগতের হিতকর মহতী ইচ্ছা স্মরণ করুন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আপনার গৃহত্যাগ করবার এই সময় এসেছে।

যস্যার্থে তে ধনবর বিবিধা
তক্ত্বা পূর্বে শিরকরচরণা।
ভেষ্যে বুদ্ধো নর মর দমকো
লোকস্যাগ্রো গুণশতনিচিতঃ॥

যার জন্য পূর্বে আপনি বহুবিধ ধনরাশি ত্যাগ করেছিলেন, নিজের হাত পা ও শির উচ্ছেদ করেছিলেন সেই দেব ও মানুষের পরিচালক শত-গুণে ভূষিত পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হ'য়ে প্রভাসিত হন।

ত্বং শীলেন ব্রত তপ চরিতঃ
ত্বং ক্ষান্তীয়ে জগহিতকরণঃ।
ত্বং বীর্যেণা শুভগুণ নিচিতো
ধ্যানে প্রজ্ঞে ন তু সমুত্রিভবে॥

আপনি ব্রত তপ ও ধর্ম আচরণে পবিত্র, সহনীয়তায় জগতের হিতসাধনে সমর্থ, বীর্যে আপনার শুভ করবার ক্ষমতা এসেছে এবং ধ্যান ও প্রজ্ঞায় এই তিন লোকে আপনার সমান কেহ নাই।

ক্রোধাবিষ্টাঃ খিলমল বহুলা
তে মৈত্রীয়ে ত্বয়ি স্ফুট সুগতা।
কারুণ্যং তে বহুবিধমবুধে
মিথ্যাত্বেষু শুভগুণরহিতে॥

হে সুগত, এই অখিল জগতের প্রাণিগণ ক্রোধে পূর্ণ, তাদের আপনি মৈত্রী দ্বারা স্পর্শ করেছেন। অজ্ঞান জীবগণের মধ্যে যারা সদ্‌গুণবর্জিত এবং মিথ্যা জন্মলাভ করেছে তাদের প্রতি আপনি করুণা প্রকাশ করেছেন।

পুণ্যে জ্ঞানে শুভনিচিতাত্মা
ধ্যানাভিজ্ঞো প্রতপসি বিরজো।
ওভাসেসি দশ ইম দিশতো
মেঘামুক্ত শশিরিব বিমলঃ॥

জ্ঞান ও পুণ্যে আপনি মঙ্গল অর্জন করেছেন, এখন আপনি নিষ্পাপ দেহে ধ্যানে সিদ্ধ হয়ে জ্যোতিষ্মান্‌ হন এবং মেঘমুক্ত বিমল শশীর মত দশ দিক আলোকিত করুন।

এতে চান্যে বহুবিধ রুচিরা
তূর্যৈঃ ঘোষা জিনরতরবনা।
যে চোদেন্তী সুরনরমোহিতং
নিষ্ক্রম্যাহি অয়ু তব সময়॥

সুরনরমোহিতকারী বোধিসত্ত্বকে উদ্বোধিত করবার জন্য এই সব এবং আরও অনেক রকম সংগীত ঋষিরা গাইতে লাগলেন এই বোলে যে আপনার এই গৃহত্যাগের সময়।

—তাঁরা যখন থামলেন তখন :

যা নার্যো মুদিতমনাঃ প্রসন্নচিত্তা
বেণুভ্যো মধুর মনোরমং রণন্তে।
অবেশাদ্দশদিগ্‌ গতাং জিনোওমানাং
গাথেমা বিবিধ বিচিত্র চিত্ররূপা॥

দশদিকে অবস্থিত এই সব শ্রেষ্ঠ ঋষিদের বিবিধ বিচিত্রবেশা নারীগণ আনন্দিত হয়ে প্রসন্নমনে ও আবেগভরে বাঁশীতে এই গান গাইতে লাগলেন :—

পূর্বে তে অয়ু প্রণিধা অভূষিধীরা
দৃষ্টে মাং জনত সদা অনাথভূতাং।
শোচিষ্যে জরমরণাত্তথান্যদুঃখাদ্‌
বুদ্ধিত্বা পদমজরং পরং অশোকং॥

হে বীর, আপনি পূর্বে এই প্রণিধী করেছিলেন যে, অজর অশোক পদ উপলব্ধি কোরে মানুষদের সব সময়ে অনাথা জেনে তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে জরা মরণ ও অন্য দুঃখ থেকে মুক্ত করবেন।

বোধিসত্ত্বের উদ্বোধন-সঙ্গীত অবিরাম চলতে থাকলো—এক দল থামেন আর এক দল উঠেন।

যখন আবার নর্তকীরা তাঁর চিত্তকে সংসারে আকৃষ্ট করার জন্য গান করেন, তখন ঋষিরা গিরি বন নিনাদিত করে তাদের চেয়েও উচ্চস্বরে বোধিসত্ত্বের উদ্বোধন-সঙ্গীত আরম্ভ করেন। এই গভীর বিশ্বাসের ফলে এই সময়ে অতীতের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সূচক কাহিনীগুলি বুদ্ধদেবের পূর্ব জন্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে 'বোধিসত্ত্ব-পারমিতা' মতবাদের সৃষ্টি করে।

অনাগারিকা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বৈশাখী-পূর্ণিমা !
মধু-চন্দ্রমা গগনে বিলায় সুশীতল চন্দ্রিমা !
প্রভু বুদ্ধের উঠে জয়-রব,
দিকে দিকে তাঁর জন্মোৎসব,
জাগে দিকে দিকে নব আনন্দ—নাহি তার পরিসীমা !

কপিলাবস্তু পুরে,
প্রাসাদ-শিখরে গোতমী আসীনা, আঁখি দুটি তাঁর ঝুরে !
গভীর ব্যথায় কেঁদে উঠে প্রাণ,
চিন্তার বিষে মুখ ম্রিয়মাণ,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিছেন শুধু, চেয়ে চেয়ে বহুদূরে !

আকাশ বাতাস রণি',
ত্রিশরণ-সুরে উঠিছে সতত, আহা কি মধুর ধ্বনি !
বুদ্ধের কৃপা লভেছে সবাই,
ধনী-নির্ধন কেহ বাকী নাই,
শুধু নারী যত আজি বঞ্চিত, মন্দ ভাগ্য গণি' !

বলেছেন তথাগত—
"সংঘেতে ঠাঁই নাহি পাবে নারী, তারাই বিঘ্ন যত !"
"একি হ'তে পারে ?"—ভাবিছেন মাতা,
"বুদ্ধ নহে কি সকলের ত্রাতা ?
কেন নারী জাতি ল'বে এ ভুবনে চির-দুঃখের ব্রত ?"

"করুণার অবতার,
হে মহামানব, তোমার নিকটে কেন এই অবিচার ?
শিশু ছিলে যবে, ছিলে অসহায়,
দিয়েছি স্তন্য-দুগ্ধ তোমায়,
দিলে তুমি মোরে একি প্রতিদান ? কেড়ে নিলে অধিকার ?"

দৃঢ় ক'রি তাঁর মন,
ভাবেন গোতমী—"এ অবিচারের প্রতিকার প্রয়োজন !
নহিলে নারীর নাহি হবে গতি,
পুণ্য-ধর্মে নাহি রবে মতি,
জগতের শুধু জঞ্জাল সম প'ড়ে রবে অকারণ !"

* * *

বৈশালীপুরী মাঝে,
প্রভু অমিতাভ রয়েছেন ব'সি ত্রিলোক-শাস্তা-সাজে !
কত জন এসে করিছে গ্রহণ,
তাঁর পবিত্র-ধর্ম-বচন,
ভুবন-পাবন ত্রিশরণ-গীতি কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে !

বিহার-বাহির-দ্বারে,
সহসা উঠিল কল-কোলাহল আর্তির হাহাকারে !
আসি' আনন্দ বুদ্ধ-আদেশে,
দেখিলেন চেয়ে—বিবশার বেশে
মহাপ্রজাপতী গোতমী দাঁড়ায়ে, তিতিছেন আঁখি-নীরে !

রয়েছেন তাঁর সাথে—
শাক্যকুলের যতেক রমণী—বিগলিতা বেদনাতে !
প্রব্রজ্যা লাগি' সবে উৎসুক,
আশায় আশায় হিয়া উন্মুখ,
কহেন গোতমী—"পাব না কি ঠাঁই—সঙ্ঘের সীমানাতে ?"

প্রভুর চরণ 'পরে,
নত-মস্তকে রহি' আনন্দ, কহেন ধীর-স্বরে—
"সংঘের বাধা জানি নারীকুল,

তবু কর দয়া, হও অনুকূল,
জননী গোতমী এসেছেন নিজে, সংঘে প্রবেশ-তরে !"

বুদ্ধের আঁখি-তারা,
সজল-জলদ সম বিগলিত—যেন শ্রাবণের ধারা !
মহা আদর্শ একদিকে তাঁর,
আর দিকে জাগে করুণা অপার,
প্রেমিক হৃদয় উঠে উদ্বেলি' মহাপারাবার-পারা !

চিন্তিয়া বারে বার,
কহিলেন প্রভু—"শোন আনন্দ, দিতে পারি অধিকার,
কঠোর-শাসন মস্তকে পাতি,
যদি নিতে পারে এই নারী-জাতি,
দিব প্রব্রজ্যা অনাগারিকার—নাহি রবে বাধা আর !"

সে করুণা-আশ্বাসে,
গোতমীর মুখ হ'ল উজ্জ্বল অপূর্ব উল্লাসে !
কাষায়-বস্ত্রে, মুণ্ডিত-শিরে,
ভাসি' অবারিত আনন্দ-নীরে ;
লভিলা দীক্ষা শাক্য-নারীরা প্রভুর চরণ-পাশে !

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব

ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জন

যে শক্তি রাজাভরণ ও কপিলাবস্তুর সিংহাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া শাক্যরাজকুমারকে প্রসাদ-ছাড়া করিয়াছিল আর যে শক্তি দগ্ধকাম সংসারবিতৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে নির্বিকল্প-সমাধিসমুদ্রের প্রশান্ত তটভূমি হইতে সবলে টানিয়া আনিয়া নরনারায়ণের সেবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধরণীর ধূলিতে অবগাহন করাইয়াছিল সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসরের ব্যবধানেও সে শক্তিকে এক ও অভিন্ন বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। সে শক্তি প্রেম,—সে শক্তি করুণা !—সীমাহীন প্রেম,—বিশেষণহীন করুণা !!

সম প্রকৃতিতে আকর্ষণ হয় তীব্র। এই দেবতনু দু'টি একই করুণার উপাদানে গঠিত বলিয়াই বিবেকানন্দ ছিলেন আজীবন বুদ্ধ-পূজারী।

ছাত্রজীবনে ধ্যানে প্রথম করুণাছলছল বুদ্ধের শ্রীমূর্তিদর্শন, যৌবনে বুদ্ধস্মৃতিপূত বোধিগয়ায় 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' ব্রতে তপশ্চরণ, বুদ্ধের চরণবেদীমূলে জীবনবলি অর্পণের নিমিত্ত শিষ্যদের

প্রতি উদাত্ত আকুল আহ্বান—এইরূপ বহু ঘটনায় বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির নিদর্শন নিঃসংশয়রূপেই মুদ্রিত রহিয়াছে। "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট—আমার ঈশ্বর"—ইহাও স্বামীজীর বাণী। বুদ্ধদেবের অপূর্ব হৃদয়বত্তা, ক্ষুরধার প্রতিভা—যাহার বলে তিনি প্রচলিত বিক্রিয়মান হিন্দুধর্মকে বাহ্যদৃষ্টিতে পরিত্যাগ করিয়াও মূলতঃ সেই ধর্মেরই সুসংস্কৃত রূপকে আপামর সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন—আর তাঁর চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা—যাহার বলে হৃদয়হীন ব্রাহ্মণকুল-কুব্যাখ্যাত বেদপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অস্বাস্থ্যকর প্রভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া মানবমাত্রকে আত্ম-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধাবিমুগ্ধ করিয়াছিল। মানুষ হওয়ার ব্রতে দীক্ষিত ভারত-ভারতীর দৃষ্টি তাই তিনি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন মহিমা-সমুজ্জ্বল বুদ্ধব্যক্তিত্বের উপর।

তবে একথাও ঠিক যে, বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে যতখানি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাঁহার বাণী তাঁহাকে ততখানি আকৃষ্ট বা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানুষকে নির্বাণলাভের সাধনায় আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আর এই নির্বাণতীর্থে উপনীত হইবার জন্য যে পথের নির্দেশ তিনি করিয়াছিলেন—তাহা হইল স্বার্থ-বিসর্জনের পথ, আত্মত্যাগের পথ। কিন্তু আত্মাকে, তাহার স্বার্থকে বিসর্জন করিব কেন? বুদ্ধবাণীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতাবলম্বিগণ বলেন—কারণ, আত্মা কথাটা, আমি কথাটা ভ্রম, একটা কল্পনা। বস্তুতঃ 'আত্মা' বলিয়া কিছু নাই। জীব জগৎ দেহ মন বুদ্ধি—সবই যে ভঙ্গুর—অচির-স্থায়ী! আপনাকে ত্যাগ ঈশ্বরের জন্যও নহে,—কেননা কে ঈশ্বর, কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ? এইরূপ 'নাস্তি' মূলক দর্শনের উপর বুদ্ধমতবাদের প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধদেবের নির্বাণও একটি অনুরূপ "নাস্তি-বাচক" অবস্থা—যেখানে দুঃখ নাই, সুখও নাই; দ্বেষ নাই, রাগও নাই, কামনা-বাসনার অস্তিত্বই নাই। অথচ কি যে আছে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখও বুদ্ধবাণীতে নাই। স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন—বেদান্তের মতবাদ এবং বুদ্ধদেবের মত-বাদে মূলগত বৈষম্য কিছু নাই। বুদ্ধের নির্বাণ আর বেদান্তের মুক্তি যে একই অবস্থার এপিঠ ওপিঠ—যাহা বাসনার নির্বাণ তাহাই যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধ-ধর্মকে হিন্দুধর্মের পরিপূরক বলিয়াই স্বামীজী মনে করিতেন। চিকাগোতে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ তিনি দেন তাহাতে তিনি সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন—Buddhism—the fulfilment of Hinduism. তবে স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন যে, বুদ্ধদেবের এই অপূর্ব জীবপ্রেম "নাস্তিমূলক" (negative) অপেক্ষা "অস্তিমূলক" (positive) তত্ত্ব দ্বারা সহজে প্রচারিত ও অনুশীলনযোগ্য হইতে পারে। বুদ্ধের মত বেদান্তধ্বজ বিবেকানন্দও স্বার্থ বিসর্জন করিতে, আত্মত্যাগ করিতে বলেন। উভয়ের মতে ইহা ভিন্ন শ্রেয়লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু কেন এই ত্যাগ? কারণ, স্বামীজীর মতে আত্মাই একমাত্র অবিতথ সত্য—তিনি তো তোমার বা আমার এই ক্ষুদ্র একটি দেহে আবদ্ধ নন। অগণ্য দেহে যে তাঁর নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠান। অসংখ্য মুখে তিনি আহার করেন, অসংখ্য চক্ষুতে তিনি দর্শন করেন, অসংখ্য কর্ণে তিনি শ্রবণ করেন, তিনি যে 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্', তিনি যে 'সর্বভূতাশ্রয়স্থিতঃ'। কাজেই একটা দেহের সুখ-দুঃখ মঙ্গলামঙ্গলে আসক্ত হইলে তাঁহাকে ত পাওয়া যাইবে না। আর তাঁহাকে না পাইলে নিজেকেই পাওয়া হইল না, জানা হইল না। কেননা তিনি যে আত্মা—আমার সত্যিকারের 'আমিত্ব'। বুদ্ধদেবের মতো স্বামীজীরও মত—সর্বাগ্রে চাই আত্মপ্রত্যয়। কেন? কারণ, বুদ্ধদেবের

মতে 'ঈশ্বর' বলিয়া 'আত্মা' বলিয়া আকাশের ওপারে কেহ বসিয়া নাই যিনি আসিয়া তোমাকে দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ করিবেন। পরিত্রাণের জন্য তোমাকে নিজেকেই খাটিতে হইবে, বাসনার সহিত দুর্বার সংগ্রামে তোমাকে যুঝিয়া নিজেকেই বিজয়মাল্য অর্জন করিতে হইবে। আর স্বামীজীর মতে—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আকাশের পরপারে বসিয়া নাই সত্য, তবে তিনি যে আত্মারূপে তোমারই হৃদয়কন্দরে বিরাজ করিতেছেন—তিনি দূরবর্তী তৃতীয় পুরুষ (Third person) নন, তিনি যে তোমার আমার সকলের মধ্যে অন্তরতম উত্তম পুরুষ-রূপে (First person) 'আমি'রূপে অবস্থান করিতেছেন। তোমার বাহুতে যে সামর্থ্য, মনে যে মননশীলতা, এ ত সেই ঈশ্বরের শক্তির গণ্ডীবদ্ধ প্রকাশ। অসীম শক্তিময়ের শক্তিতেই তুমি শক্তিমান—সুতরাং তোমার শক্তি কখনও অল্প নয় —অপরিসীম। ইহাই বরং আশ্চর্য, বরং ভ্রম, বরং পাপ—যে তুমি সীমাহীন শক্তির অধিকারী হইয়াও তুমি নিজেকে দুর্বল মনে কর—নিজের উপর প্রত্যয় হারাইয়া ফেল।

নাস্তিভাবমূলক জীবনদর্শন বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না—কারণ উহাতে সাধারণ মানুষ অবলম্বন করিবার মত কিছু খুঁজিয়া পায় না। ভারতবর্ষে তাই বুদ্ধধর্মের বাহ্যতঃ অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে, স্বামীজীর মতে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভারতেতর বহু দেশে বুদ্ধধর্ম এখনও টিকিয়া আছে—তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বোধ করি ঈশ্বরের শূন্য আসনে সেখানে স্বয়ং বুদ্ধদেবকে অথবা অন্যান্য দেবদেবীকে বসাইয়া সে শূন্যস্থান পূরণ করা হইয়াছে বলিয়া—অন্য ভাষায় বলিতে গেলে 'নাস্তি'বাচক বুদ্ধধর্ম সেখানে 'অস্তি'বাচক ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া। নাস্তিমূলক চিন্তাধারা অনুসরণে মানবমনের স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা জানিয়া শুনিয়াও কি তবে বুদ্ধদেব প্রমাদবশতঃ আত্মা বা ঈশ্বরের তত্ত্ব-প্রচারে নির্বাক্ ছিলেন? স্বামীজীর মতে—না, তাহাও না। তখনকার দিনে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান ও অন্তঃসার-শূন্য আড়ম্বরের সেই যুগে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি অতি জাগতিক বিষয়সম্বন্ধে এত বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্ষমতাগৃধ্নু ব্রাহ্মণ-সমাজ আপনাকে বেদউপনিষদের একমাত্র ব্যাখ্যাতা বলিয়া এমন কর্তৃত্ব অধিকার করিয়াছিল যাহার জন্য ঐ সমস্ত ধারণার সংশোধন ও পরিমার্জনের চেষ্টা না করিয়া একেবারে পরিবর্জন করাকেই বুদ্ধদেব লোককল্যাণের সুগম পথরূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন।

এই 'নাস্তি'মূলক দিকটি বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ভিত্তিকেও দুর্বল করিয়াছে বলিয়া স্বামীজীর বিশ্বাস। দুর্বোধ্য নির্বাণ অপেক্ষা আত্মার অমর মহিমা যে সাধারণ মানুষের কাছে শুধু বেশী বরণীয় ও বোধগম্য তাহা নয়—বেশী যুক্তিসহও বটে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, মানবজাতির চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধধর্মকে সর্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিলেও দার্শনিক দৃষ্টিতে উহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বামীজী গণ্য করেন নাই।

বৌদ্ধধর্মের নাস্তিবাচক দিক—যাহা ঈশ্বরকে, আত্মাকে অস্বীকার করে, নাই করিয়া দেয়, ভারত হইতে তাহা লুপ্তপ্রায় হইলেও ঐ ধর্মের অন্তর্নিহিত অস্তিবাচক তত্ত্বটি, প্রেমের বাণীটি যাহা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষকে, প্রাণিমাত্রকে ভালবাসিতে, আপন করিয়া লইতে শিক্ষা দেয় তাহা লোপ পাওয়া দূরের কথা—এদেশের, শুধু এদেশের নয় সমস্ত দেশের সমস্ত ধর্মেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধোত্তর যুগে এমন ধর্ম বিরল জন্মিয়াছে—যাহা তাঁহার প্রেমবাণীর দ্বারা, আর্তজীবকুলের জন্য তাঁহার গভীর দুঃখসংবেদন দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। এইজন্যই স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে এখনও অপসৃত হয় নাই—রূপান্তর পরিগ্রহ

করিয়া বাঁচিয়া আছে—সুদূর ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবে।

বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও দর্শনপ্রসূত আত্মসাম্যতত্ত্ব আর বুদ্ধদেবের হৃদয়বত্তা এদুয়ের সম্মিলনকে স্বামীজী ভবিষ্যৎভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এককভাবে এই দুয়ের কোনটাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বুদ্ধকে ও তাঁহার ধর্মকে নূতনভাবে গ্রহণ করিবার, আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে রূপায়িত করিবার কাল এখন সমাগত।

যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল ভাষায়, চলতি কথায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার বিশেষ মহত্ত্ব কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy. তাঁহার ধর্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে—নাই তাঁহার intellect ও heart যাহা জগতে আর হইল না।

(স্বামী বিবেকানন্দ—ফেব্রুয়ারী ১৮৯০)

পাঞ্জাবে সৎসঙ্গ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

কবি বলেছেন, "ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই কপি জোড়কর
কর তাহা দরশন।"

ভক্তি দুর্লভ বস্তু। ভক্ত আরো দুর্লভ জগতে। কিন্তু এই নগভাগবত দীনও জগতে সুদুর্লভ যিনি অপরের ভক্তি মুগ্ধনেত্রে দর্শন করে কৃতার্থ হন। এ মানুষও দৈবাৎ দেখা যায়। কথা-কীর্তনে কখনো কদাচ হঠাৎ চোখে পড়ে যায়, বিগলিত মুগ্ধ আনন্দে যিনি ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন করছেন। ভজনে শুনি, 'বিনা ভাবসে ভক্তি নেহি, বিনা সৎসঙ্গ ভাব নেহি ···।' এই সৎসঙ্গই মানুষকে ভাবমুখে জাগিয়ে তোলে। ভক্তিলাভ ও ভক্ত তার অনেক পরের কথা।

পাঞ্জাবে 'সৎসঙ্গ' মানে কীর্তন ও কথকতা। এই কীর্তন কথকতা অন্যত্র—দেবালয়ে, গঙ্গাতীরে যেমন কাশী হরিদ্বারে পুরীতে হয়, দেখা যায়। এখানে অমৃতসরে নানা দেবালয়ে মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু দরবার সাহেবে (শিখদের সোনার মন্দির) ভজন গান কীর্তন অহোরাত্র হয়। এছাড়া কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীতেও হয় প্রায়ই। কোনো বাড়ীতে জায়গা ঠিক করে একটি দিন ঠিক করে নেন মেয়েরা। সেই দিন কথা আহ্বান করা হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে অনেক মেয়ে সমবেত হন। এমনিও কম জমা হন না।

এখানকার বিশেষত্ব হ'ল এই যে, অন্য জায়গার মত পুরুষ কথক আর নরনারী সকলেই শ্রোতা নয়, এখানে মেয়েরা নিজেরাই কথকতা গান ভজন কীর্তন করেন। একের পর একজন গান করেন, হারমোনিয়ম ঢোল বাজিয়ে, করতাল বাজিয়ে, চিমটা বাজিয়ে সঙ্গত করে গান ভজন করা হয়। সুগায়িকাও পাওয়া যায়, কথাকর্ত্রীও অনেকে আছেন, কথকতা ভালই করেন। গল্পে গানে উপদেশে সে কথা সুন্দর ও সুমধুর হয়। এখানে

দেখতাম সাধারণতঃ সোমবারে মঙ্গলবারে কীর্তন বসে। 'ওঁরা কীর্তন বা সৎসঙ্গে' বলেন। মঙ্গলবার হল মহাবীর বা হনুমানজীর বার। সেদিন হনুমানজীর স্তব গান হবেই পাঞ্জাবী ভাষায়।

"জয় জয় হনুমান্ বিরাজে বঙ্কা"

………অঞ্জনাপুত্র যাঁর কৃপায় "থোড়ি মারি লঙ্কা," লঙ্কা সন্নিকট হ'ল। যাঁর সাহায্যে সীতার সন্ধান পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের মত এমন নিষ্কাম ভক্ত আর পাওয়া যায় না।

এখন একটু দেশ, কাল, মানুষ ও দেশাচারের কথা বলি। উৎকট গরম ও বিষম শীতের দেশ। শীতে ভোর ৭টা থেকে বিকাল পাঁচটা অবধি দিন, গরমে ভোর সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যা আটটা অবধি আলো। গরমের দিনে দ্বিপ্রহরে যেমন ঘরে তেমনি পথে সমান গরম। তারপর মাছি ও মশা। দিনে মাছির সুর, সন্ধ্যা থেকে মশার সঙ্গীত।

যদি জালি দেওয়া বাড়ীঘর না হয় তাহলে দিনে রাত্রে লেখাপড়ার কাজ করা অতি কঠিন। মশারি টাঙিয়ে বসে পড়াশোনা করা যায় কিনা ভাববার কথা। দিনেও ক্রমাগত হাত দিয়ে মাছি তাড়িয়ে তবে পড়ালেখা করতে হয়। একখানি চিঠি লিখতে বসেও মাছির জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়। অন্য কোনো মনোনিবেশের কাজ তো দূরের কথা। একখানি ভাল বই পেলে রাত্রে মশারির মধ্যে পড়া ছাড়া উপায় নেই কি শীত কি গরম। তার উপর—হাত বার করে বই পড়া শীতের রাত্রে দুরূহ। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর 'মেজ দাদা'কে স্মরণ করে তখন আর রাগ হয় না, ক্ষমা করতে পারা যায়। মনে ভাবি এদেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর; পড়া শোনার ব্যাপার কিংবা রাত্রে বিদেশী পণ্ডিত জনের মত অভিনিবেশ সহকারে পড়ালেখা বা কাজের নেশা খুবই কম লোকের মধ্যে দেখা যায়—তাই, যদি এই চর্চার নেশা থাকত তাহলে কি সম্ভব হ'ত কাজ করা? যেন স্বীকার করতেই হয় মনেমনে ও প্রকাশ্যে, হয়ত এই বিপর্যয় গরম ও অতি শীত আর অতি ধূলা অতি মাছি মশার উৎপাত মানুষকে কিছু বিপর্যস্ত করেছে, তার কল্পনা থেকে, সৃষ্টির প্রতিভা থেকে, তার নিবিষ্ট মনে কাজ করার চেষ্টা থেকেও। অথচ গুরু নানক কবীর দাদু থেকে নানা বিখ্যাত খ্যাত অখ্যাত সাধক ভক্ত কম নেই; যাঁরা শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের লেখা নানা রচনা পড়েছেন, তাঁরা আরো অনেক জানা-কমজানা ভক্তের ও সাধকের কথা জানতে পারবেন। আর যাঁরা সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে কথা-কীর্তনে মিশেছেন তাঁরা এখনো মাঝে মাঝে সেই ভক্তদের সন্তদের দু একজন ভক্ত দেখতে পাবেন। এঁরা এখনো পুরনো ভাবে থাকেন, সব দেশের জনসাধারণের মতই অসংখ্য নূতনের মাঝেও সেই পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা মোহ বড় কম নেই। দিবারাত্র গানে ভজনে কীর্তনে শিখদের 'হরমন্দির' বা 'দরবার সাহেব' আনন্দে মুখর। সে গানের রচয়িতা বহু জন। কবীরজী আছেন, সুরদাস রবিদাস দাদু আছেন, মীরাবাঈ আছেন। গুরু নানক থেকে দশ গুরুর শেষ গুরু গুরু গোবিন্দ সিং অবধি সকলের রচিত ভজন কীর্তন গান হয়। প্রকাণ্ড জলাশয়—অমৃত সরোবর, যা থেকে অমৃতসর নাম হয়েছে। মাঝখানে সোনার মন্দির—সোনার পাতে মোড়া, ভিতরে অপূর্ব মীনাকারী কাজকরা দেওয়াল, যতদূর চোখ যায় সুন্দর কারুকাজ চোখে পড়বে। মন্দিরের মাঝখানে বেদীতে 'গ্রন্থ সাহেব' সমাসীন। দশ গুরুর উপদেশাবলী-সমন্বিত এক মহাগ্রন্থ। শিখেরা 'গ্রন্থ সাহেব' বলেন। চারিধারে কোষবদ্ধ কৃপাণ কোলে বা পাশে রাখা শিখ নরনারী ভক্ত-মণ্ডলী দেখা যাবে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে সকলে বসে আছেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান হচ্ছে, দুতিন ঘণ্টা অন্তর গায়ক দল চলে যাচ্ছেন। অন্য

দল এসে গান দিয়ে গ্রন্থ সাহেবের-গুরু বচনের উপাসনা 'সেবা' করে যাচ্ছেন। শ্রোতা বা দর্শকমণ্ডলীও তারি মাঝে আসছে বসছে, পূজা দিয়ে যাচ্ছে মালা ফুল পয়সা যা খুশী দিয়ে, আর ফিরে যাচ্ছে। গান বা ভজন এমন সুন্দর যে দু দণ্ড কেটে কখন চার দণ্ড শেষ হয় মনে থাকে না। কখনো শুনতে পাওয়া যাবে কোনো সাধকের বিখ্যাত গান,—

"উঠ জাগো মুসাফির ভোর ভয়ো
অব রৈন (রজনী) কাঁহা যো শোওত হৈ।
যো শোওত হৈ, সো খোওত হৈ
যো জাগত হৈ, সো পাবত হৈ॥
* * *
যো কাল করে সো আজ কর লে,
যো আজ করে সো অব্ কর লে।
জব চিড়িয়ন ক্ষেতি চগী ডালি,
ফির পছতাযে ক্যা হোওত হৈ॥"

মনে হয় এবার শেষ হ'ল, উঠি, আবার এক গান শুরু হ'ল—

'বিনা সৎসঙ্গ ভাব নেহি, বিনা ভাবসে ভক্তি কাঁহা।' মুগ্ধ আগ্রহে নিঃশব্দে লোকে শুনছে, অনিচ্ছায় উঠে যাচ্ছেও নিঃশব্দে, এমনি সৎসঙ্গেরও মোহ, সংসারেরও মোহ।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, এই অসম্ভব গরম আর শীতের দেশ বলেই যেন এখনকার পাঞ্জাবের মানুষের মধ্যে নানামুখী কর্ম ও ভাব দেখা যায় না। অতিশয় গ্রীষ্মের সময় গরমের প্রতাপে যখন তখন আঁধি ও মাছি মশার উৎকট উপদ্রবে মানুষ কোনো রকমে সারাদিনের খাটুনির পর কিছু খেয়ে সন্ধ্যার পরেই শোবার যোগাড় করে। শুধু মাঝে মাঝে কীর্তন কথার আসরে যোগ দেয় যারা গান শোনে, গান ভালবাসে বা গান গায়। আর শীতকালেও তো তেমনি প্রচণ্ড বা উৎকট শীত, সে সময়ের রাত্রে সঙ্গীত কীর্তনের কথা প্রায় ওঠেই না। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে অথবা মেয়েদের আসরে দুপুরে কীর্তন গান হয়।

আমরা বাড়ীতে মাঝে মাঝে আলোচনা করতাম যে, পাঞ্জাবের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য বা নানামুখী জ্ঞানের ভাবের দিকে প্রবণতা বা প্রভাব প্রেরণা যেন দেখা যায় না; কিন্তু ভক্ত ও ভক্তিভাবযুক্ত লোক এখনো অনেক, এর জন্য কি দেশের অদ্ভুত অতি শীত গ্রীষ্মের আবহাওয়াই দায়ী? যে আবহাওয়াতে হাতপাখা নিয়ে বসে অথবা কম্বল মুড়ি দিয়ে কথা গান কীর্তন শোনা যায়, ঘরে বসে গালগল্প করা যায়। বই পড়া লেখা বা কোনো শিল্পের সাধনা নিবিষ্ট চিত্তে করা যায় না। কিন্তু তখনি মনে হত ইয়োরোপের জ্ঞানী সাধকের কথা। যাক্ একথা। সেখানকার শীত কম নয়। এই হ'ল পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের কথা। কিন্তু এই সাধারণ মানুষইতো সর্বত্রই দেশের নাড়ীর স্পন্দনের মত। তাদের আচার আচরণ, তাদের ধর্মকর্মই জাতির পরিচয় দেয়। তাদের মাঝ থেকেই আবির্ভূত হন মহামানব মহাপুরুষ দল।

দেশভাগের আগে পাঞ্জাবে তিন জাতি বা সম্প্রদায় ছিল। হিন্দু মুসলমান ও শিখ। বহু মিলের মধ্যে প্রধান অমিল ধর্মের ও আচারের এবং নানা অমিলের মধ্যে মিল ছিল কথ্য ভাষার। পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, উর্দু মিশানো ভাষা, লেখ্য বা পাঠ্য ভাষা উর্দু ও ফারসী এখনো। দেশভাগের পরও ফারসী উর্দু হরফের চলন আছে। রীতিনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনো অমিল নেই। মুসলমান গয়লা দুধ দিয়ে গেছে, হিন্দুর বাড়ী। ফলওয়ালা, সব্জীওয়ালা ফল সব্জী বিক্রী করে গেছে। শালের কাজ, সূক্ষ্ম কাজ মুসলমানের হাতে বেশী ভালো ছিল। কথাবার্তা হিন্দু মুসলমানের এক। পোষাকপরিচ্ছদ শিখ হিন্দু মুসলমানের এক।

সালোয়ার কামিজ চুড়িদার পাজামা শাড়ী ধুতি সবাই পরে হিন্দু শিখ মুসলমান নির্বিশেষে।

মুসলমান গয়লা দুধ দিতে এসে নিরামিষ ঘরে দুধ আলাদা করে নেওয়া দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মাতাজী, পুত্রকে সাথ অলগ্, রহতেঁ?' ওরা মুসলমানরাও বর্ষীয়সীদের মাতাজী বলে। আর মুসলমানরাও ছেলেকে পুত্রই বলে। লড়কা বা বেটী বলার দিল্লী লক্ষ্ণৌ হিন্দী উর্দু ওখানে চলে না। আমাকে বলতে হ'ল, আলাদা নয় কিন্তু রান্না ঘর পৃথকের কারণটি।

বৃদ্ধ বা বয়স্ক মুসলমানের দোকানে জিনিস কিনতে গেলে শিখেদের সঙ্গে গিয়ে দেখেছি, তাঁরা বৃদ্ধদের বাবা সম্বোধন করে দর দাম করেন। কম বয়সের কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে 'ভ্রা-জী' (ভ্রাতাজীর সংক্ষেপ) বলা নিয়ম। তাঁরাও উত্তরে হয় বহিনজী নয় মাজী বলবেন। শিখ মেয়েদের পর্দা নেই। মুসলমানদের পর্দা ছিল। হিন্দুরও ইচ্ছামত প্রথামত পর্দা মেনে চলা আছে, ছিল।

এরপর দেশ ভাগ হয়ে গেছে। এখন পাঞ্জাবে প্রায় সর্বত্রই কাশ্মীরী মুসলমান ছাড়া অন্য মুসলমান নেই। বিশেষভাবে অমৃতসর তো সীমান্তপ্রদেশ, কাজেই সেখানে আগের অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায় আর নেই।

দীর্ঘকালের মিলে অমিলে এক হয়ে থাকার দিন আজ শেষ হয়ে গেছে। এখন যাঁরা আছেন, হিন্দু শিখ ঠিক সেই ভাবেই আছেন। মাত্র একটি সম্প্রদায় দেশ ছেড়ে চলে গেছে এবং অন্য দেশ থেকে এঁদের সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করেছে এই মাত্র নূতনত্ব। সেই সালোয়ার কামিজ পরা নরনারী, 'তুন্দুরে' তৈরী করা রুটি, 'লস্সী' (ঘোল) ফল, সব্জী, মাছি মশা নিয়ে কিন্তু দেশ তেমনি আছে। আহার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বিবাহ উৎসব, জন্মমৃত্যু, সবই দেশ ও কালানুযায়ী ভাবেই মিলে অমিলে ভেদে অভেদে তেমনি আছে। আমাদের না-জানা চোখে 'বোরকা' পরা না থাকলে কাপড় রং করা মেয়ে 'রং রেজ' নারীকে মুসলমানী বা শিখ বলে প্রভেদ বুঝতে পারতাম না। সন্ধ্যার পর শহরে দোকানের সামনে গেলে দেখা যাবে, দোকানের বাইরে কোনো কোনো জায়গায় প্রকাণ্ড ডেকচি করে পোলাও চড়েছে তেমনি আগের মত—মুসলমানদের যেমন রান্না হ'ত। এখনো 'দফতর খান' বা চাদর বা ঝাড়ন পেতে তেমনি হিন্দু শিখ দোকানীরা কলাই করা থালায় করে খেতে বসে গেছেন। ক্রেতা বা ক্রেত্রীরা অপেক্ষা করছেন বা কথা কইছেন তারি মাঝে। আচারব্যবহারে শিখেরা অনেকটাই মুসলমান সমাজের মতন। জাত মানেন না। ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, উচ্ছিষ্ট বিচারও বিশেষ নেই। বিছানায় বসে খাওয়া দাওয়া চলে (যা শীত বোধ হয় সেইজন্য) উচ্ছিষ্ট খাদ্য উদ্বৃত্ত হ'লে পাতের থেকে অনায়াসে তুলে রাখেন। মেথর ছোঁয়ার ভয় নেই, অস্পৃশ্য নেই ও সম্প্রদায়ে। ঝাড়ুদারের মেয়ে বা স্ত্রী একসঙ্গে 'চাক্কী'তে আটা, নুন, বেসন পিষে দিয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ মেয়েদের সঙ্গে। শিখদের বিবাহ ব্যবহারে শ্রেণীভেদ থাকতে পারে, প্রয়োজন মত বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ হয়, জাতিভেদ নেই। 'দরবার সাহেবে' ঝাড়ুদারেরাও সমানভাবে প্রবেশ করে মালা ফুল পূজা দেয়। স্পর্শবিচারহীন এমন জাতিবর্ণহীন কঠিন গড়নের সমাজ গড়ে গিয়েছিলেন শেষ গুরু গোবিন্দ সিংজী। তাঁর আগে 'শিখ' নামও ছিল না শিখদের। পাঁচটি শিষ্যের 'শীর্ষ' চেয়েছিলেন তিনি এবং তাঁদের সেই প্রাণ দিতে অগ্রণী বীর শিষ্য-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় পাঁচজনকে তিনি শিখ নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁরাই আজকের 'শিখ' সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। অবশ্য শিখধর্মও অনেকে গ্রহণ করেন এখনো। গুরু

নানক ছিলেন, ভক্ত, উদাসী, গৃহী সন্ন্যাসী। তিনি পাঞ্জাবের উদাসী সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু পরম ভক্ত হলেও বীর্যহীন সাধু তিনিও ছিলেন না। তারপরে যিনি গুরু হন তাঁর নাম গুরু অঙ্গদ। তিনিও নানকের সন্তান নন শিষ্য। চতুর্থ গুরু রামদাসের সময়েই অমৃতসরের মন্দির হয়। তখন নাম ছিল 'হরি মন্দির' বা হরি মন্দির। পরে পরে দশ গুরু অবধি এক গৌরবময় ইতিহাস। নানা সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহময় কাহিনীতে শিখ-জাতির পুরাতন ইতিহাস ভরা। সকল গুরুই নিষ্ঠাবান্, কঠোর বীর আদর্শচারী, অথচ পরমভক্ত। সকলেই কবি, বহু ভজন রচনা করেছেন। এই গুরু শিষ্য পরম্পরা ছেলেকে পুত্রকে সব সময়ে শিষ্যত্ব বা গুরুপদ দেওয়া হত না।

এঁরাও ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায়ের মতই একেশ্বরবাদী ও গুরু পূজক, মানে গুরুবাদী। হয়ত সেইজন্য অনেক সময়ে হিন্দুদের মত সবাইকে নম্রভাবে সয়ে নানাভাবে মেনে নেওয়ার ভাব পাওয়া যায় না। তবু স্বীকার করতেই হবে, এই কঠিন এক ধর্মমত মুসলমানদের মতই ওঁদেরও শক্তি দিয়েছিল, উগ্রভাবে প্রতিকূলতা করার প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোঝবার বহুদিন অবধি। আর দিয়েছিল মানুষকে অস্পৃশ্য করে না রাখার মনোভাব। যদি বা মুসলমান-সমাজে অস্পৃশ্য 'ভাঙ্গী' বিচার থাকে, শিখ-সম্প্রদায়ে তা' নেই বলা যায়।

এবং এই মনোভাব ওখানকার হিন্দুতেও খানিকটা বর্তেছে। আমার সৎসঙ্গে ও কীর্তনে মন্দিরে যা' অভিজ্ঞতা হ'ল, তাতে দেখলাম, আব-হাওয়ার গুণেই হোক, আর মুসলমান, শিখ সম্পর্কেই হোক, সকল স্তরের সব জাতি ও শ্রেণী মিশে সৎসঙ্গ এক অপরূপ সম্মেলনী সৃষ্টি করেছে।

সৎসঙ্গের কথা বলতে বলতে অনেক দূরে চলে এসেছি মানুষের কথা নিয়ে। কিন্তু মানুষকে নিয়েই তো সৎসঙ্গ আর এই পাঞ্জাবেই এখনো ভারতবর্ষের পুরাতন সাধারণ ঐতিহ্য বজায় আছে কথকতার। আর নতুনত্ব হচ্ছে তার এই, আগেই বলেছি সেকথা, মেয়েরা মেয়েদের নিয়ে মণ্ডলী সৃষ্টি করেন। গানে বাজনায় কথকতায় গল্পে উপদেশের কথায় সে আসর চমৎকার।

আমাদের বাংলাদেশ শক্তি উপাসক। আমাদের দুর্গোৎসব সবচেয়ে বড় পূজা ও উৎসব। তারপরে সরস্বতী পূজার উৎসব, লক্ষ্মীপূজাও বছরে বার বার। সকালে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে 'দুর্গা দুর্গা' বলে। কোথাও যাত্রা করতে হলেও সেও 'দুর্গা দুর্গা' বলেই করি। শঙ্কায়, বিপদে, আতুরতায়, শুভকাজে সম্পদে যজ্ঞে উৎসবেও আমাদের 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' সহায়। দুর্গার আগমনী বিজয়ার গানে আমাদের সাহিত্য ভরা। কখনো মা, কখনো কন্যারূপে মা দুর্গা আমাদের সকলের অন্তর পরিপূর্ণ করে আছেন। বৈষ্ণবধর্ম, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিরহমিলন লীলাময় সাহিত্যের পাশে পাশে আমাদের রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত দাশু রায় প্রভৃতির গান রামকৃষ্ণ-দেবের মাতৃভাবের সাধনা অচলা একইভাবে চলেছে। একথাও বলা যায় বরং ব্যক্তি সাধনাই বেশী। এই মাতৃভাবের শক্তিপূজার সাধনা কত দিনের পুরাতন তা ভাববার বিষয়, পণ্ডিতেরা আলোচনা করে দেখতে পারেন।

বাংলাদেশ অতিক্রম করে বিহারের পরেই পড়ে উত্তর প্রদেশের সীমানা। এই বিহার থেকে শুরু হয়ে অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার, প্রয়াগ নানা তীর্থময় দেশ রামের ও রামায়ণের রাজ্য বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কর্মভূমি লীলাভূমিও যদিও বটে, কিন্তু বিহারের পর থেকে প্রায় সমস্ত উত্তর পশ্চিম রাজপুতানাও যেন প্রধানতঃ রামেরই

উপাসক, রামভক্ত হনুমান্‌জীর ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ উপাসক একভাগে মথুরা বৃন্দাবন রাজস্থানে বম্বে গুজরাট অঞ্চলে আছেন, কিন্তু রাম ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে আছেন সর্বত্র।

বাংলাদেশে যেমন কথায় বলে কানু ছাড়া গীত নাই (বোধ হয় প্রেমের), তেমনি বাংলা দেশ ছাড়িয়ে অন্যত্র অঞ্চলে পাহাড়ে পর্বতে হিমালয়েও 'রাম' ছাড়া কথা নাই। পশ্চিম ভারতে অভিবাদনে 'রাম রামজী' 'জয় সীতা রাম', আনন্দে উৎসবে রামনামই আসে। এবং গানে ভজনেও রামের নামই বেশী। রামায়ণ ছাড়া কথকতাও কম। মা বলে ভগবতী ভাবে ডেকে গান রচনা করা হয়েছে এমন গান একটিও শুনিনি। আমাদের রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের, দাশু রায়ের গান যেমন কালী-শ্যামা-দুর্গা নামে ভরা, ওদেশে তেমনি রামনামের ভজন গানই বেশী। অবশ্য কৃষ্ণ রাধার নামে গানও আছে কিন্তু সেও দু'চার জনের মাত্র। যেমন মীরা বাঈ আর কবি সুরদাসের বিরহমিলনের অভিসারের প্রেমের গানগুলি। ওঁদের 'সৎসঙ্গের' প্রথমে একটি 'প্রণিপাত' আছে, তাতেই এটার প্রমাণ মিলে,

দিলাম জয়গানটি,—

জয় মীরাকে গিরধর নাগর
জয় তুলসীকে সীতারাম,
জয় নন্দনীকে শ্যামলিয়া
জয় সুরদাসকে রাধে শ্যাম।

দেখবার জিনিস এই, শিব দুর্গা, লক্ষ্মী নারায়ণ নাম, দেবালয়, মন্দির সব আছে, কিন্তু কীর্তনের আসরে রামসীতার ছবি কিংবা কৃষ্ণগোপালের ছবি এবং হনুমান্‌জীর ছবি আগে।

শিবালয় আছে, শক্তিমন্দিরও আছে। ও সব দেশে মা দুর্গা ব্যাঘ্রবাহিনী মূর্তি। কিন্তু তাঁরা অপ্রধানভাবে বিরাজ করেন। রাজপুতানায় নব রাত্রি পূজার প্রথা আছে দুর্গোৎসবের প্রতিপদ থেকে বিজয়ায় 'দশেরা' অবধি। কিন্তু সে আর একরকম। বীরভাবে অস্ত্রপূজা। রাজস্থানের রাজপুত ক্ষত্রিয়ের সমস্ত অস্ত্রাগার সে সময় সংস্কার করা হয়, অস্ত্রগুলি পরিষ্কার করা হয়, আর রাজারা, প্রধান প্রধান রাজপুতেরা, ক্ষত্রিয়েরা ঐ ন'দিন একাহারে থেকে শুচিশুদ্ধভাবে অস্ত্রপূজা করেন। দেশের কালীমন্দিরে পূজা পাঠ হয়, বলিও হয়, কিন্তু দুর্গোৎসবের মত সর্বজনীন নয়—অন্যভাবের ব্যক্তিগত কৌলিক আরাধনা।

পাঞ্জাবে শিখদের বা হিন্দুদের মধ্যে এই নবরাত্রি পালন নেই। কালীবাড়ী, দুর্গামন্দির আছে; সেখানেও কিন্তু রামলীলার উৎসব, রাবণবধের উৎসব। এঁদের শিখ হিন্দু মিলিয়ে কীর্তন ও কথায় সৎসঙ্গের বা ভক্তের মিলনের আসর। 'অখণ্ড রামায়ণ' পাঠের আসর। 'অখণ্ড রামায়ণ' মানে সমস্ত রামায়ণখানি দু-তিন দিন অহোরাত্র ধরে অখণ্ডভাবে পাঠ করা হবে, একের পর একজন এসে সেই আসনে কথা তুলে নিতে বসবেন, দু-তিন ঘণ্টা অন্তর করে। মঙ্গলাচরণ করে আরম্ভ হবে, কোনো ভাল কথাকর্ত্রীকে দিয়ে। শেষও হবে সকলকে নিয়ে, তাঁকে দিয়েই পূজা-প্রসাদ দিয়ে। সে পূজা উপচারবহুল নয়, নিষ্ঠা-ভক্তিময় পূজা। এ আসরে বাল্মীকিরামায়ণের অনুবাদও পাঠ করা হয়, আবার তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ হয়। তুলসীদাসের রামায়ণের গল্পাংশের আরম্ভ মূল রামায়ণ থেকে কিছু পৃথক্ অনেকেই জানেন। যোগীশ্বর মহাদেব সতীর কাছে রামায়ণ কথা বলছেন, এই ভাবের আরম্ভ। নারদ ভুষণ্ডীকাক সকলের কাহিনী ও ভক্ত-কথায় আরেক রকমের অপূর্ব কথা। সেকথা অন্য কোনো সময় বলা যাবে।

একদিন কথকতা শোনার নিমন্ত্রণ এলো এক বাড়ী থেকে—সেই কথা বলি। অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হবে। বহুসংখ্যক মহিলা, নানা শ্রেণীর মেয়ে জড় হলেন উৎসবে। কলাগাছ দিয়ে ফুল দিয়ে

বেদী রচনা করা হল, 'রামায়ণ' রাখা হল বেদীতে। শুরু হল পাঠ। সকালে আরম্ভ সময়ে যোগ দিয়ে বাড়ী ফিরলেন সকলে। আমিও ফিরলাম। তারপর যখন বিকালে পৌঁছালাম তখন 'ভরত বিলাপ' চলছে।

মাতুলালয় থেকে এসে পিতার শোচনীয় মৃত্যুতে রামের আকস্মিক বনবাসে শোক ও লজ্জা অভিভূত ভরতের বিলাপ। জননীকে ভৎর্সনাধিক্কারে ভরা খেদোক্তি, আর প্রতিপদের শেষ কথা 'রামাজী রামা'। ব্যাকুল শ্রোত্রীরা কাতর মনে বিলাপ শুনছেন সজল নেত্রে। এমন জননীর এমন সন্তান! এমন নির্লোভ ভাই এমন সৌভ্রাতৃত্ব, আদর্শে যেন রামেরই সমান মনে হয়। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস নিলেন। ভরত তো ইচ্ছা করলে মাতার প্ররোচনা মত রাজ্যভোগ করতে পারতেন। নিজের সহোদর ভাইও নয়, বিমাতার পুত্র। রাজ্যও পিতার দেওয়া, জননীর বর নিয়ে পাওয়া! যুক্তির দিক দিয়ে পরম মুক্ত ভরত, কিন্তু রামচরিত্রের মত অতুলনীয় ভরতচরিত্রের সে দুর্বলতা ছিল না।

সেই ত্রেতা যুগের কথা। কিন্তু এমন কথা— এমন মানুষের কথা কেউ কখনো শোনেনি যেন। এমন লোভহীন চরিত্র, এমন মধুর এমন শান্ত শ্রদ্ধাময় ভাবে ভাইকে ভালবাসাময় মানুষ সত্যই কি ছিল? মনে যেন ও সংশয় জাগে। সাধারণ মানুষের চরিত্র তো এমন হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এমন হয় না বলেই তো আজও রাম ও রামায়ণ একইভাবে ভারতবর্ষের মানুষের মন গভীরভাবে অধিকার করে আছে। কবির কথা মনে পড়ে,—

"সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে যে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে বহু ধন কে দিয়েছে তাহার অধিক"
··· কে নিয়েছে রাজভালে ধরাতলে দুঃখ মহত্তম ·।

মন পড়ল রামায়ণের কথা "যাবৎ স্থাস্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে" ··· পৃথিবীতে যতদিন গিরি, নদী, পর্বত থাকবে, পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন এই অমর রামায়ণ থাকবে।

কথাকর্ত্রীও বল্লেন, "একথা শুধু কথা নয় তো, কাহিনীও নয়, গল্পও নয়। আপনারা তো কত কথা আজকাল পড়েন, কত রচনাও করেন লোকে, কিন্তু এমন কথা কেউ আর কি রচনা করতে পেরেছেন, না আপনারা পড়ে সে সব কোনো কাহিনী মনে রাখেন? এ সত্য ইতিহাস, সত্য ঘটনা। আজো তাই মানুষ মুগ্ধ হয়ে এই পুরানো একই কথা দিনের পর দিন শোনে। রামের অপূর্ব ত্যাগের কথা, ভরতের লক্ষ্মণের অপূর্ব শ্রদ্ধা ভালবাসা ভক্তিময় আনুগত্যের কথা, সীতার পরম দুঃখময় লাঞ্ছনাময় জীবনের কথা, জীবনাবসানের কথা, অনাথ বীর হনুমানের একান্ত রামময় জীবনের কথা, এ আমাদের চিরকালের, জিনিস, ভারতবর্ষের রক্তে মিশে আছে ··· ·····।"

মনে পড়ল, মহাভারতের চরিত্র, ঐশ্বর্যময় কথা— ভীষ্ম কর্ণ যুধিষ্ঠির বিদুর সাবিত্রী গান্ধারী দ্রৌপদীর জীবনকথা। এই দুই অপূর্ব ইতিহাসময় কাব্য অথবা কাব্যময় ইতিহাসকে অতিক্রম করে আজো কি কেউ কথা-কাহিনীতে এমনতর নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন? বস্তুতঃ কল্পনাতে তা সম্ভবপর হতে পারে না, হয় না। বরং বাস্তব জীবনের ইতিহাসের মাঝেই মাঝে মাঝে এমন মহামানবকে দেখতে পেয়েছে মানুষ।

মনে হ'ল, ভীষ্মচরিত্রের মত এমন চরিত্র কে দেখেছে? রামের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই পিতৃসত্যের জন্য রামের বনে যাওয়ার চেয়ে কোনোখানেই তো কম নয়। বৃদ্ধ পিতা শান্তনুর সত্যবতীপুত্রকে 'সিংহাসন দেবার প্রতিশ্রুতি কি জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রতকে, ব্রহ্মচারী ভীষ্ম ক'রে তোলেনি? অকালমৃত ভাইদের রাজ্য নিলেন না। বিমাতা বা অন্য কারুর অনুরোধেও বংশরক্ষার জন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নি। এমন ক্ষোভহীন,

মোহলোভহীন, দৃঢ় বীর চরিত্র—সত্যনিষ্ঠা আর কোথা আছে? মনে হল গান্ধারীর মত নারীই বা কোথা দেখা গেছে? দুর্জন পুত্রদের দমন করতে পারেন নি, অন্ধরাজাকে পতিকে ন্যায়-পথে প্ররোচনা নিষ্ফল হয়েছে, মাতৃস্নেহশঙ্কাতুর হৃদয় অধর্মের অন্যায়ের পরিণামও যেন বুঝতে পেরেছিল, তবু তাঁর হৃদয় মন্থন করে 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' এই নিঠুর সত্যই উচ্চারিত হয়েছিল। বলতে পারেন নি, নিজের সন্তানের জয় হোক, কল্যাণ হোক, রাজ্যলাভ হোক। সবাই জানে, সত্যেরই ধর্মেরই জয় হবে, কিন্তু কোন্ জননী সে কথা উচ্চারণ করতে পারে? দুর্বল শঙ্কাতুর হৃদয় সত্যকে দেখতে পেলেও দেখতে চায় না।

মনে পড়ল, উদ্ধত অমর্ষপরায়ণ মাতৃত্যক্ত বীর দাতা কর্ণের কথা। এও এক চরম দুঃখের কাহিনী। সত্যনিষ্ঠ কর্ণের ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দান করা এককথায় নিজের প্রাণই দান করা। শ্রদ্ধাভরে ভীষ্মের শরশয্যা পাশে গিয়ে সেনাপতিত্ব গ্রহণের আগে প্রণাম করার কথা। দুর্যোধনের প্রতি একান্ত আনুগত্যের জন্য জননী কুন্তীকে প্রত্যাখ্যান করা। এমন বীরের জীবনে এমন ব্যর্থতা কে দেখেছে? সত্য মানুষেই এমন জীবন সম্ভব, কল্পনায় এমন হয় না। আগাগোড়াই তিনি 'সূতপুত্র' ক্ষত্রিয়সন্তান নয়—এই ক্ষোভ বহন করেছেন ক্ষত্রিয়ের মত বীর হয়েও। বীরত্ব, দান, সত্যনিষ্ঠা, তিক্ত অসূয়াময় অদ্ভুত চরিত্র। জন্মরহস্যই যেন তাঁকে সমস্ত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও অমর্ষ-পরায়ণ ক্ষুদ্রচিত্ত করেছে মাঝে মাঝে (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সময়ে)।

পঞ্চপতির স্ত্রী দ্রৌপদীর চরিত্রও অদ্ভুত, তুলনা-হীন। তেজে, গর্বে, গৌরবে এই চরিত্র সমুজ্জল। এমন উজ্জল হয়েছে যে মানুষের কল্পনা পথ পায় না। কোথায় পঞ্চপতিত্বের অসঙ্গতি, কোথায়—অসামাজিক! দ্রৌপদী-চরিত্র অনন্য।

মনে পড়ল, রাজ্যত্যাগী রাজপুত্র শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের কথা। মানুষের কোন্ দুঃখ তাঁকে সংসার, রাজ্য, যুবতী স্ত্রী, শিশু সন্তানের মোহ ত্যাগ করিয়েছিল? রাজরাণী মীরা বাঈয়ের কথা; কোন্ অচিন্ত্য পুরুষের অচিন্ত্য প্রেমের মোহ তাঁকে রাজ্য স্বামী স্বজন বান্ধব ত্যাগ করিয়েছিল?

মনে হল, গুরু নানক, চৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি ধর্ম গুরুদের কথা। তাঁদের জীবনের গল্পের মতই আশ্চর্য অনুভূতির কথা। মানুষের কল্পনার সৃষ্টির চেয়েও অনেক আশ্চর্য চরিত্র এই বা কোথায় কে ভাবতে পেরেছে? আজ অবধি তো ভগবানের সৃষ্ট চরিত্রের কাছে মানুষের কোনো কাল্পনিক চরিত্রই দাঁড়াল না।

মনে পড়ল, রাজস্থানের প্রভুবৎসল ত্যাগী বীরদের কথা। রাজপুত্র চণ্ডের কথা, ভীষ্মেরই মত। শিখবীর গুরুদের কথা, বীর্যময় শৌর্যময় ধর্মের কথা!

রামায়ণের কথা দিয়ে আসি।* অহোরাত্র ধরে রামায়ণ শোনা তো ভাল লাগলেও সম্ভব নয়, 'ভরতবিলাপে'র মাঝেই বাড়ী এলাম। আবার রাত্রে গেলাম। খানিক শোনা হ'ল আরো। সকালের 'অখণ্ড কথা' শেষ হ'ল পরম ভক্তিভরে অতি সহজভাবে। একথালা বাতাসা ফুল ও মালা দিয়ে পূজা শেষ হ'ল।

আমাদের মত জল দিয়ে ধোয়া বা ছোঁয়া না-ছোঁয়ার আচার ওদেশে নেই। সতরঞ্চি পাতা ঘরে সকলে বসেন সবরকম শ্রেণীর মেয়েই থাকেন। সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন ভক্তিভরে।

শিখ বাড়ীতে গুরুদের জন্মোৎসব বা তিরোভাব দিনেও 'গ্রন্থসাহেব' পড়া হয়। ভারি সুন্দর সুরে গুরুদের বচন পাঠ করা হয়। গানও হয় তার মাঝে, প্রায়ই আগে গান হয়। সুগায়িকা মেয়েরা গানও করেন, আবার অনেক মহিলা বেশ ঢোল বাজাতেও পারেন। হারমোনিয়ম ঢোল চিমটা

করতালি বাজিয়ে গান হয়। কাঠের মাঝে খঞ্জনী দেওয়া করতালিও একরকম দেখা যায় যায়, তাও বেশ বাজান অনেকে। একজন এক লাইন গান সুরে বলেন আর সকলে দোয়ার দিয়ে গান, এই ভাবের নিয়ম। মাঝে মাঝে আবার একক সঙ্গীতও হয়। গুরু নানক, কবীর, মীরাবাঈ, সুরদাস সকলের গানই হয়, 'দরবার সাহেবে' ও শিখ বাড়ীতেও। ভোগও হয় 'কড়া প্রসাদ' বা হালুয়া দিয়ে। আমাদের মেথরের মেয়েও সে সভায় এসে প্রসাদ নিল, গান শুন্‌ল।

হিন্দুবাড়ীর বা আর্যসমাজীর বাড়ীতেও সৎসঙ্গ কীর্তনে গান কথকতা একইভাবে হয়। আর্য সমাজীদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে হোম করা হয়। হিন্দুবাড়ীতেও হোম হয়। কোশাকুশী বা পূজার বিশেষ বিশেষ বাসন বড় দেখা যায় না। ঘরের ব্যবহার্য গেলাস বাটী চামচ নিয়ে হোম করা হয়। মাঝখানে হোমকুণ্ড—চারদিকে চারজন বসেন, হোম করেন। মন্ত্র পাঠ করেন শাস্ত্র থেকে "ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়" ইত্যাদি। বেদ উচ্চারণ করেন কেউ কেউ। পড়া শোনা ও পাঠ শোনা অভ্যাস আছে মনে হয়।

কথা ও গান ভারি সুন্দর হয়—এক এক সময়ে। সুরদাসের একটি গান, যেমন,

> উধো কর্মনকী গতি ন্যারী।
> সব নদীয়াঁ জল ভরি ভরি রহিয়াঁ
> সাগর কেহি বিধ খারী॥
> উজ্জল পঙ্খ দিয়ে বগুলা কো,
> কোয়ল কেহি গুন কারী।
> সুন্দর নয়ন মৃগাকো দিন্ হে,
> বন বন ফিরত উজারি॥
> মুরখ মুরখ রাজ কীন্ হে,
> পণ্ডিত ফিরত ভিখারী।
> সুর, শ্যাম মিলনে কী আশা
> ছিন্‌ছিন্ বিতত ডারি॥

"হে উদ্ধব, কর্মের গতি (বোঝা কঠিন) পৃথক্। নদী মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু সাগরের জল লোনা থাকে। বকের পাখা শুভ্র, কোকিলের কিন্তু কালো। সুন্দরচোখ হরিণ নির্জন বন আলো করে ঘোরে (কেবা দেখে)। দেখ, নির্বোধ মূর্খ রাজা হয়, পণ্ডিত ভিখারী হয়। আর সুরদাসের শ্যামের সঙ্গে মিলনের আশাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় (কি জানি কেন)। হে উদ্ধব, কর্মের কথা কে জানে!"

কথকতার গল্পও বেশ সরস অথচ উপদেশযুক্ত। কথাকর্ত্রী বল্লেন, "লোকে অনেকেই ভাবে, সে বুঝি বড় ভক্ত, আর ভগবানকেও চায়। পূজা অর্চনা করে যে, সেই যে ভগবানকে চায় তা সব সময়ে নয়।

এক সময়ে নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের কাছে বল্লেন, 'আপনি বড় নিষ্ঠুর। এত লোককে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। এটি আপনার কলঙ্কের কথা। লোকে আপনার জন্য আকুল হয়ে থাকে আর আপনার দয়া পায় না।'

নারায়ণ বল্লেন, 'কি করতে বল তুমি?'

নারদ বল্লেন, 'আপনি বৈকুণ্ঠের দুয়ার খুলে দিন। লোকে ত্রিতাপ থেকে অব্যাহতি পাক্। তরে যাক্, মুক্তি পাক্।'

নারায়ণ বল্লেন, 'তোমার কি মনে হয়, মানুষ সত্যিই আমাকে চায়, বা বৈকুণ্ঠে আসতে চায়?'

নারদ বল্লেন, 'নিশ্চয় চায়। আপনি স্বর্গের দুয়ার খুলুন না একবার। দেখবেন মুক্তির বাসনা কত প্রবল। মানুষ এখনি আসবে দলে দলে।'

ভগবান বল্লেন, 'তথাস্তু, তাই হবে। আমি তোমার ইচ্ছামত বৈকুণ্ঠের দ্বার সকলের জন্য খুলে রাখলাম তিন দিন। যে ইচ্ছা আসবে। কর্ম বা পাপতাপ নির্বিচারে আসুক লোক। কেউ ফিরবে না।'

নারদ এই পরম সুসংবাদ নিয়ে পৃথিবীতে

এলেন। দেখলেন, এক অতি পলিতকেশ লোলচর্ম বৃদ্ধ—এক বাড়ীর দুয়ারের কাছে তামাক খাচ্ছে বসে।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে বৃদ্ধ, বৈকুণ্ঠে যাবে? ভগবান বিষ্ণু আজ সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য দুয়ার খুলে রেখেছেন। কর্ম, কর্মফল, পাপপুণ্য কিছুর বিচার হবে না। যেতে চাও তো এই মহা সুযোগ। সকলেই আজ অনায়াসে ত্রাণ পাবে।'

বৃদ্ধ উঠে বস্‌ল, একটু ভাবলে, তারপর বল্লে, 'বলেছ তো ভাল কথা, যাবার সময়ও হ'ল বটে, কিন্তু আর কটা দিন সবুর করে গেলে যেতে পারতাম। কনিষ্ঠ পৌত্রের বিয়ে হবে, অতি সমারোহের ব্যবস্থা হচ্ছে বিয়েটা দেখেই যাই। আর তো আসব না—আর এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কও থাকবে না! স্বর্গে তো যাবই, চিরদিন কিন্তু থাকব না এখানে।'

নারদ বল্লেন, 'বিয়ে কবে?'

বৃদ্ধ বল্লে, 'এখনো দেরি আছে কিছু দিন।'

নারদ বল্লেন, 'অতদিন তো স্বর্গের দ্বার খোলা থাকবে না।'

বৃদ্ধ বল্লে, 'তা তো বুঝছি। তা' আর কি করা যাবে। একেবারেই মৃত্যুর পরই যাব। মরবই তো, আগে গেলেই তো আর পৃথিবীর আনন্দ দেখতে আসতে পারব না।'

ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্য হয়ে নারদ চলে গেলেন সেখান থেকে।

এক পরম সুন্দর যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভালো লাগল। ভাবলেন, একে বলি, বেশ বুদ্ধিমান্ মনে হচ্ছে, এমন সুযোগ এ ছাড়তে পারবে না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে, পৃথিবীতে কেমন সুখে আছ?' সে বল্লে, 'সুখ কই, কোন সুখ নেই। অর্থ নেই। স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়ে বসে আছে, স্ত্রীর জন্য চঞ্চল হই, তাতে মা-বাপ বিরক্ত হন। সংসারে সুখ ছাই।'

নারদ বল্লেন, 'স্বর্গে যাবে? স্বয়ং ভগবানের কাছে? লোকে তপস্যা সাধনা করেও যে পরম পদ পায় না যোগী-ঋষিদেরও পরম ধাম সেই বৈকুণ্ঠে যাবে? কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, পূর্ণ আনন্দময় সেই স্থান। মাত্র তিন দিনের জন্য সকলের জন্য এই দ্বার অবারিত রয়েছে, যাবে? সংসারে সুখ নেই তা তো দেখছ।' যুবক খানিক চুপ হয়ে রইল। তারপর বল্লে, 'সংসারে সুখ নেই বটে ঠিকই। তবে যে ক'দিন বেঁচে থাকি, দেখি একটু সংসার-যাত্রা। সকলেই তো রয়েছে, এখুনি কেন স্বর্গে যাবার কথা ভাবি। মৃত্যু তো একদিন হবেই, তখনি যাব। এখন গেলে আর তো ফিরে আসতে পাব না। পৃথিবীর সুখদুঃখ দেখার আর তো সময় হবে না।'

নারদ বল্লেন, 'কিন্তু সে সময় তো স্বর্গের দ্বার সকলের জন্য খোলা থাকবে না। তখন কর্মানুসারে স্বর্গ নরক ভোগ হবে। এমন সুযোগ আর কেউ কখনো পাবে না। ভগবান আমার কথায় জীবকে এই বিশেষ দয়া করেছেন।'

যুবক বল্লে, 'আমার স্ত্রীর নিতান্ত কম বয়স। সে অত্যন্ত কাতর হবে, আমার বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথাতে। মাতা পিতাও শোক করবেন। আর এখনো তো আমার সময় আছে, কাল পূর্ণ হলেই যাব। এখন এই পৃথিবীর সুখ ছেড়ে যাবার আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। বলেছি বটে সুখ নেই, কিন্তু এই পৃথিবী ছেড়ে আমার অন্য সুখে লোভ নেই। প্রভু, আপনি অন্যত্র যান। যারা আর্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র, তাদের নিয়ে যান। আমি স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে পারব না।'

যুবক বিচলিতভাবে নারদের সামনে থেকে দ্রুত প্রস্থান করলে। আবার নারদ আশ্চর্য হলেন। আবার পৃথিবীময় ঘুরতে লাগলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী, সকলেই তাদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলে বলে, সুখ কোথায়?

কিন্তু যাবার কথা বল্লে বলে 'এখন থাক। যাবই তো একদিন। তখনি যাব।'

এর পর নারদ একটি সুন্দর বালককে দেখতে পেলেন খেলায় বিভোর হয়ে আছে। ভাবলেন, এই ধ্রুবর মত সরলচিত্ত বালক, এর কোনো মোহই এখনো সংসারে হয়নি। এই যোগ্য লোক বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য। মায়া-মোহহীন নিষ্পাপ সরল বালক এমন আর কোথায় পাওয়া যাবে। আমারই ভুল হয়েছিল ঐ চিরকাল সংস্কারে জড়িত মোহগ্রস্ত প্রৌঢ় বৃদ্ধদের আর নারী-মোহগ্রস্ত যুবকদের বৈকুণ্ঠধামে যাবার কথা বলা। ওদের শতবন্ধন সংসারে ওরা কি ভগবানকে কোন দিন ভেবেছে? যাক্ নিষ্কলুষ বালকটিকেই নিয়ে যাই, ভগবান সন্তুষ্ট হবেন।

নারদ গেলেন বালকটির কাছে। বল্লেন, 'বৎস, আমার সঙ্গে তুমি স্বর্গে যাবে? ভগবানের কাছে? সেখানে যেমন আনন্দ তেমনি সুখ। ধ্রুবর গল্প জানো? ধ্রুব গিয়েছিলেন। প্রহ্লাদও ভগবানকে পেয়েছিলেন। তাঁদের কি তুমি জানো? যাবে সেখানে?

বালক তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, বল্লে, 'হ্যাঁ যাব।' ধ্রুব প্রহ্লাদের গল্প সে শুনেছে, স্বর্গের কথাও সে জননীর কাছে শুনেছে। যাবে সে।

নারদ খুব খুশী, তাকে সঙ্গে নিলেন। সে বল্লে, 'আমি তাহলে বাড়ী থেকে খেলনাগুলি নিয়ে আসি, নইলে কি করে খেলব?'

নারদ সম্মত হয়ে তার বাড়ী গেলেন তার সঙ্গে।

বাড়ীতে তার জননীকে দেখে সে বল্লে, 'মাকেও নিয়ে যাব স্বর্গে ঠাকুর মশাই?

নারদ বল্লেন, 'হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কর।'

বালক জননীকে স্বর্গের কথা বলাতে তিনি বল্লেন, 'সেকি কথা? স্বর্গে তুমি কি করতে যাবে এখন? স্বর্গে কি কেউ এ বয়সে যায়? যত সব অলক্ষুণে কথা। আর আমিই বা সংসার, সন্তান, স্বামী সব ছেড়ে স্বর্গে যাব কেন মরতে? আপনি যান ঠাকুর মশাই। এই রকম শিশুকে আপনি কেন এসব কথা বলেছেন।'

স্বর্গসুখ বর্ণনা করে নারদ বল্লেন, 'বালক বলেছে, যাবে, বৎস, যাবে নাকি?'

বিমর্ষভাবে বালক বল্লে,' মাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না।' 'যাবে না? স্বর্গ খুব সুন্দর জায়গা।'

ত্রস্ত ও বিরক্ত জননী বালকের হাত ধরে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল। নারদের দিকে ফিরেও চাইলে না।

তিন দিন ধরে পৃথিবীর বহু স্থানে ঘুরে সংসারের বহু লোককে বহু জিজ্ঞাসা করে নানা লোভ দেখিয়েও নারদের স্বর্গে আসবার মত লোক সংগ্রহ করা হ'ল না। কারো বা অবসর নাই, কারো বা আকাঙ্ক্ষা নাই, কারো বা বিশ্বাসই নাই। অতঃপর নারদ-ভগবান-সংবাদে আর কি কথা হল—আর তার কথা হল না। গল্প শেষ হল। কথাকর্ত্রী সকলের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। শ্রোত্রীরাও অপ্রস্তুত ভাবে হাসলেন। চমৎকার সত্যটি কি সুন্দর সহজ ভাবে বল্লেন শুনলাম। মনে মনে যেন সকলেই বুঝলেন, উপদেশের কাহিনীর সত্যতা। মনে পড়ল, ছেলেবেলায় শোনা একটি গান। রচয়িতা কে জানি না, কিন্তু গানের কিছু কিছু কথা মনে আছে:

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে
　　অবসর তো আমার হ'ল না।
..　　...　　...
বাল্যে তারল্যে না তিতিল মন
রসে বিলাসে কাটিল যৌবন।
জরা ব্যাধি আদি বাদী এখন
　　আমার হ'ল না হরির সাধনা।

কথা সমাপ্ত হ'ল সেদিনের মত। সকলে বল্লেন,
কথা সমাপ্ত হোতা হৈ শুনো বীর হনুমান্,
রাম লক্ষ্মণ জানকী সদা করে কল্যাণ।

রামায়ণের কথা হোক, অন্য কথা হোক, যে কথাই হোক না কেন কথার শেষে বীর ভক্ত হনুমান্‌কে শ্রোতা মনে করেই অনুমতি নিয়ে কথা শেষ করতে হবে।

তারপর বল্লেন সবাই, 'জয় সীয়াবর (সীতাবর) রামচন্দ্রজীকী জয়', 'উমাপতি মহেশ্বরকী জয়', 'রমাপতি বিষ্ণু ভগবান্‌কী জয়', 'সদ্‌গুরুয়োঁকী জয়', 'অপনে অপনে গুরুজীকী জয়', 'সব সন্তনকী জয়', সব ভক্তনকী জয়'।

সর্ব দেবতা, স্ব স্ব গুরু মহারাজ, সব সন্তদের, শেষে সব ভক্তদের জয় উচ্চারণ করে শান্ত মধুর আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম। যেন মনে সুতো বাঁধা রইল টেনে, পরের সপ্তাহের কথার জন্য, ভক্তমণ্ডলী দর্শনের জন্য। একি মোহ? একি প্রয়োজন? একি সৎসঙ্গের নেশা মাত্র ক্ষণিকের? কে বলবে? তবু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কীর্তন কথা যেখানেই হোক দুদিন বা চারদিন লোক যাবার টান যেন ছিঁড়ে ফেলার উপায় নেই। যেতে হবেই!

বর্ষ-আহ্বান

(১৩৬২ বঙ্গাব্দ)

শ্রীশান্তিময় ঘোষ

নবীন-বর্ষ সুধা-সহর্ষ—এস আনন্দময়
এস নন্দিত, এস বন্দিত, এস ছন্দিত জয়।
কুসুমিত করি এস ধরাতল,
এস মেদিনীর মুছি আঁখিজল,
এস শান্তির শ্বেত শতদল
বিকশিয়া মনোময়।

এস মৈত্রীর মধুর ছন্দে—নির্মল নীলাকাশ
এস মিলনের মাধবীগন্ধে—মনোরম-মধুমাস।
এস বিদ্বেষ-বহ্নি নিভায়ে,
এস হিংসার হীনতা ঘুচায়ে,
এস বিক্ষোভ বেদনা মুছায়ে
প্রভাতের ফুলবাস।

এস হে রুদ্র এস হে শুভ্র এস হে শুভঙ্কর
এস মঙ্গলমন্ত্র গাহিয়া বিশ্ব-সথ্য 'পর।
এস নাশি পাপ, হানি সংশয়,
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ত্যাগে করি জয়,
সারথি সঙ্গে সাথী চিন্ময়
এস রুচিশুচিকর।

এস আনন্দ অমিয়-গন্ধ এস বিধাতৃবাণী
এস ভালবাসা মূক মুখে ভাষা বুক ভরে আশা দানি।
শৌর্যে বীর্যে করি ভাস্বর,
বিক্রম দানি অবিনশ্বর,
জাগ্রত করি জগদীশ্বর—
এস প্রিয় এস মানি।

আধ্যাত্মিক রূপান্তর

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

জগতের ইতিহাসে এমন কতকগুলি আশ্চর্য উদাহরণ দেখা যায় যে ক্ষেত্রে নিছক জৈবিক প্রবৃত্তি-সম্পন্ন 'পশু-মানুষে'র রূপান্তর ঘটিয়াছে স্বচ্ছ ভাগবত জ্ঞান ও দৈবী করুণাসম্পন্ন 'দেবতা-মানুষে'। সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা মনে পড়ে। পূর্বে তিনি ছিলেন

ঘোর যথেচ্ছচারী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে তাঁহার চরিত্রে আসিল অদ্ভুত রূপান্তর, জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। পূর্ণ পশুপ্রবৃত্তির অবস্থা হইতে তিনি লাভ করিলেন এক শুদ্ধ-সত্ত্ব অবস্থা, যথায় প্রতিমুহূর্তে তাঁহার অনুভব হইত ভগবানের সান্নিধ্য। পুরাকালের দস্যু রত্নাকরের কাহিনী স্মরণ হয়। সংসার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করিত। মহাজ্ঞানী নারদঋষি একদিন পথে তাহার কবলে পড়িলেন। নারদ তাহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"তুমি বলছো তোমার পরিবারবর্গের জন্য এইসব পাপ তোমায় করতে হয়; আচ্ছা, তুমি কি মনে কর আজ পর্যন্ত নরহত্যার দ্বারা যে বিপুল পাপভার তোমার জমা হয়েছে তার কোন অংশ তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ গ্রহণ করবে? যাও জিজ্ঞাসা করে এস।" দস্যু রত্নাকর এইভাবে কখনও চিন্তা করে নাই। নারদ না পলায়ন করেন এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁহাকে একটি বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া সে গৃহে চলিয়া গেল। ডাকাতি ও নরহত্যা করিয়া কিভাবে সে জীবিকা নির্বাহ করে তাহা পিতা, মাতা ও স্ত্রী প্রত্যেকের নিকট বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কি আমার পাপের অংশ নিবে?" কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই এই ধরণের কথা বলিল—"আমাকে পালন করা তো তোমার কর্তব্য। তুমি কি ভাবে টাকা রোজগার কর, তা আমাদের জানার দরকার কি? তোমার পাপের কোন অংশও আমরা গ্রহণ করবো না।" তাহাদের নিষ্করুণ উত্তরে মর্মাহত দস্যুর চৈতন্যোদয় হইল। সে যে জীবন যাপন করিতেছিল তাহা কত নিরর্থক ও দোষযুক্ত তাহা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল! সত্যপথ অনুসরণ করিবার জন্য প্রাণে তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। নারদের নিকট দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া সে তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিল এবং তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া ধর্ম শিক্ষা দিতে সানুনয় প্রার্থনা জানাইল। এই দস্যু রত্নাকরই তপস্যার প্রভাবে বিশুদ্ধাত্মা মহামুনি বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশে এই ঘটনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হইতেছেন সেণ্ট ফ্রান্সিস্। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীর এসিসিতে ফ্রান্সিসের জন্ম হয়। তিনি নগরীর বিলাসী যুবকদলের নেতা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে 'ব্যসন-রাজ' বলিয়া অভিহিত করিত; কিন্তু তাঁহার জীবনে অকস্মাৎ এক বিরাট পরিবর্তন আসিল ও তিনি শুচিতা, ভগবদ্‌জ্ঞান ও আর্তসেবার জীবন বাছিয়া লইলেন।

এই আধ্যাত্মিক রূপান্তর কেমন করিয়া ঘটে? পুরাতন হইতে যে নূতন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয় তাহা দেখিলে মনে হয় যে 'উহা যেন সম্পূর্ণ অন্য এক শ্রেণীর। উহার পূর্ববর্তীর সহিত কোন মিল থাকে না বলিলেই চলে। অবশ্য দেহের দিক হইতে উহাদের ভিত্তি একই থাকে কিন্তু আভ্যন্তর ভাব অর্থাৎ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। এরূপ পরিবর্তন কি প্রণালীতে আসে?

প্রাচীন যোগাচার্য পতঞ্জলি একটি সূত্রে বলিয়াছেন "সৎ ও অসৎ কর্মসমূহ প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রকৃতির বিবর্তনে তাহারা কেবল প্রতিবন্ধকগুলিকে নষ্ট করে মাত্র, যেমন কৃষক জলস্রোতের গতিপথের অবরোধ অপসারণ করিলে জল আপন স্বভাবেই চলিয়া যায়।* এই ভাবেই এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীর ক্রমবিকাশ সাধিত হয়।

এই সূত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' গ্রন্থে বলেন:—

"ভূমিতে সেচ দিবার জল পূর্ব হইতেই ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে আছে, কেবল 'আল'-এর বাধার দরুণ ঐ জল

* নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥
—পাতঞ্জল যোগসূত্র, ৪।৩

ক্ষেত্রে আসিতে পারিতেছে না। কৃষক এই সকল আল খুলিয়া দেয় আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সহায়ে জল আপনা হইতেই প্রবাহিত হয়। সেইরূপই প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সব শক্তি ও উন্নতি পূর্ব হইতেই নিহিত রহিয়াছে। পূর্ণতাই মানুষের স্বভাব, উহা কেবল বদ্ধ হইয়া আছে এবং আপন গতি লাভ করিতে পারিতেছে না। যদি কেহ বাধা অপসারণ করিতে পারে, তবে স্বভাবগত ঐ পূর্ণতা নিজ শক্তিবলে অভিব্যক্ত হইবেই। যাহাদিগকে আমরা পাপী বলিয়া থাকি, এই বাধা অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সাধু হইয়া যায়। প্রকৃতিই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে এবং কালে সকলেই সেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ধার্মিক হইবার জন্য এত যে সাধনা ও সংগ্রাম করিতে হয়, সেগুলি শুধু নেতিবাচক কর্ম; তাহারা বাধা দূর করিয়া সেই সম্পূর্ণতার দ্বার উন্মুক্ত করে যাহাতে আমাদের জন্মগত অধিকার, যাহা আমাদের প্রকৃতি। প্রাচীন যোগীদিগের বিবর্তন-বাদ, আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। যোগীদিগের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর। আধুনিকগণ এই বিবর্তনের দুইটি কারণ বলিয়াছেন, যথা—যৌন-নির্বাচন (Sexual selection) ও যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা (Survival of the fittest)। এই দুইটিই অসম্পূর্ণ মতবাদ। ধরুন বাঁচিয়া থাকা ও পতি বা পত্নী নির্বাচন—এই উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জ্ঞান এত অগ্রসর হইল যে তথায় আর প্রতিযোগিতার অবসর রহিল না। তাহা হইলে আধুনিকদের মতে মানুষের উন্নতি বন্ধ হইবে এবং জাতি ধ্বংস হইবে। এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের কশাঘাত প্রশমিত করিবার পক্ষে আপন যুক্তি অবতারণা করিতে পারিবে। আর এমন লোকেরও অভাব নাই যাঁহারা দার্শনিকের সাজে সাজিয়া সর্বপ্রকার দুষ্ট ও অযোগ্য লোকদিগকে মারিয়া ফেলিয়া (অবশ্য ইঁহারাই এই স্থলে উপযুক্ততা-অনুপযুক্ততার একমাত্র বিচারক) মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বলেন যে, বিবর্তনের আসল রহস্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বিরাজ করিতেছে তাহারই আবির্ভাবমাত্র। এই পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আছে এবং অন্তরের অনন্ত প্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য অনবরত চেষ্টা করিতেছে। সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত, কারণ আমরা দ্বারোন্মোচনের আসল উপায় জানি না এবং আরও জানি না জলকে কিভাবে ভিতরে আনিতে হয়। অন্তরস্থিত এই অনন্ত প্রবাহ আত্মপ্রকাশ করিবেই; ইহাই সকল অভিব্যক্তির উৎস। জীবন ও যৌন-চরিতার্থতার জন্য যে প্রতিযোগিতা তাহা ক্ষণিক, অপ্রয়োজনীয়, বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র; ইহা অজ্ঞতাজনিত। সকল প্রকার প্রতিযোগিতা যখন বন্ধ হইবে তখনও অদৃশ্য এই পূর্ণ প্রকৃতি আমাদের আগাইয়া দিবে যতদিন না আমরা প্রত্যেকে পূর্ণ হইতেছি। অতএব উন্নতি করিতে হইলে যে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পশুত্বের মধ্যে মানুষ অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু দুয়ার খুলিতেই মানুষ বাহির হইয়া আসিল। সেইরূপ মানুষের মধ্যেও দেবতা গূঢ়ভাবে রহিয়াছেন। অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়া তাঁহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। জ্ঞান যখন এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে তখনই সেই দেবতা প্রকাশ পান।"

অজ্ঞানতারূপ এই প্রতিবন্ধকের কারণ কি? মনোবিজ্ঞানমতে আমাদের অবচেতনের গভীরে যে সকল সূক্ষ্ম সংস্কার, প্রবৃত্তি, কামনাবাসনা বর্তমান, চেতন জীবনের উপর তাহাদের অত্যধিক প্রভাব আছে। তাহারা মনে বা সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে ও স্থূল শরীরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অবচেতন মনকে সংযত করার অর্থ হইল—সূক্ষ্ম আবেগ, কামনা ও প্রবৃত্তিগুলিকে নিম্নতর স্তরে আত্মপ্রকাশ করিতে না দেওয়া। উহাদের অভিব্যক্তি দিতে হইবে উচ্চতর স্তরে; ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে উহাদিগকে পরিশোধিত, উন্নত ও নিয়োজিত করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি ও প্রভাবকে একটি আধ্যাত্মিক গতি দিতে হইবেই। অভ্যাস ও প্রবৃত্তিসমূহকে একেবারে মূল দেশে সংযত করিয়া কারণ অবস্থায় পরিণত করিতে হইবে; এই কারণ অবস্থাকেও পরে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

অহং-বুদ্ধি হইতে আসক্তি ও দ্বেষ জন্মায়; আবার অজ্ঞতাই অহংবুদ্ধির জনক। তাই আত্মজ্ঞান বা আমাদের মধ্যে যিনি পরমাত্মা আছেন তাঁহার অনুভূতিই কেবল বাসনার বীজকে নষ্ট করিয়া আত্মাকে তাহার মৌলিক পবিত্রতা, স্বাধীনতা ও শান্তিলাভে সমর্থ করে। আচার্য শংকর বলেন,

"মানুষের মনই তাহার বন্ধনের কারণ, তাহাই আবার তাহার মুক্তির উপায় হইতে পারে।" মন জড় বস্তুতে আসক্ত হইলে উহার ফল হয় বন্ধন; এইরূপ আসক্তি হইতে মুক্ত হইলে আত্মা সেই স্বাধীনতা লাভ করে যাহাতে আমাদের জন্মগত অধিকার।

আমাদের সকল প্রবৃত্তি, কামনা ও আসক্তির পশ্চাতে রহিয়াছে শাশ্বত অস্তিত্ব, পূর্ণজ্ঞান ও অক্ষয় আনন্দ লাভের জন্য আত্মার পিপাসা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছে এক সৎ-চিৎ-আনন্দ সত্তা। সেই সত্তা আমাদিগের ব্যক্তিগত চেতনার অভ্যন্তরে অনুস্যূত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। এই আত্মসত্তার অনুভূতিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হইলেই সব পিপাসা মিটে, অজ্ঞতা ও অহংজ্ঞান আমাদের যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল উহাকে আমরা লাভ করিতে পারি। ইহাই মুক্তি—আধ্যাত্মিক জীবনের ইহাই সার কথা।

কু চিন্তা ও কুভাবসমূহ দ্বারা আমাদের শরীর ও মন যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। আজকালকার বহু সত্যানুসন্ধিৎসু চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ আমাদের নিকট এই তথ্য উপস্থিত করিতেছেন যে, আমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা ও ভাবসমূহই বহু দৈহিক ও মানসিক পীড়ার প্রধান কারণ, আর সেগুলি বহুলাংশে নিবারণযোগ্য। একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক (স্যার উইলিয়াম অসলার) বলিয়াছেন, যক্ষ্মারোগীর ভাগ্য তাহার বুকের অবস্থার উপর তত নির্ভর করে না, যত করে তাহার মস্তিষ্কের উপর। বাহিরের কাজের অপেক্ষা, মানসিক চিন্তা ও হৃদয়াবেগের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব, সঞ্চিত ক্রোধ, ঘৃণা, দ্বেষ, ভয় ও অন্যান্য নেতিবাচক ভাবের জন্য ঘাড়ে ব্যথা, পাকস্থলীতে ক্ষত, রক্তে শর্করাসঞ্চয়, বুকের ব্যাধি এবং স্নায়ুঘটিত অন্যান্য নানাবিধ পীড়া হইতে পারে। ইহা অনেক বহুদর্শী মনস্তত্ত্ববিদের অভিমত। আবেগগুলির উদ্‌গতি (Sublimation)র ফলে কেমন করিয়া স্নায়বিক গতিরও মোড় ফিরিয়া যায় এবং রোগীর বহির্জীবনেরও পরিবর্তন হয় এই বিষয়ে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কেহ হয় তো বহু বৎসর রুগ্ন থাকিবার পর নিজেই নিজের বিষয় চিন্তা করিতে শিখিয়া এবং জীবনের সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়া স্বাস্থ্যকর ভিত্তিতে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। "মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তন করা যাইতে পারে। কাঁচা শিশুরাই যে একমাত্র নমনীয় তাহা নহে। যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন আমরা সকলেই পরিবর্তিত হইবার ক্ষমতা রাখি। এমন কি চরিত্রের মৌলিক ধাতটিরও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে।"—জনৈক আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের এই নিশ্চয়োক্তি শুনিয়া উল্লসিত হইতে হয়।

ভারতে একটি প্রবাদ আছে, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" প্রত্যেক অকপট উন্নতিকামীর আশা আছে। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণও মানুষকে কত আশার বাণী শুনাইয়াছেন! "যদি তুমি ঘোর পাপীও হও, আত্মজ্ঞানের ভেলায় চড়িয়া, তুমি সকল পাপ, সকল দোষ অতিক্রম করিতে পারিবে।" "আত্মজ্ঞান যেন জ্বলন্ত অগ্নি। সকল অমঙ্গলকে ভস্মীভূত করিয়া উহা পরমাত্মার মহিমা প্রকাশ করে যিনি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমাদের সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন।"

ব্যাপক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে হিন্দু-ঋষিগণ সর্বকালেই আমাদের বলিয়া আসিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিবর্তন আনিয়া আমরা আমাদের চিন্তার ও ভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে পারি, আবার চিন্তা ও ভাবের পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের দেহেও বিপুল পরিবর্তন আনা যায়। শুধু অশুদ্ধ মন ও অপবিত্র সূক্ষ্ম শরীর নহে,

পশু-মানবের অপবিত্র স্থূল দেহও, দেব-মানবের পবিত্র সাত্ত্বিক স্থূল শরীরে রূপান্তরিত হইতে পারে। দেবমানবের দেহ শুদ্ধতর উপাদানে গঠিত, পৃথক্ ভাবে নির্মিত ও এরূপ অধ্যাত্মমুখী যে সেই দেহে তিনি কোন কুকর্ম করিতে অক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোহার তরবারির উদাহরণ দিতেন। স্পর্শমণির স্পর্শে উহা যখন সোনা হইয়া যায় উহার আকার তরবারির মতই থাকে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা কাহারও আর কোন হিংসা করা যায় না। এক্ষেত্রে যেমন তরবারির প্রকৃতিটিই বদলাইয়া গিয়াছে সেইরূপ দেহ ও মনের প্রকৃতিও রূপান্তরিত হইতে পারে।

ভগবদ্গীতায় সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের প্রাধান্যানুসারে তিন স্তরের মানুষের বর্ণনা আছে। পশুমানব তমোগুণ দ্বারা চালিত হয়। আলস্য, মূঢ়তা, প্রমাদ (অসাবধানতা) ও ভ্রান্তি তমোগুণের লক্ষণ। রজোগুণের লক্ষণ হইল লালসা ও অস্থিরতা। ইহার সহগামী হইল দ্বন্দ্ব ও দুঃখ। সাধারণ মানুষ ইহারই দ্বারা চালিত হয়। সত্ত্ব আধ্যাত্মিক সংস্কার-সম্পন্ন মানুষকে চালনা করে, জ্ঞান ও শান্তি উহার লক্ষণ।

তমোগুণী মানুষ অপরিষ্কার খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কর্মী হিসাবে সে চঞ্চল, গর্বিত, প্রবঞ্চক বিষণ্ণ ও দীর্ঘসূত্রী। ভ্রান্তিবশে সে সব কিছু করে, পরিণামের দিকে নজর রাখে না। দান করিলে সে অপাত্রে দান করে, এবং অসময়ে, অস্থানে বা কুভাবে দান করে। পূজা করিলে তাহার পূজায় ঠিক ঠিক বিশ্বাস বা হিতৈষণার ভাব থাকে না। সে কুসংস্কার দ্বারা প্রতারিত হয় বা এমন তপস্যা করে যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়।

রজোগুণী মানুষ, উত্তেজক, তিক্ত, অম্ল, উষ্ণ বা উগ্র আহার পছন্দ করে। সে তাহার কর্মের প্রতি বা স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতি অতিশয় আসক্ত অথবা অন্যের প্রতি ও তাহাদের স্বার্থের প্রতিও সে অতিমাত্রায় আসক্ত হইতে পারে। কর্মফলের জন্য সে বড় বেশী উদ্গ্রীব থাকে এবং তাহার সকল কর্মের লক্ষ্য হইল আপন বাসনা বা গর্বের পরিতৃপ্তি করা। সে লোভী, হঠকারী, সহজেই উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ হইয়া পড়ে এবং সে ভয় ও উদ্বেগ-প্রবণ। সে অশ্রদ্ধায়, ফলের আশায় বা লোক দেখাইবার জন্য দান করে। সে যদি তপস্যা করে, তবে তাহা সম্মান ও শক্তিলাভের জন্য এবং তাহাও করে আড়ম্বর করিয়া।

সত্ত্বগুণী মানুষ, শক্তি, স্বাস্থ্য ও আয়ুবর্ধক ও যাহা পরিষ্কার ও পুষ্টিকর এরূপ খাদ্য গ্রহণ করে। ধৈর্য ও উদ্যমগুণে গুণান্বিত হইয়া, লাভ বা অলাভে বিচলিত না হইয়া সে আসক্তি ও অহংশূন্য অবস্থায় কর্ম করে। সে বিবেকবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কর্ম করে কিন্তু তাহাতে তাহার আসক্তি থাকে না, পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা থাকে না বা কর্মফল সম্বন্ধে উদ্বেগ থাকে না। যাহারা প্রতিদান করিতে অক্ষম, এরূপ লোককে সে দয়াপরবশ হইয়া দান করে। তাহাও আবার যথাকালে ও যথাস্থানে। তাহার দৈহিক তপস্যা পরিচ্ছন্নতা, শীলতা ও অহিংসা। তাহার বাক্য ও তপস্যা অনুদ্বেগকর অথচ সত্যপ্রতিষ্ঠ ও উপকারী। সে প্রায়ই নীরব থাকে যেহেতু তাহার মন আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন। প্রশান্তি, আত্মসংযম, ও পবিত্রতার সহিত এই নীরবতার অভ্যাসই তাহার মানসিক তপস্যা।

নিজেদের আভ্যন্তর প্রকৃতি অনুধ্যান করিলে দেখি যে আমাদের মনে পরস্পর বিরোধী ভাব-সমূহ বর্তমান। পশু, দানব, বা দেবতাকে খুঁজিতে বাহিরে যাইতে হইবে না। আমাদের মধ্যেই উহারা রহিয়াছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা একাধারে বিখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন এবং উপনিষদের একাধিক আখ্যানে এইটি প্রকাশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ একটি

আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া বলিতেছেন, তিন শ্রেণীর জীব—দেবতা, মানব ও দানব—সকলেই আদি স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান, তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল। উপদেশ হিসাবে প্রত্যেককে তিনি 'দ' এই একটি অক্ষর বলিলেন। দেবতারা ইহার অর্থ করিলেন 'দাম্যত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত কর। মানব বুঝিল—'দত্ত' অর্থাৎ লোভ সংযত কর ও দান কর এবং দানব বুঝিল—'দয়ধ্বম্', অর্থাৎ নিষ্ঠুর প্রকৃতি সংযত কর ও দয়াশীল হও।

এই উপাখ্যানের টীকায়, আচার্য শংকর বলিয়াছেন, মানুষ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা বা দানব নাই। একই প্রাণী—মানুষ, আত্মসংযম দান ও দয়া এবং সত্ত্ব, রজ, তম গুণের তারতম্যে দেবতা, মানব ও দানবরূপে কথিত হয়। সেই জন্যই শ্রোতার যে প্রকৃতি প্রবল সেই অনুসারে একই উপদেশ তিনটি বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইল। যে সব মানুষের আত্মসংযম নাই, কিন্তু যাহারা অন্যান্য সদ্গুণের অধিকারী, তাহারাই দেবতা; যাহাদের লোভ খুব বেশী তাহারা সাধারণ মানুষ আর যাহারা নিষ্ঠুর ও অপরের অনিষ্ট করিতে আনন্দ বোধ করে তাহারাই দানব। উল্লিখিত তিনটি অনুশাসনই মানুষ যাহাতে অভ্যাস করিতে পারে সেজন্য বলা হইয়াছে, কারণ মানব চরিত্রের মধ্যেই দেবতা, মানব ও দানবের বাস এবং আমাদের সমতাগুণের তারতম্যে, সৎকাজ সম্পাদনায় ও লোভ ও নিষ্ঠুরতার সংযম-শক্তি অনুযায়ী, আমরা দেবতা, মানব ও দানব বলিয়া কথিত হইতে পারি।

মুণ্ডক উপনিষদে একটি সুন্দর রূপক আছে। সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট দুইটি পাখি প্রীতিবদ্ধ হইয়া একই বৃক্ষে বাস করিতেছে। একটি পাখি অস্থির, সে গাছের নীচের ডালে বসিয়া কটু তিক্ত নানা ফল খাইতেছে; অপরটি কিন্তু গাছের খুব উচু ডালে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। নীচের ফলাহারী পক্ষীটি, মানবের রজোগুণাত্মক বাসনা-তৃপ্তির প্রতীক। উপরের পাখিটি সত্ত্বগুণপ্রবৃদ্ধ লোকের ন্যায় নীচের ডালের ফল খাইবার কোন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না। নীচের ডালের পাখিটি চঞ্চলভাবে ফল খাইয়া চলিয়াছে কিন্তু কখনও পরিতৃপ্ত হইতেছে না, সেজন্য থাকিয়া থাকিয়া উপরের পাখিটির দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে সে কত শান্ত, ও ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্তে উড়িয়া যাইতে প্রস্তুত। শেষে অবশ্য তাহার অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া সে অপর পাখিটির সহিত যুক্ত হইতে সমর্থ হইল এবং উপলব্ধি করিল যে তাহারা উভয়েই বস্তুতঃ অভিন্ন। তখন সে বুঝিল, অজ্ঞতার বশে সে নিজেকে সাংসারিক বাসনা কামনার জনক রজোগুণের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার চিরসত্য, অপরিণামী আত্ম-প্রকৃতির সহিত যখন একাত্মবোধ জন্মে তখনই তাহার পশুপ্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া যায়।

অজ্ঞতা মারাত্মক বস্তু, কারণ ইহাতে আত্মাকে ভুলাইয়া দেয় এবং এই অজ্ঞতা আছে বলিয়াই আত্মা আবরণ বরণ করিয়া লয়—উহাই হইল 'ব্যক্তিভাব' (personality)। (ইংরেজীতে persona অর্থে মুখোস) আমরা এইরূপ ভাবে মুখোসের পর মুখোস পরিয়া যাই যে আমাদের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে পারি না। নাট্যকার গিরিশের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তিনি বলিতেন—"কখনও কখনও কয়েকটি অভিনেত্রীকে সাজাইয়া আনিলে আমি তাহাদের চিনিতেই পারিতাম না, অথবা কোনটি কে তাহা বুঝিতে পারিতাম না।" এইভাবেই আত্মা প্রথমে সূক্ষ্ম দেহ ও পরে স্থূল দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহে বিবিধ উপাধির পোষাক পরিধান করিতে করিতে অবশেষে তাহার প্রকৃতস্বরূপ আর চিনিতে পারে না এবং যে কারণে আমরা আমাদের স্বরূপ চিনিতে পারি না ঠিক সেই কারণেই অপরকেও চিনিতে অক্ষম হই।

অজ্ঞানের এই আবরণ দূর না হইলে ও আবরণের অন্তরালবর্তী বস্তুকে দেখিতে না শিখিলে, আমরা আত্মাকে কখনও আবিষ্কার করিতে পারিব না। আবরণের সহিত এই মিথ্যা একাত্মবোধই আমাদের যত দুঃখের যত বন্ধনের কারণ। জীবাত্মা যখনই নিজ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তথা পরমাত্মার সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করিবে তখনই তাহার দুঃখ যাতনার সমাপ্তি ঘটিবে। এই পরমাত্মাই কাহিনী-বর্ণিত, ঊর্ধ্ব শাখায় নিত্য অবস্থিত পাখি যিনি তাঁহার দয়িতের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেদান্ত মতে, আমাদের আত্মার সূক্ষ্ম আবরণ মন ও ইন্দ্রিয় এবং ভৌতিক শরীর উহার স্থূল আবরণ। এই উভয় আবরণ এমনভাবে পরিমার্জিত করিতে হইবে যেন তদভ্যন্তরস্থ শাশ্বত আত্মার জ্যোতি উহাতে প্রতিফলিত হয়। সর্বপ্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশাসনের ইহাই উদ্দেশ্য।

দেহ, মন ও আত্মা সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। দেহ ও মনের সম্বন্ধ লইয়া বহু বিভিন্ন ধারণা বর্তমান। মনঃসমীক্ষকগণ মনে করেন যে মানুষ মন-যুক্ত দেহ অথবা দেহ-যুক্ত মন নহে কিন্তু একটি সমন্বিত দেহ-মন। তাঁহাদের এক-জন বলিয়াছেন—"দেহ ও মন এক ও অবিভাজ্য। তোমার মন তোমার দেহ এবং দেহ তোমার মন।" আবার কেহ কেহ মনকে দেহের অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকেন। "মন কোন জড় বস্তু নহে। ইহাকে দেখা যায় না; স্পর্শ, পরিমাপ বা ওজন করা যায় না। ইহাকে আধ্যাত্মিক কোন কিছু বলা যাইতে পারে।" সমন্বিত দেহ-মনবাদের উপরে ইহা আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। ডক্টর জুং (Dr. Jung) আরও একটু আগাইয়া যাইয়া বলেন—"ব্যক্তি-অহং 'সমগ্র' হইতে সম্পর্ক হারাইয়া ও সমষ্টি-মানব ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্যই অসুস্থ বোধ করে।" কিন্তু ডক্টর জুংএর 'আত্মানুসন্ধানে আধুনিক মানব' (Modern man in search of a Soul) গ্রন্থদৃষ্টে মনে হয় যে, তিনিও বিশুদ্ধ আত্মা যে মন হইতে পৃথক এবং মন আত্মার সূক্ষ্ম আবরণ ও যন্ত্র মাত্র—এই সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান এখনও শৈশবাবস্থায়, মানুষের যথার্থ স্বরূপ তাঁহারা এত শীঘ্র ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না।

মানুষের যথার্থ স্বভাব আবিষ্কার করিবার জন্য হিন্দু ঋষিগণ মানব চেতনার বিভিন্ন স্তরকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত মানবের তিনটি শরীরের কথা বলে, যদিও সে মূলতঃ শুদ্ধ আত্মা। প্রথম, কারণ শরীর বা নির্জ্ঞান (Unconscious) অহং। ইহাতে সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য সুপ্ত অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয় সূক্ষ্ম দেহ। ইহা আত্ম-সচেতন অহং, মন, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মবীজের সমষ্টি। ইহাদের সবগুলিই স্বপ্নে প্রকট হয়। তৃতীয় স্থূল শরীর যাহা আমরা জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করি। স্থূল চক্ষু, কর্ণ, ও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম শক্তির যন্ত্র মাত্র। এই শক্তি দৈনন্দিন দৈহিক প্রচেষ্টার মধ্যে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্থূল অবয়বসমূহকে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্ম অবয়ব-ক্রিয়া সম্পাদন করে।

সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমরা সূক্ষ্ম দেহে মনোনিবেশ করিলে দৈহিক ও ভাবগত প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা লাভ করিতে পারিব এবং তখন শুধু যে ভাবময় প্রকৃতিকে সংযত করিতে শিখিব তাহা নহে এমনকি আমাদের জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিও সংযত হইবে। আচার্যগণ বলেন, এই ভৌতিক দেহে যেমন বহু গুপ্ত অংশ ও কর্মপ্রণালী আছে, যাহা আমাদের অগোচর, যাহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি আমাদের অজ্ঞাত, সেইরূপ আমাদের মনে চেতন-ব্যতিরিক্ত অবচেতন-স্তরও আছে। আমাদের অন্তরের গভীরে নিহিত অনেক বাসনা কামনা অবচেতন-স্তরে অবস্থান করে।

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে হইলে এইগুলিকে আবিষ্কার করিয়া ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহসমূহের কতিপয় সংযোগস্থল আছে। এইগুলি চেতনার কেন্দ্র বা যোগীর ভাষায় চক্র। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত, মেরুদণ্ডের বরাবর এই চক্রগুলি অবস্থিত। কতিপয় যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহাদিগকে জাগরিত করা যায়। দেহমনের সহিত ইহাদের সংযোগের দরুন ইহারা পরস্পরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এখন বুঝিতে পারা গেল যে, চিন্তা ও ভাবসমূহ আমাদের দেহের উপরেই শুধু প্রভাব বিস্তার করে না বরং উহাকে পুনর্গঠিত ও রূপান্তরিত করিতে পারে।

মানবের জান্তব জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট চেতনার নিম্নতর কেন্দ্রসমূহ, স্বার্থপূর্ণ জৈবিক চিন্তা ও ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। উচ্চতর চিন্তা ও ভাবসমূহ উচ্চতর কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া করে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনটি গুণ বর্তমান—সত্ত্ব, রজ ও তম। উচ্চতর ও নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে যে সংগ্রাম চলে উহাই রাজসিক গুণ। সত্ত্বগুণে উচ্চতর প্রকৃতি প্রবুদ্ধ হয়। কিন্তু তখনও অসৎপ্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা দ্বারা যতদিন না মন্দ অভ্যাসকে উৎখাত ও ভস্মীভূত করা যাইতেছে ততদিন পর্যন্ত অসৎভাবের বীজ অবচেতন মনে থাকিয়া যায়। সর্ব প্রকার কুভাব মন হইতে অপসৃত হইলেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়।

সত্ত্বকেও এবং যাহাকে সাধারণতঃ নৈতিক চেতনা বলা হয় তাহাকেও অতিক্রম করাই আধ্যাত্মিক জীবনের চরমাদর্শ। পুনঃপুনঃ উঠা-নামায় নিম্নাভিমুখী না হইয়া, ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে হইবে যতক্ষণ না আমরা অধ্যাত্ম চেতনার এমন এক স্তরে পৌঁছাইতেছি যথায় জীবন সদসৎ দ্বন্দ্বের পরপারে চলিয়া যায়। তখন সব কর্ম সৎ, শুভ ও ব্যষ্টির পক্ষে যেমন সমষ্টির পক্ষেও তেমন মঙ্গলবিধায়ক। একমাত্র পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞানই বাসনার সূক্ষ্ম বীজকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, আংশিক অভিজ্ঞতা, অস্থায়ী আধ্যাত্মিক দর্শন বা আনন্দবিধায়ক উচ্চাবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, আধ্যাত্মিক শুচিতালাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ঋষিরা বলেন যতদিন না উচ্চতম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে ততদিন আমরা কখনও নিরাপদ নই। চরম লক্ষ্যে না পৌঁছিয়া আমরা থামিব না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে তাঁহার নিকট বহু অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসু সমবেত হইতেন। তাঁহাদের অগ্রণী স্বামী বিবেকানন্দ দেখিলেন যে, কয়েকজন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবী শক্তির অলৌকিক বিকাশ দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেন কারণ উহার সংস্পর্শে তাঁহারা নিজেরা অতীন্দ্রিয় ভাবে আবিষ্ট হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক-জনের আংশিক ভাবাবেশের সহিত অশ্রু পুলক দেখা দিত। একদিন স্বামীজী ঠাকুরের নিকট অনুযোগ করিলেন, তাঁহার কেন ঐরূপ হয় না। ঠাকুর বলিলেন—অগভীর ভাব ও ক্ষণিক দর্শন, মানসিক ও আন্তরিক পবিত্রতা লাভের তুলনায় তুচ্ছ বস্তু। ঐ পবিত্রতা আসিলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও মুক্তি লাভ হয়। তখন মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। "বাবা, বিচলিত হয়ো না। ডোবায় হাতি নামলে জল তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু গঙ্গায় নামলে যৎসামান্যই চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই ভক্তেরা ডোবা, তুমি মহানদী।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যুবক ভক্তদের বলিয়াছিলেন, যদি ভাব-প্রবাহের সহিত অন্তরের রূপান্তর না হয়, সাংসারিক আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম এরূপ চারিত্রিক শুচিতা না আসে, তবে আধ্যাত্মিক জীবনে সেগুলির যথার্থ কোন মূল্য নাই। ধর্মজীবনের কঠোর

নিয়ম পালনে অনিচ্ছুক বহু ব্যক্তি লোক দেখানো অনুষ্ঠান করে বলিয়া ভণ্ড হইয়া যায়। কতক লোক হয়ত বিরাট ভাবপ্রবাহের আধার, কিন্তু নৈতিক শক্তি এবং পবিত্রতা অর্জনে উদাসীন থাকায় ঐ অদম্য ভাব-প্রবাহ তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু যাহারা অকপটে আধ্যাত্মিক পথানুসরণ করে, জীবনের কর্তব্য পূজাজ্ঞানে সম্পন্ন করে ও অন্তরশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিয়া থাকে, তাহাদের ধর্ম-জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া যায়।

আধ্যাত্মিক জীবনে পতন-সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত এবং নৈতিক পবিত্রতা ও শক্তিপ্রদ চারিত্রিক রূপান্তরলাভের জন্য আমাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত। এইভাবেই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করিব বলিয়া নিজেদের প্রস্তুত করিতে থাকিব। মাত্র ইহা করিলেই আমাদের অন্তরস্থ তম-পশু বা দানব, রজো-মানব এবং সত্ত্ব-মানুষকে পরিবর্তিত করিয়া, আমরা দেবমানবের অনুভূতি পাইব—আধ্যাত্মিক জীবনের উহাই চরম লক্ষ্য।

উপনিষদ্ বলেন,—সাধক যখন সেই ভাস্বর, জগৎকর্তা, পরমেশ্বর পরিপূর্ণস্বরূপ বিশ্বসত্তার প্রভু ও উৎস ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপ ও পুণ্য সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।*

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—"যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বভূতহিতে রত সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। (গীতা ৫।২৫) দেব-মানবের ইহাই আদর্শ। আমাদের নিজেদের ভাব ও সামর্থ্যানুযায়ী আমরাও যেন শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারি, আমাদের নিম্নপ্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া দেব-মানবের শুচিতা, অধ্যাত্মচেতনা ও প্রেমের কিছুটা লাভ করিতে পারি।

* যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
মুণ্ডক উঃ ৩।১।৩

শ্রীরামকৃষ্ণায় *

ইন্দিরা দেবী

লাখ লাখ বন্দনা লো রামকৃষ্ণ প্যারে!
সন্ত সিদ্ধ মুক্ত ভক্ত পরমহংস ন্যারে!
হে মহান্ অমর জ্ঞান তুমসে জগনে পায়া
তূ অনূপ বালরূপ ধরকে দেব! আয়া।

তূ দয়াল, মাকা লাল—রাম তূ কনৃহাই।
ভকতবছল ভকত বনা লীলা ক্যা রচাই!
প্রেমীকা মান দীনতা, হয় ত্যাগ বল—হয় বোলে।
ভোলে সরলসে মুখসে ক্যা অপার ভেদ খোলে!

আয়া দরপে যোগী ভোগী রাজা য়া ভিখারী।
গয়া ন খালি কোই জিসনে লী শরণ তুম্হারী।
মোহে ভি শরণ দেনা—মাগূঁ চরণ ময় তুম্হারে।
দো নামদান প্রেমদান রামকৃষ্ণ প্যারে!

* পুনায় ১৩ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সভায় শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্তৃক গীত—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে।

অনুবাদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কোটি প্রাণের বন্দনা লও রামকৃষ্ণ নাথ !
সন্ত সিদ্ধ মুক্ত ভক্ত ! শিখাও প্রণিপাত।
অমর জ্ঞানের অঝোর সুধা বইয়ে করুণায়
এলে কৃপাল, বালগোপাল ! নন্দি' বসুধায়।

তুমি দয়াল, মায়ের দুলাল—শ্রীরাম, জনার্দন।
ভক্তবছল ভক্ত হ'য়ে কোন্ লীলার সাধন !
গাইলে : "প্রেমীর মান—দীনতায়, ত্যাগই শক্তিসার।"
সরল কথামৃতে ঘুচাও রহস্য-আঁধার।

তোমায় নমে যোগী ভোগী রাজেন্দ্র ভিখারি :
শরণ তোমার যে-ই চায় তার হও তুমি কাণ্ডারী।
আমায়ও দাও শরণ কমল-চরণে তোমার :
শিখাও প্রেমের নাম পরমানন্দ সারাৎসার।

পঁচিশে বৈশাখ প্রসঙ্গে

অমিয়কুমার

আমাদের জাতীয় জীবনে পঁচিশে বৈশাখ একটি চিহ্নিত দিন। নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন দেশ জুড়ে হয়। নানা সভা। অবশ্য এত সভায় সব বক্তাই প্রায় এক কথাই বলেন, অর্থাৎ তাঁদের (সেই বক্তাদের), সভার কর্তৃপক্ষ কেন বক্তৃতা করতে (বা সভাপতিত্ব করতে) ডেকেছেন তা তাঁরা জানেন না। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার কবি নন, তিনি শুধু ভারতের কবি নন, তিনি বিশ্বকবি—ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'প্রগতিশীল' বক্তাদেরও বাঁধা গৎ, যার মূল কথা হ'ল রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেত যদি কপালজোরে বুড়ো বয়সে দেশবিদেশে না যেতেন এবং তারপর প্রায় মৃত্যুকালে কনফেস না করতেন যে তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয়নি। অবশ্য সরস্বতীপুজোর মন্তর যদি সর্বত্র এক হয়, তাহ'লে রবিপুজোরও বা তা হবে না কেন।

তবু এসব অনুষ্ঠানেরও সার্থকতা আছে, কারণ এই দিন আমরা যাঁকে স্মরণ করি চটকদার একটা কিছু করে দেশশুদ্ধ লোককে চমকে দেবার কোনো অভিসন্ধি তাঁর কোন দিন ছিল না। সেলাম পাবার সহজ-সাধনার পথে তিনি পা মাড়ান নি কোনোদিন। তাই এই রকম মানুষকে স্মরণ করে আমরা আমাদের জীবন-সম্পর্কে যথার্থ মূল্যবোধটি কী হওয়া উচিত তা হয়তো ক্ষণকালের জন্যেও অনুভব করতে পারি, আর সেটুকুই আমাদের পরম লাভ।

গুণীকে শুধু সমানধর্মীরাই ঠিকভাবে বুঝতে পারেন। কালিদাসকে বুঝতে হলে দরকার একজন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে একজন বিবেকানন্দ, খ্রীষ্টকে বুঝতে একজন গান্ধী। আর ঠিক সেভাবে না হলেও কিছুটা বুঝতে পারার জন্যেও প্রয়োজন শ্রদ্ধার এবং সাধনার, পাণ্ডিত্যের এবং রসবোধের। রবীন্দ্রনাথের জন্যে কালিদাসকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু মল্লিনাথকে তিনি অনেক আগেই পেয়েছিলেন।

সমাজে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-গান্ধী বহু ভাগ্যে

আসেন। মল্লিনাথরাও সংখ্যায় খুব বেশি হন না। কিন্তু একথা ঠিক, সমাজ যদি শ্রদ্ধা জানায় গুণীদের, তাতে তার নিজেরই কল্যাণ।

আমাদের জীবনে ও সমাজে গুণীর সম্মান কতটুকু? বছরে তিনশ' ষাট দিনই আমরা ব্যস্ত নিজের ক্ষুদ্র অহং নিয়ে। আমাদের মূল্যবোধও যে কতটা বিকৃত তাও ভুলে যাই। কুর্ণিশ করতে ছুটি পলিটিশানদের, হাজির হই মান্যগণ্যদের দরবারে—রাজকীয়-মুদ্রাঙ্কিত-কাগজগুচ্ছের সঞ্চয়ের পরিমাণেই যাদের মান আর পদই যাদের একমাত্র মর্যাদা। প্রতিদিন প্রতিক্ষণই আত্মপ্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠি।

এমন সময় কয়েকটি দিন আসে, যখন আমাদের এমন মানুষের কথা মনে পড়ে যাঁদের কথা মনে না করলে আমাদের সাংসারিক অর্থে কিছু যায়-আসে না, যাঁরা আমাদের কাছে কিছু দাবি করেন না কিন্তু একবার যদি তাঁদের কাছে যাই, তাঁদের কথা শুনি তখন অহংয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পাই, জীবনের মহৎ এক অর্থ খুঁজে পাই।

আগুনে হাত দেব অথচ হাত পুড়বে না—তাও কি হয়? মহতের সংস্পর্শে আসব অথচ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হব না—এও কি সম্ভব?

পঁচিশে বৈশাখ এমনই একদিন। এ দিনের স্পর্শে আমাদের মোহ দূর হয়। এই দিন আমরা মনে না করে পারি না যে, প্রতিটি মানুষের মনে, প্রতিটি দেশে আর পৃথিবীতে গুণীর বাণী সাড়া পাক। মানুষের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা তাঁদের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হোক।

আর একটি কথা।

সুন্দর যদি কখনো মূর্তিলাভ ক'রে থাকে তবে তার নাম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ। আমরা, যারা সাধারণ মানুষ তারা পঁচিশে বৈশাখ প্রার্থনা করি, আমরাও যেন সুন্দরের স্পর্শ পাই—আমাদের আচার-আচরণ, আমাদের অন্তর, আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ আর আমাদের পৃথিবী সুন্দর হোক। সুন্দরকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সত্য থেকেও ভ্রষ্ট হব না এবং মঙ্গল থেকে হব না বঞ্চিত।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যেমন কালিদাস ও ভবভূতির নাম যুগ্মচর, তেমনি স্মৃতিসাহিত্যেও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সঙ্গে সঙ্গেই চলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে উভয়ের মত এক হলে শাস্ত্রমত বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; বৈষম্য দৃষ্ট হলেই সুকঠোর বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সৌভাগ্যক্রমে বহুল বিষয়ে এঁদের মতৈক্য দৃষ্ট হয়। সময়ের দিক থেকে মনুসংহিতা যে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতার পূর্ববর্তী, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে বিরচিত হয়েছিল, এ মতই সমীচীন।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা মনুসংহিতা থেকে সুসংশ্লিষ্টতর ভাবে লিখিত। তাঁর সংহিতা তিন ভাগে বিভক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রীয় যাবতীয় বক্তব্য বিষয় এ তিন ভাগের মধ্যেই যথাযথভাবে সুসন্নিবদ্ধ রয়েছে। মনুসংহিতার প্রায় সমস্ত বিষয়ই যাজ্ঞবল্ক্যে পর্যালোচিত হয়েছে; কিন্তু ভাষার সঙ্কোচনগুণে মনুসংহিতার দুই বা ততোধিক শ্লোকের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যে একটি মাত্র শ্লোকে সুব্যক্ত হয়েছে। ফলে সমপরিমাণ বক্তব্য বিষয়ের জন্য মনুসংহিতার ন্যূনাধিক ২৭০০ শ্লোকের স্থানে যাজ্ঞবল্ক্যে কেবল এক হাজার শ্লোক

দৃষ্ট হয়। অবশ্য এমত নহে যে মনুসংহিতার কোনও কোনও শ্লোকের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যে একটি শ্লোকে ব্যক্ত হয়নি। (ফলতঃ মনু ৩.৭০ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১.১০২, মনু ৩.১১৯ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১.১১০, মনু ৭ ১৭১ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১.৩৪৮, মনু ৭.২০৫ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১.৩৪৯ একই বিষয়ে লিখিত।) যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতায় সামঞ্জস্য এত সমধিক যে, অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন যাজ্ঞবল্ক্য মনুসংহিতা খানার বক্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিজের অনবদ্য তথ্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর ভাষায় বলে গেছেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যে এমন কতিপয় বিষয় আছে যা' মনুতে নেই বা যা' মনু প্রসঙ্গতঃ অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ করে গেছেন; যাজ্ঞবল্ক্যের বিনায়ক শান্তি ও গ্রহশান্তি (১ ২৭১—৩০৮) বিষয়ে মনুতে কিছুই উল্লেখ নেই। যাজ্ঞবল্ক্যে তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ—এ পাঁচ প্রকারের দিব্য বিশুদ্ধির বর্ণন আছে; মনু কেবল অগ্নি ও জলের (৭.১১৪) আকস্মিক উল্লেখমাত্র করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য শরীর-তত্ত্ব ও ভৈষজ্য বিষয়ে (৩.৭৫ – ১০৮) অনেক বিষয় সন্নিবদ্ধ করেছেন, যার উল্লেখও মনুসংহিতায় নেই। অন্যদিকে মনুসংহিতায় উল্লেখ ও প্রপঞ্চন আছে, যা যাজ্ঞবল্ক্যে নেই সে রকম বিষয়ও রয়েছে, যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব। উভয়ের উল্লিখিত বিষয় বস্তুর পার্থক্যের দিক থেকে বলতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়ের মতভেদ বিশেষ করে চোখে পড়ে—

(১) মনুর মতে ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাকেও বিবাহ করতে পারেন (৩ ১৩) কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ বলে তারস্বরে ঘোষণা করেছেন—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥
১.৫৬ (৫৯) ॥

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন বলে যে একটি কথা আছে, তা' আমার সম্মত নয়, যেহেতু তাতে স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে।

(২) মনু প্রথমে নিয়োগপ্রথা বর্ণন পূর্বক তৎপর এর অত্যন্ত নিন্দা করেছেন (৯.৫৯—৬৮); কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য (১.৬৮—৬৯) এর নিন্দা করেন নি।

(৩) মনু অষ্টাদশ প্রকারের ব্যবহার পদ উল্লেখ করেছেন; যাজ্ঞবল্ক্য একস্থলে অষ্টাদশ ব্যবহার পদের কথা বলেন নি—তিনি কেবল ব্যবহার পদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং ব্যবহারাধ্যায়ে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রকীর্ণক কবিতা রচনা করেছেন।

(৪) পুত্রহীন ব্যক্তির বিধবার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ে মনু নির্বাক, এবং উত্তরাধিকারের তালিকা তাঁর যেন এলোমেলো; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বিধবা স্ত্রীকে উত্তরাধিকার বিষয়ে শীর্ষস্থানে সমাসীনা রেখেছেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে পর পর উত্তরাধিকারি-গণের নামোল্লেখ করেছেন। ২—১১৭ ও পরবর্তী শ্লোক।

যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলেছেন যদি সম্পত্তির সমান অংশ করতে হয়, তা হলে পত্নীকে সমান অংশ দিতে হবে—

"যদি কুর্যাৎ সমানাংশান্ পত্ন্যঃ কার্যাঃ সমাংশিকাঃ॥" ২ ১১৭ পুনরায় যোগমূর্তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন -

পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর সম্পত্তির বিভাগ করলে মাতাও পুত্রদের সমান অংশ প্রাপ্ত হবেন—

"পিতুরূর্ধ্বং বিভজতাং মাতাঽপ্যংশং সমং হরেৎ।"

(৫) মনু দ্যূতক্রীড়াদির নিন্দা করেছেন তীব্রভাবে; যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু এ দ্যূতাদিকে রাজকর আদায়ের উপায়স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। ইত্যাদি

সমগ্র যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি অনুষ্টুভ্ ছন্দে লিখিত। সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হলেও যাজ্ঞবল্ক্যের লেখনীর প্রসাদে সর্ব শ্লোক মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে। পাণিনির মতে অসিদ্ধ পদ যাজ্ঞবল্ক্য খুব বেশী ব্যবহার করেন নি।

গ্রন্থ-বিরচন বিষয়ে কথিত হয়েছে যে, মুনিরা মিথিলায় যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন। মিতাক্ষরার মতে যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবস্ এবং অন্যান্য ঋষিকে এই স্মার্তমতাবলম্বী উপদেশ দেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩.১.২) কথিত আছে যে যাজ্ঞবল্ক্য সামশ্রবকে এক হাজার গাড়ী নিয়ে যেতে বলেন—তাতে মুনিরা বাধা দেন (৩ ১১৮ ১২৯)। ফলে মুনিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য বিষয়ের পর বিষয়, অধ্যায়ের পর অধ্যায় বলতে থাকেন। তিনি যে মুখে উপদেশ দিয়েছিলেন, লেখন নি—তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ "শৃণুধ্বম্" (যথা ১ ১৭৮ শ্লোকে) প্রভৃতি পদ-প্রয়োগ। চারটি বেদ ব্যতীত—যাজ্ঞবল্ক্য ষড়্ বেদাঙ্গ এবং চতুর্দশ বিদ্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বকীয় আরণ্যক ও স্বরচিত যোগশাস্ত্রেরও উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে ১.১৪৫ শ্লোকে আরণ্যকের বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে; এবং ৩.৩০৯ শ্লোকে সুক্রিয় আরণ্যকের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ৩.১৮৯ শ্লোকে উপনিষদের উল্লেখ আছে এবং পুরাণ বিষয়ে বহু বচনে উল্লেখ আছে। ১.৪৫ শ্লোকে ইতিহাস, পুরাণ, বাকোবাক্য ও নারাশংসি গাথার উল্লেখ আছে। প্রারম্ভে আত্মব্যতিরেকে উনিশ জন ধর্ম-শাস্ত্রকারের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের অন্যত্র কোথাও কোনও ধর্মশাস্ত্রকার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি। আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতির (১.৩১১) উল্লেখও তিনি করেছেন। তাঁর মতে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ যেখানে ঘটে, সেখানে ধর্মশাস্ত্রের মতই প্রমাণ হবে। ৩.১৮৯ শ্লোকে তিনি সূত্র ও ভাষ্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ১.৩৬ শ্লোকে একবার মাত্র তিনি সমবেতভাবে ধর্মশাস্ত্রকারদের মত উল্লেখ করেছেন। (বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রে (১.২.৪) উক্ত মত সমুদ্ধৃত হয়েছে)।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম বা আচার অধ্যায়ে প্রধান প্রধান বর্ণিত বিষয়—চতুর্দশ বিদ্যা; ধর্মশাস্ত্র-কারগণ এবং উৎপত্তিস্থল। গর্ভাধান, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার; ব্রহ্মচারীর দৈনন্দিন কর্তব্য। বিবাহ—কন্যার লক্ষণ প্রভৃতি। অষ্টপ্রকার বিবাহ। পত্নীর কর্তব্য। বর্ণপ্রথা। গৃহীর কর্তব্য ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ। অতিথি সেবা। বৈদিক যজ্ঞ। স্নাতকের কর্তব্য। অন্যায় দিবস। খাদ্য, প্রেয় প্রভৃতি বিনির্ণয়। তারপর যাজ্ঞবল্ক্য করেছেন দান-বিষয়ক আলোচনা। যথা, গোদান, অন্যান্য দান প্রভৃতি—এবং মনু করেছেন যে সমস্ত দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান।

হেমশৃঙ্গা শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥ ১২.০৪
দাতাঽস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরাল্লোমসংজ্ঞিতান্।
কপিলা চেত্তরিষ্যতি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্॥ ১.২০৫

* * *

সর্বদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্॥ ১.২১২

অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। এ গাভীদাতা—প্রদত্ত গাভীর যত রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্ত গাভী যদি কপিলা হয়, তা হ'লে আপনার উদ্ধার ত হয়ই, অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে। * * যেহেতু জ্ঞান সর্ব-ধর্মময়; ঐ জ্ঞানদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জ্ঞানদান করলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যিনি সম্পূর্ণ পাত্র হয়েও অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে দানের উপযুক্ত পাত্র হয়েও দান গ্রহণ করেন না, তিনি—যে সকল স্থান নিরন্তর দান কর্তাদের প্রাপ্য—সে সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

অনন্তর শ্রাদ্ধবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রাদ্ধের যথার্থ সময়, শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যক্তি, পার্বণ, বৃদ্ধি, একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে দেয় মাংস প্রভৃতির মনোহারী বিবৃতি প্রদান করেছেন। অতঃপর

বিনায়ক ও নবগ্রহ শান্তি। বিনায়ক শান্তি মানব-গৃহ্য সূত্রানুসারে বিলিখিত বলে মনে হয় (মানব গৃ. সূ.—২.১৪)। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে রাজধর্ম, রাজার গুণাবলী, মন্ত্রী, পুরোহিত, রাজশাসন, মণ্ডল-সংগঠন, চতুর্নীতি, ষড়্‌গুণ, দণ্ডদানে নিরপেক্ষতা, প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বা ব্যবহার অধ্যায়ে বিচারক, ব্যবহার পদের সংজ্ঞা, বিচার-পদ্ধতি, সাক্ষ্যপ্রদান, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ, প্রমাণ, দলিল, অধিকার-গ্রহণ, বিভিন্ন বিচারালয়, জাল-প্রবঞ্চনা, বয়সন্যূনতা এবং অন্যান্য প্রকারের অসিদ্ধতা, ধনদৌলত-প্রাপ্তি, কর্জ, সুদ, যৌথ পরিবারের ঋণ, পুত্রের পিতৃঋণ শোধ, টাকা জমা, সাক্ষীর প্রকার ভেদ, সম্পত্তি-বিভাগ, স্ত্রীর সম্পত্তি, পিতার মৃত্যুতে সম্পত্তি বিভাগ, অবিভাজ্য সম্পত্তি, পিতা ও পুত্রের যৌথ সম্পত্তি, দ্বাদশবিধ পুত্র, অপুত্রক ব্যক্তির উত্তরাধিকার, স্ত্রীধনের উপরে স্বামীর ক্ষমতা, জমির সীমানির্দেশ, মালিক ও প্রজার মধ্যে বিরোধ; কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বিক্রয়; দানে অযোগ্যতা; বিক্রয়ে অক্ষমতা, চাকরির শর্তভঙ্গ; বলপূর্বক দাসত্ব; বেতন-প্রদানে অস্বীকৃতি; জুয়াখেলা, কলঙ্কারোপ, শারীরিক অত্যাচার, যৌথ কারবার, চুরি, ব্যভিচার, বিভিন্ন প্রকারের অন্যায়, রায়দান প্রভৃতি ব্যবহার ও ব্যবহারজীবের উপজীব্য বহুল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন, বিচার ও বিশ্লেষণ এ এ অধ্যায়ে রয়েছে।

প্রায়শ্চিত্ত বা তৃতীয় অধ্যায়ে শ্মশান ও কবর; পিতৃ-তর্পণ, অশৌচবিধান জননাশৌচ; মৃত্যু বা জন্মের অব্যবহিত পরেই অশৌচাভাব; বিশুদ্ধির বিবিধ উপায়; আপৎকালে আজীবাহরণাদির উপায়; আরণ্যক যতি প্রভৃতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী; জীবাত্মার শরীর পরিগ্রহ; ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায়, শরীরের অস্থিসংখ্যা; প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি; শিরা-উপশিরা; আত্মবিষয়ক মন্তব্য; মোক্ষমার্গে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা; বিভিন্ন যোনিতে পাতকিগণের জন্ম পরিগ্রহ; যোগিগণের অমরত্ব-লাভ; সত্ত্ব-রজঃ-তমো ভেদে কার্যের পার্থক্য; আত্মজ্ঞানোপায়; অমরত্ব ও স্বর্গলাভের দুই পৃথক্ উপায়; বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি; প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য; একুশ নরক; পাতক, উপপাতক; ব্রাহ্মবধ, বা অন্য ব্যক্তি বধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত; মদ্যপান প্রভৃতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত; স্থানকালসামর্থ্যবয়স প্রভৃতি ভেদে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান, দশবিধ যম ও নিয়ম; সান্তপন, মহাসান্তপন, তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত সুব্যবস্থা রয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিষ্ণু-ধর্ম সূত্রের একটি নিকট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। সমভাবে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গেও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। সময়ের দিক থেকে বিবেচনায় যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাই কৌটিল্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার উপর যজুর্বেদের এবং যজুর্বেদীয়, বিশেষতঃ, শুক্লযজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ শতপথ, উপনিষৎ বৃহদারণ্যক এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্যে ধৃত মন্ত্রসমূহ কিছু ঋগ্বেদের; অধিকাংশ রাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার রচয়িতা শুক্লযজুর্বেদীয় ছিলেন বা ঐ গুরু-পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত হন, এ অনায়াসে বলা চলে।

ঋগ্বেদের যুগ স্বাধীন চিন্তার যুগ। ধীরে ধীরে সমাজ যখন গড়ে উঠতে লাগলো, সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতিও সুপ্রতিষ্ঠ হলো। কালক্রমে বর্ণপ্রথাও কঠোরতর রূপ ধারণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার যাগযজ্ঞের প্রতিও ভারতীয় সমাজ অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হলো। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে দর্শন ও কল্পসূত্র সবই সূত্রাকারে গ্রথিত হলো। ক্রমশঃ তাও হলো দুর্বোধ্য। বৌধায়নীয়, হিরণ্যকেশি, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতির ধর্মসূত্রে ধর্মশাস্ত্রীয় বিষয় পর্যালোচিত হয়েছে অতি

সুন্দরভাবে—কিন্তু এ সূত্রসাহিত্যের মাধ্যমে স্মৃতি—ক্রমে শ্লোকাকারে সমাজে বিশিষ্টতর, বহুলতর প্রবেশ লাভ করলো। ফলে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

স্মৃতিশাস্ত্র সমাজের দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃষ্টরূপ বিনির্ণয়ের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ দর্পণ-স্বরূপ। পারিবারিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত জীবনের এমন নিখুঁত চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। সামাজিক অভ্যুন্নতির দিক থেকে পুনরায় স্ত্রী ও শূদ্রদের প্রতি আচরণই শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। দেশ যখনই স্বাধীনতা হারিয়েছে বা বাহিঃশত্রুর করতলগত হয়েছে বা অন্যপ্রকারে বিধ্বস্ত হয়েছে, দেশে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাধীন গতি হয়েছে ব্যাহত। বৈদিক যুগ থেকে উপনিষৎ-সূত্রযুগের মাধ্যমে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ পর্যন্ত সমাজের চিত্র পর্যালোচনা করলে এ সত্যসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। এ চিত্র-চিত্রণের দিক থেকে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বিশিষ্টস্থানের অধিকারী। এঁদের চিত্রণে সমাজ তেমন অনুন্নত স্থানে অবনমিত হয় নি। নারীর অপ্রশংসা আছে, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ আছে, কিন্তু প্রশংসাও আছে প্রচুর, তাঁদের প্রতি সমাজ কর্তাদের সম্মান পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ না থাকলেও হ্রাস পায় নি। ফলতঃ—এমন কি পরবর্তী স্মৃতি ও অন্যান্য সাহিত্য পর্যালোচনা করলেও এ উপসংহার করতেই হয় যে, অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন যুগেও সমাজে দুইটি বিরোধী মত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করেছে নিরন্তর। তখনও অত্যন্ত সাবধানী সমাজসংরক্ষকেরাও নারীদের "গৃহপিঞ্জরকোকিল" বলেছেন, গৃহশ্রী, গৃহদীপ্তি তো বলেছেন-ই।

স্মৃতিকারমধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকাররূপ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের চিরপূজার্হ। বহু দিক্ থেকে তাঁর গ্রন্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অভিনব ও আদর্শ-স্থানীয়। এজন্য তাঁর টীকাকার বিশ্বরূপ (বালক্রীড়াকার), মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, সুবোধিনীকার বিশ্বেশ্বর ও বালম্ভট্টীকার বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড, অপরাদিত্য বা অপরার্ক, দীপকলিকাকার বাঙ্গালী মহামহোপাধ্যায় সাহুভিয়ান শূলপাণি, বীর মিত্রোদয়কার মিত্রমিশ্র প্রভৃতি অমর হয়ে আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথা*

আইডা আন্‌সেল

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমার বিশিষ্ট দু'জন বন্ধু টম্ অ্যালান (অজয়) ও তার স্ত্রী এডিথ (শ্রীমতী বিরজা) প্রথম দর্শনে স্বামীজী সম্বন্ধে তাদের ধারণার কথা বহুবার আমায় বলেছে। খ্রীঃ ১৯০০ সালে স্বামীজী যখন প্রথম ওকল্যাণ্ডে আসেন তখন এডিথ খুব পীড়িতা। খবরের কাগজে হিন্দুসন্ন্যাসীর বক্তৃতা হবে বিজ্ঞাপন দেখে টম্ একাই শুনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে যেন তার উত্তেজনা ও উৎসাহ চেপে রাখতে পারছিল না। এডিথ্‌কে বললে, "আমি আজ এমন একজনকে দেখেছি যিনি মানুষ নন—তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। প্রকৃত যা সত্য তাই তাঁর কাছে আজ শুনলাম।" কি এমন কথা শুনেছে যা তার মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছে জিজ্ঞাসিত হলে টম্ স্বামীজীর উক্তি থেকে চমৎকার দুটি

* Vedanta and the West (May-June, 1954) পত্রিকার সৌজন্যে। অনুবাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভাবধারার কথা বললে। প্রথমটি,—'ভাল ও মন্দ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ, এরা যেন একটি টাকারই দুটি পিঠ—এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি পেতেই পার না।' 'হোম অব টুথে' কিন্তু আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে, যা কিছু বিশ্বসংসারে আছে তা সবই ভাল, মন্দ বলে কিছুই নেই। স্বামীজীর অপর যে কথাটি টমকে মুগ্ধ করেছিল সেটি এই যে, 'একটি গরু মিথ্যা কথা বলতে পারে না, মানুষ পারে—কিন্তু গরু চিরকালই গরুই থাকবে, মানুষ কিন্তু পবিত্রতা অর্জন করে দেবত্ব লাভ করতে পারে।'

এর পর থেকেই টম স্বামীজীর ভক্ত হয়ে পড়ল এবং স্বামীজীর বক্তৃতার সময় হল ঘরের দ্বাররক্ষীর কাজ করতে আরম্ভ করল। রোগমুক্ত হয়ে এডিথও একদিন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে গেল। বক্তৃতার পর দরজার কাছে টমের জন্যে সে অপেক্ষা করছে এমন সময় স্বামীজী তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "একবার এদিকে আসুন তো।" এডিথ কাছে যেতে বললেন, "আপনি যদি একান্তে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তাহলে আমার বাসাবাড়ীতে আসবেন।"

এডিথ যেন কৃতার্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কখন আমি আসব ?"

স্বামীজী বললেন, "কাল সকাল ৯টার সময়।"

পরদিন সকালে এডিথ স্বামীজীর বাসস্থানে গিয়ে, ঘরের ভেতর উপসাগরের দিকের একটা খোলা জানালার কাছে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে স্বামীজী গুন্ গুন্ করে আবৃত্তি করতে করতে এলেন ও জানালাটির অপর পাশে গিয়ে বসে বললেন, "ম্যাডাম, এইবার কি বলবেন বলুন তো।" এডিথ তখন ভাবাবেগে এমন হ'য়ে পড়েছিল যে কোন কথাই বলতে পারলে না—কেবলই চোখের জলে ভাসতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তখন স্বামীজী তাকে বললেন, "কাল এমনি সময়ে আপনি আবার আসবেন।"

তারপর এডিথ কয়েকবারই তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ ও প্রেরণার জন্যে গিয়েছিল। তিনি তাকে প্রাণায়ামের কয়েকটি খুব সহজ পন্থা শিখিয়ে দিয়ে সাবধান করে দেন যে তাঁর সামনে ছাড়া সে যেন এগুলি কখনও অভ্যাস না করে। স্বামীজী তাকে 'হোম অব টথ'—সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, পাশ্চাত্ত্যে উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই সবচেয়ে ভাল হচ্ছে। সেখানকার কর্মীরা যে আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্যে কারও কাছে কিছু আর্থিক দাবি করে না এটা তাঁর খুবই ভাল লেগেছে।

অন্য এক সময়ে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমি এমন একজনের শিষ্য যিনি নিজের নামটি পর্যন্ত লিখতে পারতেন না অথচ আমি তাঁর জুতার ফিতা খোলবারও যোগ্য নই। কতবার আমার ইচ্ছা হয়েছে যে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানবুদ্ধি গঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দি।" একটি মহিলা অনুযোগ করে বললেন, "কিন্তু স্বামীজী, আপনার এই জ্ঞানবুদ্ধির জন্যেই ত, আপনাকে আমাদের এত ভাল লাগে।" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তার কারণ আপনারাও আমারই মত বোকা।"

স্বামীজীর সেবারকার শেষ ভাষণের পর এডিথ যখন ক্লাসঘর থেকে নীরবে চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে তাকে বললেন, "আপনি চলে যাবেন না, খাবার ঘরে গিয়ে বসুন।" তারপর সকলকে বিদায় জানিয়ে তিনি খাবার ঘরে তার কাছে গিয়ে তাকে রাত্রে খেয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন ও পরে নিজেই রান্না করতে আরম্ভ করে দিলেন। এডিথ আলু ও পিঁয়াজের খোসাগুলি ছাড়াতে লাগলেন। রান্না করতে করতে তিনি গীতার শ্লোক মধুর স্বরে উচ্চারণ করছিলেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১নং শ্লোকটি, ইংরেজীতে অবৃত্তি করলেন। মূল সংস্কৃত শ্লোকটি—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

তারপর বললেন, "তাহলেই আপনি দেখুন, তিনিই (ঈশ্বরই) আমাদের সকলকে যেন একটি চাকার ওপর রেখে ঘোরাচ্ছেন—এ ক্ষেত্রে আমরা আর কিই বা করতে পারি ?"

পরে যখন স্বামীজী অ্যালামেডার (Alameda) 'হোম্ অব ট্রুথে' কিছুদিন ছিলেন তখন এডিথ তাঁকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে খুব আনন্দ পেয়েছিল। এখানে স্বামীজী সব সময়েই সদানন্দে থাকতেন—কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের ধার ধারতেন না, অথচ এরই মধ্যে তিনি এডিথকে সাধারণ কথাবার্তার ভিতর দিয়ে অনেক উপদেশও দিতেন। একদিন এডিথ একটি নতুন সবুজ রংএর পোষাক পরে বেশ গর্ববোধ করছিল। হঠাৎ কড়া থেকে একটু মাখন তার পোষাকের ওপর ছিটকে পড়ায় তখনি সে আর্তনাদ করে উঠে চেঁচামেচি করতে আরম্ভ করে দিলে। স্বামীজী কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আপনমনে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। আর একদিন কিছু আচার কিনে একটি ছোট কাঠের প্লেটে রাখা হয়েছিল, হঠাৎ তা থেকে একটু আচারের রস, স্বামীজীর হাতের উপর পড়ে গেল। অমনি তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মুখের ভিতর পুরে দিয়ে, ছেলেমানুষের মত আনন্দে চাটতে আরম্ভ করে দিলেন। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে এটা অভদ্রতাজনক, তাই এডিথ স্বামীজীকে ঐ রকম করতে দেখে বিক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠল, "ওঃ স্বামীজী।" এর উত্তরে স্বামীজী বললেন, "সামান্য এই বাহ্যিক ঘটনাতেই তোমরা এত বিচলিত হয়ে পড়, এইটাই ত তোমাদের মুস্কিল। তোমরা সব সময় বাহিরটাকেই সুন্দর করে রাখতে চাও।"

টমও তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলেছিল। স্বামীজীর বক্তৃতার সময় সে হলের দ্বাররক্ষীর কাজ করত, সেকথা আগেই বলেছি—আবার কখনও কখনও শ্রোতাদের কাছে স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দিত। প্রথম দিন যখন সে ও স্বামীজী মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন, তখন তার মনে হয়েছিল, যেন তিনি উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট আর তার নিজের উচ্চতা মাত্র ৬ ইঞ্চি। সেই অনুভূতির পর থেকে, সে আর কখনও মঞ্চের ওপর তাঁর সঙ্গে দাঁড়াত না, নীচে দাঁড়িয়ে থেকেই তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিত। একবার স্বামীজী ভারতের সম্বন্ধে কিছু বলতে যাবার আগে, তাকে বললেন, "দেখ, আমি যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করি, তখন আমার থামার কথা একেবারেই মনে থাকে না, তাই তুমি ঠিক ১০টার সময় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে মনে করিয়ে দিও।" তাই শুনে টম হলের একেবারে শেষে গিয়ে দাঁড়াল, আর ঠিক ১০টার সময় তার চেনশুদ্ধ ঘড়িটি পকেট থেকে বার করে চেনটি ধরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোলাতে আরম্ভ করে দিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীর দৃষ্টি সেই ইঙ্গিতের দিকে পড়াতে তিনি শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন, "আমি এখানকার কর্মীদের বলেছিলাম যে ওঁরা যেন ঠিক ১০টার সময় আমার ভাষণ শেষ করতে আমাকে ইঙ্গিত করেন, তা দেখুন ওঁরা ওঁদের ঘড়ি দুলিয়ে ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করেছেন, অথচ আমি এখনও আমার বক্তব্য আরম্ভই করিনি!" স্বামীজী অবশ্য তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করলেন। সেই থেকে টম্ অ্যালান যতদিন জীবিত ছিল, ঐ ঘড়িটি, স্বামীজীর স্মৃতি হিসাবে সব সময় সঙ্গে রাখত ও ব্যবহার করত।

ইষ্টারের রবিবার (Easter Sunday) রাত্রিতে স্বামীজীর কয়েকটি বন্ধু 'হোম্ অব ট্রুথ'-এর বারান্দায় বসেছিলেন আর তিনি, তাঁর আমেরিকার

অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁদের বলছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, একবার তাঁর পায়ের আঙ্গুলের ব্যথার জন্যে তাঁকে একটি মহিলা কাইরোপডিষ্টের* কাছে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং তিনি যানও। এর ওপর তাঁর কোনই আস্থা হয়নি, কেননা স্বামীজী পরে এই মহিলার কথা উঠলেই বলতেন, 'গোড়ালির বগ্গি'। আরও বলতেন—"ওর কথা মনে পড়লেই আমার পায়ের গোড়ালি ব্যথা করতে থাকে।" ঐদিন সন্ধ্যায় একজন তাঁকে 'ত্যাগ' সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা ছেলেমানুষ, তোমরা 'ত্যাগ' সম্বন্ধে কি বুঝবে? তোমরা যদি আমার শিষ্য হতে চাও তাহলে, বিনা দ্বিধায় কামানের মুখে তোমাদের বুক পেতে দিতে হবে।"

টম জাতিতে ইংরেজ। ও আগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তার চেহারায় সৈনিকের দৃঢ়তা প্রকাশ পেত। স্বামীজীর সামনে একদিন সে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "মিঃ অ্যালান, আমরা দুজনাই একই জাতের—মানে সৈনিকজাতি।" টম জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা স্বামীজী, কোথায় আপনি সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিষ্য পেয়েছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "ইংলণ্ডে। অবশ্য প্রথমে তাদের পাওয়া খুবই শক্ত, কিন্তু তাদের যখন পাওয়া যায়, যখন পুরাপুরিই পাওয়া যায়।"

স্বামীজী যখনই যেখানে যেতেন সেখানেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তাঁর আকৃতির ভিতর সব সময়ই এমন একটা মর্যাদা ফুটে উঠত যে সকলেরই সেটা হৃদয়ঙ্গম হত। যখন তিনি মার্কেট স্ট্রিট্ দিয়ে হেঁটে যেতেন, লোকে তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াত, পরস্পর বলাবলি করত, "এই হিন্দু যুবকটি কে হে?" এমনি করেই তিনি একদিন জাহাজের জেটির ভিতরের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাহাজ ভাসান দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঘটনাটা এই—টম তখন স্যান-ফ্রান্সিস্কোতে একটা খুব বড় লোহার কারখানায় কাজ করত। স্বামীজী তার কাছে তাঁর জাহাজ ভাসান দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, সে তাঁকে ও আরও কয়েকজনকে জাহাজের জেটিতে আসতে আমন্ত্রণ করলে। কিন্তু জেটির ভিতরের মঞ্চটি জাহাজের কর্তৃপক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ছাড়া জনসাধারণের জন্যে প্রবেশ-নিষিদ্ধ ছিল। এইসব নিমন্ত্রিতদের প্রবেশ করবার জন্যে টিকিট দেওয়া হয়েছিল—মঞ্চের প্রবেশপথে দুজন রক্ষী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। স্বামীজী সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে ভিতরের মঞ্চে গিয়ে না দাঁড়ালে ভাল দেখা যাবে না, অতএব ভিতরে যাওয়াই স্থির করে তিনি ধীরে ধীরে রক্ষীদের সামনে দিয়েই মঞ্চে গিয়ে পৌঁছালেন—রক্ষীরা তাঁকে কোনই বাধা দিল না, টিকিটের কথাও জিজ্ঞাসা করল না। জাহাজ ভাসান দেখবার পর তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এসে বলেছিলেন, "শিশুর জন্মগ্রহণের মতই যেন এই ব্যাপারটা।"

স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়ে বলতেন যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও গোঁড়া বা রুক্ষ হতে পারে না। বলতেন, "তারা লিকলিকে রোগাও নয়, লম্বামুখো কিম্ভূতকিমাকারও নয়, তারা দেখতে ঠিক আমারই মত মোটাসোটা মানুষ।"

ক্যাম্প আরভিংএ মিস্ বেল-(Miss Bell) এর তাঁবুতে বসে কথাবার্তার সময় একদিন ঐ মহিলা অভিমত প্রকাশ করলেন, "এই জগৎটা একটা স্কুল-বিশেষ, এখানে আমরা সকলে আমাদের পাঠ শিক্ষা করতে আসি।"

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "জগৎটা যে একটা স্কুলের মত, একথা তোমায় কে বললে?" তাঁর কথা শুনে মিস্ বেল নীরব।

* হাত-পা-নখ-কড়ার চিকিৎসক।

স্বামীজী তখন বলতে লাগলেন, "এই জগৎটা একটা সার্কাসের মত। আর আমরা এক একটি ক্লাউনের মত নানারকম সাজে সেজে, নানারকম ভাবে ডিগ্‌বাজি খেয়ে কসরৎ দেখিয়ে চলেছি।"

মিস্ বেল জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কেন এরকমভাবে ডিগ্‌বাজি খাচ্ছি স্বামীজী ?"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কেন ? কারণ আমরা ডিগ্‌বাজি খেতেই ভালবাসি বলে। ডিগবাজি খেতে খেতে যেদিন আমাদের ক্লান্তি আসবে, সেই দিনই আমরা খেলায় ক্ষান্তি দেব।"

টম ও এডিথের স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে একটি বাড়ী ছিল—সেটি ছিল স্বামীজীর স্মৃতিতে ভরা। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা স্যানফ্রান্সিস্কোতে এলেই এঁদের দুজনার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহান্বিত হতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন বা লিখে জানিয়েছিলেন যে, সারা পাশ্চাত্যে এঁরা দুজনেই সবচেয়ে বেশী করে স্বামীজীর আদর্শকে ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতে সক্ষম হন। আমার একটি বন্ধু এঁদের বিষয়ে বলেছিলেন যে, কয়েক বছর আগে যখন তিনি ও তাঁর ছেলে, এই অ্যালান দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন স্বামীজীর বিষয়ে তাঁদের বর্ণনা এত জীবন্ত ও আনন্দপূর্ণ হয়েছিল যে তাঁদের মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং স্বামীজী সেই ঘরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। বাড়ীটির খাবার ঘরে স্বামীজীর একটি বড় ফটো টাঙ্গান ছিল। সেই দিকে মুখ করেই সকলে বসতেন। খাবার আগে কিছু আবৃত্তি করা হত ও পরে স্বামীজীর কথা, তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও তাঁদের ভাব-ধারার কথা নিয়েই তাঁরা আলোচনা করতেন। এ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ প্রায় হতই না। স্বামীজীর সমস্ত বই সেখানে রাখা ছিল। এই অ্যালান দম্পতি স্বামীজীর অনেক ফটোও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, এই ফটোগুলি তাঁদের বন্ধু-বান্ধবকে দেখিয়ে তাঁরা খুব আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন। এই ফটোগুলির মধ্যে একটি ফটো তাঁদের খুব প্রিয় ছিল। সেটি একটি বাগানে তোলা। একদিন স্বামীজী বাগানে ঘাসের ওপর শুয়ে তাঁর কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছেন, এমন সময় একজন এসে তাঁর একটি ফটো তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। তিনি প্রথমে উঠে দাঁড়াতে রাজি হলেন না কিন্তু সকলের বিশেষ অনুরোধে যেমন ছিলেন সেই অবস্থাতেই, ফুলে ভরা আঙ্গুর গাছগুলির সামনে উঠে দাঁড়ালেন। মাথায় পাগড়ি নেই, মুখের ভাবটি—যেন কিছু বলতে যাচ্ছেন। ফটো তোলা হল। এই ফটোটিই স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম।

এডিথের গলা খুব মিষ্টি ছিল আর মাঝে মাঝে সে বেশ ভাবে তন্ময় হয়ে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত গানগুলি গাইত। "রাজনর্তকীর গানটি"* তার

* প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।
ইক লোহা পূজামে রাখত, ইক রহত ব্যাধ ঘর পরো
পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ দুঁহু এক কাঞ্চন করো।
ইক নদী, ইক নহর, কহাবত মৈলো নীর ভরো,
জব মিলি দোনো তব এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম, কহাবত সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

হে প্রভু, আমার দোষ দেখিয়ো না। তোমার নাম তো সমদর্শী, খুশী হয় তো আমায় পার করিয়া দও। একই লোহা দিয়া গড়া পূজার ঘরের কল কাটিবার বঁটি আবার ব্যাধের ঘরের হিংসার অস্ত্র, কিন্তু স্পর্শমণির মনে কি দ্বিধা আছে? সে তো দুইটিকেই কাঞ্চনে পরিণত করে। একটি ছোট নদীতে পরিষ্কার জল, আর নালায় ময়লা জল কিন্তু দুইই যখন গঙ্গায় গিয়া পড়ে তখন তো একই বর্ণ ধারণ করে। সুরদাস বলিতেছেন, মানুষ জীব ও ভগবানকে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিয়া ঝগড়া করে—কিন্তু এই ভেদ তো অজ্ঞানতা-জনিত। জ্ঞানীর কাছে উচ্চনীচ পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

খুব প্রিয় ছিল। এই গানটি কোন এক ভারতীয় রাজসভায় একটি নর্তকী গেয়েছিল, স্বামীজী অনুবাদ করে এঁদের গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতের এক রাজবাটীতে। নর্তকীর গান হবে শুনেই তিনি স্থানত্যাগ করে বাইরে চলে যাচ্ছিলেন, রাজার অনুরোধে বসলেন। গানের কথাগুলির উদারভাবটি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। গানের ভাব ও সুরে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি নর্তকীকে আশীর্বাদ করে মধুর সান্ত্বনার স্বরে বলেছিলেন, "তুমি তোমার গানের ভিতর দিয়ে আমাকে এক অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছ। আজ আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্ভাব্য অহঙ্কার নিঃশেষে দূর হয়ে গেল।"

শেষবিদায় নেবার সময় এডিথকে স্বামীজী আশীষবাণী দেন, "যদি তুমি কখনও কষ্টে পড়, আমাকে স্মরণ কোরো—আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমি তোমার কথা ঠিক শুনতে পাব।" বিগত ৫০ বছর ধরে এডিথের তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। স্বামীজীর সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে সে নির্ভীক ভাবে অনেক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল রকম সাহায্যের প্রয়োজনেই স্বামীজীকে স্মরণ করে সে কখনও বিফল হয় নি।

স্বামীজী তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, "যদি কারও জীবনে দুঃখের সময় আসে, তাতে কি এসে যায়? ঘড়ির পেণ্ডুলাম এক দিক থেকে আর এক দিকে আসবেই—কিন্তু বিশেষ কি তারতম্য হবে? প্রয়োজন হচ্ছে তার দোলনকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া।" তারপর তিনি আমেরিকান বালকদের অনুকরণ করে বললেন, "বুড়ো বিড়ালটা মরুক" (Let the old cat die). [আমেরিকায় খেলা-ধূলার সময় ছেলেরা যখন দোলনায় বসে দোল খায়, তখন অন্য একজন লোক যন্ত্রের সাহায্যে দোলনাটিকে দোল দিতে থাকে। যখন সে লোকটি দোল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়াতে দোলনাটি থেমে যায়, তখন ছেলেরা দোলা থেকে নেমে চলে যেতে যেতে প্রায়ই বলে, "Let the old cat die."]

এ আমার জীবনে দুর্লভ সৌভাগ্য যে আমি স্বামীজীকে দর্শন করতে ও তাঁর কথা শুনতে পেয়েছি। আরও অনুভব করেছি যে, তাঁর কথার ভিতরের অসীম শক্তিই আমার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, কাগজে ধরা দিয়েছে ও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকেই এই লেখা পড়ে অন্তরে সাহস ও প্রেরণা পাবে, সন্দেহ নেই। আমাকে তিনি তাঁর যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। এতে আমি কৃতার্থ। আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনার নিঃশেষ ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে—আজ আমিও বলতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি,—"বুড়ো বিড়ালটা মরুক"।*

* লেখিকা গত ৩১শে জানুয়ারী, '৫৫, ৭৮ বৎসর বয়সে স্বল্পকালস্থায়ী পক্ষাঘাত রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন—এ সংবাদ আমরা গত মাসের উদ্বোধনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-সংবাদ' স্তম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।—উঃ সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

জামসেদপুরে শিক্ষাপ্রচার—জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৩ সালের ৩২তম বর্ষের বার্ষিক কার্যবিবরণী কয়েকমাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটি-পরিচালিত ৪টি উচ্চ (২টি বালিকাদের জন্য), ৩টি মধ্য (১টি বালিকাদের জন্য) এবং ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ৩৭০২; প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা

১৭৫৫। অবৈতনিক পাঠাগারে ৮ খানি মাসিক, ৩ খানি সাপ্তাহিক এবং ৪ খানি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। ৮টি স্কুল লাইব্রেরীর মোট গ্রন্থসংখ্যা ৪৮২৯। বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হাই স্কুলের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার ১০০%। ২টি ছাত্রাবাসে ৪৪জন ছাত্রের মধ্যে ১ জন বিনা খরচে, ৩ জন অর্ধেক খরচে ও বাকীগুলি আংশিক খরচ দিয়া ছিল। যোগ্যতাসহকারে এতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে পরিচালিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিবরাত্রি, খ্রীষ্ট-জন্মদিন, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের করুণায় আশ্রমটি ৩৪তম বর্ষ অতিক্রম করিল। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী বিশেষ লক্ষণীয়। বন্যাবিধ্বস্ত উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় সেবাকার্যের জন্য মঙ্গলগড়ে এবং দেওধায় সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া চৌদ্দখানি গ্রামে ছয় সপ্তাহ যাবৎ ৮৫০০ লোককে সাহায্য দান করা হয়। এই সেবাকার্যে অক্টোবর, '৫৪ পর্যন্ত ২৯০১/০ মণ চাল, ২৬/০ মণ ডাল, ৭৫/০ মণ লবণ এবং ৪৮১১ ব্যক্তির মধ্যে ১৩৯৫০ খানি নূতন ও পুরাতন বস্ত্র ও ২৫১৩ খানি নূতন কম্বলও বিতরণ করা হইয়াছিল। ৩২০৯ পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধাদি দেওয়া হয়। আশ্রমস্থ ভুবনেশ্বর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ৭০,০৩৩ এবং এ্যালোপ্যাথিক বিভাগে ১৪,৫৬৬ জন রোগী চিকিৎসালাভ করেন। অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪৩, ইহার মধ্যে ৭৫%ই হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। আশ্রমের ছাত্রাবাসে বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চারজন ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন এম্-এস্‌সি এবং দুই জন অর্থনীতি ও গণিতে বি. এ (অনার্স) লাভ করিয়াছে। তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৮২৮; পাঠাগারে ৬ খানি দৈনিক, ২০ খানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র নিয়মিত আসিয়াছে। এই গ্রন্থাগারটিকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থাগারে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। হিন্দী ও বাংলায় ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক ১৫০টি ক্লাস ও ১৫টি আলোচনা-সভা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে বিবিধ কর্মসূচীসহ এক সপ্তাহব্যাপী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব-অনুষ্ঠান আলোচ্যবৎসরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাঁকুড়া কেন্দ্র—বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ—আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ও শহরতলীতে মোট ১৭০টি ধর্মালোচনা ও ১০টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা, সরস্বতীপূজা, বাসন্তীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি-পূজা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। গ্রন্থাগারে ১৮৮৮ খানি পুস্তক ছিল। ২৮ খানি মাসিক ও ২ খানি দৈনিক পত্রিকা আসিয়াছে। গ্রন্থাগারের ১৭৬৬ জন সভ্যের মধ্যে ৮৩৮ জন অবৈতনিক। মিশনের তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ৯৬৬৩৭ (নূতন ২৯৬৫১) জন রোগীর চিকিৎসা ও ৬৯৭ জনের (নূতন ১৭১) অস্ত্রোপচার করা হয়। আবাসিক বিভাগে ১২৭ জন রোগী ছিল। রামহরিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৭ জন (ছাত্রী ২৯) ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৮৪ জন (বিনা বেতনে—১৯, অর্ধবেতনে—২১) এবং বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়ে ৮ জন বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করে। আশ্রমস্থ সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ২১ জন ছাত্র ছিল।

ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর উৎসব—বিগত ২৫শে জানুয়ারী ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ-কর্তৃক বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন হাজার ভক্ত নর-নারী বালক-বালিকা ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে স্বামী গদাধরানন্দ 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' হইতে পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। বিকালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পরিজার সভাপতিত্বে একটি ধর্ম-সভার অধিবেশন হয়। মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ, পুরী সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী ও স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীইন্দুভূষণ মিশ্র বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার উপদেশাবলী অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ উৎসবে উপস্থিত থাকায় বহু নরনারী তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৫ই এবং ১৬ই জানুয়ারী—দুই দিন ধরিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৩তম জন্ম-জয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিনকার কার্যসূচী ছিল বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, প্রসাদবিতরণ এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা। সন্ধ্যারতির পর সমবেত ভক্তগণের নিকট স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ স্বামীজীর উপদেশ হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিয়া শুনাইবার পর স্বামী পরমাত্মানন্দ তামিলে এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজী স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী কৈলাসানন্দজী আবেগময়ী ভাষায় চরিত্রবান্ যুবকগণকে দলে দলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া স্বামীজীর স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিবার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় দিন (রবিবার) প্রাতঃকালীন কর্মসূচী ছিল স্বামীজীর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী ও জীবনীর 'পারায়ণ'। ১২৫ জন ভক্ত (তন্মধ্যে কয়েকটি তরুণও ছিল) ইহাতে অংশগ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রী এস্ বদিরাজ ভাগবতার কর্তৃক 'মহাত্মা কবীর দাস' বিষয়ক 'হরিকথা' অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় একটি জনসভার নেতৃত্ব করেন ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী এস্ বরদাচারী। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, বিগত শতাব্দী-সমূহে ভারতের সর্ববিধ অবনতির জন্য অনেকে যে ধর্মকে দায়ী করেন ইহা ভুল। মুক্তির বাসনাকে ব্যক্তি-পরতন্ত্র স্বার্থপরতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। মুক্তির সাধককে সাধনার পথে মানবসেবা অবশ্যই করিতে হয়। ধর্মকে যদি আমরা যথাযথ বুঝি তাহা হইলে উহা সামাজিক প্রগতির একটি শক্তিশালী স্তম্ভবিশেষ—স্বামী বিবেকানন্দ ইহা পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সভায় অন্যান্য বক্তা ছিলেন দক্ষিণ ভারত হিন্দীপ্রচার সভার কর্মসচিব শ্রী এম্ সত্যনারায়ণ, এম্-পি, অধ্যাপক এস্ রামস্বামী এবং স্বামী চিদ্ভবানন্দ।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু এই দিন সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে মঠ দর্শন করিতে আসেন। অনুরুদ্ধ হইয়া তিনিও পূর্বোক্ত সান্ধ্য জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ভাষণ দিয়াছিলেন। (এই ভাষণটির বঙ্গানুবাদ উদ্বোধনের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)

ফরিদপুরে অনুষ্ঠান—ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-

মিশন আশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১লা মাঘ, তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী- ও গীতাপাঠ, ভজনকীর্তনাদি এবং অপরাহ্ণে আনুমানিক পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ৯ই মাঘ (২১শে ফেব্রুয়ারী, '৫৫) ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এস্ বি চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনার্থে একটি সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে বহু সরকারী ও বেসরকারী হিন্দু-মুসলমান নর-নারী সমবেত হন। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর মি. এম্ আলী, রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র, অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর জীবনী-অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। আশ্রমের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় এবং পুলিশ সুপার জনাব এম্ এ করিম ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণকে সভায় যোগদান ও অংশ-গ্রহণ করিবার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

রাঁচিতে অনুষ্ঠান—রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (মোরাবাদী এলাকায় অবস্থিত) উদ্যোগে গত ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে এবং হিন্দু ক্লাব হলে শ্রীমা সারদা দেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দিনই প্রধান বক্তা ছিলেন কলিকাতার ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী। প্রথমদিনকার সভার পরিচালনা করেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়; দ্বিতীয় দিন সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দজী।

ছাত্রাবাসে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—যদুলাল মল্লিক রোডস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসে গত ২৮শে ও ২৯শে ফাল্গুন স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে পূজা, হোম ও ভজনাদির পর অপরাহ্ণ ৫টায় একটি ছাত্রসভায় আশ্রমিক কয়েকজন বিদ্যার্থী স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী ওঁকারানন্দজী যুগচিত্তের বহুবিধ দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অভ্যুদয়-সমস্যার সমাধানে স্বামীজীর অভ্রান্ত পথনির্দেশ ও তাহার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভান্তে অন্ধগায়ক শ্রীদিলীপ ঘোষের ভক্তিমূলক ভজন শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করে।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে একটি সাধারণ-সম্মেলনে স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ।

শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জন্মোৎসব

লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়েল হলে আহূত একটি জনসভায় সভাপতি জনাব আলী জাহীর (উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী) বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন একটি বিরাট আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জন্মদাতা। ঐ বিপ্লব মানুষের বিবিধ কর্মধারাকে এবং মানুষে মানুষে তথা জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক সম্পর্ককে নূতনভাবে গঠিত করিয়াছে। ডক্টর বি মুখোপাধ্যায় এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ও সুচিন্তিত ভাষণ দেন। শেষোক্ত বক্তা বলেন, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, কবীর এবং নানক ইঁহাদের সকলের সমন্বিতপ্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি নূতন আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের অগ্রদূত—যাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-হরিজন ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদৃষ্টি একটি অভিনব

আধ্যাত্মিক মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের ইহাই মূলমন্ত্র।

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ডি এন রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শশধর দত্ত তাঁহার ভাষণে বলেন যে, মানুষের দুঃখের মূল কারণ 'আমি'। এই 'আমিত্ব'কে কিভাবে জয় করিতে হয়, সেই শিক্ষা দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে ভগবান লাভ করিতে হইলে চাই তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা ও তাঁহার উপর নির্ভরশীলতা।

শ্রীজয়রাম মিশ্র, কুমারী পৃথী অদাবল, মির্জা হামিদুল্লা বেগ ও বিচারপতি রায় তাঁহাদের ভাষণে পরমহংসদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী আলোচনা করেন।

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ও কুমারী চন্দ্রা কর্তৃক সঙ্গীত গীত হয়।

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ১৮ই ফাল্গুন হইতে ৩রা চৈত্র পর্যন্ত ১৬ দিন ব্যাপী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ ও নিত্যপূজা এবং শাস্ত্রাদি পাঠ করা হয়। ২০শে ফাল্গুন একটি ধর্মসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব সভাপতিত্ব করেন। কুমিল্লার পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় 'বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান' বিষয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন সাহেব 'শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্মসাধনা' সম্বন্ধে, ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যোগস্থানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বার্তাবহ বিবেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ দ্বারা প্রায় চারি সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। পরদিন ২১শে ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় "শ্রীমদ্ভাগবত" পাঠ করেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আশ্রমে তিন দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি ১নং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলেও ছায়াচিত্রযোগে দুইটি সুন্দর ভাষণ দেন। ২২শে ফাল্গুন প্রায় সাত হাজার দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত বসিয়া পরিতোষের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উৎসবের শেষ দিন বেলুড় মঠের সহ-সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ আশ্রমে শুভাগমন করিয়া সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা স্থানীয় ভক্তদিগকে পরিতৃপ্ত করেন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর ঢাকায় ফিরিয়া যান।

মেদিনীপুর শাখাকেন্দ্রে ১২ই ফাল্গুন হইতে ১ সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিথিপূজার পুণ্যদিবসে সকাল হইতে বিশেষপূজা, হোম ও ভোগরাগ হয়; দ্বিপ্রহরে সহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-জীবনী আলোচনা এবং অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্তৃক কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত হয়। দ্বিতীয় দিন সরকারী প্রচার-বিভাগ কর্তৃক সবাক্ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৫ই ফাল্গুন, রবিবারে সাধারণ উৎসব বিশেষ সমারোহে নানাবিধ কর্মসূচীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। ১৮ই ফাল্গুন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমরেশ চক্রবর্তী

মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটীর উদ্যোগে বিগত ১৯শে মার্চ হইতে এক সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় এবং সোসাইটী-পরিচালিত ৪টি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও ২টি মধ্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব-উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আসানসোল শাখা-কেন্দ্রের স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, কলিকাতা জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, জামসেদপুরে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। পারিতোষিক বিতরণী সভায় অন্যূন ৪॥০ হাজার ছাত্রছাত্রী তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে। ২৩শে মার্চ বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পারিতোষিক সভায় ভারতপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ উপস্থিত থাকিয়া সারগর্ভ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য সভায় স্থানীয় নামকরা মহিলাগণ সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের গান, আবৃত্তি ও বিচিত্রানুষ্ঠান দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। গত ২০শে মার্চ সোসাইটীপ্রাঙ্গণে ২ হাজার দরিদ্র নরনারীকে আহার করানো হয় এবং তাঁহাদিগকে পুরাতন বস্ত্র ও জামা বিতরণ করা হয়। ২৩শে ও ২৫শে মার্চ সোসাইটীপ্রাঙ্গণে বাঁকুড়া জিলার সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ-গায়ক শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রামচরিত্র গান বহু সহস্র নরনারীর মনে ভক্তিভাবের সৃষ্টি করিয়া বিমল আনন্দ দান করিয়াছিল।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১২ই ফাল্গুন বিশেষ পূজা, পাঠ, হোমাদির মাধ্যমে তিথিপূজা উদ্‌যাপিত হয়। ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ৫৫) সকালে কীর্তন-গানসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সুসজ্জিত পট চতুর্দোলায় বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। মধ্যাহ্নে ১ হাজার নরনারী বসিয়া মঠে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বিহারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা কর্তৃক পরিচালিত একটি জনসভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ এবং আরও একজন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয়েরও ভাষণ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী সংবাদ

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট জেলা) শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে গত ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে ২৬শে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত পাঁচদিন-ব্যাপী জয়ন্তী-উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজাপাঠ ভজনাদি ব্যতীত ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, মহিলাসভা, সাধারণসভা ও রামায়ণ-গান উৎসবসূচীর অঙ্গীভূত ছিল। সুপরিচিতা দেশকর্মী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাস-মোহন চক্রবর্তী, আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ এবং শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায় বিভিন্ন দিন তাঁহাদের মনোজ্ঞ আলোচনা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ ও তৃপ্তি দান করেন। দুই দিন 'রামায়ণ গানে'র ব্যবস্থা হইয়াছিল। শেষদিন (রবিবার) প্রায় আট হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব

শহরের সর্বস্তরের অধিবাসীর ভিতর একটি অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল।

শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে ২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী, '৫৫) হইতে ৫ দিবস ধরিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা শরদিন্দুপ্রভা রায় চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভার অনুষ্ঠান হয়। ছায়াচিত্রে শ্রীধরণীরঞ্জন পাল শ্রীমার জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীমার সুসজ্জিত প্রতিকৃতি জয়রামবাটীর অনুকরণে নির্মিত পর্ণকুটীরে স্থাপন করিয়া সঙ্কীর্তন ও শোভাযাত্রা সহকারে শহরের বিশিষ্ট রাস্তা সমূহ পরিভ্রমণ করা হয়। অপরাহ্নে চট্টগ্রাম হইতে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রিয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে আশ্রমে একটি সভায় শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন ভাবধারা আলোচিত হয়। সন্ধ্যায় কবির পাঁচালি গান হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন প্রবীণ গায়ক শ্রীনলিনীমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র দাস। তৃতীয় দিন স্বামী সত্যকামানন্দের সভাপতিত্বে 'সর্বধর্ম সম্মেলনে' বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক সামসুদ্দিন মিঞা, ভিক্ষু প্রিয়ানন্দজী ও শ্রীধরণীরঞ্জন পাল। চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান ছিল বিশেষপূজা পাঠ হোম, প্রসাদবিতরণ 'কৃষ্ণলীলা' কীর্তন এবং কবির পাঁচালি। শেষদিন একটি সাধারণ সভায় 'মানবতা', 'শ্রীমা' এবং 'ভগবান্ বুদ্ধে'র জীবনী আলোচিত হয়। স্থানীয় সঙ্গীতদক্ষগণ একটি সঙ্গীতসম্মেলনেরও আয়োজন করিয়াছিলেন।

করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব ২৬শে কার্তিক (১২ই নভেম্বর, '৫৫) হইতে চারদিনব্যাপী নানা আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তৎপূর্বে ২৩শে কার্তিক (৯ই নভেম্বর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর জীবনী-অবলম্বনে প্রস্তুত একটি চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ অগ্রহায়ণ মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রদর্শনীটি দশ দিন উন্মুক্ত থাকিয়া সহস্র সহস্র দর্শক-দর্শিকার শিক্ষা ও আনন্দবর্ধন করিয়াছিল। উৎসবের বিবিধ কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ পূজা পাঠ যজ্ঞাদি ব্যতীত প্রথমদিনকার সমস্ত শহর পরিক্রমারত অর্ধ মাইল দীর্ঘ সুপরিকল্পিত শোভাযাত্রাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়দিনকার 'কুমারী বন্দনা' অনুষ্ঠানটিও সকলের নিকট একটি অদ্ভুত অধ্যাত্মিক ভাবদ্যোতনার সঞ্চার করিয়াছিল। পাঁচ হইতে সাত বৎসর বয়স্কা ১০৮ জন কুমারীকে নয়ন-রঞ্জন সাত্ত্বিক বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বন্দনা ও মিষ্টিমুখ করানো হয়। প্রত্যেক কুমারীকে এক একখানি 'মায়ের উপদেশ' পুস্তিকা উপহার দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন দিনে আয়োজিত ৪টি জনসভায় (১টি মহিলাসভা এবং একটি ছাত্রসভা) ভাষণ দেন বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, প্রবীণ জননায়ক শ্রীধর্মদাস দত্ত, কলিকাতার প্রবীণ সাহিত্যিক এবং বক্তা শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীমতী মিলনশশী মজুমদার, শ্রীমতী প্রভাবতী সাহা, শ্রীমতী মাধুরী মজুমদার এবং শ্রীমতী আরতি আদিত্য। বিভিন্ন সময়ে কীর্তন ও ভজন গাহিয়া যাঁহারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার গুণী পদাবলী-গায়ক শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কল্যাণী সেনগুপ্তা এবং রাধারমণ দাস বাবাজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৯শে কার্তিক মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অন্যূন বারো হাজার নরনারী পরিতোষপূর্বক খিচুড়ি, ডালনা, টক ও পায়স-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামপুর সংস্কৃতিসম্মেলন—শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর 'বনফুল সাহিত্য-সমিতি'র উদ্যোগে গত ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, '৫৫) হইতে ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) এই নয়দিনব্যাপী শ্রীরামপুর সংস্কৃতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিনকার আলোচ্য বিষয় 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিন শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী ও শ্রীবাণী দেবী 'ভারতীয় নারীর আদর্শ ও শ্রীমা সারদা দেবী' সম্বন্ধে মহিলা-সভায় আলোচনা করেন। তৃতীয় দিন (১লা মার্চ) 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীঅরবিন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন ডাঃ মাখনলাল ধর। চতুর্থ দিন 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে ডাঃ কালিদাস নাগ আলোচনা করেন। পঞ্চম দিন কান্তকবির গান পরিবেশন করেন শ্রীদিলীপকুমার রায় ও সম্প্রদায়। ষষ্ঠ দিন শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতুষার সাহা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সপ্তম দিন 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীআশাপূর্ণা দেবী। অষ্টম দিন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 'মহাভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। নবম দিন (৭ই মার্চ) 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীমহাপ্রভু' সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বক্তা ও অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলার বহু বিশিষ্ট নরনারী বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে এই প্রকার সাংস্কৃতিক সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল।

* **পরলোকে শ্রীঅতুলানন্দ রায়**—গত ২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) শনিবার রাত্রি ৮টায় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঅতুলানন্দ রায় তাঁহার বাগুইআটি বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ৯০ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅতুলানন্দ রায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'পাণিপথ', 'পাশুপত', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং রামকৃষ্ণ সাহিত্যে 'গদাধর', 'সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ', 'সবার মা সারদা' জীবনীগ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি তিনি 'শ্রীশ্রীনিগমানন্দ জীবনী' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গমে' গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। অতুলানন্দ বাবুর কয়েকটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অমায়িক ভক্ত সাহিত্যিকের শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। শ্রীভগবান পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন ইহাই প্রার্থনা।

বিবেকানন্দ সমাজসেবা কেন্দ্র—পাথুরিয়া-ঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (১৮ ও ২০, যদু-লাল মল্লিক রোড, কলিকাতা-৬) কর্তৃক কলিকাতার রামবাগান বস্তীতে পরিচালিত বিবেকানন্দ সমাজসেবা কেন্দ্র গত ১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ, ৫৫) হইতে ৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ) পর্যন্ত তাঁহাদের তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ও বিবেকানন্দ-জয়ন্তীর আয়োজন করিয়াছিলেন। উৎসবের এবং 'চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়।

উৎসব-উপলক্ষ্যে অনেকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়, যথা বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, শিশুদের ও বয়স্কদের চিত্র প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, বয়স্কদের বেতের কাজের ও মাটির কাজের প্রতিযোগিতা, মেয়েদের সেলাইয়ের কাজের প্রতিযোগিতা এবং সানাই-প্রতিযোগিতা।

বিবেকানন্দ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২রা চৈত্র পূর্বাহ্নে

পূজা, ভজনসংগীত ও প্রসাদবিতরণ ও অপরাহ্নে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর তাৎপর্য আলোচিত হয়। ৫ই চৈত্র একটি শোভাযাত্রা স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ স্বামীজীর সিমলা স্ট্রীটস্থ জন্মস্থান প্রদক্ষিণ করে।

৩রা চৈত্র পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারত সরকারের অনুন্নত জাতি ও সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার শ্রীএল্ এন্ শ্রীকান্ত। ৪টা চৈত্র অপরাহ্নে অপর একটি জনসভায় কলকাতার জনশিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীপরিমল রায় মহাশয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে আলোচনায় যোগদান করেন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত, এম্. এল্. সি, শ্রীঅমর নন্দী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্র নাথ দাশ, সমাজ-শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর ও আরও অনেকে।

উৎসব-উপলক্ষ্যে বস্তীর বালকদের 'কুশধ্বজ' অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। উৎসবের শেষ দিন নরনারায়ণ সেবায় রামবাগান ও আশেপাশের আরও দু' একটি বস্তীর সর্বশ্রেণীর অন্যূন ২০০০ লোক, বসিয়া পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চাঁদপুরে অনুষ্ঠান—গত ১৬ই পৌষ চাঁদপুর (ত্রিপুরা) রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুইদিনব্যাপী এক শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু ও শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তীর পরিসমাপ্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ প্রায় ৫০০ নরনারীর একটি শোভাযাত্রা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে। পরে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বৈকালে ময়মনসিংহ আশ্রমের স্বামী যোগস্থানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়; বরিশাল আশ্রমের স্বামী শর্মানন্দ ও কুমিল্লার পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পূত জীবনী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কবি কালশশী চক্রবর্তীর পাঁচালি সকলকে আনন্দদান করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগারতি হয়। সকালে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তীর পরিচালনায় একটি ভক্ত-সম্মেলন হয়। উহাতে কুমিল্লা, ধূম (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি স্থানেরও অনেক ভক্ত নরনারী যোগ দিয়াছিলেন। ১১টায় "মাথুর" কীর্তন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী

মথুরাপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে স্থানীয় অধিবাসিগণের উৎসাহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২০তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে গত ১২ই ফাল্গুন ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি যথাশাস্ত্র সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ফাল্গুন দ্বিপ্রহরে নরনারায়ণ সেবা এবং সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগীতি' পাঁচালিগানের অনুষ্ঠান হয়। পরদিবস অপরাহ্নে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী-সম্বন্ধে আলোচনা এবং তদনন্তর কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র-সংযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক বক্তৃতা হয়। অধিক রাত্রে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ফায়ার ওয়ার্কসের আতসবাজী এই অঞ্চলের অন্যূন ৫০০০ লোককে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল।

দরং (তেজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উপলক্ষ্যে পূজাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ঠাকুরের পুণ্যজীবন ও উপদেশাবলীর আলোচনা হয়। সভায় শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়, মহিলা এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসমরেশ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীঅজয় বসু, শ্রীনির্মলেন্দু পুশিলাল, শ্রীপরমেশ ধর এবং শ্রীবিলাস ভট্টাচার্য সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধপাঠে অংশ গ্রহণ করেন।

সিন্দ্রি শহরপুরায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গত ৬ই চৈত্র সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পালন করা হয়। প্রাতঃকালে নগরকীর্তন, পূজা-পাঠ-হোম ইত্যাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্নে প্রায় ছয়শত নরনারায়ণকে পরিতোষ-সহকারে খাওয়ানো হয়। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় প্রায় এক হাজার নরনারী যোগদান করেন। অন্যতম বক্তা ছিলেন শ্রীমতী উষারাণী বসু, এম. এ. সাহিত্য-সরস্বতী, এবং অধ্যাপক হরলাল মাহাতো।

ঢাকুরিয়া (দক্ষিণ কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিগত ২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ) রবিবার সমগ্র দিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে বিশেষ পূজা পাঠ ও দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন সহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে এবং প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারীর উপস্থিতিতে এক বিরাট ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মহারাজ উভয়েরই বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর রাধারমণ কীর্তন সমাজ কর্তৃক "মাথুর" কীর্তন ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

অশোকনগর, হাবড়া (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে গত ১৫ই ফাল্গুন, সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর, এল্ এল্. বি. বিদ্যাবিনোদ, ভাগবত শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এবং স্থানীয় আরও কয়েকজন সুধী সারগর্ভ ভাষণ দেন। বিদ্যামন্দিরের শিশু ছাত্রছাত্রীদের সমবেত স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে বিশদভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিল। ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রায় হাজার লোকের ভিতর খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরিত হয়।

মুথাডাঙ্গা গ্রামে (হুগলী জেলা) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ২২শে ফাল্গুন হইতে পাঁচ দিন পূজার্চনা, ভজন, বক্তৃতা, ভোগ-রাগ, প্রসাদ-বিতরণ ও যাত্রাগান প্রভৃতি সহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হাই স্কুল প্রাঙ্গণের বাহিরে একটি সভা-মণ্ডপে বেলুড় মঠ হইতে সমাগত স্বামী মনীষানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে আবৃত্তি, পারিতোষিক-বিতরণ এবং বক্তৃতা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আরামবাগের ডাক্তার শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায় এবং কালীপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন অন্যতম বক্তা। সভাপতিমহারাজের ভাষণও সকল হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিল।

খড়দহ বসুপাড়ায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ৪ঠা চৈত্র হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত বিপুল উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ প্রাতে ভজন সঙ্গীত ও পূজা হয় এবং আশ্রম বালকগণ কর্তৃক 'ভক্তির ভোর' ও গরাণবেড়িয়া 'মহাশক্তি অপেরা' কর্তৃক "দানবীর" যাত্রাভিনয় হয়। ১৯শে মার্চ বৈকাল ৫ ঘটিকায় এই আশ্রমের অন্তর্গত মনোমোহন বিদ্যাবীথি ও অধ্যাপনা বিভাগের পুরস্কার-বিতরণী সভা শ্রীবৈদ্যনাথ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রম-পরিচালক স্বামী যজ্ঞেশানন্দ বাৎসরিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন ও আশ্রমে প্রতিপালিত দরিদ্র ও নিঃস্ব ছাত্রদের সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত সকলের নিকট আবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিবস প্রভাতে ঠাকুরের পুষ্পমাল্য সজ্জিত একটি প্রতিকৃতি লইয়া প্রভাতফেরী, দ্বিপ্রহরে কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ এবং বৈকাল ৫টায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্বোধন

স্বেচ্ছায় ত্যাগ

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়া
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তা হ্যেতে শমস্নুখমনন্তং বিদধতি॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্মলধিয়ঃ কুর্বন্ত্যহো দুষ্করং
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ।
সংপ্রাপ্তান্ন পুরা ন সংপ্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়ান্
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহানপি পরং ত্যক্তুং ন শক্তা বয়ম্॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ১২, ১৩

পৃথিবীর বহুবিচিত্র বিষয়-পরিভোগ হয়তো দীর্ঘকাল আমাদের নিকট থাকিবে, কিন্তু বরাবর নয়—একদিন তাহারা অবশ্যই বিদায় লইবে। একদিন রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীত-হাস্য-লাস্য থামিয়া যাইবে, সঙ্গবিহীন নৈঃশব্দ্যের মর্মান্তিক পীড়া ভীতচকিতহৃদয়ে শূন্য নাট্যশালায় একা—একান্তই একা অসহায়ভাবে বসিয়া সহ্য করিতে হইবে। এই বিচ্ছেদই অখণ্ডনীয়, দুষ্প্রতিরোধ্য বিধিলিপি। তবে কেন সেই বিচ্ছেদকে পূর্ব হইতেই মানুষ হাসিমুখে স্বেচ্ছায় বরণ করে না? আগে ছাড়িয়া দেওয়া আর পরে ছাড়িয়া দেওয়া—প্রভেদ তো কিছু নাই। চঞ্চল বিষয়নিবহ আমাদের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেরা যখন চলিয়া যায় তখন আমাদের জন্য রাখিয়া যায় বিপুল মনঃপীড়া—কিন্তু আমরা নিজেরা যদি উহাদের ক্রীতদাসরূপে নয়—প্রভুর মতো উহাদিগের আকর্ষণ ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের লাভ হয় চিত্তের অনন্ত প্রশান্তি—দুর্জয়কে জয় করিবার অপরিমিত পরিতৃপ্তি।

জগৎ ও জীবনের বৃহত্তম সত্য—ব্রহ্মের অনুভব দ্বারা চিত্তের দ্বন্দ্বমোহ যাঁহাদের কাটিয়া গিয়াছে, নিঃসংশয় বিবেক যাঁহারা লাভ করিয়াছেন সেই বিশুদ্ধাত্মা সাধুপুরুষগণের অহো কী আশ্চর্য কৃতিত্ব! উপভোগের সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একান্ত নিস্পৃহ তাঁহারা সংসারের যাবতীয় ভোগসম্পদ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আর আমরা? পূর্বেও যাহা পাই নাই, এখনও যাহা সুদূরে, আর ভবিষ্যতেও যাহা পাইব বলিয়া কোন নিশ্চিত ভরসা নাই, মনেমনেই যাহা চাহিয়া আমাদের ভোগের আশা মিটানো—সেই সব অলীক আকাশকুসুমের উপরই আমাদের কী আসক্তি! সেই সব কল্পিত ভোগ্য বস্তুই আমরা ছাড়িতে পারি না। (আর বাস্তবিক যদি উহাদিগকে কাছে পাইতাম তাহা হইলে আমাদের দশা যে কী হইত, তাহার ঠিকঠিকানা নাই।)

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম ও কুসংস্কার

ধর্ম কি তাহা মোটামুটি সর্বজনীনভাবে যদি বুঝাইয়া বলিতে হয় তাহা হইলে বোধ করি বলা উচিত—যাহা মানুষের চরিত্রকে, জীবনকে, সমাজকে বিচ্ছিন্নতা হইতে, দুর্বলতা হইতে ধরিয়া রাখে তাহাই ধর্ম; অথবা—বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ামক কল্যাণকর ভাগবত শক্তিতে বিশ্বাস ও ঐ শক্তির নিকট আত্মসমর্পণের নাম ধর্ম; কিংবা—জগৎ ও জীবনকে সূক্ষ্মভাবে যে চেতনশক্তি বা শক্তিসমূহ পরিচালিত করিতেছে ঐ শক্তি বা শক্তিসমূহের সহিত নিজের মঙ্গলের জন্য সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাই ধর্ম, ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি বিষয় সুপরিস্ফুট। (১ম) জগৎসংসারের পিছনে একটি সর্ববিধারক চেতন শক্তি আছেন; (২য়) মানুষ ঐ শক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে; (৩য়) এই সংযোগের দ্বারা তাহার ব্যষ্টিগত ও সমাজগত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ধর্ম একাধারে বিশ্বাস ও ক্রিয়া দুইই।

বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু ধর্মের যে পরিচয় আমরা পাই উহা এত সহজ ও সরল নয়। ধর্মের রীতি-নীতির মধ্যে অনেক সময় আমরা এত শাখাপ্রশাখা, পরিবিস্তার ঢুকিয়া পড়িতে দেখি যে তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া ধর্মের পূর্বোক্ত স্বরূপটি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তখন আমাদের মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নাই, মানবের যথার্থ কল্যাণকর বীর্যপ্রদ কোন শক্তি উহার মধ্যে নাই। এমনকি অনেক সময়ে আমরা ধর্মের নামে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াও বসি—এগুলি 'কুসংস্কার'।

'কুসংস্কারে'র কিন্তু সর্বজনবোধগম্য কোন সংজ্ঞা নাই। একজনের নিকট যাহা কুসংস্কার অপরের কাছে তাহা একটি সুসঙ্গত নীতি। কতকগুলি নির্দিষ্ট কৃত্য বা চারিত্রিক ধারা এক দেশে বা এক জাতির দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণকর বলিয়া অত্যন্ত সমাদরণীয় —অন্য দেশের বা জাতির লোক কিন্তু সেগুলিকে 'কুসংস্কার' ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারে না।

সংজ্ঞা দিতে গিয়া যাহাকে আমরা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে পারি বাস্তব জীবনে খুঁজিতে গিয়া তাহাকে এত আগাছায় আবৃত দেখি কেন? ইহার কারণ এই যে, ধর্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু। উহাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে ধরিতে ছুঁইতে পারি না; অনেক সময়েই অপরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে ধর্মের সম্বন্ধে ধারণা আনিতে হয়, ধর্মাচরণ করিতে হয়। এই জন্যই ধর্মের বাস্তব পরিচয়ে নানা দুর্বোধ্যতা, জটিলতা, অযৌক্তিকতা, বিবেকবিরুদ্ধতা আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়—অর্থাৎ কুসংস্কারের বীজ ধর্মের অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, আলোক মানুষের জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয়—উহাদের জন্য আমাদিগের যে আকাঙ্ক্ষা, উহাদিগকে আমাদিগের যে নানাভাবে প্রয়োগ—এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের বিশেষ কোন অবসর নাই। উহাদের উপকারিতা অপকারিতা আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করি। উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কোন 'কুসংস্কার', গড়িয়া উঠিতে পারে না। যদি কেহ গড়িয়া তুলিতে চায় আমরা দু চার দিনেই উহার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিতে পারি, কেননা আকাশ-বাতাস-জল-মাটি-আলোক আমাদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার এলাকার মধ্যে। বিজ্ঞানের খরসন্ধানী দৃষ্টি এড়াইয়া মানুষকে ধোঁকা দিয়া বোকা বানাইয়া যাইবে এমন ঘটনা আজকাল কয়দিন ঘটিতে পারে? কিন্তু ধর্মকে লইয়া যে 'কুসংস্কার' তাহার পরমায়ু অতি দীর্ঘ। উহাকে আমরা সহজে ধূলিসাৎ করিতে

পারি না। গালি খাইয়াও উহা হটে না, প্রখর যুক্তির আঘাতেও উহা ধসিয়া পড়ে না, বিজ্ঞানের উজ্জ্বল কিরণের সম্মুখেও উহা সকল চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া জমাট-বাঁধা অন্ধকার-রূপেই উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকে।

আবার বলি, ইহার জন্য দায়ী ধর্মই—ধর্মের অতীন্দ্রিয়তা। যাহা সহজে দেখিতে পাই না, তাহাকে দেখিবার যে কোন চশমা বিক্রয়ের জন্য হাজির হইলে আমরা উহা সাগ্রহে কিনিতে যাই। যে রাজা দিনের পর দিন সপ্তপ্রাচীর-বেষ্টিত রাজ-প্রাসাদের সুগোপন অভ্যন্তরেই বাস করিয়া চলেন তাঁহার সম্বন্ধে প্রজাপুঞ্জের কাছে যেমন অসংখ্য কথা-উপকথাই জমিয়া উঠে—ইহাও কতকটা সেইরূপ।

তাহা হইলে কঃ পন্থাঃ? অতীন্দ্রিয়তা-বিমুক্ত ধর্ম যখন সম্ভবপর নয়, আর অতীন্দ্রিয়তা থাকিলেই 'কুসংস্কার' জমা হইবার সম্ভাবনা যখন দুনিবার, তখন ধর্ম রাখিয়া কুসংস্কারকে সহ্য করিব, না কুসংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ধর্মেরই সহিত সকল সংস্পর্শ ত্যাগ করিব? ধর্ম বনাম কুসংস্কার—কঠিন প্রতিযোগিতা!

আমরা বলি, ধর্মকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, 'কুসংস্কারে'র চাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার এত উদগ্র উৎসাহও না দেখাইলে চলিবে। বরং সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মের মর্ম ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আর 'কুসংস্কার' সম্বন্ধে যে কুসংস্কার তাহাই বর্জন করা। যুগ যুগ ধরিয়া ধর্মকে জড়াইয়া অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে, ধর্মের নামে অনেক মিথ্যা, অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধর্ম তো মানুষকে নানা কল্যাণকর ভাবে 'ধরিয়া'ও রাখিয়াছে, ধর্মের দ্বারা মানুষের হিতও তো কম হয় নাই। ধর্মকে মানিয়া মানুষ তাহার উৎকট মদ, মোহ, দম্ভ, লোভ, কাম সংযত করিয়াছে, নিঃস্বার্থ হইতে শিখিয়াছে, সন্তোষ, সেবা, মৈত্রী সাধিয়াছে, বোধবান্ হইয়াছে, জীবনে ও সমাজে শান্তি ও সামঞ্জস্য আনিয়াছে। ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞায় ধর্মের যে আসল স্বরূপ ব্যঞ্জিত তাহা যদি মানুষ ভুলিয়া না যায়, তাহা হইলে ধর্ম সত্যই মানুষের একটি প্রচণ্ড কল্যাণশক্তি। প্রকৃতই ইহা মানুষকে 'ধরিয়া' রাখে।

ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে সাধারণ মানুষ ধরিতে ছুঁইতে পারে না। ধর্ম যদি শুধু পুঁথির তত্ত্ব হইত তাহা হইলে উহাকে ধরা-ছোঁয়ার কথা উঠিত না—উহার বিষয়ে আলাপ আলোচনা বিচার কল্পনা করিয়া আমরা তৃপ্ত থাকিতাম। পথ আমাদের পরিষ্কার থাকিত। কিন্তু ধর্ম যে শুধু বিশ্বাস নয়—কেবল শব্দ-মুখস্থ-করা মগজের সিদ্ধান্ত নয়, উহা যে অভ্যাস, আচরণ, অনুভূতি। ধর্মের প্রেরণা হৃদয়ে জাগিলে মানুষ শুধু শুনিয়া, কল্পনা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—সে কিছু দেখিতে চায়, ধরিতে চায়, করিতে চায়। তাই আসে মন্ত্র-তন্ত্র পূজা-পার্বণ জপ-তপ ব্রত-উপবাস স্নান-তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি—ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে স্থূল মন বুদ্ধি দিয়া ধরিবার বুঝিবার নানা স্থূল চেষ্টা—বিচিত্র মানব-প্রকৃতির জন্য যুগ যুগ ধরিয়া উদ্ভাবিত বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই মধ্যে হয় তো কোন যুক্তি, বিবেকসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—হয় তো উহাদের প্রথম প্রচলনের কালে ধর্মের মূল তত্ত্বের সহিত উহারা যতটা জড়িত ছিল বহু শতাব্দীর অশিক্ষা, অনবধানতার ফলে সেই সংযোগ এখন সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া গিয়াছে, এখন সত্যই উহারা 'কুসংস্কার'। তথাপি এই 'কুসংস্কার'গুলির প্রতি আমাদের সহিষ্ণুতা থাকা উচিত। আজ তাহাদের মধ্যে যাহা 'কু', তাহা একদিন হয়তো 'সু' ছিল। তাই আজ যদি উহাদিগকে বর্জন করিতেই হয় আমরা যেন গালাগালি দিয়া উহাদিগকে বিদায় না করি। একদিন উহারা অতীন্দ্রিয় ধর্মবস্তুকে বুঝিবার সহায়তা যত অক্ষমভাবেই হউক করিয়াছে

তো। এইটুকু স্বীকার করিয়া প্রেমের সহিত যেন এই অতীত মিত্রগণকে ত্যাগ করি।

মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের অবস্থানুসারে অনেক 'কুসংস্কারের' আবার প্রয়োজনই রহিয়াছে—অপরিহার্য প্রয়োজন। রামবাবু-শ্যামবাবুদের পক্ষে হয়তো উহাদের প্রয়োজন নাই (কেননা, হয় তাঁহারা ধর্ম জিনিসটাকে শুধু কিতাব-গত একটি বুদ্ধি-বিলাস বলিয়াই মনে করেন, ধর্ম-সম্বন্ধে 'আচরণীয়' তাঁহাদের কিছুই নাই—কিংবা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সংস্কার এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে স্থূল অবলম্বন ব্যতীতই তাঁহারা ধর্মকে বুঝিতে পারেন) কিন্তু, যদু-মধু-কালিন্দী-নিস্তারিণীদের নিকট উহারা যে অন্ধের যষ্টি। যতদিন না চোখ খুলিতেছে ততদিন ঐ যষ্টি তাহারা ফেলিয়া দিবে কোন্ ভরসায়?

'কুসংস্কারের' প্রতি বিদ্রোহের দ্বারা আমরা যতটা না উন্নতি লাভ করিব তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার হইতে পারে ধর্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পোষণ করিয়া। ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য কি, উহার স্বরূপ কি, ধর্মকে বাস্তব জীবনে পরিণত করিলে কি পরিবর্তন আসে, ধর্মের সার্থকতা কি—এই সকল বিষয়ে যদি আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকে তাহা হইলে 'কুসংস্কার' আমাদিগের বড় বেশী ক্ষতি করতে পারে না। নিজের জন্য যে 'কুসংস্কার'-এর প্রয়োজন নাই, অপরের জন্য উহাদের যে প্রয়োজন থাকিতে পারে এই সহজ বুদ্ধি তখন আমরা হারাইনা এবং হারাইনা বলিয়া 'কুসংস্কার'কে গালিগালাজ দিতে আমাদের বিবেকে বাধে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার 'মাষ্টার মহাশয়' বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিন যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে বিশ্বাস। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগী মাষ্টার বলিলেন,—"নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তা বেশ, একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। তবে এ বুদ্ধি কোরোনা এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা।" 'কুসংস্কারের' সংস্কার-কামী মাষ্টার তাহার পরে বলিয়াছিলেন,—"আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের 'কুসংস্কার'-বিষয়ক কুসংস্কারকে আঘাত করিয়াছিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্রসূর্য মানুষ জীবজন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।"

তিনিই শ্রেষ্ঠ সংস্কারক যিনি ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে বেশী মনোযোগ দেন। ধর্মসম্বন্ধে জনগণের যে সকল 'কুসংস্কার' আমাদিগের চিত্তকে পীড়িত করে উহা দূর করিবার জন্য তাই আমাদের উচিত ধর্মের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনগণকে শিক্ষিত করা। তাহা হইলে তাহারা কোনটি শাঁস, কোনটি খোলা তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে। 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলিয়া দিনের পর দিন চিৎকার করিলেই অন্ধকার দূর হয় না, কষ্ট করিয়া আলো জ্বালিলে মুহূর্তে সকল আঁধার কাটিয়া যায়।

এই আলোচনার প্রারম্ভে ধর্মের আমরা যে সংজ্ঞা দিয়াছি উহার মর্ম যদি আমাদের পুরোভাগে

থাকে তাহা হইলে আমরা 'কুসংস্কারের'ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কুসংস্কারের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। এক গোষ্ঠীর লোক যাহাকে 'কুসংস্কার' বলিয়া গালি দেয় অপর এক গোষ্ঠীর নরনারী হয়তো তাহারই মধ্যে বহু শক্তি, বহু অগ্রগতির প্রেরণা, বহু আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করে। তাই 'কুসংস্কার'-বিষয়ে কোন ভালমন্দ রায় দিতে হয় খুব সাবধানে।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা ধর্ম-সম্পৃক্ত 'কুসংস্কার' সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ; পারিবারিক বা সামাজিক কিংবা লোক-ব্যবহারের অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের কুসংস্কারের রক্ষণ বা বর্জন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

অবিশ্বাসীদের জন্য দুশ্চিন্তা

রেভারেণ্ড বিলি গ্রাহাম (Rev. Billy Graham) নিউজ্-উইক্ পত্রিকায় রাশিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্য একটি সাতদফা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন।

(১ম) আমরা (অর্থাৎ রাশিয়ার বাহিরে খ্রীষ্টান-সমাজ) রাশিয়ার জনসাধারণকে জানাইয়া দিব যে, যদিও আমরা কম্যুনিষ্টদের রাজনৈতিক মতবাদ সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি তবুও মানুষ বলিয়া তাঁহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করি এবং আমরা যে মুক্তি, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্বাস উপভোগ করিতেছি তাঁহারাও আসিয়া উহা অনুভব করুন ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।

(২য়) 'মুক্ত' পৃথিবী (অর্থাৎ রাশিয়ার বাহিরের খ্রীষ্টান-জগৎ) রাশিয়ার জনগণের জন্য প্রার্থনা করিবেন (অর্থাৎ যাহাতে তাহাদের মতিগতি গির্জার দিকে ফিরিয়া আসে)।

(৩য়) 'লৌহযবনিকা'র চারিপাশে ধর্ম-সাহিত্য বিতরণ। লৌহযবনিকার অভ্যন্তরে ধর্মসাহিত্য যাওয়া নিষেধ বলিয়া বাইবেলের জন্য তথায় একটি ক্ষুধার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক বাইবেল সোসাইটি উপরোক্ত কাজে নামিতে প্রস্তুত রহিয়াছে, তবে এজন্য অর্থের প্রয়োজন।

(৪র্থ) সরল বোধগম্য ভাষায় বাইবেলের বাণী যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এজন্য কতকগুলি ধারাবাহিক 'ধর্মীয়' প্রোগ্রাম বেতারযোগে প্রচার।

(৫ম) রাশিয়ার সীমান্তে অবস্থিত দেশসমূহের খ্রীষ্টানগণ মাঝে মাঝে লৌহযবনিকার নিকটে বিরাট আকারে ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করিবেন। সীমান্তে কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু আইনসম্মত লোকচলাচল আছে, কাজেই উক্ত সম্মেলনের উদ্দীপনা লৌহযবনিকার ভিতরের জনগণকে বেশ প্রভাবিত করিবে।

(৬ষ্ঠ) রাশিয়া হইতে যে সকল খ্রীষ্টান উদ্বাস্তু চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা রাশিয়ায় ফিরিয়া বাইবেল প্রচার করিবার শিক্ষা দিতে পারি। রুশভাষাভাষী কোন কোন খ্রীষ্টান, কম্যুনিষ্ট দেশ-সমূহে গিয়া গোপনে এই ধরণের কাজ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

(৭ম) অবিশ্বাসী দুনিয়ার কাছে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টধর্ম মাত্র একটি ধর্মীয় মতবাদ (theolgy) নয়। কম্যুনিষ্টদের আমরা দেখাইয়া দিব যে, খ্রীষ্টধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত—ইহা আমাদের সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে পারে। শুধু ফাঁকা বুলি দিয়া নয়, আদর্শ জীবন দেখাইয়া আমরা কম্যুনিষ্টদের বুঝাইয়া দিব যে, খ্রীষ্টধর্ম কম্যুনিজ্‌ম্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

'অবিশ্বাসী'দের জন্য দুশ্চিন্তা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণের একটি বহু পুরাতন অভ্যাস অথবা ব্যাধি (?)। তাঁহাদের এই 'দুশ্চিন্তা' এবং তৎপ্রসূত প্রচারক্রিয়ার জন্য অ-খ্রীষ্টান বিশ্বের শান্তি বহুদিন ধরিয়া কত ভাবে ব্যাহত হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য আছে। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের হৃদয় অবিশ্বাসীদের জন্য

যতনা কাঁদিত পাদ্রীসাহেবদের বুকের আর্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। ইহার একটি স্বাভাবিক কারণ এই যে, ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কোন পার্থিব স্বার্থ ছিল না কিন্তু তাঁহার পতাকা যাঁহারা ধরিবার দাবি করেন তাঁহাদের অনেক রকম ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থের কথা ভাবিতে হয়। ধর্মের প্রেরণার সহিত জড়াইয়া থাকে রাজনীতি, পুঁজির অধিকার-রক্ষা, আরও অনেক কিছু। তাই তো পাদ্রী-সাহেবদের দুশ্চিন্তা এত প্রখর।

যাহা হউক উপরোক্ত পরিকল্পনার সাতটি প্রস্তাবের মধ্যেই একটি জিনিস যেন খুব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—পাদ্রীসাহেবদের সেই প্রাচীন অন্ধ দম্ভ—'খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র বিশ্বপরিত্রাণকারী ধর্ম', খ্রীষ্টধর্মেই বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।' ধর্মজিনিসটি জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো উচিত নয়—চাপাইলে তাহার ফল ভাল হয় না। লৌহযবনিকার অভ্যন্তরে মানুষ যদি আজ গির্জার উপর বিরূপই হইয়া থাকে তাহার জন্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্মের গির্জা-কেন্দ্রিকতাই (Churchianity) অনেকাংশে দায়ী।

আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম মানব-প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক চাহিদা—তাহার দৈহিক জীবনের বায়ু-জল-খাদ্যের চাহিদার মতো, তাহার মানস-জীবনের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির আকাঙ্ক্ষার মতো, তাহার আবেগ-জীবনের ভালবাসা, সৌন্দর্যপিপাসা প্রভৃতির মতো। ধর্ম মানুষের আত্মিক প্রকৃতির চাহিদা। একদিন না একদিন মানুষকে উহা স্বীকার করিতে, গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষ যেমন তাহার দেহকে, প্রাণকে, মন-বুদ্ধি-হৃদয়াবেগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, তেমনই তাহার সত্তার অন্তরতম দিক্—আত্মাকেও চিরদিন ঘুম পাড়াইয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে মানুষ বলিয়াই। আত্মার ঘুম একদিন ভাঙ্গিবেই। ইহারই নাম তাহার ধর্ম-বোধ। লক্ষ লক্ষ নরনারী কর্তৃক অধ্যুষিত একটি বিরাট ভূখণ্ডে মানুষের ধর্মবোধ একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এমন অঘটন ভগবানের পৃথিবীতে হইয়াছে বা হইবে বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি না। অতএব রেভারেণ্ড গ্রাহামদের ন্যায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণকে আমরা বলি, বন্ধুগণ অপেক্ষা করুন। কোন লৌহযবনিকাই মানবাত্মাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। ওখানে নাস্তিকতার দৃষ্টি সাময়িক অবস্থা মাত্র। আজ বা কাল বা পরশু আপনারা তথায় নূতন ধর্মজাগরণ দেখিবেন—ধর্মেরই জাগরণ—কিন্তু হয় তো গির্জা-কেন্দ্রিক ধর্মের নয়, মানুষের বৃহত্তম সত্যকে আশ্রয় করিয়া যে সার্বভৌম ধর্ম—সেই ধর্মের।

আইনস্টাইন

গত ১৮ই এপ্রিল আমেরিকার প্রিন্সটন হাসপাতালে (নিউ জার্সি) বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডক্টর এলবার্ট আইনস্টাইন পীড়িত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে মাত্র একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অন্তর্ধান হইল না, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও জ্ঞানতাপসেরও অভাব ঘটিল। ডক্টর আইনস্টাইন ছিলেন বিজ্ঞান-সাধনার মূর্ত প্রতীক। আঁধারের জগতে আলোর শিখার মতো তিনি আসিয়াছিলেন, চলিয়া গেলেন মানুষের চিন্তার জগতে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া। বিজ্ঞান তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র থাকিলেও মানব-প্রেম ও সৌহার্দ্য ছিল তাঁহার ঐকান্তিক কামনা। যুগের সীমার ঊর্ধ্বে যে সকল মহামনীষী চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের সহিত ডক্টর আইনস্টাইনের নাম সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

বহুবৎসর পূর্বে যখন তিনি আপেক্ষিকবাদ প্রথম প্রচার করেন তখন অনেক বৈজ্ঞানিকও তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার গভীরতা পরিমাপ ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্তী কালে কিন্তু

তাঁহার উদ্ভাবিত সত্য বৈজ্ঞানিক জগতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির মূল নিয়মগুলি সমস্তই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে, শুধু সেগুলির অনুশীলনই বাকি আছে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে তাঁহার অভিনব আবিষ্কার গতানুগতিক চিন্তার ভিত্তিকে আলোড়িত করিয়াছে। বর্তমান যুগে আণবিক শক্তি যে মানুষের করতলগত, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আইনস্টাইনের মনীষা-উদ্ভাবিত আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity)। শান্তিবাদী আইনস্টাইন আণবিক শক্তির ধ্বংসমূলক ব্যবহার সমর্থন করেন নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন পরমাণুনিহিত প্রচণ্ডতম শক্তি যেন মানবকল্যাণে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করিতে নিয়োজিত হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবন কঠোর সংগ্রাম-মুখর ছিল। ইহুদী পরিবারে জন্ম বলিয়া এত বড় বৈজ্ঞানিককেও নাৎসী জার্মানী হইতে নির্বাসিত হইতে হয়, কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অবিচার-উৎপীড়নে তাঁহার জ্ঞান-সাধনা ও মানবপ্রীতি কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া এক বাণী প্রেরণ করেন ও যথেচ্ছভাবে আণবিক শক্তি ব্যবহারের পরিণতি-সম্পর্কে জগদ্বাসীকে সতর্ক করিয়া দেন।

আমরা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে এই বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করি, করুণাময় জগদীশ্বর আইনস্টাইনের উত্তরসাধকগণকে অমিত শক্তি ও শুভবুদ্ধি দিন—যেন তাঁহারা বিজ্ঞানসাধনা জনকল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারেন।

‘নিরক্ষর’ শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বাস্তবিক নিরক্ষর ছিলেন? জনৈক পত্রলেখক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া আলোচনার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কোন সময় ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বসকল অতি সরলভাষায় আলোচনায় রত থাকার কালে জনৈক ভক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “মশাই আপনি ত লেখাপড়ার ধার দিয়ে কথনও গেলেন না, তা এত সব জানলেন কি ক'রে?”

এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তবৎসল ঠাকুর বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া সস্নেহে উত্তর দিয়াছিলেন, “ঢের যে সব শুনেছি গো। সব কিছু শুনে সে সব মালা গেঁথে গলায় পরেছি এবং পরে ‘মা এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দে’ বলে মা'র শ্রীচরণে সেই মালা স'পে দিয়েছি।” সম্পূর্ণরূপে অহংশূন্য ঠাকুর কখনও কখনও দেখাইতেন যেন তিনি বালকদের কাছে পরাজিত হইয়াছেন এবং পরে বলিতেন ‘মা দেখিয়ে দিলে এই সব’, যেন নিজে কিছুই জানেন না! তাঁহার যে বিদ্যা-বুদ্ধি অপর পণ্ডিতদের অপেক্ষা কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু শক্তিশালী মল্ল যেমন ছাত্রদের কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য অনেক সময় নিজে পরাজিত হয় সেইরূপভাবেই ঠাকুর প্রথমটা কখনও কখনও কোন প্রশ্নের সম্মুখে যেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছেন এইরূপ দেখাইতেন।

সুতরাং জানিতে চাই যে, জনৈক বক্তা যে গত ১০ই এপ্রিল তারিখে শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য সমিতিতে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ‘নিরক্ষর’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি কিভাবে বলিয়াছিলেন।

পত্রলেখক মহাশয়ের সহিত আমরা একমত যে সুতীক্ষ্ণ মেধা, গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসমূহের ভূয়ঃশ্রবণ ও আলোচনার দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যথার্থ ইএকজন শ্রেষ্ঠ ‘পণ্ডিত’ ছিলেন—নিরক্ষর বলিতে যাহা বুঝায় আদৌ তাহা নয়। আবার তিনি যে লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না তাহাও ঠিক নহে। তাঁহার স্বহস্তলিখিত নকল করা পুঁথি বেলুড় মঠে সুরক্ষিত আছে। তাঁহার ‘শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়’ স্বাক্ষরের প্রতিচ্ছবিও শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমাদের মনে হয় পত্রলেখকের উল্লিখিত বক্তাও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের এবং অক্ষরপরিচয়ের কথা জানিতেন। তথাপি তিনি যদি তাঁহার সম্বন্ধে ‘নিরক্ষর’ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিক ছিল না ইহা ভাবিয়াই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও রহস্যচ্ছলে বলিতেন তিনি ‘মূর্খোত্তম’। যাহা হউক পত্রলেখক প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়া ভালই করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ‘নিরক্ষরত্বে’র যথার্থ তাৎপর্য কি সেদিকে হুঁশ রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারকগণ কথা বলিবেন।

শ্রীগুরুবন্দনা

নরেন্দ্র দেব

ব্রহ্মানন্দে স্থিতি যাঁর
পরম সুখের সার,
কেবল জ্ঞানের মূর্তি যিনি,
দ্বন্দ্বের অতীত ধন,
ত্রিগুণরহিত মন ;
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

নিত্য যাঁর একা গতি,
বিমল, অমল জ্যোতি ;
সর্বদা সবার সাক্ষী যিনি.
জ্ঞানের অঞ্জন দানে
সর্ব অজ্ঞানতা হানে,
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

অখণ্ড মণ্ডলাকার
ব্যাপ্তি চরাচরে যাঁর,
দেখান শ্রীপাদ তাঁর যিনি,
চিত্তের বিক্ষেপ শত
ধ্যানে যাঁর সুসংযত,
নমি' তাঁরে গুরু মোর তিনি !

বিপথে নির্দেশি পথ
চালান এ মনোরথ,
ষড়-রিপু-চক্র ভেদি যিনি,
আত্মনিবেদন-যাগ
শেখান যে মহাভাগ,
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

যাঁর দেবোপম স্নেহে
স্বর্গ মানি এই গেহে,
অপার আনন্দময় যিনি,
শোকে, তাপে, চিন্তাভারে,
শান্তি দেন এ সংসারে ;
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

বিদূরিয়া তর-তম
গর্বিতেরে তৃণসম,
সুবিনীত করেছেন যিনি,
অভিমান, অহংকার
ঘুচিয়াছে প্রেমে যাঁর ;
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

সকল বিভেদ-জ্ঞান
গুণে যাঁর অবসান,
সত্যের সন্ধান দেন যিনি ;
জাগায়ে বিবেক-বুদ্ধি
করিলেন চিত্তশুদ্ধি,
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

যাঁহার কৃপায় আমি
পরমার্থ অনুগামী,
শিখালেন ত্যাগমন্ত্র যিনি ;
বিষ-তিক্ত এ বসুধা
স্পর্শে যাঁর হল সুধা,
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

পাপে যেবা অভিভূত,
তাহারে করেন পূত,
আপনার মহাপুণ্যে যিনি ;
অনুতাপ অশ্রুলোরে
ধুয়ে নেন যিনি মোরে,
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

পাপ, পুণ্য, ধর্মাধর্ম
আমার যা-কিছু কর্ম,
নিজ হাতে নিয়েছেন যিনি ;
দয়া যাঁর সীমাহীন,
লভি' ধন্য এই দীন—
নমি' তাঁরে, গুরু মোর তিনি !

অনুভূতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

গত বৎসর পূজার সময় কাশীতে ছিলাম। বৈকালে অনেকে আসতেন। ধর্মালোচনা হত। একটি ভক্তিমতী মহিলা ভগবানে নির্ভরতা সম্বন্ধে কথা তুললেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলুম,—"তুমি ভগবানকে তোমার ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাস ?"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তর এল,—"নিশ্চয়।"

৩০।৪০ জন মহিলা ছিলেন সে ঘরে। তাঁর উত্তর শুনে আমি বললুম, "কেউ 'নিশ্চয়'—এর অর্থ বুঝতে পারল না।" তিনি বললেন, "ভগবানকে বেশী ভালবাসব না? তিনিই দিয়েছেন—তিনিই নেবেন। ছেলেমেয়েরা তো তাঁরই দেওয়া। তিনি যে কত আপনার। তাঁকে সর্বস্ব জ্ঞান করব না? তাঁর দান যখন ইচ্ছা তিনি কেড়ে নেবেন।"

তাঁর কথা শুনে ও সরলতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভগবানের দেওয়া জিনিস বলে ভগবানকে আমরা আপনার মনে করতে পারি না। সবাই ছেলেমেয়ে সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকে ও বলে,—"ভগবানের দেওয়া জিনিস,—কর্তব্য আছে" ইত্যাদি। কিন্তু এর মূলে রয়েছে আসক্তি। এই আসক্তি ত্যাগ করে তাঁর দেওয়া জিনিস গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে আপনার বলে মনে করতে হবে—সর্বস্ব জ্ঞান করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, খুঁটী ধরে ঘোর। খুঁটী অর্থে ভগবান। তাঁকে সর্বস্ব জ্ঞান করে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হলে আসক্তি আসে না। ঠাকুরের আর একটি মূল্যবান্ উপদেশ—"তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গো।" কাঁঠাল ভাঙ্গা মানে আপন কর্তব্য করা—সংসারের কর্ম করা। আর আঠা হল আসক্তি—আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার সংসার ইত্যাদি বোধ। মেয়েটি যখন বললেন, "ভগবানের দেওয়া জিনিস। তিনিই দিয়েছেন—তিনিই নেবেন। তাঁকে সর্বস্ব জ্ঞান করব না?"—এই ভাবেই বলেছেন। সংসার তাঁরই দেওয়া। সংসার করতে হবে কর্তব্য বলে। তবে ঈশ্বরকে সর্বস্ব জ্ঞান করতে হবে তাহ'লে আসক্তি আসবে না। ঠাকুরের উপদেশ, "হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙ্গো"—এখানে তেল হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনুরাগ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি বলছেন,—তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ, অন্তরতরং যদয়মাত্মা। * * * আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। "এই অন্তরতর আত্মা পুত্রের অপেক্ষাও প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষাও প্রিয়, অন্য সব কিছুর চেয়ে প্রিয়। এঁকেই ভালবাসার বস্তু বলে উপাসনা করবে।" আমাদের দুটি জিনিস বিশেষ প্রিয়—সন্তানাদি ও বিভব। কিন্তু আত্মা তাদের চেয়েও অনেক বেশী প্রিয়। যীশুখ্রীষ্ট বলছেন, "He who loveth his parents more than me is not worthy of me." (যে তার পিতা-মাতাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার যোগ্য ভক্ত নয়) তা বলে কি পিতামাতাকে অভক্তি করবে? না। এর অর্থ,—"আমি পিতার পিতা, মাতার মাতা। আমায় না ভালবেসে পিতামাতাকে ভালবাসা আসক্তি।" তাই আমাদের শাস্ত্রে বলছেন, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য-দেবো ভব, "মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি কর, পিতা তোমার দেবতা হোন, আচার্যের উপর দেব-বুদ্ধি করবে, অতিথিকে দেবতার সম্মান দেবে।"

* কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭।৪।৬৪ তারিখে বক্তার ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত।

সকলের মধ্যে ঈশ্বর আছেন তাইতো তাঁরা আমাদের প্রিয়।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে যাবেন তখন তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকে ডেকে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে করে কী হবে? এতে কি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন,—"না।" মৈত্রেয়ী বললেন, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। "যা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ লাভ করতে পারবো না তা দিয়ে আমি কি করবো?" তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করলেন।

বললেন, ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ, কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। "পতিকে পত্নী পতির জন্যই ভালবাসেন না, পত্নী পতিকে ভালবাসেন পতির মধ্যে বিরাজমান পরমাত্মার জন্যে। পত্নী যে পতির প্রিয়া, তা পত্নীর জন্য নয়, আত্মার জন্যে।" মাতা পুত্রকে ভালবাসেন, পুত্র মাতাকে ভালবাসেন, এরও মূলে রয়েছেন তিনি। এই আমাদের Culture (সংস্কৃতি)। তাঁকে নিয়েই সব করতে হবে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছেন,—যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি। "যাঁর শক্তিতে প্রাণিবর্গ বেঁচে থাকে আবার মৃত্যুতে যাঁতে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই জানতে উন্মুখ হও।" সেই ব্রহ্ম, সেই ভগবান, সেই সব। সমস্ত জগৎই তাতে অধিশ্রিত হয়ে রয়েছে। অথচ চোখে ঠুলি বলে তাঁকে দেখা যায় না। মোহ, মায়া, অজ্ঞান এই চোখের ঠুলি। আসল জিনিসকে আমরা জানতে পারি না। কিভাবে আসল জিনিসের প্রতি টান আসবে তাই শেখাতে অবতার পুরুষরা আসেন।

ঠাকুর শিখিয়ে গেলেন অনুভূতি। তিনি স্বয়ং অনুভব করেছেন। উপনিষদের প্রতিপাদ্য তাঁর অনুভূতি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। অনুভূতি বিনা কিছু হয় না। শাস্ত্র বলছেন,

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো যথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ॥

শাস্ত্র শুধু পাঠ করে যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই। অনুভূতি না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে না। অনুভূতি ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা জলে প্রতিবিম্বিত গাছের ডালে যে ছায়া-ফল তার স্বাদ গ্রহণ করার মতই হাস্যকর। কিন্তু পুঁথি-পাঠ করা পণ্ডিতরা এই ভাবেরই অনুভূতি করেন আর শাস্ত্রের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামান। অনুভূতি জিনিসটা ঠাকুর তাই দেখিয়ে দিলেন। তাঁর জীবন যেন beacon light (আলোকস্তম্ভ)। আমরা ভাবি যীশুখ্রীষ্টই বা অবতার পুরুষরাই শুধু অনুভূতি করেছেন—আমাদের অনুভূতি সম্ভব নয়। কিন্তু তা নয়। তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে জানা চাই। ভাল করে তেল মেখে নিতে হবে যেন আঠা না লাগে। তা নইলে তাঁর মধ্যে বাস করেও, তাঁর দ্বারা আবৃত থেকেও, শাস্ত্রাদি পাঠ করেও, তাঁর কোনও অনুভূতি হয় না। একটি শ্লোক আছে—

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা॥

চারবেদ অধ্যয়ন করেও অনেকে ব্রহ্মবিদ্যা জানতে পারে না, যেমন রান্নার হাতা রান্না করা খাদ্যের আস্বাদ জানতে পারে না। পণ্ডিতরাও সেইরূপ শাস্ত্রের শব্দার্থ ও বাগাড়ম্বরে মত্ত থেকে অনুভূতি লাভ করতে পারেন না।

অনুভূতি ছাড়া ধর্মজীবন তৈরী হয় না। এই যে ঠাকুর অবতার—পাছে লোকে বলে পণ্ডিত, তাই মূর্খ হয়ে এসেছেন। আমরা ধর্ম খুঁজি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে, কিন্তু ভুলপথে চলি। বস্তুতঃ ঠাকুরের মতো জীবনই আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁর

কাছে এলে, তাঁর কথা শুনলে আমরা বিশ্বাস করি, কারণ তাঁর অনুভূতি হয়েছে।

মাদ্রাজে একজন খুব বড় পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আমরা বিচার না করে মানি না, কিন্তু ঠাকুরের বাণী মাথা পেতে নিতে হয়।" এই হল অনুভূতি। পেছনে সাধনা থাকলে জিনিস এক কথায় বোঝা যায়।

অনুভূতির অনেক স্তর। ঠাকুর তিনটি স্তর বলেছেন। একবার রামচন্দ্র মহাবীর হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, "কি ভাবে উপাসনা করা হয়?" হনুমান্ বললেন—

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

"যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে তখন আমি তোমার দাস, নিজেকে জীবাত্মা বলে বোধ হলে আমি তোমার অংশ এবং আত্মস্বরূপে আমিই তুমি—এই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি।" এই তিন ভূমিতেই ঠাকুর দর্শন করেছেন। সে আস্বাদন প্রকাশ হত তাঁর সমাধির ভেতর। যখন যে ভাবের কথা হত তখন তাঁর সেই স্তরের সমাধি। তাঁর সমাধিতে কখনও তিনি উপরের স্তর থেকে নীচে নামতেন কখনও বা নীচের থেকে উপরে উঠতেন। মন্দিরে মার সঙ্গে মা-সন্তান লীলা। মাকে খাওয়ানো, মার কোলে বসা প্রত্যক্ষ করতেন। একবার কেশববাবুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলছেন "সত্যি বলছি, মাইরি বলছি, তোমায় যেমন দেখছি, তেমনই দেখি।" "কেশব! এই দেখ মা চিন্ময়ী—শ্বাস পড়ছে।" নাকের কাছে তুলা ধরে দেখিয়ে দিলেন, শ্বাসে তুলো নড়ছে। তিনি এ পারতেন। স্পর্শে কুলকুণ্ডলিনী জাগতে পারতেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেককেই—অনেক যুবককেই তিনি প্রভাবিত করেছিলেন।

কেশববাবুও ঠাকুরের কাছে এসে আশ্চর্য হয়ে যান। নববিধানে ঠাকুরের উপদেশগুলি ছাপিয়ে দুই পয়সা দামে বিক্রী করতেন ও বলতেন প্রত্যেকের পড়া কর্তব্য। স্বামীজীও ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে তাঁদের গোঁড়ামিভাব কমে যেতে লাগল। ব্রাহ্ম-সমাজে অনেকেই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করত তিনি সাকার না নিরাকার। তাঁদের ধারণা সগুণ নিরাকার। ঠাকুর বলতেন, "তিনি সাকার নিরাকার সব।" এই অনুভূতি সর্বতোমুখী। সকলেই তাঁর মধ্যে আদর্শ পেত। তিনি কর্তাভজা সম্বন্ধে বলছেন, "এও পথ, তবে পায়খানার পথ। সদর দরজা খোলা থাকতে খিড়কীর পথে যাবি কেন?"

এই একটা বড় জিনিস—তাঁর অনুভূতি। পরজন্মে আমাদের সংশয় হয় কারণ অনুভূতি নাই। গীতা উপনিষদে যা আছে তা' আমরা ঠাকুরের জীবনে পাই, কারণ তিনি তা' নিজের জীবনে অনুভূতি করেছিলেন। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, তিনি সকল ধর্মের সাধনা করে অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ইসলাম ও খ্রীষ্ট মতের সাধনায়ও তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। এর ভেতর দিয়ে সব দ্বন্দ্ব মিটিয়ে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আগে ঠাট্টা করতেন মূর্তি-পূজাকে, এমন কি ঠাকুরকে পর্যন্ত বলতে হয়েছিল, "আর আসিস্ না।" সেই স্বামীজীকে পরে দেখি মূর্তির মায়েতে দৃঢ় বিশ্বাস। বেলুড় মঠে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বসে আছেন। স্বামীজী বারান্দায় পায়চারী করছেন ও গাইছেন,—"মা কি আমার কালো রে!' যেন সত্যি তাই হচ্ছে—তাঁকে দেখছেন। ভাবে বিভোর হ'য়ে গাইতেন।

আর একটি ঘটনা। আমেরিকা যাওয়ার আগে তিনি আলোয়ারে যান। মহারাজা ছিলেন পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন। তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করে বিলাসিতার ভিতর সময় কাটাতেন। কিন্তু দেওয়ান ছিলেন খুব ভাল লোক। স্বামীজী উঠেছেন একজন গরীবের বাড়ী। দেবালয়ে ভজন করেন। সুন্দর গাইতেন। বহু লোক আসত

ক্রমশঃ প্রশংসা কানে গেল দেওয়ানের। কথাবার্তায় অবাক্ হ'য়ে গেলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় তাঁর অধিকার দেখে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর মনে হ'ল এই আশ্চর্য সন্ন্যাসী হয়ত রাজাকে কুসঙ্গ ও কুপথ থেকে সৎপথে আনতে পারবেন। এদিকে দেওয়ানজী রাজাকে খবর পাঠালেন—আপনি শীঘ্র আসুন। এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী এসেছেন। লোক পাঠালেন তখনই। মহারাজা চিঠি পেয়েই চলে এলেন। দেওয়ানের উদ্দেশ্য রাজার স্বভাব পরিবর্তন করা। আলাপ হল। রাজা প্রথম প্রশ্ন করলেন, "এই যে মূর্তিপূজা—এইগুলো সম্পূর্ণ ভুল।" স্বামীজী শুনলেন চুপ করে। দেওয়ানরা ভাবছেন, বুঝিয়ে দেবেন। স্বামীজী কিন্তু চুপ। মহারাজার একটা ফটো ছিল সে ঘরে। দেওয়ানকে বললেন পাড়তে। তারপর দেওয়ানকে বললেন, "থুতু ফেলুন এর উপরে। এ একটা কাগজমাত্র। এর মধ্যে মহারাজ নেই। থুথু ফেলুন।" দেওয়ানজী সভয়ে সবিস্ময়ে বললেন, "কী বলেন!" স্বামীজী বললেন, "মহারাজ পাশে বসে—এতে তো নেই। আসুন, থুথু ফেলুন।" দেওয়ানজী বললেন, "মহারাজকে এর মধ্যে দেখছি।" স্বামীজী বললেন, "দেখুন মূর্তি-পূজার উপর ঘৃণা করছিলেন। দেখুন দেওয়ান কি দেখছিলেন? আপনাকে দেখছিলেন।" মহারাজের চোখ খুলল।

ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে স্বামীজীর সাকারে বিশ্বাস হয়েছিল। বিশ্বাস হয়েছিল যে ঠাকুর এসেছিলেন সব করার জন্য। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন মহাসমাধিলাভের পূর্বে। গিরিশবাবু প্রভৃতি ত' আগে থেকে প্রচার করতেন যে ঠাকুর অবতার। স্বামীজী অদ্ভুত শক্তি দর্শন করেছিলেন। বসে ভাবছেন ঠাকুরের মহাসমাধির ২।৩ দিন পূর্বে, "আর তো দু দিন পরে পাব না। কে এই মহামানব? পরিচয় না দিলে ত' মহাসংশয় থেকে যাবে।" বসে ভাবছেন। এমন সময় ঠাকুর নিকটে ডাকলেন। স্বামীজীকে পরিচয় দিলেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এবার রামকৃষ্ণ।" তারপর থেকে স্বামীজী firmly convinced (দৃঢ়বিশ্বাস সম্পন্ন) হ'ন। পাকা অনুভূতি।

কর্মযোগ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সর্ব অঙ্গে ধূলি মাখি
ধূলিভরা দীর্ঘপথ বাহি'
দিবা-অবসানকালে
খেয়াঘাটে উপজিল রাহী।
কাতরে কহিল রাহী,
"পারের কড়ি ত নাই সাথে,
দয়া করি পার করো
আসিয়াছি আমি রিক্ত হাতে।
সারাটি জীবন শুধু
খাটিয়াছি ধূলায় কাদায়।
কিছুই সম্বল নাই
ধূলা ছাড়া কিছু নাই গায়।"

কাণ্ডারী কহিল—"বন্ধু,
আগে তোমা ক'রে দেব পার।
নাইক পারের কড়ি,
মিথ্যা কথা, বলিও না আর।
সঙ্গে নাই, অঙ্গে আছে
অঙ্গভরা ও ধূলার চেয়ে
দুর্লভ পারের কড়ি
কোথা পাবে এ ঘাটের নেয়ে?
ও ধূলা ব্রজের রজ
জ্ঞান, পুণ্য তুচ্ছ ওর কাছে,
তরীতে সবার আগে
জানিও তোমার ঠাঁই আছে।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ কতোটুকু সেইটি আলোচনা করতে একটা কথা মনে পড়লো। ক'দিন আগে আমার কাছে একটি স্কুলের মেয়ে এসেছিলো, বেচারা বেজায় ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে দেখলাম, বললো—"কাল আমাদের ছাত্রীসমিতির বার্ষিক উৎসব, সেই উপলক্ষ্যে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি আমরা। কিন্তু এমন মুস্কিল হয়েছে, 'প্রিসাইড' করবার জন্যে কাউকে পাচ্ছি না, যাঁর কাছে যাচ্ছি তিনিই বলছেন, 'সময়ের অভাব'। সভাপতির অভাবে সব বন্ধ হ'তে বসেছে। এখন আপনি যদি—"

মেয়েটি ছোটো, তাই সাহস করে বললাম—"সাংস্কৃতিক উৎসব তো করছো, কিন্তু সংস্কৃতি মানে কি বলো তো?"

মেয়েটি তৎপর হয়ে বলে উঠলো "কেন, নাচ-গান!"

এ উত্তর দেওয়া তার পক্ষে হয়তো অসঙ্গত হয়নি, কারণ সে বোধ হয় তার জ্ঞান অবধি সংস্কৃতি শব্দটার ওই একটা মানেই পেয়ে এসেছে।

অবশ্য নৃত্যগাত যে শিল্পকলার একটি বিশিষ্ট কলা এটা ঠিকই, সংস্কৃতির ধারক হিসেবে তার বিশেষ একটি ভূমিকাও রয়েছে, কিন্তু সেইটাই তো প্রধান নয়।

তাছাড়া—এই সব তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন অনেক বিকৃতরুচি আয়োজন এসে জোটে যে, তাকে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' বললে সংস্কৃতি বেচারার উপর অবিচারই করা হয়। কারণ মানুষের রুচিবোধই হচ্ছে সংস্কৃতির জনক।

একটি মাত্র শব্দে যদি সংস্কৃতি কথাটার ব্যাখ্যা করতে হয় তো, বলা চলে "সুরুচিসঞ্জাত উৎকর্ষ।"

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে উৎকর্ষের বিকাশ হওয়া সম্ভব। জীবনযাত্রার রীতিপদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠু নীতি, দৈনন্দিন আচার আচরণ, এমন কি চলার ধরণটি, কথা বলার ভঙ্গীটি, সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্গত।

শোভনতাই সংস্কৃতি, যা অশোভন অসুন্দর সেইটাই সংস্কৃতির বিরোধী।

একটা সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতির প্রত্যেকটি লোকই কিছু আর সংস্কৃতির বাহক হয় না, প্রত্যেকেরই আচার-আচরণ শোভন হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়, তবু তাদের রুচির একটা মান থাকে।

যদিও সর্বদেশের বা সবকালের রুচিবোধ এক হয় না, দেশভেদে কালভেদে সংস্কৃতির সংজ্ঞাও বিভিন্ন, তবু স্থান কাল পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় সমসাময়িক দৃষ্টিতে যা শোভন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, মাত্র তাকেই সংস্কৃতি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

যুগে যুগে বিভিন্ন হলেও এক একটি দেশের বা এক একটি জাতির ঐতিহ্যে সংস্কৃতির একটি অব্যাহত ধারা প্রবহমান। সে ধারা বহু মানুষের মানস-রসধারায় পুষ্ট।

যেমন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ত্যাগের আদর্শ চিরন্তন আদর্শ। কালে কালে ভারতের জীবন-নীতিতে এসেছে কতো পরিবর্তন, বারে বারে তার উপর এসেছে কতো বিদেশীয় ভাবধারার আক্রমণ, কিন্তু তার আদর্শ কোনদিন ম্লান হ'লো না।

আর 'সাহিত্য' বস্তুটা কি?

কেবলমাত্র যত্নে গঠিত কল্পিত কাহিনীই কি সাহিত্য?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সেই বস্তুই সাহিত্য যাহা

এক হৃদয়ের 'সহিত' অপর হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটায়।" আবার সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যের যেন পিতাপুত্র সম্বন্ধ,' যদিও কে পিতা কে পুত্র সে মীমাংসা করা শক্ত। কে বলবে সাহিত্যই সংস্কৃতির ধারক, অথবা সংস্কৃতিই সাহিত্যের বাহক।

একটা দেশের সংস্কৃতির ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করে তার কাব্য, তার সাহিত্য। সাহিত্যের মাধ্যমেই অতীতকে অবলোকন করা যায়।

মানুষের উত্থানপতনের ইতিহাস, পৃথিবীর ভাঙাগড়ার ইতিহাস, যদি কেবলমাত্র নীরস হিসাবের খাতাতেই লিপিবদ্ধ থাকতো, কাব্যে সাহিত্যে নাটকে সঙ্গীতে রূপায়িত না হতো, তা'হলে কি ভবিষ্যৎ কালের দরবারে তার কোনও আবেদন পৌঁছুতো, না সে দরবারে সে পাকা-আসন লাভ করতে সমর্থ হতো!

পুণ্যচরিত, দেবচরিত, পুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি রচিত না হলে, কে জানতে পারতো কোন যুগে কিভাবে পরিচালিত হ'তো জাতির সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন, ধর্মজীবন, কর্মজীবন। কে ভাবতে শিখতো জাতীয় ঐতিহ্য কি, তার সংস্কৃতির ধারা কোন পথে প্রবহমান।

দেশের সংস্কৃতি তখনই বিপন্ন হয়ে পড়ে যখন তার সাহিত্যে সংকট দেখা দেয়। সাহিত্য একটি পবিত্র বস্তু, একটি মহান্ বস্তু। অনধিকারীর হাতে পড়লে সে বস্তু কলুষিত হয়ে পড়ে, গ্লানিকর হয়ে ওঠে।

অথচ সেই কলুষিত সৃষ্টিই যদি কোনোক্রমে একবার সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়, তাহলে সে সৃষ্টি জাতির রুচিবোধ নষ্ট করে দেয়, নষ্ট করে দেয় জাতির চরিত্র।

অনধিকারীর সেই অপরিণামদর্শী সৃষ্টিই সাহিত্যে সংকট ডেকে আনে।

বঙ্কিমাজিত চিত্তের রসানুভূতি বা ভাবানুভূতির বিকাশরূপই সাহিত্য। সৌন্দর্যের অনুভূতি, আনন্দের অনুভূতি, ঈশ্বরের অনুভূতি, চিত্তকে যে অনির্বচনীয় ভাবলোকে পৌঁছে দেয়, সাহিত্য সেই ভাবলোকের বাণী, এক অনাস্বাদিত জগতের আস্বাদ।

সাহিত্যের দায়িত্বও কম নয়। কেবলমাত্র আনন্দ পরিবেশনেই তার কর্তব্য শেষ হয় না।

সাহিত্যের কাজ অতীত কালকে রক্ষা করা, বর্তমান কালকে বহন করা, ভবিষ্যৎ কালকে সৃষ্টি করা।

সাহিত্যের শক্তি সহজ নয়।

একমাত্র সাহিত্যই পারে অনতিক্রমণীয় কালকে অতিক্রম করতে, মৃত অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে। সাহিত্যই পারে একটা জাতির জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে।

একটা জাতির মূলধন যদি হয় তার সংস্কৃতি, তো তার সম্পদ হচ্ছে তার সাহিত্য।

পৃথিবীতে যখন ভাষা ছিলো না, বর্বর মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতো জন্তুজানোয়ারের মতো চীৎকার করে। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ভয় উল্লাস ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটি ভাবের জন্য বিশেষ কয়েকটি ধ্বনিই ছিলো তার সম্বল।

কিন্তু শুধু সেই চীৎকার-ধ্বনি সম্বল করে বেশী দিন আর সে সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না, সেই ধ্বনিতে আরোপ করলো রূপ। সৃষ্টি হলো ভাষা। শব্দময় ভাবসমুদ্রকে নিঃশব্দ করে বেঁধে রাখতে তৈরী হলো অক্ষর। আর সেইদিনই হলো বর্বর যুগের অবসান।

'অক্ষর' শব্দটার বিশেষ একটি অর্থও আছে, সে অর্থ কি? না, যার বিনাশ নেই,—যা চিরস্থায়ী।

ভাবকে চিরস্থায়ী করে রাখতে, অক্ষরের মাধ্যমে এলো কাব্য; এলো সাহিত্য।

অরণ্যচারী মানুষ সহসা একদিন বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করে ফেলে অভিভূত আনন্দে যে গান গেয়ে উঠেছিলো, সেই গান হলো বেদগান।

সৌন্দর্যমুগ্ধ মানবচিত্তের উল্লসিত প্রকাশ। সেই বেদগানই বোধ করি কাব্য ও সাহিত্যের আদি জনক।

তাই সাহিত্য আর সংস্কৃতির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। একজন অপরজনকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

সহসা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলে প্রথম উপলব্ধির আবেশে বিচলিত মানুষ গান গেয়ে উঠলো। কেমন করে সে নিঃশব্দে বহন করবে এই অজানিত হৃদয়ভার। এ কী আনন্দ! এ কী ব্যথা! এ কী অনুভূতি! কে সৃষ্টি করলো এই রহস্যময়ী প্রকৃতিকে, কে আমার চোখের সামনে উন্মোচন করে ধরলো সেই রহস্যের ভাণ্ডার। কোথায় ছিলো আমার এই চেতনা? এ চেতনা কি সবাইয়ের এসেছে? যারা পায়নি, তারা পাবে না এই অজানা লোকের সন্ধান?

"হাজার হাজার বছর কেটেছে
কেহ তো কহেনি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে
তরুরে ঘিরেছে লতা।
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে
তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
তটিনী ছুটেছে বেগে।
এতো যে গোপন মনের মিলন
ভুবনে ভুবনে আছে—"

এ কথা যার কাছে প্রথম প্রকাশিত হয়ে গেলো, সে আর স্থির থাকতে পারলো না, সে উল্লাসে বলে উঠলো—

"—নর-নারী শোনো তবে,
এতোকাল ধরে কী যে রহস্য,
ঢাকা ছিলো এই ভবে।"

সাহিত্য সৃষ্টির মূল কথা এই। আমি যে ঐশ্বর্য পেলাম, সে ঐশ্বর্য সকলকে ভাগ করে দিতে হবে, আমি যা বুঝে ফেলেছি, সকলকে তা বোঝাতে হবে, আমার উপলব্ধির আনন্দ অন্যের উপলব্ধির জগতে পৌছে দিতে হবে।

এই যে ইচ্ছা, এই যে চেষ্টা, এই যে অপরের হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয়ের একাত্মতার বাসনা, এইটাই মানসিক সংস্কৃতি। আবার এই বাসনাই মানুষকে উৎসাহিত করেছে সাহিত্য অনুশীলনে।

বিশ্ব প্রকৃতিকে বুঝতে বুঝতে, বুঝতে শিখেছে মানুষের অন্তর প্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতির চাইতেও যে দুর্বার, যা নিত্যনূতন, যা পরিবর্তনশীল। যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট নিয়মের অন্ধ আনুগত্য করে চলে না। সাহিত্যিকের কারবার সেই মন নিয়ে।

কাজেই সাহিত্যিক যদি আপন দায়িত্ব বোঝেন তো তিনি জাতির রুচি গঠন করতে পারেন, সৃষ্টি করতে পারেন রুচিবান্ পাঠক।

দেশে রুচির উৎকর্ষ সাধিত হলেই, কি ব্যক্তি-জীবনে, কি সমাজজীবনে দেখা দেবে শোভনতা শালীনতা, উন্নীত হবে সংস্কৃতির মান।

একথা হয় তো সত্যি যে অবাস্তব উচ্চ আদর্শের দিন আজ শেষ হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে 'স্বর্গ কল্পনা'।

কিন্তু তাই বলে শিল্পীর অন্তরস্থিত স্বর্গলোকও কি মুছে যাবে? মানুষ তাহলে কোথায় পাবে আশ্রয়, কোথায় পাবে আশ্বাস?

বর্তমান সাহিত্যে 'বাস্তব ছবি' আঁকার একটা অন্ধমোহ দেখা দিয়েছে বোঝা যায়। এ যুগে দিনে দিনে মানুষ কতো অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, কতো নীচে নেমে যাচ্ছে, ভাগ্যনিপীড়িত মানুষ প্রতিনিয়ত কতো বঞ্চিত হচ্ছে, কী নিরুপায়তার পাঁকে পুঁতে আছে, এই ছবিই অনবরত এঁকে চলা হচ্ছে। কারণ এইটাই বাস্তব।

কিন্তু বাস্তব হলেই কি সে বস্তু সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে? বিচ্ছেদ-বিরহ বিষাদ

কাব্যের প্রাণ, কিন্তু উন্মত্ত শোকের উচ্চ ক্রন্দন কাব্যে অপাংক্তেয়।

অথচ উন্মত্ত শোককে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এতো বড়ো রূঢ়সত্য জগতে অল্পই আছে। কাজেই রূঢ়তাই 'বাস্তব' নয়।

নারীর নগ্নদেহ শিল্পীর আদর্শ মডেল হতে পারে তখনই, যখন সে সৌন্দর্যের মধ্যে থাকে সুঠাম সুষমা, থাকে সু-সম ছন্দ, থাকে দেহাতীত আত্মার রূপ। সেই লোকোত্তর অনুভূতি শিল্পীকে সংসারের সমস্ত মালিন্যের উর্ধ্বে নিয়ে যায়।

অপর পক্ষে যদি সেই দেহাতীতের সন্ধান না মেলে, তা'হলে তা'র চাইতে কুৎসিত, তার চাইতে মলিন বস্তু জগতে আর কি আছে?

সাহিত্য বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠাটাই সাহিত্যধর্মের শেষ কথা নয়। দেখতে হবে সাহিত্য সংস্কৃতিধর্মী হয়ে উঠছে কি না।

দেখতে হবে—সাহিত্য এবং সংস্কৃতির যে একটি সমান্তরাল ধারা চিরপ্রবহমান, সাহিত্য সে ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে কি না। দেখতে হবে—শক্তিশালী সাহিত্যিকের লেখনী 'প্রকাশধর্ম' হারিয়ে 'প্রচারধর্ম' গ্রহণ করছে কি না।

তাতে যে শুধু শিল্পীর ধর্মই ব্যাহত হয় তা নয়, পরবর্তীকালে আর সেই প্রচার-সাহিত্যের কোনো মূল্যই থাকে না, কারণ আজকের প্রচার আগামী যুগে অর্থহীন, আজকের প্রগতি আগামী যুগে হাস্যকর, আজকের দুঃসাহস আগামী যুগে ছেলেখেলার সামিল।

কথাশিল্পীকে এমন 'কথা' নিয়েই লিখতে হবে যাকে বর্তমানকালই নগদ বিদায় দিয়ে চুকিয়ে দেবে না, পরবর্তীকালও যার দেনা শোধ করবে।

অবশ্য সাহিত্যিকমাত্রেরই সে ক্ষমতা থাকবে এমন আশা করা চলে না, কিন্তু বাণীর সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করতে চান, তাঁদের প্রভূত ক্ষমতা না থাক, আদর্শটা তো থাকবে? থাকবে রুচিবোধ, থাকবে সমাজকল্যাণবোধ। বিশ্বের দরবারে একটা জাতির পরিচয় তা'র স্বর্ণভাণ্ডারে নয়, তার জনসংখ্যা বা দৈহিক শক্তির পরিমাপ দিয়ে নয়, তার সৈন্যসংখ্যা বা পুলিশবাহিনীতে নয়, পরিচয় পাওয়া যায় তা'র সাহিত্যে। তার সংস্কৃতির মান নির্ণীত হয় সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারে।

নিতান্ত পরিতাপের কথা, আমাদের দেশে যথেষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকতেও, জাতীয় সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌছে দেবার কথা বিশেষ চিন্তাও করা হয় না। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে এদেশের ধর্মবোধকে অন্যের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থাপিত করার চেষ্টা আছে, কিন্তু চেষ্টা নেই এদেশের কাব্যবোধকে অন্যের হৃদয়ে পৌছে দেবার।

রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন, তাই বিশ্ববাসী ভারতকে 'অনার্যের দেশ' বলে ভাববার অভ্যাস থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলো, প্রথম সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো, কিন্তু সে দৃষ্টি সেইখানেই থেমে থাকলো। হয়তো আজ অনেকেই মনে করতে শুরু করেছে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গেসঙ্গেই তিরোহিত হয়ে গেছে ভারতের সাহিত্যানুশীলনের ধারা।

অথচ অস্বীকার করা যায় না রবীন্দ্রোত্তর যুগে এদেশের সাহিত্য অনেক পরিমাণে অগ্রসর হয়ে গেছে। তথাপি কারুরই যেন সে সম্বন্ধে সম্যক্ মূল্যবোধ নেই, নেই সাহিত্যের প্রতি মর্যাদাবোধ। জাতীয় সম্পদের প্রতি এই যে শ্রদ্ধার অভাব, এও এক প্রকার অসংস্কৃতি।

অবশ্য এ কথাগুলো একটু গণ্ডির মধ্যে এসে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে এই কথাই বলা যায় সাহিত্য আর সংস্কৃতির সম্পর্কবন্ধন অবিচ্ছেদ্য। তা সে যে দেশের সংস্কৃতি যেমনই হোক, আর যেমনই হোক তার সাহিত্য।

সাহিত্য বহন করে আসছে মানুষের অন্তরের শাশ্বত বাণী, আর সংস্কৃতি বহন করে আসছে তার চিরন্তন উন্নতির চেতনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায়

(এক)

যুবরাজ শ্রীকরণ সিংহ

(সর্দার-ই-রিয়াসত, জম্মু ও কাশ্মীর)

[নয়া দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে গত ২০।২।৫৫ তারিখে প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত। অনুবাদক: ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য]

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের মহাত্মা গান্ধীজী পর্যন্ত ভারতবর্ষে সময় সময় এরূপ মহানুভব ব্যক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন, যাঁরা দারুণ সঙ্কট ও ভীষণ সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্যোতি পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত রেখেছেন। এই অখণ্ড পরম জ্যোতির প্রতাপেই ভারতীয় সভ্যতা সদা উজ্জ্বল ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক্ বা রোমীয় প্রভৃতি সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতি না থাকায় তা আজ বিলুপ্ত—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সদসদ্‌বিচারহীনতার জন্যই এই পরিণাম !

এক ভয়ানক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ভারতমাতার ক্রোড়ে এরূপ এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে শুধু পুনর্জীবিত করেন নি, ভারতসংস্কৃতির শোভা পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়েছিলেনও। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলেও তিনি নিজের প্রতিভা ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা জনচিত্তে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁর পুণ্য সংস্পর্শে মানুষ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল এবং নিজেদের কুকৃত্য স্মরণ করে অনুতপ্ত হল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সরল ব্যাবহারিক উপদেশ দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, ঈশ্বর ও ধর্মের মূলতত্ত্বটি কি। মানবজীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বরলাভ। আত্মা অনন্ত, অবিনাশী ও সর্বব্যাপক। দেহধারণের জন্যই আত্মার সাংসারিক সুখদুঃখের অনুভূতি, যখন দেহে তাদাত্ম্যবোধ দূর হয় এবং অবিনাশী আত্মাকে জানা যায়, তখনই মানুষ পরম সত্য এবং চিরশান্তি লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষে সময় সময় এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্যোতি নিষ্প্রভপ্রায় হলেও আবার তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের আবির্ভাবে দেদীপ্যমান হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতীয় সভ্যতায় প্রবল আঘাত এসেছিল। সভ্যতা বিচলিত হল, সংস্কৃতির প্রশস্ত পথ ধূলিমলিনতায় ভরে গেল, দেশবাসী উচ্চ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে লাগল। এই সময় বৈদেশিক সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট অন্ধ-অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসী নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতেও লজ্জিত হতে থাকে। স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর দোষারোপেই ছিল তাদের আনন্দ ! এই সব অনর্থের মূল কারণ ছিল তৎকালীন শিক্ষাপ্রণালী। এ সম্বন্ধে লর্ড মেকলে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, যে কেউ এই শিক্ষা গ্রহণ করবে, তার স্বধর্মে কখনও প্রবৃত্তি হবে না। পাশ্চাত্য প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। লোকের বিচারধারার গতিও হল বিপরীত-মুখী। বিদেশী শিক্ষাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ -এই ভাবটি যাতে জাতির মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয় তার জন্যই ছিল প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মজ্ঞানের

প্রকাশে দেশের প্রতি প্রান্ত চমৎকৃত হয়ে উঠল। তাঁর সরল উপদেশে যুবকগণের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ জাগ্রত হতে লাগলো। তিনি দেখিয়েছিলেন, জগতের সমস্ত ধর্মই একই সত্যপথের সন্ধান দেয়। সমস্ত ধর্মের মূল সিদ্ধান্ত সমান। একটি ধর্ম অন্য একটি ধর্ম থেকে বড় বা ছোট নয়, কোন ধর্মই উচ্চ বা নীচ নয়, সমস্তই সমানমর্যাদাসম্পন্ন, ধর্ম সম্বন্ধে স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য নেই—এই ছিল তাঁর বাণী। সব ধর্মেই হিংসা না করার কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে এক সুবিশাল ধর্মের বিভিন্ন রূপমাত্র; তাই বলা উচিত এইগুলি পরমপিতা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার বিভিন্ন রাস্তা ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যসংখ্যা প্রতিদিন বাড়তেই লাগল, তাঁরা এক স্থানে সমবেত ও সংগঠিত হতে মনস্থ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর এই শিষ্যসঙ্ঘ সুসংগঠিত ধর্মপ্রচারকরূপে প্রকাশিত হলেন। তাঁদের পরমারাধ্য গুরুদেবের প্রদত্ত জ্ঞানে তাঁদের আত্মা সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তাঁরা ভারতের দীনহীন বিপথগামী জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে প্রতিজ্ঞা করলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি জগতে জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন সব চেয়ে বেশী। স্বামীজী দেশে ও বিদেশে জনসাধারণকে সত্য ও মোক্ষের সন্ধান দিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল পতিত উদ্ধারের অদ্বিতীয় অমিত শক্তি। আজকের বিষমতাময় জগতে যদি কোথাও কিছু সদ্‌ভাবনা বা মিলনের আশা থাকে তো তা পাওয়া যাবে স্বামীজীর অভ্রান্ত বৈদান্তিক সিদ্ধান্তগুলির প্রচারের এবং গ্রহণের মধ্যেই। এই সর্বমান্য স্বয়ংপ্রভ উপদেশাবলী আমেরিকার জনচিত্তে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমেরিকাবাসীর দৃষ্টিও ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধালুভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁর মোহনাশক ও জ্ঞানবর্ধক উপদেশামৃতে পরিতৃপ্ত ভারতবাসী ও বিদেশী সমভাবে তাঁর চরণতলে সবিনয়ে মস্তক নত করে ধন্য হয়েছে।

ভারতের শোচনীয় অবস্থা দেখে স্বামীজীর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের অমরনাথ অবধি পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করে ভারতসংস্কৃতির যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ব্রহ্ম নিখিল প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত—এইভাবে উপাসনা করলে জীবাত্মার নির্ভয়তা আসে। দুর্বল ব্যক্তি কখনও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে না—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বীর্যবত্তা ও নির্ভীকতাই মুক্ত হওয়ার সহজ উপায়। স্বামীজীর অমর বাণীর সারমর্ম ছিল এই, মানুষ তুমি 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' বীর হও, তীরন্দাজের মত লক্ষ্য স্থির রাখ। ঘৃণা কর কেবল কাপুরুষতাকে, নিন্দনীয় হলেও কাউকে নিন্দা করতে যেয়ো না। পরনিন্দায় কর্ণপাত করো না, কারণ সকলের মধ্যেই রয়েছে অসীম শক্তি। উদ্যোগী ও অক্লান্তকর্মী বিপ্লবী হয়ে এগিয়ে চল। সাহস, ধৈর্য এবং শান্তির দ্বারা সুকঠিন কার্যও সিদ্ধ হয়। কাউকে দুর্বল, পাপী, দরিদ্র এবং ভীরু বলা বা মনে করা অপরাধ। শক্তিই জীবন এবং দুর্বলতাই মৃত্যু। সংসারের সমস্ত ব্যাধির মহৌষধই হল শক্তি। ইহলোক অথবা পরলোকের ভয় মানুষের অধঃপতনের মুখ্য কারণ। যিনি বিশ্বসংসারকে নিজের অন্তরের অন্তস্থলে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই উত্তম সাধক। তাঁর জীবন সার্থক, কর্তব্যপালনে তাঁর কখনও কোন ত্রুটি হয় না।

স্বামীজী বলেছেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখা একান্ত আবশ্যক। দারুণ দুঃখকষ্ট ও আপদবিপদের সম্মুখীন হলেও আত্মবিশ্বাসী কখনো অকৃতকার্য হয় না। আত্মবিশ্বাসের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সে নাস্তিক নয়, যথার্থ নাস্তিক বরং সে, যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই।

প্রত্যেক মানুষেরই উদারচরিত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। উদারহৃদয় ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর সহিত এমন প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন যে তাঁর পূত সংস্পর্শে অপরের দ্বেষ, ঘৃণা ও ভয় তিরোহিত হয়। প্রেমের প্রভাবে পরও হয় আপনার।

স্বামীজীর আর একটি অত্যুত্তম উপদেশ ছিল—সত্যের উপর অটল বিশ্বাস রাখ। সত্য এমন বস্তু যার সব অবস্থায় সর্ব ক্ষেত্রেই বিজয়। কোন সময় হয়তো মিথ্যা সত্যের উপর কার্যকরী হল, কিছুকাল পরে কিন্তু সত্যকেই বিজয়গর্বে সর্বোপরি প্রকাশশীল হতে দেখা যায়। এই জন্যই মহর্ষি এবং মহামুনিগণ সত্যের অনুপম যশোগাথা কীর্তন করেছেন। বিশ্বসংসার বিরুদ্ধে থাকলেও পরিণামে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

নারীগণের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শ জাগরিত করতে স্বামীজী বলেছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথা স্মরণ করে পাতিব্রত্য, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতির অনুশীলন প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে বিদুষী হয়ে সংসার-ক্ষেত্রে অগ্রগতির অভিনব পথ-নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। নারীজাতি নিজেদের অধিকার লাভ করে এই পথে অগ্রসর হলেই হবে প্রকৃত কল্যাণ।

স্বামীজীর অমূল্য উপদেশগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার উপযোগী। তাঁর স্বল্পপরিমিত আয়ুতে তিনি দেশের জাগরণ ও উন্নতির জন্যে যা করে দেখিয়েছেন তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী জগতে পরিব্যাপ্ত করার কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন ভাবে জনকল্যাণে ও সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন।

আধুনিক জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি বিচিত্র। বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে এক দেশ অপর দেশের প্রতি ঘৃণা ও ভয়ের ভাব পোষণ করে চলেছে। বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতিতে একদিকে যেমন জনসাধারণের জীবন যাপন সুগম ও সুখকর হয়েছে, অপর দিকে তেমনি হাইড্রোজেন বোমার মত মারণাস্ত্র আবিষ্কারে লোকের চিত্ত হয়েছে সর্বদা শঙ্কাব্যাকুল। ক্ষোভ এবং অশান্তি ক্রমাগতই ছড়িয়ে পড়ছে। এখনও যদি জগদ্বাসী স্বামীজী নির্দেশিত পন্থার অনুসরণ ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ অবলম্বন করে তবে তাদের মন থেকে অশান্তি দূর হতে পারে এবং জগতের ক্ষুব্ধ আবহাওয়া পুনরায় শীতল হয়ে উঠতে পারে।

অপরকে শুধরাবার আগে আমাদের নিজেদের সংস্কার দরকার। ভ্রাতৃপ্রেম ও নিষ্কাম সেবা জন-কল্যাণের উৎকৃষ্ট সাধন। স্বদেশের হিতসাধন করবার পর অন্য দেশ ও প্রাণিবর্গের উন্নতিসাধনে যোগ্যতা আসে। ভারত সর্বদাই অন্যান্য দেশকে ন্যায় ও সত্যের পথ দেখিয়েছে। আজ স্বতন্ত্র ভারতের পুনর্বার এই সৌভাগ্য উপস্থিত যে অতীতের মতো আমরা জগদ্বাসীকে শান্তির পন্থা-প্রদর্শনের তৎপর কাজে এগিয়ে চলেছি।

(দুই)

ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু

[মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্যে আহূত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত]।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা স্বামী বিবেকানন্দের নানা দিক নিয়ে সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন। আমার নিজের কথা এইটুকু বলতে পারি যে, যেদিন হতে আমি স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহশীল হয়েছি সেদিন থেকে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করে এসেছি একটি বিশেষ দৃষ্টিতে। আজ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে

আমরা স্বাধীন ভারতে বাস করছি। জগতের যেখানেই যাই না কেন আজ আমরা একটি সুবৃহৎ গণতন্ত্রের নাগরিক বলে গণ্য হই। পৃথিবীর সর্বত্রই ভারতবাসীর প্রতি স্বাধীন দেশের নাগরিকোচিত সম্মান, সৌজন্য ও সমাদর প্রদর্শিত হয়। কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে অথবা বলা যেতে পারে একশ' বৎসর আগে অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ব্যাপার এমনই দাঁড়িয়েছিল যে আমরা শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খলেই আবদ্ধ ছিলাম না, অন্তরে অন্তরে আমাদের নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা সব কিছুকেই সমালোচনার চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। এই ছিল পরিস্থিতি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, স্মৃতিসূত্র ধরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চলে গেছি। কোন কোন মনীষী সক্রিয় হয়ে আমাদের শাস্ত্র এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা বিঘোষিত করতে আরম্ভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং তাঁদের কথায় বড় বেশী কেউ কানও দেয়নি। আমার মনে হয়, যে ভারতসন্তান সর্বপ্রথম ভারতকে আত্ম-গৌরবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং বিদেশে গিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—'আমি ভারতবাসী, আমি হিন্দু—এই আমার ধর্ম' তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমার পূর্ববর্তী বক্তা কুমারিকা অন্তরীপের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি সেখানে গিয়েছি এবং সেই শিলাটিও দেখেছি, যা এখনও স্বামীজীর নামে অভিহিত হয়ে তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন করছে। কথিত আছে, স্বামীজী এখানে বহুক্ষণ সমাধিমগ্ন ছিলেন। আমি এই স্থানটিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির বলে মনে করি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে তাদের সুমহান্ গৌরবময় উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতন করেছিলেন। আমরা অজ্ঞতার গভীরে এতদূর ডুবে গিয়েছিলাম যে এই মূল্যবান্ রত্নরাজি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। এগুলি তো নষ্ট হয়নি, আমাদের সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী ঐ সম্পদ্ আমাদের জন্যে রক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু এঁদের প্রতি উপযুক্ত সম্মানটুকু প্রদর্শন করতেও আমরা কুণ্ঠিত ছিলাম। তখনকার দিনে ভারতীয় সমাজ এক অদ্ভুত অবস্থায় ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ নির্ভীকভাবে হিন্দুধর্মের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন এবং আমাদের ভাবতে শিখিয়েছেন যে, হিন্দুধর্মে লজ্জার কিছুই নেই বরং এমন জিনিস আছে যা পরম গৌরবের, যেটিকে অন্যান্য দেশ আজ সম্মান দিতে শিখেছে। তিনি চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় গিয়েছিলেন। আমি নিমীলিত নেত্রে আমার মানসপটে যেন সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি—স্বামীজী দৃপ্তভঙ্গীতে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছেন এবং কী অপূর্বভাবে আমাদের ধর্মের মহত্ত্ব ও চমৎকারিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর রচিত সমস্ত গ্রন্থই আমি পড়েছি। আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার অধিকাংশেই তিনি অনুপম অননুকরণীয় ভঙ্গীতে আমাদের ধর্মের সত্য, আমাদের উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবদ্গীতার উপদেশ তিনি অভিনবভাবে যুগোপযোগী করে দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ ছিল ভগবৎসত্তায় পরিব্যাপ্ত।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে অতি অল্প বয়সে হারিয়েছি। আজ তাঁর ৯৩তম জন্মজয়ন্তী প্রতিপালিত হচ্ছে। তিনি ৫০ বৎসর পূর্বে মহাসমাধিতে লীন হয়েছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হত, তাহলে হয়তো তিনি আরও ৩০।৪০ বৎসর এই পৃথিবীতে থাকতে পারতেন। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র কয়েকটি বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন, তার মধ্যেই তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন তা কোন দিন নিববে না, নিবতে পারে না। দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত তাঁর রাজকীয় অগ্রগতির তৎকালীন

বিবরণী আমি পরিষ্কার স্মরণ করছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীকে প্রদত্ত অভিনন্দনের একখানি প্রতিলিপি আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রক্ষিত রয়েছে। তারপরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। কী সুন্দর ও গভীরভাবে এই মিশন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। মনে হয়, যখন আমরা তাঁর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করছি, তখন তাঁর অমূল্য উপদেশাবলীর কয়েকটিও অনুধ্যান করা একান্ত প্রয়োজন।

আজ আমার এই ঐকান্তিক প্রার্থনা শুধু বড় বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠগুলিই নয়, দেশের যেখানে যেখানে এই মঠ আছে—সব কেন্দ্রগুলিই শক্তিশালী হোক্—প্রত্যেক প্রধান পল্লীতে এর শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ুক। যেখানেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই কি পীড়িত ও আর্তের সেবায়, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি সমাজ-উন্নয়নে সমস্ত বিষয়েই তাঁরা সুন্দর কাজ করছেন। কিন্তু তাঁদের কর্মিসংখ্যা আশানুরূপ নয়; জানিনা, বর্তমানে তাঁরা সংখ্যায় কত।

আমরা এখন চাই আমাদের এই স্বাধীন ভারতে প্রতি শত গ্রামে একটি করে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। প্রতি শত গ্রামের সেবার জন্যে এক একটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থাকা উচিত। তাঁদের কাজ যেরূপের মাধ্যমেই প্রকাশ পাক, সমস্তই উচ্চতম সেবার ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেবার ভাব ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকে আমরা সঞ্চারিত দেখতে ইচ্ছা করি। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কি রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি সমাজকল্যাণ সর্বত্র সর্বসাধারণের জন্যে যে কাজ তা উচ্চতম সেবাদর্শে করা হোক—এই আমাদের কামনা। যে ভাবাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, আমরা সেই ভাবাদর্শ চাই। আমি আশা করি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের সচ্চরিত্র যুবকগণ দেশের জন্য, জাতির জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে দলে দলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রচার ও বাস্তব রূপদানে ব্রতী হবে। এই প্রকারেই তারা আমাদের জাতীয় ভাবের মহত্ত্ব ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুব সৌভাগ্য ও আনন্দ বোধ করছি।

সত্য-সাধকের পথ

'দাদু'

মুখে শুধু 'ঈশ্বর', 'ঈশ্বর' করলেই ঈশ্বরলাভ হয় না। যাঁর সত্তা সম্পর্কেই অবিশ্বাস তাঁর দর্শন-লাভ ত' পাগলেরই প্রলাপমাত্র! কেউ এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলে 'হে ঈশ্বর', 'হে ঈশ্বর' করলেই ঈশ্বরের সত্তায় তার গভীর বিশ্বাস আছে এমনি ধারণা করে নেওয়া ভুল। এতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতে পারি বা অপরের চোখে ভক্ত সাজতে পারি, এইমাত্র। কিন্তু, এতে প্রমাণ হয় না ঈশ্বরের সত্তায় আমার গভীর বিশ্বাস হয়েছে।

'তুমি—আছ', সত্যিই 'আছ'—তুমি আছ বলেই আমার চোখের সামনে সব ফুটে আছে মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, জীব, জগৎ সবই স্থূল ভাবে গ্রহণ করতে পারছি। এই গ্রহণে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হচ্ছে না। তুমি আমার অন্তরের অন্তর্যামীরূপে

আমার চৈতন্যরূপে, আমার অস্তিত্বরূপে প্রকাশিত। অথচ, তোমার সত্তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারছি না। তুমি যে আমার ভিতরবাহির ঘিরে, জলে-স্থলে, ঊর্ধ্বে, অধে বিরাজিত তা' সত্যি করে গ্রহণ করতে পারিনি। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মত সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যেমন বাইরের নাম-রূপকে স্থূলভাবে পেয়ে সত্যবোধ করছে, তেমনি করে তোমায় আজো আমার পাওয়া হয়নি। তোমার অস্তিত্ব আমি প্রাণে প্রাণে সত্যি বলে গ্রহণ করিনি। তুমি যে বিশ্বের অন্তরে বাহিরে সকলের আধাররূপে, চৈতন্যরূপে রয়েছ সে জ্ঞান আজও আমার হয়নি।

তাই, জীবত্বের অসহনীয় পেষণ সহ্য করে চলেছি একটা লক্ষ্যহীন, অজানা শূন্যপথে। মন আর ইন্দ্রিয় নানা কল্পনার বস্তুরাশি সৃষ্টি করে আমায় ভুলিয়ে রেখেছে নাম রূপে তাই আজো আছি ডুবে- এই মোহে। চোখবাঁধা বলদের মত আমায় সংসারচক্রে ফেলে অবিরত অনর্থক কর্ম করিয়ে নিচ্ছে—তার কামনা-বাসনা সিদ্ধ করিয়ে নিচ্ছে। আর আমি শুধু অশান্তিতে ঘুরে মরছি। তুমি আছ এ বিশ্বাস সত্য হলে, স্থির হলে—জগৎ সত্তার ছোটখাট ঢেউগুলো তোমার মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে এক অখণ্ড অস্তিত্বে পরিণত হয়।

সেই অস্তিত্বকে স্বীকার করলেই সাধকের সত্য-প্রতিষ্ঠা হয়। যা ঠিক ঠিক পাওয়া যায় তা' তো কখনো হারায় না। হৃদয়-চিদাকাশে তাকে পেলে আর হারানোর ভয় থাকে না। হারালে জানবে ঠিক পাওয়া হয় নি। পেলে শত পরীক্ষাতেও মন অধীর হয় না। প্রলোভনে মন চঞ্চল হয় না। নির্মল শান্তির প্রদীপটি জ্বালিয়ে জীবনের দিনগুলি মোহ কাটিয়ে পথ চলতে পারে। তিনি আছেন এই সত্য-প্রতিষ্ঠা হলে সাধক শুধু অন্তরেই থাকতে চায়। বাইরে এসেও চোখ তার অন্তরের দিকেই থাকে। তখন অন্তরে বাহিরে সে দেখে তারই প্রিয়তমকে—চেতনারূপে, প্রাণরূপে, শাশ্বত সনাতন সত্যরূপে প্রকাশিত। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই সাধনা।

জীব, তুমি তোমার ভেতরে যে ক্ষুদ্র চৈতন্যটিকে অনুভব কর, তারই পেছনে আছে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এক মহাশক্তি, মহাচৈতন্য। তাঁকেই বলি মহাশক্তি, মহাকালী। আরো কত নামে তাঁকে ডাকি। তাঁকে তোমার অহং-বোধের অন্তরালে ঢেকে রেখেছ বলেই তোমার কাছে তিনি গুপ্ত আছেন আজো। ঐ অহংবোধের পর্দাটি সরিয়ে দাও। মুছে ফেল—দেখবে, প্রকাশিত হয়ে আছেন তিনি—তোমারই হৃদয়ে। তুমি শুধু তোমার জীব-বোধটিকে, অহং-বোধটিকে মায়ের পায়ে উৎসর্গ কর—তবেই নিজের স্বরূপটিকে ফিরে পাবে। মায়ের বিরাট প্রাণশক্তিতে তুমি প্রাণময় হবে। 'তুমি' হবে 'তিনি', 'তিনি' হবে 'তুমি'। হবে জগৎজোড়া একটি আমি। অহংবোধ না গেলে একাত্মবোধ পাওয়া যায় না, ক্ষুদ্র মনোগত 'আমি' থাকতে বিরাট শাশ্বত ও সনাতন 'আমি' কে উপলব্ধি করা যায় না।

তুমি আছ এ বিশ্বাস তোমায় করিয়ে দেবার দরকার হয় না। অন্তরে অন্তরে তুমি জান, তুমি আছ। এটি বুঝতে কোনই কষ্ট হয় না। কোনই সাধনার দরকার হয় না। তোমার অস্তিত্বের ওপর তোমার জন্মগত বিশ্বাস। এই স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্বই তোমার আত্মা, নিত্য স্বপ্রকাশ।

এইটে না বুঝতে পারাই জীবের বন্ধনকারণ, অজ্ঞানতা। ইহাই জীবত্বের অভিশাপ। আত্মা ছাড়াও আর কিছুই নেই। মন একটা কাল্পনিক সত্তাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে, তা' হল এই দৃশ্যমান জগৎ, এই ইন্দ্রিয়—যাদের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে বাইরের দিকে। জীব ওই কল্পনার আবরণে যতদিন আবৃত ততদিনই সে বদ্ধ। আসলে সে বদ্ধ নয়, চিরমুক্ত সে। নিজের কল্পনাজালেই সে বাঁধা পড়েছে।

আত্মা আছেন আমার অন্তরে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হলে জড়ভাব, তামসিক ভাব নষ্ট হয়ে যায়। এই জড়ভাবই জীবের জীবত্ব। এই জড়ভাবই অসুর। তার নিধনই সাধনার লক্ষ্য। সত্য-প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নিজের লুপ্ত শক্তির প্রকাশ হতে থাকে। সাধককে অভয় দিয়ে নিয়ে যায় জন্ম-মরণের পরপারে। আমি যে অমর আত্মা এই জ্ঞানটি নেই বলেই জড়ত্ব তার পশুশক্তি বিস্তার করতে পেরেছে। আপন সত্তায় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে অন্তরে শোনা যায় অভয়বাণী—মাভৈঃ, মাভৈঃ। ভয় নেই। মোহ তখন ঘাড় নীচু করে পালায়। মানুষ তখনই পায় মুক্তির আস্বাদ।

একটি প্রণাম

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মিথ্যা পূজা অনুষ্ঠান ; পূজাবস্তু করি আহরণ,
হে প্রভু, তাহাতে তৃপ্তি লভিল না কেন মোর মন ?
বারবার মনে হয় মিথ্যা মোর পূজা আয়োজন,
মিথ্যা এ আচার।
জাঁকজমকেতে কতবার
মন্দিরের মাঝে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য রবে উচ্চকিত করিয়াছি দিক্
তবু কেন পূর্ণ নাহি হল মোর হিয়া ?

অনিদ্রায় অনাহারে কোনদিকে চাহি অনিমিখ
জাগাইতে কারে করিয়াছি প্রাণপণ ?
নিঃশেষেতে করিয়াছি আত্মনিবেদন
বলিয়াছি হে দেবতা, জাগো—দেখা দাও
সিদ্ধি আমি চাই।
করি মন্ত্র উচ্চারণ মৃতেরে বাঁচাতে চাই
আনিবারে চাই যে চেতন।
দেখি—ব্যর্থ—ব্যর্থ আমি, দেবতা তবু তো জাগে নাই।

ফিরিনু আরাধ্যে খুঁজি দেশে দেশে, বিজনে, কান্তারে
করিলাম কত ধ্যান,
পূজা তরে বহি আনিলাম আমি কত উপচারে,
কত ক্লেশ সহিলাম,—অনাহারে অনিদ্রায়
কাটাইনু কত দিন রাত।
চাহিনি নিজের পানে, চাহি নাই পরিজন পানে।
ঘাত প্রতিঘাত
কত আমি সহিলাম—পাষাণ দেবতা !
মোর আর্ত হাহাকার পশে নাই কি তোমার কানে ?

ব্যর্থচিত্তে ফিরিলাম ; —ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত বড় আমি,
জানিয়াছি সবই মিথ্যা, দেবতা জগতে কেহ নাই।

মিথ্যা কষ্ট সহিলাম, কাটাইনু কত দিবাযামি,
চিত্ত করে হাহাকার—
কোথা পাব, সবারে সুধাই।

পথপ্রান্তে আসি থেমে যাই।
মানবরূপেতে আসি দাঁড়ালে দেবতা
নয়নসম্মুখে,—
জিজ্ঞাসিলে—"পথ ভুলে চলেছিস কোথা,
শ্রান্ত ক্লান্ত কেন তুই—
ভেঙ্গে পড়েছিস কোন্ দুখে?"
চাহিলাম সবিস্ময়ে,—এ কি হেরিলাম!
ওগো দেব, নেমে এলে আমারই দুয়ারে,—
না চাহিতে দিলে দেখা;—বাড়াইয়া দিলে দুটি হাত,
কাহারে চাহিয়া সারা বিশ্ব খুঁজিলাম?
তুমি বারে বারে
কত মোরে ডাকিয়াছ, বলিয়াছ "ওরে দিনরাত
উন্মাদের মত ছুটে চলেছিস কোথা?
আমি যে দাঁড়ায়ে আছি তোরই গৃহদ্বারে।
ওরে শোন কথা
মিথ্যা ছায়ামূর্তি খুঁজে কাননে কান্তারে
ফিরেছিস মূর্খ তুই—;
সে দেবতা ডাকে রুদ্ধ দ্বারে
আঘাত করিয়া তোর, দেখ দেখ চেয়ে।

ধ্যানের দেবতা মোর মূর্ত হেরি সম্মুখে আমার।
পরম ঈশ্বর তুমি হে দয়াল প্রভু
হে দয়াল রামকৃষ্ণ;
প্রেম-অশ্রু ঝরে গণ্ড বেয়ে।
ক্লান্তিহরা শান্তিভরা লইলাম নাম,
পরিপূর্ণ প্রাণে আমি সঁপিয়া দিলাম
আমার সর্বস্বে সৃষ্ট একটি প্রণাম।

পাশ্চাত্ত্যের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূত

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

মানব-কল্যাণকামী শিক্ষাব্রতী মাত্রই পরস্পর পরস্পরের সমধর্মী। প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর বিশেষ জাতিদেশ নাই, একথা মনে রাখিয়াই পাশ্চাত্ত্যের কর্মজাত শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ও অগ্রদূতদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান রুশোর শিক্ষাদর্শন ও মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে বলা যায়। রুশো ছিলেন বিপ্লবী। রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এমিল' (Emile)এ তখনকার দিনের শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে তাঁহার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্য-যুগীয় অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার —এক কথায় জনমতসম্মত ডেমোক্রেটিক সমাজও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহার 'আইডিয়া' আলোকবর্তিকার ন্যায় পরবর্তী শিক্ষা-ব্রতী ও সংস্কারকদিগকে আলো দান করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমেই রুশোর মতবাদের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়।

জেনেভা শহরে রুশো (Jean Jacques Rousseau) ১৭১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭৭৮ সালে। তিনি প্রকৃতির একজন খাঁটি উপাসক ছিলেন; সেজন্য তাঁহার শিক্ষা-সম্পর্কীয় মতবাদও ন্যাচারালিজম্ (Naturalism) বলিয়া খ্যাত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রুশো ছিলেন ভলটেয়ারের (Voltaire) সমসাময়িক ও বন্ধু। এখানে রুশোর শিক্ষা-সম্পর্কীয় মতবাদ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু কর্মজাত শিক্ষাদর্শের জন্মদাতারূপে নামোল্লেখের প্রয়োজন আছে। কারণ যে সকল শিক্ষাব্রতীদের সাধনার ফলে আজ শিক্ষার অবশ্য অঙ্গরূপে কর্মজাত শিক্ষা ও শিল্প নির্দিষ্ট রূপ স্থান ও মান পাইয়াছে, তাঁহারা সকলেই রুশোর জীবনদর্শনের প্রভাবে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদের জীবনীর কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং স্বাধীন ভারতের পিতামাতা ও শিক্ষকসাধারণের চিন্তার খোরাকও যোগাইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা।

শিল্পকে—হাতের কাজকে শিশুর ও সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূতকরণে যাঁহারা অগ্রণী, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনজন শিক্ষাবিদ্—যথা পেস্টালোৎসি (Pestalozzi), ফ্রোয়েবেল (Froebel), ও সালোমন (Salomon)। তাঁহাদের নির্দেশ ও পথ অবলম্বন করিয়াই বহু শিক্ষাবিদ্ কর্মজাত শিক্ষাসম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা শিল্পনীতি আবিষ্কার ও প্রবর্তনের অগ্রদূত তাঁহারাই। পেস্টালোৎসি গঠনমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেই আদর্শে শিক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছিলেন। শিশুর জীবনে খেলাধূলার বিশেষ স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন।

পেস্টালোৎসির আদর্শে উদ্বুদ্ধ ফ্রোয়েবেল 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতির জনক। উভয়েই বিশেষভাবে শিশু-শিক্ষার কথাই ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ে গঠনমূলক কর্ম ও শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি গঠনের অগ্রদূত হইতেছেন শ্লয়েড (Sloyd)-পদ্ধতির জনক অটো সালোমন (Otto Salomon)। ইউরোপের ও আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহে আজ শিক্ষাশিল্পের যে ব্যাপক ব্যবস্থা দেখা যায়, ইহার উৎস সুইডেনের অন্তর্গত 'নেশ' নামক শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সালোমন।

পেস্টালোৎসি

জুরিক শহরে ১৭৪৬ সালে ইঁহার জন্ম। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্ ও লোকসেবকরূপেই তাঁহার খ্যাতি। অজ্ঞাত নিঃসহায় কুড়িটি শিশুকে লইয়া তিনি তাঁহার যে প্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন কৃষক-সমাজের উন্নতিই ছিল উহার প্রথম লক্ষ্য। মামুলী পদ্ধতিতে তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন না। ক্ষেতখামারের কাজের সঙ্গে শিক্ষার কার্য চলিত। তাঁহার বিদ্যালয়টি ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে, কিন্তু ১৭৭০ সালে উহা উঠিয়া যায়। অর্থাভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব না হওয়ায় তখন তিনি নিজের শিক্ষার আদর্শ ও ভাবধারাকে লেখনীর সাহায্যে প্রচার করিতে সচেষ্ট হন। পেস্টালোৎসি নিজেই একটি শিক্ষাসম্পর্কীয় কাগজ প্রকাশ করেন কিন্তু অর্থাভাবে এই কাগজও অল্পদিনই বাঁচিয়াছিল। যাহা হউক ১৭৯৯ সালে বাউদ (Vaud)এর সমীপে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রসংখ্যা ইহাতেও দুই শতেরও অধিক হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পেস্টালোৎসির শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও স্থান হইতে বহু দর্শকের সমাগম হইতে থাকে। এই দর্শকদের কেহ কেহ পরে শিক্ষাবিদ্-রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদেরই একজন ছিলেন ফ্রোয়েবেল।

পেস্টালোৎসির জীবনে আর্থিক দিক দিয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সহজ হয় নাই কিন্তু শিক্ষা-নীতির অভিনবত্বে তিনি বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশুর জীবনের সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ও ছন্দোময় স্ফুরণ বা বিকাশ (harmonious development) ছিল তাঁহার শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য। পেস্টা-লোৎসি রুশোর শিক্ষাদর্শনের (naturalism) অনুবর্তী হইয়াই শিক্ষার গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুস্তকে (The evening hour of a hermit) সেই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার মতে মানুষের কল্যাণকর সকল বৃত্তির উৎস প্রকৃতি হইতেই প্রাপ্ত,—ইহা আকস্মিক নয়, তাই মানুষের শিক্ষা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তী হওয়া প্রয়োজন।*

—উর্বর রসযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের সংগে তিনি শিক্ষার উপমা দিয়াছেন। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজে সমগ্র গাছের রূপ—ইহার আকার, গঠন-সামঞ্জস্য নিহিত আছে। সেই বীজ রোপণ করার পর লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় ইহার অঙ্কুরোদ্গম, কাণ্ডের অবতারণা ও বৃদ্ধি, শাখাপ্রশাখা বিস্তার, পাতা, ফুল ও ফল। গাছের এই সমগ্র রূপটিই বীজে নিহিত থাকে। আর মানুষও ঠিক গাছেরই মত। নব-ভূমিষ্ঠ মানব-শিশুর মধ্যেও সেইরূপ সমগ্র জীবনের রূপটি থাকে—যাহা পরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়।

শিক্ষার সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন :— মানুষের সর্বগুণ ও ক্ষমতার স্বাভাবিক, প্রগতিসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। সেজন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গতিপূর্ণ ক্রম থাকিবে। এই ক্রমের সঙ্গে সংগতি রাখিয়াই তাহার শারীরিক, মানসিক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি সমভাবে বিকশিত হইবে।†

* "All the beneficent powers of man are due to neither art or chance, but to nature and the education should follow the course laid down by nature"—The evening hour of a hermit by Pestalozzi.

† The natural, progressive and harmonious development of all the powers and capacities of human beings.—The knowledge to which the child is to be led by instruction must, therefore, be subjected to a certain order of succession, the beginning of which must be adopted to the first unfolding of his powers, and progress kept exactly parallel to that his development—*Pestalozzi.*

ইয়োরোপে তখনকার দিনের চলিত শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশের চলিত পদ্ধতির ন্যায়ই পুঁথিকেন্দ্রী ছিল। পেস্টালোৎসির জীবনে সৌভাগ্য-জনক ঘটনা এই যে তিনি নিজেই নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতির সুফল ও তখনকার প্রচলিত মামুলী পদ্ধতির কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

পরিণত বয়সে ১৮২৭ সালে ব্রুগ (Brugg) নামক স্থানে তিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষার রূপ ও বিকাশে সংকর্মিগণের প্রচেষ্টার অজস্র প্রশংসা তিনি করিয়া গিয়াছেন। এই একটি বিশেষ গুণের জন্য তিনি অমর হইয়া থাকিবেন; কারণ কোন বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি—রচয়িতার প্রতিভা যতই থাকুক—একের প্রচেষ্টায় রূপ পায় না; বরং সহকর্মীদের প্রতিভা জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই রচয়িতার প্রতিভা মূর্ত হইয়া উঠে। পেস্টালোৎসির শিক্ষা-পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার পরবর্তী যুগে প্রচুর হইয়াছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাজগতে পেস্টালোৎসির দান অসাধারণ। কর্ম, জ্ঞান ও নিষ্ঠার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ তিনি দেখাইয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষানীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

ফ্রেড্রিক ফ্রোয়েবেল (Friedrich Froebel)

ইনি পেস্টালোৎসির একজন বিশিষ্ট অনুগামী শিশু-শিক্ষাবিদ্ এবং 'কিণ্ডারগার্ডেন' শিক্ষাপদ্ধতির জনক। ১৭৮২ সালে জার্মানীর অন্তর্গত ওবের-উইসবাক (Oberweissbach) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হন, তাঁহার পিতা—একজন ধর্মযাজক, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। মাতৃহীন ফ্রোয়েবেল বাল্য-জীবনে বয়সজনোচিত আদরযত্ন পান নাই। হফম্যান নামক এক আত্মীয় শিশু ফ্রোয়েবেলের লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে ফ্রোয়েবেলকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়; সেখানে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষাও কম বিবেচিত হইয়াছিল। পনেরো বৎসর বয়সে তরুণ ফ্রোয়েবেলকে বনবিভাগের কাজশিক্ষার্থী করিয়া ভরতি করা হয়। বৎসর দুইকাল এই বনবিভাগে শিক্ষানবীশি করা কালেই তাঁহার প্রকৃতি-বিজ্ঞানের স্বাদ ও রস গ্রহণের সুযোগ হয় এবং তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করেন। পরে তিনি নিজের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য 'জেনা' (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো মাস অধ্যয়ন করেন কিন্তু অর্থাভাবে খাওয়াপরার ঋণ শোধ না করিতে পারায় তাঁহাকে তখন নয় সপ্তাহের জন্য কারাবরণ করিতে হয়। তারপর তিনি কিছুকাল আপনাকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করেন। পরে জার্মানীর বহুস্থান ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে তিনি বিভিন্ন পেশা, যথা—হিসাব রাখার কাজ, জরিপের কাজ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মেইনে (Frankfort-on-Maine) স্থপতিরূপে কাজ করার সময় তাঁহার সঙ্গে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিচয় ঘটে, এই শিক্ষকটি পেস্টালোৎসির শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ফ্রোয়েবেলকে স্থাপত্যের কাজ ছাড়িয়া শিক্ষার কাজ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন।

তদনুযায়ী তেইশ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজে যোগ দিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহাই তাঁহার জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিবার পথ। ১৮০৭-১০ পর্যন্ত য়ারদুনে (Yverdun) তিনি পেস্টালোৎসির সহ-কর্মীরূপে কাজ করেন। তখনও তিনি নিজের শিক্ষা ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেজন্য তিনি গথিংগেন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

শুরু করেন। এই সময়ে যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠে। ফ্রোয়েবেলকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয় কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তাঁহার শিক্ষানৈতিক জীবনকে ক্লিষ্ট করে নাই, বরং নূতন প্রেরণাই দান করিয়াছিল। ১৮১৪ সালে ফনটেনব্লুতে (Fontainbleau) যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগ দেন এবং সেখানকার খনিজ-বিজ্ঞানের (Mineralogical) মিউজিয়মে কিউরেটার নিযুক্ত হন।

১৮১৬ সালে তিনি গ্রেইস্‌হেইম নামক স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিদ্যালয়টিকে কিয়েলহাউ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। পেস্টালোৎসির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিদ্যালয়ে পনের বৎসর 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতির কার্যকরী রূপ বিকাশে সচেষ্ট হন; আর এখানেই প্রসিদ্ধ কিণ্ডারগার্টেন-পদ্ধতি যথার্থ বিকাশ লাভ করে। ১৮২৯ সালে ফ্রোয়েবেল তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানুষের শিক্ষা' (Education of Man) প্রকাশ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক সামান্যই প্রচারিত ও পঠিত হইয়াছিল।*

তাঁহার শিক্ষাদর্শনের আর একটি মূল কথা—"Co-development of faculties a harmonious unity"। বিদ্যালয়ের শিক্ষার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে হইলে শিশুর শিক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন—ফ্রোয়েবেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। শিক্ষাবিদ্ কমেনিউসের (Comenius) রচনা "School of Infancy" পড়িয়া তিনি নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চয় হন।

কিয়েলহাউ বিদ্যালয় বর্তমান থাকা কালেই তিনি আর একটি সুইস্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সুইস্ clergy (ধর্মযাজক সম্প্রদায়) তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেন নাই। যাজক-সম্প্রদায়ের ধারণা হয় যে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা-প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য প্রটেস্টান্টিজম্ প্রচার করা।

তৎপর ফ্রোয়েবেল একটি শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পেস্টালোৎসির শিক্ষাদর্শনানুযায়ী নিজের শিক্ষা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাঁহার আশা ছিল যে এভাবে যুবক শিক্ষকদের দল তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি সর্বত্র প্রচার করিবে।

কিণ্ডার গার্ডেন

১৮৩৭ সালে ব্ল্যাঙ্কেন বুর্গ (Blanken burg) নামক স্থানে—কিয়েলহাউয়ের সন্নিকটে তিনি প্রথম 'শিশু উদ্যান' স্থাপন করেন, তাহার শিক্ষানীতি প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক তখন তিনি প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত কোর্স চলিতে থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার এই প্রচেষ্টা অনেক ব্যাহত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠানটি আট বৎসর কাল বাঁচিয়াছিল।

শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ 'কিয়েলহাউ'তে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। কোন সহৃদয় মহিলার (Duchess of Meiningen) আহ্বানে লিবেনস্টাইন (Liebenstein) নামক স্থানে তিনি আর একটি 'শিশু উদ্যান' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ সালে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপ্রচেষ্টা Baroness

* এই পুস্তকে শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁহার মতবাদ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—'In all things there lives and reigns an eternal law— · · · This law has been and is enounced with equal clearness and distinctness in nature (the external), in spirit (the internal), and in life which unites the two. This all-controlling law is necessarily based on an all pervading, energetic, living, self-conscious, and hence eternal unity . . This unity is God. All things have come from the divine unity, from God, and have their origin in the Divine unity, in God alone. All things live and have their being in and through the Divine Unity, in and through God. The Divine effluence that lives in each thing is the essence of each thing.

Von Bulowর দৃষ্টিগোচর হয়। এই শেষোক্ত মহিলা ফ্রোয়েবেলের অসাধারণ মনীষা ও তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বইখানার ইংরেজী নাম—"Recollection of Friedrich Froebel."

ফ্রোয়েবেল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই ইহার স্রষ্টার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং প্রকৃতিজাত সকল কিছুই যে একটা বিশেষ নিয়মের অনুবর্তী, সেই অনুভব তাঁহার হইয়াছিল। ইহা তাঁহার রচনা হইতে জানা যায়। শেষ বয়সে কিন্তু তিনি অভাবিত বাধার সম্মুখীন হন। তাঁহার কোন আত্মীয় (ফ্রোয়েবেল নামীয়)—সোসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন। ভুল ক্রমেই হউক আর সন্দেহের বশেই হউক শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেলের উপর এই পুস্তক ও ইহার মতবাদ আরোপ করা হয় এবং ১৮৫১ সালে 'ফ্রোয়েবেল পদ্ধতি' জার্মাণীতে নিষিদ্ধ হয়। ফ্রোয়েবেলের জীবনে ইহা মর্মান্তিক দুঃখকর ঘটনা। বৎসর কাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৮৫২ সালে ম্যারিয়েনথাল (Marienthal) নামক স্থানে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ফ্রোয়েবেল শিল্পশিক্ষার জন্য আজীবন শ্রম করিয়াছিলেন। শিশুর খেলা, শিশুর গান, শিশুর কর্ম-প্রবৃত্তিকে (self-activities) তাহার শিক্ষার কাজে রূপ দিতে গিয়া তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিশুশিক্ষার অগ্রদূতরূপে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় যথোচিত সমাদর লাভ করেন নাই। অর্থাভাব তাঁহার কাজের ধারাকে বারবার ব্যাহত করিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি গুরু পেস্টালোৎসির আদর্শকে যে রূপ দিয়াছিলেন—তাহা শিক্ষাজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন ও নূতন ভাবধারা আনয়নে সমর্থ হইয়াছে, পরোক্ষে অগণিত শিশু ইহার শুভফল লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। "শিশুদের জন্যই আমরা বাঁচিব"—তাঁহার এই বাণী পরবর্তী শিক্ষাব্রতীদের জীবনে মহৎ একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছে।

অটো সালোমন (Otto Salomon)

১৮৪০ সালে সুইডেনে ইঁহার জন্ম। পেষ্টা-লোৎসি ও ফ্রোয়েবেল কর্মের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা-নীতির বনিয়াদ-গঠনে জীবন দান করিয়াছিলেন আর সালোমন সাধারণ বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের শিক্ষাশিল্পের জন্য গবেষণা করিয়াছিলেন। এই গবেষণার জন্য পেষ্টালোৎসি ও ফ্রোয়েবেলের ন্যায় সালোমনকে আর্থিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। *কারণ তাঁহার এক ধনী আত্মীয়* (*Herr August Abrahamsson*) নিজের বিপুল ধনসম্পত্তি ও প্রাসাদ লোকহিতব্রতী উৎসাহী নীরব শিক্ষাব্রতী সালোমনের গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। ১৮৭২ সালে সুইডেনের অন্তর্গত 'সেবেলাঙ্গন' নামক হ্রদের তীরে সুরম্য প্রকৃতির কোলে 'নেস' নামক স্থানে শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিক্ষাশিল্প দর্শনের মূল বাণী এই; শিল্পের মাধ্যমে শরীরের চর্চা জীবন-বিকাশে সহায়তা করে; আর সেই বিকাশ বিদ্যার্থীর জীবনে একটি বিশেষ সম্পদ।

সালোমন প্রথম জীবনে কৃষিবিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জন করেন কিন্তু দেশের নৈতিক জীবনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ও সমাজজীবনে ইহার কুফল লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়ের আবশ্যক শিক্ষার মাধ্যমে তাহা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়া-লিজমের আবির্ভাবে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনের ছন্দপতন তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের বন্যায় যখন অধিকাংশ পাশ্চাত্যের সমাজবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমরা দেখিতে পাই সালোমন নীরবে শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে ইহার প্রতিকার করিতে প্রয়াসী। এ সম্বন্ধে আলোচনা

করিলে প্রথমেই দেখিতে হয় উত্তর ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থা ও তখনকার সামাজিক পরিবেশ। উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহে অর্থাৎ স্কানডিনাভিয়ার সূর্যালোকে উজ্জ্বল স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মঋতুর পরে নামিয়া আসে অন্ধকারময় দীর্ঘ শীতকাল। তখনকার দিনে দেশের শতকরা ষাট জন ছিল কৃষিজীবী। দীর্ঘ সুকঠিন তুষারময় শীতকালে কৃষকেরা খেত-খামারের কাজ করিতে পারিত না কিন্তু প্রাচীন প্রথানুযায়ী শীতকালে ঘরে বসিয়া জীবিকার জন্য কাজ করিতে বাধ্য হইত। সেজন্য গৃহের অভ্যন্তরে প্রস্তরনির্মিত চুল্লীর অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে পরিবারের সকলে—নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে এমন কি চাকর পর্যন্ত সমবেত হইত। বৃদ্ধবৃদ্ধারা প্রাচীনকালের কাহিনী মুখে পরিবেশন করিতেন; কেহ বা সঙ্গীতে উপস্থিত সকলকে আনন্দদান করিতেন, কেহ বা কবিতা আবৃত্তি করিতেন; আর এই আনন্দময় গৃহপরিবেশে সকলের হাতগুলিই কোন না কোন শিল্পকাজে লিপ্ত থাকিত। পুরুষেরা দা, খন্তি, কুড়ালের সুদৃশ্য হাতল, কাঠের থালি ও গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস অথবা কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় কাঠের যন্ত্রাদি তৈরি করিতেন, আর এ সকল জিনিস তাঁহারা সরল অথচ সুরুচিসম্পন্ন ডিজাইনে অলংকৃত করিতেন; নারীরা চরকা বা তাঁত চালাইতেন অথবা নিত্যব্যবহার্য পোষাকপরিচ্ছদ ও সূচিকর্ম করিতেন। এরূপ কাজ কখনও বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হইত না। এ জাতীয় গৃহ-শিল্পকে 'শ্লয়েড' (sloyd) বলা হইত। শ্লয়েড শব্দের প্রকৃত অর্থ হস্তনৈপুণ্য, কিন্তু সহসা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের সমাগম ও সমবায়পদ্ধতি বিস্তারলাভ করায় যুগযুগের গৃহশিল্পের ধারা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল যুগের পূর্বে ঘরে ঘরে লোকহস্তে যে কাজ সম্পাদিত হইত, সেই কাজ পূর্ণ করিতে লাগিল বৃহৎ যন্ত্র ও কারখানা, রেলওয়ে, খাল ও যানবাহনের প্রাচুর্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে তৈরি দ্রব্য সর্বত্র সহজে পৌছিতে লাগিল।

সালোমন কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অভিযান করেন নাই। কিন্তু কল-বিস্তারের ফলে দেশের সমাজ, সাংস্কৃতিক ও গৃহজীবনে যে দুর্যোগ ঘনীভূত হইতেছিল, তাহার প্রতিকার তিনি শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে রোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে তখনকার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপদমুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি লিখিয়াছেন—"ইহা সত্য যে, হাতে যে কাজ সম্পাদন করা যায় তাহা কলে করিলে সময় ও অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং যে সময় বাঁচে তাহা ব্যক্তির জীবনে সৃজনমূলক কর্মে নিযুক্ত করিলে আপত্তির কোন কারণ থাকে না; কিন্তু যদি তাহা না করা হয়,—পূর্বেকার ব্যবস্থায় যে সময় আনন্দময় পরিবেশে সৃজনমূলক কাজে নিয়োগ করা হইত, তাহা এখন যদি আলস্যের মধ্যে কাটে বা অসাধু কাজে নিয়োজিত হয়, তবে উদ্বৃত্ত সময়ের শুধু অপচয়ই ঘটে না, উপরন্তু ইহা নৈতিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়াই বিশেষ ক্ষতিকর।" সেজন্য সালোমন হাতের কাজকে তরুণ-তরুণীর অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে রূপান্তরিত করেন; বিশেষ ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—যাহাতে শিক্ষাদান ও গ্রহণ উদ্দেশ্যপূর্ণ হয় এবং সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে সম্পাদিত হয়। শিক্ষা-জগতে এই পদ্ধতিই শিক্ষানৈতিক শিল্প বা 'শ্লয়েড' বলা হইয়া থাকে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ক্রমে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পেস্টালোৎসি ও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শনে আস্থাবান্ ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রগতিসম্পন্ন শিক্ষাব্রতী দলে দলে 'নেশ' কেন্দ্রে যোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা

বাস্তব শিক্ষাশিল্প ও শিল্পশিক্ষাদান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতেন এবং সকলেই নূতন প্রেরণা লইয়া স্বদেশে ফিরিতেন। ইংলণ্ডে সালোমনের প্রভাব কতখানি বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা ব্রিটিশ শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায়। 'নেশ' প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট পাঠেও এ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়।*

আমরা দেখিতে পাইতেছি রুশো, পেস্টালোৎসি ফ্রোয়েবেল প্রভৃতি মৌলিক ও অগ্রণী শিক্ষাব্রতী-দিগকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সালোমনের দূরদৃষ্টি ও তাঁহার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ইহার প্রচার ও প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই এবং সেজন্য তাঁহার নিজের জীবনেই স্বকীয় শিক্ষাশিল্পী নীতির বিস্তার দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাশিল্প-দর্শনের মূল কথা—গঠনমূলক শিল্পের মাধ্যমে যথার্থ শরীর ও মনের চর্চা বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিকাশে সহায়ক, আর এই বিকাশ তাহাদের জীবনের একটি বিশেষ সম্পদ। সুইডেনের শিক্ষাবিভাগ সালোমন শ্লয়েড পদ্ধতিকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ইহাকে 'অবশ্য শিক্ষণীয়' শিক্ষার বিষয়-বস্তুরূপে গ্রহণ না করিলেও ইহা দেশের আবশ্যিক শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য পরবর্তী কালে সালোমন পদ্ধতিরও বিবর্তন ঘটিয়াছে, সময়ের—সমাজ ও কালের পরিবর্তনে এইরূপ বিবর্তন স্বাভাবিক ও প্রগতি-শীলতার লক্ষণ। সুইডেনের ১৯৫০ সালের "বিশেষ শিক্ষাআইন" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। শিক্ষা-নৈতিক শ্লয়েডের ক্ষেত্রও এই আইনের বলে ইতিমধ্যে অনেক সম্প্রসারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সুইডেনের জন-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষানৈতিক শ্লয়েডের দান অনন্য-সাধারণ; ইহা সমগ্র সুইডজাতিকে কর্মক্ষম করিয়া তুলিয়াছে; কর্মের ও শ্রমের যথার্থ মর্যাদা দান করিয়াছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষার আদর্শ আমরা বহুকাল অনুকরণ করিয়াছি। রক্ষণশীল ইংলণ্ডেরও গত মহাযুদ্ধের সময়ে শিক্ষাশিল্পের প্রচার ও প্রসার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের গঠনমূলক ও মৌলিক শিক্ষাবিদদের জীবনী ও দর্শন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারা প্রকৃতির খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাক্ষেত্রে মহান্ যুগের সম্ভাবনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন; পরবর্তী শিক্ষাব্রতীদের সাধনার ক্ষেত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অন্যপক্ষে পাশ্চাত্ত্যের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও নীতির বিচার করিলে (এবং ইহা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউসনের একটি অনিবার্য ফল) স্বীকার করিতে হয় যে শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও ইহার সংস্কৃতি দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন, উৎকট ভোগবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহার রাজনৈতিক শক্তির খেলা—হিংসা দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব এবং ইহাদের অপরিহার্য পরিণাম—যুদ্ধকে ডাকিয়া আনিতেছে। এক একটি যুদ্ধ ইহার গৃহ, শিশুজীবন, মাতৃজীবন—এক কথায় সমগ্র সমাজজীবনকে ক্রমেই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। জীবনের আনন্দময় ছন্দকে তাহারা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে। সমাজমঙ্গল প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের বহির্দেশের ক্ষত সারানো সম্ভব হইলেও সমাজের বনিয়াদ তথা গৃহের ও সমাজের শান্তি সুখ আজ আহরণ করা কষ্টসাধ্য হইতেছে। এমন হইতে পারে যে হিংসা, পরশোষণ, পরবিদ্বেষবিহীন রাষ্ট্রনীতি

* The Sloyd Teacher's Training Seminarium at 'Nâäs' began operations in 1872. . . . During the period of fifty years, about thee thousand foreign scholars attended the Sloyd course at Naas, and among them teachers from England and Scotland numbered more than nine hundred, inspite of the fact that the periodical courses similar to that of Sloyd began in both these countries after the year 1906.—Education and Reconstruction. By L. Sinha

গ্রহণ ও শিক্ষার মাধ্যমে মহত্তর মানবীয় সভ্যতার রসাস্বাদন করিতে পাশ্চাত্ত্যকে আরও অনেক ধাপ বা ক্রমবিবর্তনের' মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কারণ যে মহাদেশে এরূপ মৌলিক শিক্ষাবিদ্ জন্ম লইয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ কখনও অন্ধকারময় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

উদয়-মন্ত্র

শ্রীরবি গুপ্ত

দুর্যোগময়ী রজনী নিবিড়—কোরো না পথিক ভয়,
হবে তিরোহিত পান্থ তোমার সকল অরাতি-ছায়া :
জমাট আঁধার যাবে টুটে মুছে সন্দেহ সংশয়,
চির পূর্ণিমা-যামিনী-স্বপন ধরিবে কিরণ-কায়া।

দুর্লগনের ঝঞ্ঝা দারুণ জ্বালাবে মেঘের মণি
অন্তরে সে-ও ধরিয়া বজ্র—হবে তারো উল্লাস ;
বাঁধো বুকে আশা দেবে সে-ই ভাষা তুলিবে বিজয়-ধ্বনি,
আঁধার-অন্তে রাজে যে উদয় সাধিবে তারি প্রকাশ।

পথ-কণ্টক হবে তা' ব্যর্থ তোমারি চরণ-তলে,
শুধু চলো সাধি' সব জীবনের বাঞ্ছিত অভিযান ;
হের ওই জাগে নব রূপ-রাগ অরুণ-কিরণ-দলে
পান্থ তোমার ঢালে নির্ঝর তারি দ্যুতি অম্লান।

দুর্যোগময়ী রজনী নিবিড়—কোরো না পথিক ভয়
উদয়-মন্ত্রে হের নিশীথের বন্ধন হ'ল লয়।

অসহায়

শ্রীচিত্ত দেব

যা আছে আমাতে ধরিতে না পাই
ভিখারীর মতো যাচিয়া কাটাই
দিন যায় দিন কত যে।

না জানি কোথায় আশা করে থাকি
আপনারে আমি আপনিই ঢাকি
না বুঝি কি কাজে রত যে॥

দেখি ছলনার সাগর উছলি
ছলিয়া আমার নয়ন-পুতলি
ইশারায় কত কথা কয়।

তবু সে বিভব না দেখি খুঁজিয়া
বাহিরে বাহিরে মিথ্যা যুঝিয়া
জীবনের পুঁজি করি ক্ষয়॥

কাঠিয়াওয়াড়ের পুরা-কথা

স্বামী জপানন্দ

(এক)

সগু়া পটেল

ভাবনগরের রাজা বিজয়সিংহ খুব লোকপ্রিয় ছিলেন। প্রথম প্রথম কিন্তু তাঁর খুব দুর্নাম হয়েছিল। তিনি অধিকাংশ সময় শিকার খেলে বেড়াতেন এবং রাজকার্য কর্মচারীরাই চালাত। ফলে রাজ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, অত্যাচারের অবধি ছিল না, —বিশেষ করে কৃষকবর্গ একেবারে নিঃস্ব—নির্ধন হ'য়ে বর্ণনাতীত দুঃখ ভোগ ক'রছিল। প্রবাদ যে, এক কৃষকের স্পষ্টবাদিতাই তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করে। বর্তমান গল্পটি ঐ কাহিনী অবলম্বন করে লেখা।

বিজয়সিংহ একদিন শিকার করতে গিয়ে দুপুর রৌদ্রে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে এক কৃষকের কুয়ার

কাছে গেলেন এবং অঞ্জলি ভরে জল নিজে খেয়ে ও ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসলেন,—সঙ্গের লোকেরা বহু দূরে রয়ে গিয়েছিল। কৃষক 'কোষ' 'কোষ' (জল সিঞ্চনের নিমিত্ত চামড়ার বড় থলে) বলে হাঁকছিল। শতছিদ্র-বস্ত্রাবৃত শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ তার এবং চোখে মুখে দারুণ ক্লেশের চিহ্ন ; বলদ দুটাও জরাজীর্ণ—জির জির ক'রছে হাড়, যেন যমরাজা তাদের ভুলে থাকায় বিষাদযুক্ত ! বিজয়সিংহের আর বুঝতে বাকি রইলো না—কৃষকের দুরবস্থা কতটা ! কৃষক আপন মনে কোষ হাঁকছিল, তাঁর প্রতি লক্ষ্য ও করলে না। একটু আরাম করতেই ক্ষুধা তার কায়েমী সত্ব জাহির করলে এবং তিনি তার তাড়া সহ্য করতে না পেরে বল্লেন—"এই পটেল। কিছু খাবার আছে ?" [পটেল—হচ্ছে সাধারণ ভদ্র শব্দ কৃষকমাত্রের প্রতি প্রযোজ্য। আবার যারা কৃষকদের জ্ঞাতি-মোড়ল বা মণ্ডলাধ্যক্ষ, এবং রাজ্যকর্তৃক নিযুক্ত গ্রামের 'প্রধান', তাদেরও 'পটেল' ব'লে]

পটেল।—এই হাড়মাস বাকি আছে বাপ ! খেয়ে শান্ত হও।

বিজয়সিংহ।—পটেল ! বড় ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু নেই কী ?

পটেল—রাজা কি আর কিছু রেখেছেন ? শিকার, শিকার, শিকার ! এদ্দিকে রাজ্য যে তাঁর লোকেরা লুটে খাচ্ছে, প্রজার সর্বনাশ ক'রছে, চাষার ঘরে অন্ন নেই—তার খবরই রাখেন না। কী লক্ষীছাড়া রাজাই হলো রে বাপ ! পেট ভরে একবেলা দুটি অন্নও জুটছে না। হে ভগবান, গরীবের কি কেউ নেই রে ?……[একটু চুপ করে থেকে]—তা তোমায় কি আর খেতে দিব ? একটু ঘেঁস খাবে ? [ঘেঁস—গম বা বাজরার আটা 'ছাশ' অর্থাৎ তক্রে সিদ্ধ ক'রে একটু নুন মসলা সংযোগে করে। ইহা ইংরেজী Porridge এর মত।]

বিজয়সিংহ—তাই নিয়ে এস, খুব খিদে পেয়েছে।

একটি হাঁড়িতে 'ঘেঁস' ছিল, কৃষক তা নিয়ে এসে, দু'তিনটি বট পাতা দিয়ে ঠোঙা তৈরি করে তাতে ঘেঁস খেতে দিল। জীবনে বোধ হয় সেই প্রথম ঘেঁস খেলেন বিজয়সিংহ, পূর্বে হয়তো নামই শুনেছিলেন। গরীবের খোরাক, রাজা-রাজড়া কী আর খায় ! সে যা হোক খেতে খুব সুস্বাদু লাগলো, তাই ঠোঙা যখন আর একবার সে ভরে দিল, তিনি একেবারেই আপত্তি করলেন না। ভেক্‌জিহ্বা কৃষক অত কর্কশ কথা বল্লেও যখন খাওয়াচ্ছিলো তার নিজের মুখের গ্রাস, তখন তার মুখে কিন্তু দৈন্যের রেখা ছিল না।

পেটটি ভরলে তৃপ্তি হল, তখন জিজ্ঞাসা করলেন—"পটেল ! তোমার নামটি কি ?"

"আর নাম-ধাম নিয়ে কাজ কি বাপ !—তোমার ক্ষুধার শান্তি হয়েছে ত ? বাস !" ···বল্লে পটেল। বিজয়সিংহ।—বলি যদি কখনও ওদিকে—ভাবনগরে এস······

পটেল।—ভাবনগরকে দূর থেকেই নমস্কার ! যদি কাজকর্মে কখনও যাই তো অমনি দরবারের (রাজার) ব্যাগার ঠেলতে জুড়ে দেয়, জোর জুলুম করে। আমার কাজ হউক্ না হউক্ তাঁর ব্যাগার পুরো করলে তবে নিস্তার। অহহহ ! জুলুম ······ জুলুমের কি আর অন্ত আছে !······

বিজয়সিংহ।—পটেল ! তুমি এত সৎকার করলে, তোমার নামটি না জেনে কি আর খেতে পারি ? কখনও······

পটেল।—সৎকার তো ঠিক ভা ! আমার নাম সণ্ডা পটেল।* ···এ রাম রাম ভা !······ "রাম, রাম সণ্ডা ভাই !" বোলে বিদায় নিলেন বিজয়সিংহ। রাস্তায় শিকারীদলের সঙ্গে দেখা হল।

* রসধার পুস্তকে—সোঁডা পটেল।

[কাঠিয়াওয়াড়ে রাজপুত ক্ষত্রিয়দের নামের শেষে "ভা" জোড়ে এবং অন্য সকলের—"ভাই", সম্মানার্থক শব্দ। কাঠিদের নামের আগে বা পরে জোড়ে—"আপ্পা বা আপা।"]

সগুা পটেলের কটু কিন্তু নিছক সত্য কথা বিজয়সিংহের অন্তরের আসুরী প্রবৃত্তি নষ্ট ক'রে দিব্য প্রেরণা দিলে, তিনি এখন হতে রাজকার্যে মন দিলেন,—কর্তব্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সগুাকে তিনি ডাকিয়ে পাঠালেন। সেপাই যখন সগুার পর্ণকুটিরের দ্বারে গিয়ে তাকে রাজাজ্ঞা শোনালে, সগুার ভারী রাগ হলো,—"ঐ যে 'ঘেঁস' খেয়ে গেল রাজপুত, সে-ই নিশ্চয় রাজাকে বলে দিয়েছে, আমার সর্বনাশ করেছে! (স্ত্রীর প্রতি) আর কী, তোমরা নিজেদের রাস্তা দেখ। জেলে চল্লাম। সেদিন রাগের মাথায় রাজাকে গাল দিয়েছিলুম, আজ সেপাই এসেছে ডাকতে। বাস, চল্লাম! …(মরিয়া হয়ে) …গিয়ে মুখের উপরই শুনিয়ে দিব, যা পারে ক'রবে! মিথ্যা তো নয়! জুলুমের চোটে মলুম যে!"……

বিজয়সিংহ রাজসভায় বসেছিলেন সভাসদ পরিবেষ্টিত হ'য়ে, সেপাই সগুা পটেলকে নিয়ে হাজির হল। সগুা দেখে—সেদিনকার সেই রাজপুত অন্য কেহ নয় স্বয়ং ভাবনগরের অধিপতি! তার লজ্জা হল, কিন্তু ভয় হল না। সে তো মিথ্যা বলে নাই। বিজয়সিংহ প্রসন্নদৃষ্টিতে তার প্রতি দেখলেন এবং ডেকে কাছে বসালেন। …"সগুা পটেল! অমন সুস্বাদু ঘেঁস আমি জীবনে খাই নাই, ওটা অমৃতের কাজ কাজ করেছে। …আচ্ছা, তোমার জমি কতটা?" পটেল—"এই সামান্য বাপু! দু' সাঁথী* হবে, আর ঐ কুয়াটি"……

বিজয়সিংহ।—"আজ হতে তোমার দশ সাঁথী হলো (দেওয়ানকে)—একে দশ সাঁথীর উপযোগী বলদ ও অন্য খরচাদি দেওয়ান্। …সগুা! তোর বংশ এ জমি ভোগ দখল করবে লিখে দিলাম।"… এবং নূতন পাগড়ি আনিয়ে তাকে বাঁধালেন আর নানাভাবে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। বাড়ী ফিরে যখন তার স্ত্রীপুত্রদের সব ঘটনা বল্লে, তাদের আর আনন্দের সীমা রইলো না। —"শত বৎসর সুখে রাজ্য কর বিজয়সিংহ, অমর হউক তোমার কীর্তি" —ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ দিল সগুার গৃহিণী।

* সাঁথী—সাঁতী—সাথী—স্থানভেদে। জমির জরীপ-মাপবিশেষ ওদেশে প্রচলিত]

(দুই)

মা সোন বাই

সে অনেক দিনের কথা,—তখন সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র-শক্তির জন্ম হয় নাই, আর ইংরেজ বাহাদুর বণিক্‌-বৃত্তি নিয়ে এদেশে সুদৃঢ় ঘাঁটি করে নাই—'জোর যার, মুল্লুক তার' এই নীতিই প্রবল ছিল। কাঠিয়াওয়াড়ে কাঠি ও রাজপুত রাজন্যেরা রাজ্য করছিল। আর অনেক কোল, খুঁটি, বাঘের ইত্যাদি জাতি কোথাও ছোট ছোট গণরাজ্য, কোথাও বা স্বতন্ত্র গ্রাম কিংবা গ্রামযুত স্থাপন করে বসেছিল। অথবা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সমগ্র প্রদেশে লুটতরাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পৌণ্ড্‌ বা পিণ্ডরা জাতির ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র দল তখন পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে থাকতো আর মাঝে মাঝে লুটপাট করে গ্রামীণদের সঞ্চিত সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে চলে যেত, এবং পশ্চাতে রেখে যেত—আতঙ্ক ও মৃত্যুর বিভীষিকা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ছবির মত সুদামড়া—কাঠিদের একটি ছোট্ট পুরাতন গ্রাম। এই গ্রামে সকলেরই সমান ভাগ। বড় ছোট সকলেরই সমান

অধিকার গ্রামের উপর, এবং তাই যুদ্ধ-বিগ্রহে সমান ভাবেই তারা ভাগ নিত। সকলেরই গৃহে অন্ন ছিল। প্রত্যেকেরই ছিল ২।৪টি গরু-মোষ, অর্থের সচ্ছলতা না থাকলেও অভাব ছিল না, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম ছিল না। হুকুমের তাঁবেদারি ছিল কিন্তু প্রীতির বন্ধনও ছিল। কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য ছিল না এবং অর্থবল, লোকবল ইত্যাদি হেতু কেহ বিশেষ প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা রাখতো না। তাই, ঈর্ষাশূন্য শান্তিময় জীবন ছিল তাদের—নিষ্কপট আনন্দের জীবন ছিল তাদের। হঠাৎ একদিন ঐ পৌণ্ড্রা আক্রমণ করলে গ্রাম। সেদিন কার্যোপলক্ষে অধিকাংশ বয়োজ্যেষ্ঠরা গ্রামান্তরে গিয়েছিল, গ্রামে উপস্থিত ছিল অল্পবয়স্ক যুবকগণ আর বৃদ্ধেরা। পৌণ্ড্দের বাজনা শুনতেই ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠলো। উপায়? বিশে পা দেয় নাই এমন কতকগুলি কচি যুবক কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পরস্পর মুখ দেখাদেখি করছিল। তারা তখন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে ("চৌরাহ"-বলে ওদেশে) বসে এক চারণ বৃদ্ধের কাছে কাঠি জাতির বীরত্বপূর্ণ পুরা কথা শুনছিল। চারণ আর থাকতে পারলে না—"বলি. মুখ দেখাদেখি করছ কী? অসি নিয়ে শত্রুর মুখ দেখতে প্রস্তুত হও।" কিন্তু নেতাবিহীন ঐ মুষ্টিমেয় কচি যুবকের দল তবুও সাহস করতে পারছিল না। "ধিক্ তোদের জনক, আর ধিক্ তোদের জননী! তেজহীন ছাগদুগ্ধ তাদের স্তনে ছিল দেখছি, তা না হ'লে ··" এ কশাঘাত ভীষণ লাগলো এবং তাদের জননীর স্তনে যে সিংহীর দুধ ছিল তা প্রমাণ করবার জন্য তারা অধীর হয়ে বলে উঠলো—"ব্যস, দাদা, ব্যস! আমরা যে কেমন মায়ের দুধ খেয়েছি তা দেখে নাও!"

এমন সময়—'জয় মা, জয় মা জগদম্বে' রব চকের দিক হতে আসছে তারা শুনতে পেলে। দৌড়ে সে দিকে গিয়ে দেখে—মা সোনবাই, বুড়ো আপ্পার গৃহিণী কোমর বেঁধে করে অসি নিয়ে রণরঙ্গিণী হয়ে যুদ্ধার্থে সকলকে আহ্বান করছেন। ছেলেরা লজ্জিত হল, এ দৃশ্যে তাদের প্রাণে অসীম সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত করলে, আর মরিয়া হয়ে পড়লো তারা পৌণ্ড্দের দলের উপর। ভীষণ লড়াই হলো, মরণপণ করে মা সোনবাই ও তাঁর ছেলেরা যুদ্ধ করছিলেন। অন্য অনেকের সঙ্গে তারাও আহত হয়ে ধরাশায়ী হলো এবং অন্তে মৃত্যুকে বরণ করলে। কিন্তু পৌণ্ড্রা গ্রাম লুটতে পারলে না। বহুসংখ্যক হতাহত রেখে তারা পালিয়ে গেল।

রাত্রির সময়, সর্বত্র নিস্তব্ধ—শোকমগ্ন সকলে নিজজনদের অন্বেষণ করছে যুদ্ধক্ষেত্রে। দেখলে এক অপূর্ব দৃশ্য—ক্ষতবিক্ষত দেহে মা সোনবাই একটি পাথরে ঠেসান দিয়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা, আর তাঁর কোলে মাথা দিয়ে তদ্রূপ শায়িত রয়েছে তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তান ও আশেপাশে গ্রামের অন্য ছেলেরা—কেহ মৃত, কেহ বা অর্ধমৃত এবং কেহ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে।······ 'জয় মা জয়' বলে সবাই তাঁকে নমস্কার করলে।

কালিদাস-নাটকে হাস্যরস

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বোস, এম-এ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ

মহাকবি কালিদাস-প্রণীত নাটকে হাস্যরসের অবতারণা এবং এই বিষয়ে তিনি কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে হাস্যরসের স্বরূপ ও সংস্কৃত-নাটকে ইহার সৃজন-কৌশল সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা প্রবন্ধের মুখবন্ধে উল্লেখ করা যাইতে

পারে। মানুষের মনের ইমোশান্ বা ভাব অনন্ত। এই ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে আলংকারিকেরা বলেন স্থায়ীভাব। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি নয়টি স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে। হাস এই নয়টির অন্যতম। বিকৃত আকার, অদ্ভুত কার্য, অস্বাভাবিক বেশভূষা দর্শনে এবং বাগ্বৈদগ্ধ্য শ্রবণে মানুষের মনে যে প্রসন্নতাসমন্বিত অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকে হাস বলা হয়। এই হাসই আবার অঙ্গবৈকল্য, অদ্ভুতবাক্য, আশ্চর্যজনক সাজসজ্জা প্রভৃতি বিভাব (স্থায়ীভাবের উদ্বোধক); চক্ষুসংকোচন, বদনস্মেরতা প্রভৃতি অনুভাব (যে সমস্ত স্বাভাবিকবিকার ও উপায়ে তাহা বাহিরে প্রকাশ হয়); এবং নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাবের (এই ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না, কোন না কোন স্থায়ীভাবের সম্পর্কেই যাতায়াত করে) সহযোগে হাস্যরসে পরিণত হয়।

ইংরেজী সাহিত্যে হাস্যরস বুঝাইবার জন্য humour, fun, wit, satire প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই সকল শব্দে হাস্যরসের প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃতনাটকে প্রধানতঃ wit বা বাগ্বৈদগ্ধ্যজনিত হাস্যরসের অবতারণাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। Wit বা বাগ্বৈদগ্ধ্য হইতে উৎপন্ন হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অতর্কিতে পাঠক বা শ্রোতার মনকে ধাঁধাঁইয়া তুলে এবং ইহার স্রষ্টা স্বয়ং হাসে না কিন্তু পরকে হাসায়। সংস্কৃতনাটকে হাস্যরস পরিবেশন করা হয় নায়কসখা বিদূষক বা বয়স্যের উক্তির মাধ্যমে। আলংকারিকেরা বিদূষকের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে অঙ্গবৈকল্য, অদ্ভুতকার্য, বিচিত্র সাজসজ্জা এবং আশ্চর্যজনক বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির সাহায্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করাই মুখ্যতঃ তাহার কাজ।

মহাকবি কালিদাস তৎপ্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী ও অভিজ্ঞানশকুন্তলা—এই নাটকত্রয়ে চিত্রিত বিদূষক-চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। কালিদাস যে কেবল জীবনের প্রধান ও গভীর সমস্যাকে উপযুক্ত বিষয়বস্তুর সাহায্যে তাঁহার নাটকে রূপ দান করিয়াছেন তাহা নহে, জীবনের লঘুহাস্যপরিহাসচঞ্চল দিক্‌টাকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। গভীর রস ও ভাব তাঁহার প্রধান উপজীব্য হইলেও চিন্তাভারাক্রান্ত পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া তাহাদের মুখে সাময়িক হাস্যের অনাবিল দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিতেও তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে উক্ত নাটকত্রয়ের বিদূষকচরিত্রের ভিতর দিয়া মহাকবির নাট্যপ্রতিভা যে সম্যক্ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্রাবয়ব প্রবন্ধে প্রধানতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলার হাস্যরসই আলোচিত হইবে এবং প্রসঙ্গক্রমে অপর দুইটির হাস্যরসেরও স্বল্প আলোচনা করা হইবে।

অমরকবি কালিদাসের লেখনীপ্রসূত প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে বিদূষকের হাস্যরস পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে তত আকর্ষণ করে না যত করে তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা। তথাপি হরদত্ত ও গণদাস নামক নৃত্যশিক্ষকদ্বয়কে উত্তেজিত করিবার দৃশ্যে, পরিব্রাজিকার বর্ণনায় এবং রাজ্ঞীর অঙ্গুরীয়ক-প্রাপ্তির দৃশ্যে তাহার রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সাধারণচরিত্র বিদূষককে আশাতীত প্রাধান্য দিয়া প্রায় প্রত্যেক অঙ্কেই তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। সার্থক নাটকীয় পরিণতির জন্য তাহার সৃষ্টি অপরিহার্য এবং হাস্যরসপরিবেশন নিতান্তই গৌণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মহাকবি স্বয়ং এই ত্রুটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং মনে হয় এই কারণেই তৎপ্রণীত দ্বিতীয় নাটক বিক্রমোর্বশীতে

বিদূষক-চরিত্রের প্রাধান্য অনেকাংশে খর্ব করিয়াছিলেন।

বিক্রমোর্বশী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রাজ্ঞীর পরিচারিকা নিপুণিকা কর্তৃক বিদূষকের নিকট হইতে রাজা পুরুরবার প্রণয়ের গোপন তথ্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অতিশয় হাস্যোদ্দীপক। জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করা বিদূষক চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই নাটকে অনুপযুক্ত অবসরে ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করিয়া একাধিকবার হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলিয়া দিলাম—"নিমন্ত্রণিকঃ পরমান্নেনেব রাজরহস্যেন স্ফুটন্ন শক্নোমি আকীর্ণ আত্মনো জিহ্বাং রক্ষিতুম্।" নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ যেমন পরমান্নদর্শনে স্বীয় জিহ্বা সংযত রাখিতে পারে না তদ্রূপ আমিও রাজরহস্যের দ্বারা আকুলিত হইয়া আপন জিহ্বাকে শাসনে রাখিতে অক্ষম। অন্যত্র চন্দ্রকে মোদকের সহিত তুলনা করিয়া বিদূষক বলিল—"খণ্ডমোদক-সশ্রীক ইব উদিতো রাজা ঔষধীনাম্। ঔষধিপতি চন্দ্র মোদকখণ্ডের সৌন্দর্যবিমণ্ডিত হইয়া উদিত হইয়াছে। রাজা পুরুরবা তৎকর্তৃক উর্বশী দুর্লভা এই মত ব্যক্ত করিলে উপজাতকৌতূহল উর্বশীর সৌন্দর্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল—"কিং তত্রভবত্যুর্বশ্যহমিব সুরূপতয়াদ্বিতীয়ারূপেণ।" আমি যেমন দৈহিক গঠনে অদ্বিতীয় উর্বশীও কি আমার মত সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়া? বস্তুতঃ বিদূষকের রূপ যে বানরের মত তাহা চেটীর উক্তি হইতে জানা যায়,—"এষ খলু আলিখিতো বানর ইব।" বিদূষক আরও বলিল যে স্বর্গও তাহার কাম্য নয়, কারণ সেইখানে পানাহারের সুযোগ নাই, কেবল অপলক দৃষ্টিতে অপ্সরাদের রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া মৎস্যত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। "ন বা অশ্যতে ন বা পীয়তে। কেবলম্ অনিমিষৈঃ নয়নৈর্মীনত্বং বিড়ম্ব্যতে॥" উক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই নাটকে বিদূষক হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্বোক্ত নাটকে অঙ্কিত বিদূষক চরিত্র হইতে এই নাটকের বিদূষকচরিত্রের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু কবি তাহার যথাযোগ্য স্থান এই নাটকেও নির্দেশ করিয়া দিতে সমর্থ হন নাই।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা মহাকবি কালিদাসের নাট্য-প্রতিভার সার্থক পরিণতির অপূর্ব নিদর্শন। অপর দুইটি নাটকে অঙ্কিত বিদূষক চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্জন করিয়া আলোচ্য নাটকে সার্থক ও সঙ্গতিপূর্ণ বিদূষক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদূষক চরিত্রের নাটকীয় পরিণতির প্রয়োজনীয়তা এবং হাস্যরসপরিবেশন এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তসহচর বিদূষকের সহিত পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। মৃগয়াশীল নৃপতি দুষ্মন্তের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল বিপদের সম্মুখীন হইয়া দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে বিদূষক তাহার এক হাস্যোদ্দীপক ফিরিস্তি পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের নিকট পেশ করিল। একে ত পানাহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত, তদুপরি অবিরত অশ্বারোহণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকল হইয়াছে শিথিল, তাহারও উপর আসিয়া পড়িল আর একটা উপগ্রহ। রাজা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার কথাও উল্লেখ করেন না। এই অবস্থাকে বিদূষক রসগর্ভ বাক্যে প্রকাশ করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিল—"ততো গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ।" সেইজন্য "গোদের উপর বিষফোড়া" হইয়াছে। ইংরেজীতে যেমন বলা হয়—"Misery added to misery" এবং "One woe succeeding another".

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদূষক মৃগয়ায়

বহির্গত হইতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য দূর হইতে নৃপতি দুষ্মন্তকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে অঙ্গবিকৃতি করিয়া দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনে বিদূষক দণ্ডায়মান হইল এবং রাজাকে জানাইল—"বয়স্য ন মে হস্তপাদং প্রসরতি; বাঙ্‌মাত্রেণ জাপ্যসে"। বয়স্য, আমি হস্তপদ পরিচালনা করিতে অক্ষম সুতরাং আপনাকে বাক্যের দ্বারা মাত্র অভিবাদন করিতেছি। দুষ্মন্ত বিদূষককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"কুতঃ কিল স্বয়মক্ষীণি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি"। আপনি স্বয়ং চক্ষুকে পীড়া দান করিয়া অশ্রু কোথা হইতে আসিল—এই প্রশ্ন করিতেছেন কেন? নৃপতি দুষ্মন্ত ইহার মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিদূষক আরও মনোরম বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে বলিল—"ভো বয়স্য, যদ্ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিমাত্মনঃ প্রভাবেন ননু নদীবেগস্য।" বেত্রলতা যে কুব্জলীলা অর্থাৎ বক্রত্ব অনুকরণ করে তাহা কি নিজের প্রভাবে না নদীর স্রোতের প্রভাবে, রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন,—"নদীবেগস্তত্র-কারণম্।" নদীর স্রোতের বেগই তাহার কারণ। বিদূষক এইবার স্পষ্ট করিয়া বলিল—"মমাপি ভবান্।" আমার এই অঙ্গবৈকল্যের কারণও তাহা হইলে আপনি।

কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার সহিত প্রথম মিলনের পর রাজা দুষ্মন্ত কি প্রকারে তাহার সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ করা যায় তাহা পরামর্শ করিবার জন্য নিভৃতে বিদূষককে বলিলেন—"মম একস্মিন্ কর্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্।" আমার একটা কার্যে তোমাকে সহায় হইতে হইবে। তদুত্তরে বিদূষক সোল্লাসে ভোজ্য-দ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"কিং মোদক-খাদিকায়াম্? তেন হি সুগৃহীতোঽয়ং জনঃ।" কি মোদক খাইবার ব্যাপারে? সেই কার্যে এই ব্যক্তি অতিশয় পটু।

নৃপতি দুষ্মন্ত শকুন্তলার অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় রূপ বর্ণনা করিয়া উপসংহারে যখন বলিলেন—"ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।" জানি না স্রষ্টা কোন ভোগীকে এই রত্ন উপহার দিবেন। তখন বিদূষক রসাল বাক্যে উত্তর দিল—"তেন হি লঘু পরিত্রায়তামেনাম্। সা কস্যাপি তপস্বিনঃ ইঙ্গুদীতৈলচিক্কণশীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি।" তাহা হইলে শীঘ্রই আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, নতুবা সে ইঙ্গুদীতৈল প্রয়োগে মসৃণমস্তক কোন তপস্বীর হস্তে পতিত হইবে।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম হইতে আগত ঋষিকুমারদ্বয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দুষ্মন্ত যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসবধের নিমিত্ত আশ্রমে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই বার্তাবহ করভক আসিয়া জানাইল যে রাজমাতার আদেশ—পুত্রপিণ্ডপালন-ব্রতে দুষ্মন্তের উপস্থিতি অপরিহার্য। দুষ্মন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদূষকের পরামর্শ চাহিলেন—"ইতঃ তপস্বিকার্যম্, ইতো গুরুজনাজ্ঞা। দ্বয়মপি অনতিক্রমণীয়ম্। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।" একদিকে ঋষিদের প্রতি কর্তব্য অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ—উভয়ই পালনীয়। এখন কি করা কর্তব্য। বিদূষক তদুত্তরে বলিল—"ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরা তিষ্ঠ।" ত্রিশঙ্কু যেরূপ স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন তদ্রূপ আপনিও উভয়েরই অন্তরালে অবস্থান করুন। এইরূপ রসগর্ভ উক্তিতে যে নিতান্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষের মুখেও হাসি ফুটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পর্যন্ত উদ্ধৃতিসমূহ ও ইহাদের ভাবানুবাদ উল্লেখ করিয়া আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, কালিদাস হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন প্রধানতঃ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য-সমন্বিত উক্তির মাধ্যমে। স্থানে স্থানে বিদূষক অঙ্গবিকৃতির দ্বারাও হাস্যরসের উপকরণ জোগাইয়াছে। মহাকবির হাস্যরস শুচিশুভ্র, সংযত ও উপভোগ্য। তাঁহার হাস্যরসের মধ্যে কোথাও ব্যঙ্গের খোঁচা নাই, বিদ্রূপের কাঁটা নাই, সর্বত্রই

তাহা স্নিগ্ধতায় বিমণ্ডিত। কোথাও এই হাস্যরস অশ্লীল ভাঁড়ামিতে পরিণত হয় নাই। মহাকবির সালংকারা ভাষা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যসমন্বয়ে হাস্যপরিহাসের ফেনরাশি উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁহার হাস্যরস কখনও চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহার হাস্যরস একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। হাস্যরসের অবতারণায় কবির দৃষ্টি ততটুকু নিবদ্ধ ছিল না যতটুকু ছিল গভীর ও জটিল আদিরসের অভিব্যক্তিতে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের সুচিন্তিত অভিমত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। "Kalidasa's perfect artistic sense which was his good genius throughout his life, and which enabled him to do perfectly what he could do and not try at all where he could not achieve perpection whispered to him to control and limit himself when he came to the land of laughter."

স্বতন্ত্র

'অনিরুদ্ধ'

আমার যে চেয়ে থাকা
সে তো নয় সুদূর আকাশে—
ব্যাকুল পরাণে ডাকা
নহে কারো ফিরিবার আশে।

আমি যাহা দেখিবারে চাই
রয়েছে তা নিকটে সদাই।
যতবার করিনু আহ্বান
জাগালেম আপনারি প্রাণ।

আমার যে জানাজানি
সে তো নয় পুঁথির সম্ভার—
যদি কেহ বলে মানী
সে গৌরব নহে হেথাকার।

যেই জ্ঞানে নাহি ভয় শোক
আমারি তা অন্তর-আলোক।
ভাঙে যবে ক্ষুদ্র যত সীমা
রাজে নিত্য ভূমার মহিমা।

আমি আঁকি যত ছবি
সে তো নয় সাত রঙ দিয়া—
যেখানে হয়েছি কবি
কভু নয় শব্দই বুনিয়া।

অফুরান বর্ণ ও আকার
চিত্রপটে ধরেছি আমার।
মোর ছন্দ অলঙ্কার গতি
রহে যেথা বাক্যের বিরতি।

আমার আনন্দ নয়
দেখা ছোঁয়া কোন কিছু সনে—
সাধনার পরিচয়
বিস্তারিয়া বুঝাব কেমনে?

আমার ফুরালো যত পথ
পুরিয়াছে সব মনোরথ।
যাহা কিছু চিন্তায় ভাষায়
দেখিনু তা আপন সত্তায়।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী—

মফস্বলের কোন জেলাস্কুলে পড়িবার সময় প্রথম বেলুড় মঠ দর্শনের সুযোগ হয়। পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজীকে (বাবুরাম মহারাজ) পত্র লিখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবের সময় আসিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। বাল্যকালে মঠ দর্শনের সেই স্মৃতির অন্য কিছু তেমন মনে নাই—একটি জিনিস শুধু অবিস্মরণীয় হইয়া আছে—ঠাকুরঘরে বাবুরাম মহারাজের আরতি করার দৃশ্য। একটি লাল জবাফুল লইয়া যখন তিনি ঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন তখন যত না ঠাকুরের দিকে চাহিয়াছিলাম, মনে পড়ে, সমস্ত প্রাণের আকর্ষণ নিবদ্ধ হইয়াছিল গৈরিকপরিহিত গৌরদেহ সন্ন্যাসী-পূজকের প্রেমবিহ্বল তদ্গত আরাধনার দিকে। সেবার কয়দিন মঠে ছিলাম; উৎসব দেখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন—"এখন ফিরে গিয়ে পড়াশুনা কর। সময় হলে নিশ্চয়ই আসবে।"

'সময়' কিন্তু আসিতে দেরি হইল। ছেলেবেলার স্মৃতি সংসারের বেগবান্ কালস্রোতে প্রায় ভাসিয়াই গিয়াছিল। বড় হইয়া শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হইলাম। অনেক দিন পরে কার্যস্থলে ডাকবিভাগের জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। ইনি বেলুড় মঠের অনুরাগী এবং স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য পূজনীয় সুধীর মহারাজের (স্বামী শুদ্ধানন্দজী) বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। একবার গঙ্গাসাগর মেলার সময় যোগাযোগ করিয়া আমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। সুধীর মহারাজের সহিত আলাপ হইল। সঙ্গী ভদ্রলোকের বিশেষ ইচ্ছা ছিল জয়রামবাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া আসেন। আমাকেও ঐ একই উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতে উৎসাহিত হইলেন। আমি কিন্তু পিছাইয়া গেলাম—কারণ তখনও পর্যন্ত দীক্ষা লওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্নই আমার মনে উঠে নাই। তাহা ছাড়া, গৃহসংস্কারবশতঃ কুলগুরু ব্যতীত অপর কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পাপ হয় এই বদ্ধমূল দৃঢ় ধারণাও প্রতিবন্ধরূপে সম্মুখে দাঁড়াইল। সে যাত্রা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়া হইল না। সেই ভদ্রলোকও গেলেন না, কারণ স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খুবই পীড়িত, এখন গেলে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিবে না।

কার্যস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। যতদূর মনে পড়ে খ্রীঃ ১৯১৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির কিছুদিন পূর্বে শেষরাত্রে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে একটি মন্ত্রলাভ ঘটিল এবং লালপেড়ে শাড়ী পরিহিতা একজন দেবীমূর্তির দর্শনও পাইলাম। এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে চিত্তের সংস্কারসমূহে একটি যেন বিপ্লব উপস্থিত হইল। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রটির যথাযথ ব্যবহারপ্রণালী ও মর্মার্থ অবগত হইবার জন্য হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে সন্ন্যাসীদের নিকট যাইবার প্রেরণা বোধ করিতে লাগিলাম। সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপন্থা অবলম্বনের আকর্ষণও দেখা দিল। যাহা হউক অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, কারণ সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের সহিত অনেকদিন পূর্ব হইতেই আমার পরিচয় হইয়াছিল। কাঁকুড়গাছিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজভোগ উৎসব এবং বেলুড় মঠের মহোৎসব খুবই আনন্দসহকারে দর্শন করিলেও

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইবার জন্য খুবই ব্যাকুলতা বোধ করিতে লাগিলাম। আমার সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময় যশোহর হইতে শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য নামক জনৈক ভদ্রলোক কাঁকুড়গাছি মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় জানিতে পারি তিনি অনেকদিন পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শীঘ্রই জয়রামবাটী যাইবেন স্থির করিয়া এখানে আসিয়াছেন। আমি ও শ্রীযুত অশ্বিনী বাবু শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য শীঘ্রই জয়রামবাটী যাইব শুনিয়া কাঁকুড়গাছির একজন সন্ন্যাসীও আমাদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্বপ্নে মন্ত্রলাভের পর আমার মন হইতে কুলগুরুসংস্কার ক্ষীণ হইতে থাকে। জয়রামবাটী রওনা হইবার ঠিক পূর্বদিন সকালে শ্রীশ্রীগৌরীমার আশীর্বাদলাভের জন্য শ্যামবাজারে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দোলপূর্ণিমার পূর্ব একাদশীতে বৈকাল বেলা আমরা তিন জনে তারকেশ্বরের গাড়ী ধরিবার জন্য কাকুড়গাছি হইতে পদব্রজে হাওড়া ষ্টেশন রওনা হই। আমি ও অশ্বিনী বাবু ধীরে ধীরে চলিতেছিলাম কিন্তু কাঁকুড়গাছির সন্ন্যাসী মহারাজ পক্ষীরাজের ন্যায় তাড়াতাড়ি আগাইয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, আমরা তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও পাইলাম না। স্থির করিলাম নিশ্চয়ই ষ্টেশনে দেখা হইবে। শ্রীযুত অশ্বিনী বাবুর পরামর্শানুসারে পূজাদির উদ্দেশ্যে বড়বাজার হইতে পাঁচ প্রকার ফল খরিদ করিলাম। শেষে শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহারোপযোগী সরু লালপেড়ে ধুতি ক্রয় করিবার জন্য সমস্ত বড়বাজার অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায় যখন খুবই দুঃখিত হই তখন আমার মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অশ্বিনী বাবু বলিয়া উঠেন "দুঃখের কারণ নাই, মায়ের দেশে ওই প্রকার কাপড় অনেক আছে।" অগত্যা নিরাশ হইয়া মাকে স্মরণ করিতে করিতে ষ্টেশনে যাইবার সময় হ্যারিসন রোডে একটি কাপড়ের দোকান দেখিতে পাইয়া আমরা কৌতূহলবশতঃ সেই দোকানে যাইয়া পুনরায় অনুসন্ধান করিবার পর সেইরূপ মনোমত কাপড় মাত্র এক খানা পাই। ঐ কাপড়খানা খরিদ করিয়া মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সেই সন্ন্যাসী মহারাজকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া গেল না। তাহার পর ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিলাম তারকেশ্বরের গাড়ী অর্ধ ঘণ্টা পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে। সারারাত্রিতে আর গাড়ী নাই, অগত্যা আমরা শ্রীরামপুরে গিয়া অশ্বিনী বাবুর জনৈক আত্মীয়ের অতিথি হইলাম এবং পরদিন সকালের গাড়ী ধরিয়া বেলা ৯৷১০টার সময় তারকেশ্বর পৌঁছিলাম। সেই সন্ন্যাসী মহারাজকে দেখিতে পাইলাম। তিনি রাত্রিকার সেই গাড়ীতে বরাবর তারকেশ্বর চলিয়া আসিয়াছেন বলিলেন। আমরা তিন জনে একত্র হইবার পর আমাদের মনের উদ্বেগ চলিয়া গেল। আনন্দে স্নানাদি শেষ করিয়া যথাসাধ্য বাবা তারকনাথের পূজা এবং মনোবাসনা নিবেদন করিয়া আহারান্তে সামান্য বিশ্রামের পর বেলা ২টার সময় কামারপুকুর রওনা হইলাম। সন্ধ্যানাগাদ দামোদর নদী পার হইয়া আরামবাগগামী একটি গরুর গাড়ীতে রাত্রি অনুমান ৯টার সময় আরামবাগে পৌঁছাইলাম। গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া পুনরায় সেই সুবিমল জ্যোৎস্নালোকে পদব্রজে কামারপুকুর রওনা হওয়া গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর রাত্রি অধিক হওয়ায় এবং পথে রাস্তা-নির্দেশের জন্য কোন লোকজন না পাইয়া নিকটবর্তী একটি দীপালোক দেখিয়া তথায় যাইয়া জানিতে পারি উহা একটি আবগারী দোকান। আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া দোকানের মালিক নীচের তলার একটি ঘরে সেরাত্রি থাকিবার অনুমতি দিলেন। ভোরে গৃহস্বামীর নির্দেশমত

পথে রওনা হইয়া অনুমান বেলা ৯টার সময় আমরা শ্রীধাম কামারপুকুর গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীযুত শিবু দাদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) চির পরিচিতের ন্যায় আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতি যত্নসহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জল খাবারের জন্য সেই দেশের প্রথানুসারে সরিষার তৈল মাখান কাঁচালঙ্কাসহ মুড়ি আনিয়া দিলেন। বাড়ীর উঠানে একটি লাল জবাফুলের গাছ দেখাইয়া শিবুদা বলিলেন, ঐস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমরা সেই স্থানটিতে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া শিবুদার প্রদত্ত রঘুবীরের প্রসাদসহ সেই মুড়ি ভোজন করিলাম। শিবুদার নিকট জানিতে পারি যে শ্রীশ্রীমা বর্তমানে কোয়ালপাড়ায় আছেন। সমস্ত দিন ও রাত্রিটার কিয়দংশ সময় শিবুদার সহিত আলাপ আলোচনা ও ভজন কীর্তনে আনন্দে কাটাইয়া পর দিবস ভোরে কামারপুকুর হইতে পদব্রজে রওনা হইলাম এবং বেলা অনুমান ১০টার সময় কোয়ালপাড়া মঠে পৌছিলাম। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কেশবানন্দজীর সহিত আলাপে জানিতে পারিলাম শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রাধারাণী খুবই অসুস্থা, শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। কেহই মাকে দর্শন করিতে পান না। কেশবানন্দজী আরও বলিলেন যে, কয়েকদিন পূর্বে ঢাকা হইতে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করিয়াও শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পান নাই এবং বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আমি মনে মনে আশা পোষণ করিয়া গিয়াছিলাম যে, ধূলাপায়ে চতুর্দশীর দিন মাকে দর্শন করিব এবং দোলপূর্ণিমার দিন তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইব; কিন্তু এই সকল কথা শুনিয়া খুবই ভগ্নোৎসাহ হইলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে মনে হইতে লাগিল, মা নিশ্চয়ই আশা পূর্ণ করিবেন। সমস্ত দিন চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় কাটিবার পর যখন সন্ধ্যাও অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তখন মনের মধ্যে খুবই নৈরাশ্য ও দুঃখ বোধ হইতে লাগিল এবং চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী বরদা মহারাজ (বর্তমানে স্বামী ঈশানানন্দজী) আসিয়া "মা আপনাদের ডাকিতেছেন" সংবাদ দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া কলিকাতা হইতে কৃপালাভের জন্য যে সমস্ত জিনিস আনিয়াছিলাম সে সমস্তই সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মায়ের বাসস্থানে গিয়া তাঁহার ঘরের বারান্দায় উপস্থিত হইলাম। নিয়মানুসারে এক এক করিয়া দর্শনের পালা শেষ হইবার পর সকলের শেষে আমার সময় হওয়ায় আমি সমস্ত জিনিসগুলি মায়ের শ্রীপাদপদ্মের নিকট রাখিয়া প্রণামান্তে তাঁহাকে ভালরূপে দর্শন করিতে লাগিলাম। ইহার পূর্বে কলিকাতা উদ্বোধন আফিসে আমি আরও ২।৩ বার মাকে প্রণাম করিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার মূর্তি ভাল দর্শন করিবার সুবিধা হয় নাই। এখন দেখিলাম মা চৌকির উপর পা মেলিয়া বসিয়া সহাস্যবদনে সন্তানদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দর্শন বা কথা বলার কোন প্রকার বাধা নাই; ঠিক যেন নিজ গর্ভধারিণী জননীর নিকট রহিয়াছি। মাকে দর্শন করিবামাত্র মনে হইল স্বপ্নে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম ঠিক যেন সেই দেবীমূর্তিটি চৌকির উপর বসিয়া রহিয়াছেন, তবে স্বপ্নের মূর্তিটির পরিধানে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি ছিল আর এই মায়ের পরিধানে সরু লাল পেড়ে ধুতি, কেবলমাত্র ইহাই পার্থক্য। আমি প্রণাম করিবার সঙ্গেসঙ্গে মা বলিলেন, "বাবা, ঠাকুরের জিনিস পায়ের নিকট রাখতে নেই।" অপর একজনকে উহা সরাইয়া রাখিতে বলিলেন। আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি কমলালেবু এনেছ, আমিও তাই ভাবছিলাম। তোমার কিছু বলবার আছে?" আমি তাঁহার কৃপালাভের

বাসনার কথা নিবেদন করিলাম। মা বলিলেন—"আচ্ছা কাল হবে।" কথাটি তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া প্রকাশ হওয়ামাত্র আমার মনে যে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা প্রকাশ করা কঠিন। পর দিন সকালে শ্রীমৎ বরদা মহারাজের নিকট শুনিলাম রাত্রিতে রাধুর অসুখ খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় মা সমস্ত রাত্রি রাধুর নিকট বসিয়াছিলেন। মোটেই ঘুমাইতে পারেন নাই। আজ আর কেহই মায়ের দর্শন পাইবেন না। হঠাৎ ইহা শুনিবামাত্র বড়ই চিন্তিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, তবে আজ আর আমার ভাগ্যে মায়ের কৃপালাভ নাই। তাহার পরই কিন্তু মনে হইল কাল রাত্রিতে স্বকর্ণে যে শুনিয়াছি, "আচ্ছা কাল হবে" তাহা কি বিফল হইতে পারে? ইহার কিছু পরে খুবই উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রস্তুত হইয়া কোয়ালপাড়া মঠের একটি বিল্ব বৃক্ষের নিকট একান্তে বসিয়া মনে মনে কেবলই মাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বেলাও অধিক হইল এবং আর কোনই আশা নাই ভাবিয়া যখন চক্ষুর্দ্বয় জলভরাক্রান্ত হইল ঠিক সেই সময় বরদা মহারাজ আসিয়া "কে দীক্ষা লইবে, মা শীঘ্রই তাকে ডাকিতেছেন" বলার সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার সহিত মায়ের পূজাঘরের বারান্দায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মা বলিলেন, "বাবা তাড়িতাড়ি এস।" পূজাঘরের মধ্যে গিয়া দেখিলাম মা একটি আসনে উপবিষ্টা, তাঁহার ঠিক দক্ষিণ দিকে আর একখানি আসন রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বেই পূজা শেষ হইয়াছে, ধূপ দীপ ঠিকভাবেই জ্বলিতেছে। আমি ঘরের ভিতরে যাওয়ামাত্র মা আমাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া তাঁহার নিকট রক্ষিত খালি আসনখানায় বসিতে বলিলেন। পরে পূজার কোশা হইতে জল লইয়া আচমন করিতে বলিয়া কিরূপভাবে উহা করিতে হইবে তাহা নিজে সঙ্গেসঙ্গে করিয়া দেখাইয়া দিলেন। আচমন করার পর আমাকে ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন।

* * *

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যে মহামন্ত্র পাইলাম তাহা আমার পূর্বে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের সহিত অবিকল মিলিয়া গেল। অতঃপর তাঁহার সহিত নিম্নোক্ত কথোপকথন হইয়াছিল—

মা।—আর কারো কাছে দীক্ষা হয়েছে কি, কুলগুরুর কাছে বা স্বপ্নে?

আমি। - কিছুদিন আগে ভোরের সময় স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাই।

মা।—উহা তোমার এখনও মনে আছে? কখনও জপ কর কি?

আমি।—মনে আছে, সর্বদাই মনে হচ্ছে, তবে কেমন করে জপ করতে হয় তাহা জানি না।

ইহার পর মা আমাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষণেকের তরে যেন ধ্যানস্থা হইলেন। তাহার পর আমাকে কৃপা করিয়া স্বপ্নপ্রদত্ত মন্ত্রটি বলিতে আদেশ করিলেন।

আমি।—এইমাত্র আপনি আমাকে যাহা দিলেন উহা সম্পূর্ণ একই।

মা।—তবুও বল।

আমি তাঁহার আদেশ পালন করার সঙ্গেসঙ্গে মা একবার আমার মুখের দিকে স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া একটু হাসিয়া প্রায় মিনিটখনেক পরে তাঁহার কমলহস্তখানি আমার মস্তকোপরি দিবার সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত শরীরে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় বোধ হইয়া কিছু সময় পর্যন্ত আমার অবস্থা যেন কেমন হইয়া গেল। এইরূপ অবস্থা যে কতক্ষণ ছিল তাহা আমার কিছুই স্মরণ নাই। আমি প্রকৃতিস্থ হইলে মা করুণামাখাস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কিছু জানবার আছে?"

আমি।—মন্ত্র কত দিন করে (হাতে) জপ করবো? মালা নিতে পারব কিনা?

মা।—মালা এনেছ?

আমি।—না, আপনার অনুমতি না নিয়া আনতে সাহস হয় নাই।

মা।—যত দিন ইচ্ছা করে জপ করে যাও। (একটি মালার দানা আমাকে দিয়া) এই দানাটি মালায় গেঁথে রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দেবে। পরে রাখাল তোমাকে দিলে সেই মালা জপ করবে।

আমি। ভুলক্রমে বা কাজের ভিড়ে কোনদিন যদি জপ করতে না পারি ?

মা।—কেন পারবে না ? ভয় নেই, তুমি তো ঘরের ছেলে, না পার আমি আছি।

শেষের এই কথা কয়টি একটু জোরের সঙ্গে বলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কিছু বলবার আছে ?" ঠিক মায়ের এই জিজ্ঞাসার সঙ্গেসঙ্গে কে যেন আমার মুখ দিয়া প্রকাশ করিল, "মা। আমি সন্ন্যাস চাই।" আমি কেবল মাত্র মায়ের কৃপালাভেরই সঙ্কল্প লইয়া গিয়াছিলাম। পূর্বে বা কৃপালাভের পরমুহূর্তেও আমার মনে সন্ন্যাসসম্বন্ধে কোন চিন্তাই আসে নাই। মনে সঙ্কল্প ছিল মায়ের নিকট হইতে কৃপালাভের পর কর্মস্থলে যাইয়া পুনরায় চাকরিতে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু মায়ের শেষ কথার সঙ্গেসঙ্গে হঠাৎ আমার মুখ দিয়া সন্ন্যাসের প্রার্থনা বাহির হইল !

মা।—বিবাহ করেছ ?

আমি।—না।

তখন মা আমাকে স্থিরভাবে বসিয়া জপ করিতে আদেশ করিয়া কিছুক্ষণ পরে সেই পূজার কোষা হইতে জল লইয়া আমার সমস্ত শরীরে ছিটা দিয়া এবং কপালে একটি চন্দনের ফোঁটা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গেরুয়া এনেছ ?" আমি "না" বলার সঙ্গেসঙ্গে বলিলেন, "যা দরকার করে দিচ্ছি, তুমি মঠে যাও, সেখানে শরৎ আছে, কাহারও নিকট থেকে হোম করে সন্ন্যাস নেবে।" সমস্ত কার্য শেষ হইবার পর মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, আমি কি আজই মঠের দিকে রওনা হব ?

মা।—হাঁ, আজই এখান হতে রওনা হবে। আজ খুব ভাল দিন, দোলপূর্ণিমা। খুবই ভাল দিনে ঠাকুর তোমাকে কৃপা করলেন। কোন চিন্তা নেই। সর্বদা ভাববে, আমার পিছনে একজন আছেন।

ইহার পর মায়ের আদেশানুসারে বাহিরে আসিবার জন্য দরজা খোলামাত্র বাহির হইতে বরদা মহারাজ মাকে বলিলেন "মা, এইমাত্র কটক থেকে কয়েকজন দীক্ষা নেবার জন্য এসে পৌছুল।"

মা।—কত জন ?

ব্রঃ বরদা।—তারা মোট চার জন।

মা।—শীঘ্র তাদের আসতে বল।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রতি মায়ের এই আদেশ শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ইঁহারা আমাপেক্ষা কত না ভাগ্যবান্। এখানে পৌছাইবার সঙ্গেসঙ্গে মায়ের কৃপার অধিকারী হইলেন। তাঁহারা মায়ের নিকট পৌঁছিবার পর জানিতে পারিলাম ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত হরিবল্লভ ঘোষ নামক ভক্তটি ইহার পূর্বেই মায়ের কৃপালাভ করিয়াছেন। বাকী তিন জন আজ মায়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তাহাদের কৃপালাভের পর আমরা সকলেই সেই বাড়ীতে মায়ের প্রেরিত পূজার প্রসাদ ধারণ করিয়া পরে কোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া প্রসাদ পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে মায়ের 'দুধ ভাত' প্রসাদও পাইয়া ধন্য হই। সেইদিন মঠে কিছু সময় বিশ্রাম করিবার পর বৈকালে শ্রীশ্রীমায়ের প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী আবির ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করিতে করিতে মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী দর্শন করিবার জন্য অশ্বিনী বাবু এবং কটকের সেই চার জন ভক্তসহ রওনা হইলাম। কেবল আমাদের সহযাত্রী কাঁকুড়-গাছির সেই সন্ন্যাসী মহারাজ কয়েক দিনের জন্য কোয়ালপাড়া মঠেই রহিয়া গেলেন। আমি পথ চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীমায়ের অহেতুকী করুণার কথাই কেবল ভাবিয়াছিলাম, মনে পড়ে।

আধ্যাত্মিকতা

শ্রীঅমিয়া দেবী

এই মনকে সাধনা দ্বারা একমুখী করে অন্তর্নিহিত মহাশক্তির সাথে পরিচিত হওয়াই হল আধ্যাত্মিকতা। আমাদের মন জগতের সঙ্গে যুক্ত। তাকে ঘুরিয়ে আত্মাভিমুখী করা চাই। স্বামীজী বলেছেন— আধ্যাত্মিকতা হল পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। অন্য সব বিজ্ঞানই কোন একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। দেখা যায় যিনি একটি বিষয়ে পারদর্শী তিনি অন্যটির রস গ্রহণ করতে পারেন না। যিনি সাহিত্য বোঝেন তিনি হয়ত সংগীত বুঝছেন না। আধ্যাত্মিকতা এমন এক বিজ্ঞান যার ফলে জীবন হয় সর্বদিকে প্রসারিত। আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা হলেও, এক ব্যক্তির দ্বারা যেমন সেগুলি বিধৃত হয়ে রয়েছে, তেমনি আধ্যাত্মিকতা সব বিরুদ্ধভাবকে এক সুরে এনে মিলিত করে। জীবনের সত্যিকারের পূর্ণতা আসে আধ্যাত্মিক জীবনেই।

নিঃস্বার্থতা ও ভালবাসা এই দুটোই হল আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। যেখানে এদুটির অভাব, বুঝতে হবে সেখানে আধ্যাত্মিকতা নেই। মুক্ত-পুরুষ সব কিছুই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন ও মস্তিষ্কের সাহায্যে প্রকাশ করেন। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ না করলে পণ্ডিত হওয়া যায় কিন্তু তার দ্বারা গভীরভাবে আত্মস্পর্শ লাভ করা যায় না। এক বিন্দু আধ্যাত্মিক ভাব থাকলে মানুষ কখনও নৃশংস ও পশুপ্রকৃতির হতে পারতো না। স্বামীজী বলে গেছেন ভারতের শক্তি আধ্যাত্মিকতায় নিহিত। একমাত্র এই আধ্যাত্মিকতাই মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবনের গতি স্তরে স্তরে চলে। এ পথে কেউ ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। যখন অভাব জাগে, যখন নিজের অবস্থায় মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না তখনই হয় তার উন্নতির আরম্ভ। খাওয়াপরার জীবন হল নিম্নস্তরের। তাতে যখন মানুষ তৃপ্ত হয় না, তখন হয়তো সৌন্দর্য, সুর বা বিদ্যাচর্চার দিকে মন যায়। তাতেও যদি তৃপ্ত না হয়, তখন হয়তো উচ্চাঙ্গের রসের সন্ধান করে। অভাববোধ না জাগলে তো আর কেউ অন্য রাজ্যের সন্ধান করে না। এই অভাববোধ থেকেই সভ্যতার সৃষ্টি। অসভ্য মানুষের অভাব-বোধ খুব কম ছিল। শরীরে তৃপ্ত না হলে মনের খোঁজ হয়। মনেও যখন তৃপ্তি হয় না, বুদ্ধি বা অন্তরের দিকে তখন দৃষ্টি হয়। আবার এমন এক অবস্থা আসে যখন সুর, সৌন্দর্য, কাব্য এ সব কিছুই ভাল লাগে না, তখনই হয় আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান। মনের সৃষ্টি যেগুলি—যেমন সংগীত, শিল্প প্রভৃতি তাতে দুঃখ সাময়িক ভাবে ভুলে থাকা যায় কিন্তু আবার অভাব জাগে, সে জন্যই আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। মণি মল্লিকের ছেলে মারা যেতে শান্তির আশায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। ঠাকুর তাঁকে এমন রাজ্যে নিয়ে গেলেন, যেখানে নিজের চেষ্টায় যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন আর্ট, সংগীত, কাব্য কিছুই তাকে শান্ত করতে পারতো না।

এ জগতের কোন একটা অভাব বা বাসনা অপূর্ণ থাকতে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবার তীব্র পিপাসা জাগতে পারে না। মানুষ যখন বুঝতে পারে, জাগতিক উপায়ে দুঃখের হাত থেকে একেবারে ত্রাণ পাওয়া অসম্ভব, তখন তার অন্য জগতের কথা মনে হয়। কোন অভাববোধ থাকতে ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা জাগতে পারে না। যদিও শরীর ধারণোপযোগী অভাব থাকবেই, কিন্তু এ

ছাড়া মনের অভাবও আছে। মনটাতো নিজের হাতে, মনের অভাববোধই তো বেশী। সমস্ত অভাব না মিটতে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন হয় না। এজন্যই নানা রকম কর্মব্যবস্থা ও নানা ঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি শোধ দেবার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত অভাব, সব কর্তব্য মিটে যাবার পর মন আত্মাভিমুখী হয়। তখন দেখতে পাওয়া যায়, এই জগৎটা পর্যাপ্ত নয়, প্রতিপদেই অতৃপ্ততার দুঃখ। যেমনটি চাই তেমনটি পাই না। ইন্দ্রিয় সীমাবদ্ধ, ভোগ্যবস্তু সবই সীমাবদ্ধ। চারিদিকের বিরুদ্ধ শক্তি এসে যেন সব কল্পনা ভেঙ্গে দিয়ে যায়। বাইরেও এই অপূর্ণতা, ভেতরেও যা বলতে চাই বলা হয় না, ভাষা সবটা প্রকাশ করতে অক্ষম, যা লিখতে চাই তাও লেখা হয় না. কল্পনা যেন আত্মপ্রকাশে অক্ষম। শিল্পী তার মনের ভাবটি ঠিক ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে না, সবত্র যেন একটা না পাওয়ার বেদনা গুমরে মরছে। ভেতরে যে অসীম রয়েছে, তাই সীমার ভেতর মানুষ পায় না তৃপ্তি। সেই অনন্তই সান্তের ভিতর দিয়েই নিজেকে পেতে চাচ্ছে। অপরূপ রূপের ভেতর দিয়ে, অসীম সীমার ভেতর আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টায় কেঁদে মরছে। পূর্ণ আছে বলেই আমাদের অংশের ধারণা, অরূপ আছে তাই রূপ, অসীম আছে তাই সীমার ধারণা এই অনন্ত অসীম হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে অনন্তপ্রেম, অনন্তজ্ঞান বোঝায়; তিনি সমষ্টি, তিনিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। এ জগতে ব্যর্থ হয়ে মানুষ যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখনই তার সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

একটা সংস্কার গড়তে হলে তখন বিরুদ্ধ ভাবের কোন কিছু গ্রহণ করতে নেই। দশটা একসঙ্গে করতে গেলে কোনটাই হয় না। কিছু চিন্তা করলেই ভিতরে দাগ পড়ে। তখন স্নায়ুগুলি সেই সব ভাল মন্দ চিন্তার দ্বারাই গঠিত হয়। ভিতরে একটা দাগ পড়াতে হলে অনবরত সেইভাব নিয়ে থাকতে হয়। তখন অন্য বিষয় বলা বা শোনা একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়। যা শুনলে, বললে বা চিন্তা করলে মনকে চঞ্চল করে, অবিশ্বাসের ভাব জাগে তা কখনও করতে নেই। কিছুদিন এরূপ করলে ভাবটা ঠিক বসে যায় ও ভিতরে নতুন বাড়ী তৈরী হয়। একটা ভাব বসে গেলে নতুন দেহ হয়, মুখের চেহারা, চোখের চাউনি গলার স্বর বদলে যায়। কিন্তু ভাব গড়ার সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়। সর্বদা লক্ষ্যস্মরণ, এক সঙ্গে পাঠ আলোচনা এবং যাতে অভিমান না আসে সেদিকে দৃষ্টি রাখা, এসব হল ভাব স্থায়ী করার উপায়। এসব দিকে লক্ষ্য না রাখলে অনেক সময় উল্টো ফল হয়, ভিতরে সব এলোমেলো হয়ে যায়। ঘড়ীর স্পীং কেটে যাবার মত সব কেটে যায়। ভাল ভাবটা চলে গিয়ে খারাপ ভাব সব ঠেলে উঠে। মানুষের ভিতর ভাল মন্দ, আলো অন্ধকার দুটোই আছে। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব অনেক দূর পর্যন্ত চলে। তারপর অবশ্য সাধক দুটোকেই আলাদা করে ফেলতে পারে। এই দুটো অবস্থা মানুষের ভিতর অনবরত আসে একটা আর একটাকে ফুটিয়ে তোলে। ভালটা প্রবল হলে মন্দটা চলে যায়। সেটা আর তত জোর করতে পারে না। ফটো তোলার সময় নড়লে ফটো হয় না। অনেকগুলো এলোমেলো ছাপ পড়ে আসল চেহারা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি আধ্যাত্মিক জীবন চাইলে একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়, নইলে কিছুই হয় না।

আধ্যাত্মিক জীবন এই বাস্তব জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। যে চেতনার সাহায্যে আমরা জগতের সঙ্গে ব্যবহার করি, সেই চেতনার যেখানে পরিসমাপ্তি সেখানে আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। আমাদের মন দেহের ভিতর দিয়ে জগতের সাথে যেরূপ যুক্ত, আবার বুদ্ধি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আত্মার সাথেও তেমনি যুক্ত। দেহের সাথে তার

সম্পর্ক খুব নিকট নয়। ভাবেই দেহ গঠিত হয়, ভাবই আসল। জন্মজন্মের সংস্কার বা ভাবরাশিই মানুষকে জন্মমৃত্যুর ফেরে ঘোরায়। স্বপ্নাবস্থায় দেখা যায় দেহ স্থির থাকে কিন্তু মনে কত কিছুই চলে। তখন মনে সব ফিরে যায়। তখনই মনের যথার্থ ভাবগুলি, তলিয়ে যাওয়া বাসনাগুলি জেগে উঠে। তবে স্বপ্নে বা নিদ্রায় জীবনের কোন পরিবর্তন হয় না। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যেমন তেমনি থাকে। কিন্তু সমাধিতে জীবন বদলে যায়। তখনই মানুষ তার যথার্থ স্বরূপে ফিরে আসে। তখনই হয় আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ।

অলৌকিক দর্শন হওয়াই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি নয়। সেগুলিও মনের নানারূপ ভাবের সূক্ষ্ম রূপান্তর। আসল জিনিস হল ব্যাকুলতা ও আরও চাওয়ার ভাব। যত এগিয়ে যাওয়া যায় ততই গভীর অনুভূতি হয়।

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবার নানা উপায় আছে। যে পথেই যাওয়া হোক ভক্তির অভাব হলে সবটাতেই পেছিয়ে পড়তে হয়। আর একটা উপায় আছে, যদিও তাতে খাটতে হয় বেশী, কিন্তু পেছবার ভয় থাকে না। সেটা হল—সব সময় একটা উচ্চ চিন্তা জাগিয়ে রাখা। মনকে সব সময় একটা উচ্চ চিন্তার খোরাক দিলে সে আর বাজে চিন্তা করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন মন হল ধোপা ঘরের কাপড়। যে চিন্তা দেবে সেইটে নিয়েই সে ব্যাপৃত থাকবে। যার যা সংস্কার তা বদলানো সহজ নয়। কিন্তু সব সময় উচ্চ চিন্তা জাগিয়ে রাখলে আর কিছু মাথা তুলতে পারে না।

প্লেটো সুন্দর বলেছেন—এই দেহটা যেন আত্মার কবরভূমি। এর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই হল আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক পথকে বলেছে ক্ষুরস্য ধারা। সাপকে চুমু খাওয়া, বাঘকে আলিঙ্গন করা বরং সহজ তার চেয়েও কঠিন এই পথে চলা।

এই মন-বুদ্ধি দিয়ে আধ্যাত্মিকতা কিছুই বোঝা যায় না। তাই সে পথে যেতে হলে নিজেকে বিসর্জন দিতে হয়। মন-বুদ্ধি যেদিকে চালিত করা যায় সেই দিকের দৃষ্টি খোলে। কাজেই জাগতিক দিকে যে খুব বুদ্ধিমান্ সে হয়ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছুই ধারণা করতে পারবে না। আবার জগতের দিক্ থেকে যে একেবারে অকর্মণ্য, সেও হয়ত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের চেষ্টা করে, সেই দিকে বেশ অগ্রসর হয়। আমাদের দেশে এমন অনেক সাধু হয়ে গিয়েছেন যাঁদের ব্যাবহারিক বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই ছিল না, কিন্তু তাঁদের কথা শুনে অনেক বড় বড় বিদ্বান্ লোকে ও অবাক্ হয়েছেন। তাই এপথে চলতে গেলে পুরাণো মনবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়।

আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভের কোন সময় অসময় নেই। আন্তরিক হলে ভগবান্ তাকে পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন। একজনের ক্ষেতের কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কিন্তু সেদিনই তার সব কাজ শেষ করা দরকার। সে অন্য সব মজুরদের কাজ করার জন্য ডাকলো। তারা অল্প সময় বলে, আসতে চাইলো না, তখন সেই লোকটি বললে, তোমাদের পুরা মজুরি দেব, তোমরা এসো। সারাদিন যারা খাটলো তারাও যা পেলো, এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা যারা খাটলো তারাও তাই পেল। সারা জীবন তপস্যা করে মানুষ যা পায়, তাঁর দয়া হলে মুহূর্তেই তা পেতে পারে। কাজেই জীবনে যত সময়ই চলে গিয়ে থাকুক তার জন্য আফসোস না করে যখনই ইচ্ছা জাগবে তখনই তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে জীবন আরম্ভ করতে হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে কোন নিয়ম বেঁধে দেওয়া চলে না, সকলের গতি বা পথ এক নয়। কাজেই স্পষ্ট করে কিছু বললে বা কোন নিয়ম বেঁধে দিলে আধ্যাত্মিক জীবন বাড়তে পারে না বরং নষ্ট হয়ে যায়। এ পথে ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

আধ্যাত্মিক জীবনে আনন্দ আছে, শান্তি আছে কিন্তু সুখ নেই। সুখের আশা থাকলে এ পথে না আসাই ভাল। 'দুর্বল যে সে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে না। প্রথমে সব কিছুকে নিজের বশে আনতে হয়। মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম,—তখন চলে শক্তির সাধনা। এই হল ধর্মজীবন। আগে ধর্মজীবন তারপর আধ্যাত্মিকজীবন।

বৈজ্ঞানিক জগতে অন্ধকার বলে কিছু নেই। আমার কাছে যেটা অন্ধকার আর একজনের কাছে সেখানেও আলো দৃষ্ট হয়। আলোর একেবারে অভাব কোথাও হয় না। কম বেশী এই মাত্র প্রভেদ। মানুষের কাছে যেখানে আঁধার অনেক পশু সেখানে আলো দেখতে পায়। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও স্বামীজী বলছেন, ভুলপথ বলে কিছু নেই, সব পথই অধিকারী হিসাবে সম্পূর্ণ সত্য।

সমালোচনা

প্রজ্ঞার আলো—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার-প্রণীত; প্রবর্তক পাবলিশার্স কর্তৃক ৬১ নং বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২ + ৫ ; মূল্য ১।০ মাত্র।

এই পুস্তকটি দার্শনিক গ্রন্থকারের শেষ রচনা—তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন এবং আর একজন লিখিয়া লইয়াছিলেন তাহাই বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার 'মিষ্টিক' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক ছিলেন। পাশ্চাত্য মিষ্টিকদিগের অনুভূতির বিস্তৃত বিবরণ তাঁহারা নিজেরাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্লোটিনাস্ (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) তাঁহার সমাধিকালের (Ecstasy) অনুভূতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সাধকদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাদের সমাধিকালের অনুভূতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শন ও তন্ত্রে সমাধির বর্ণনা আছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়েও (২০—২৩ শ্লোক) সমাধিকালের অনুভূতির সাধারণভাবে বর্ণনা আছে। বর্তমান গ্রন্থে সাধনার বিভিন্ন স্তরে অনুভূতির যে বর্ণনা আছে তাহা গ্রন্থকারের স্বকীয় অনুভূতিলব্ধ অথবা শাস্ত্র হইতে গৃহীত, তাহা তিনি বলেন নাই। পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার নিজের অনুভূতিরই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। বইখানিতে তন্ত্র, শৈবদর্শন এবং শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার ছাপ পাওয়া যায়।

প্রজ্ঞা কি ভাবে স্থিতি লাভ করে, কি প্রকারে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারা যায়, তাহাই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। তাহার জন্য বহির্বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে হয়, চিত্তে সঞ্চিত দুর্লঙ্ঘ্য সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, মনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মনের ক্রিয়ার সাক্ষী হইতে হয়, পরে মনের ক্রিয়ার নিরোধ করিতে হয়। সাধনার বিভিন্ন স্তরে যাহা যাহা ঘটে, গ্রন্থকার তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাণের বর্ণনায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন—প্রাণের নিম্নতম স্তরে আছে প্রকৃতির বিকাশ। তাহার ঊর্ধ্বে ক্রিয়ার মধ্যে থাকে অস্ফুট প্রকাশ-জ্ঞান, তাহাও স্বভাব দ্বারা চালিত। এই অস্ফুটালোকে অনেক সময় প্রাতিভজ্ঞানের স্ফূর্তি হয়।

"প্রাতিভজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট কোন কিছু অপ্রকাশ থাকে না।" "প্রাণময় বিশ্ব যখন হয় তেজোমণ্ডিত তখনই

পশ্যন্তী বাক্যের স্ফুরণ।" "প্রাণের শ্রেষ্ঠতম বিকার জ্ঞানে ও ইচ্ছায়। ...সত্তার স্বচ্ছ আলোকে অনেক অপূর্ব সত্যের ও তথ্যের প্রকাশ হয়। ...এই প্রকাশ নিম্নতম প্রদেশে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধান্বিত। কুণ্ডলিনী যেখানে প্রজ্বলিত, সেখানে সর্বদিক প্রসারিত, সর্ববিকাশ উন্মুক্ত।" "কুণ্ডলিনীর এমনি শক্তি যে উর্ধ্ব মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি খুলে দেয়।" "প্রাণ ও মনের সংযোগে হয় মানুষের সাধারণ সংজ্ঞা। চিতিশক্তির কোনওরূপ স্বরূপ-বিকাশ ইহার মধ্যে নাই। মনঃপ্রাণের স্বভাবধর্মই এমনি যে সত্য সাক্ষাৎকার তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

প্রাণগ্রন্থিগুলি নাভিচক্রে ক্রিয়মাণ। হৃদয়ক্ষেত্রের প্রাণের সূক্ষ্মাংশ নানা সূক্ষ্মবৃত্তির সঞ্চার করে। হৃদয় উদ্বোধিত হইলে বিশুদ্ধপ্রেমে সাধকের দিব্য স্বরূপের সহিত পরিচয় হয়। নাভিচক্রে সঙ্কুচিত রাগদ্বেষাদি ক্রিয়াশীল হইয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধাকে আবৃত করে। হৃদয়ের গভীর স্তরে শাশ্বত জ্যোতি বর্তমান। এই জ্যোতিতে সূক্ষ্ম জগৎ প্রকাশিত হয়। যাহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ, তাহারাই ব্যাপক সত্তার স্ফূর্তি দেখিতে পায়। গভীর হৃদয়ের পশ্চাৎ ভাগে এক অপরূপ প্রাতিভ জ্ঞানের বিকাশ হয়, যাহাতে দিব্য জ্ঞান, দিব্য ভাব ও দিব্য ইচ্ছা সংক্রামিত হয়। ইহার দ্বারা অন্তের চিত্তও এক পরা সংবিদে স্পন্দিত হয়। এই সংবিদের আগমনে আনন্দ ও বিষাদ উভয়েরই উদ্ভব হয়। বিষাদ আসে কেননা ইহার ক্রিয়া স্থায়ী হয় না।

"ভাব ও অর্থ একত্র সন্নিবদ্ধ।... ভাব অর্থের স্বরূপ। ...ভাবের উৎপত্তিতে অর্থের উপস্থিতি। যেমন তন্ত্রের মন্ত্র শক্তি ও অর্থের উপস্থিতির সম্বন্ধে। ...ভাব জমাট হয় বর্ণে, বর্ণ জমাট হয় অর্থে। ...এই সত্যের উপর তন্ত্রের বর্ণমালার সাধন-কৃতিত্ব। তন্ত্রের 'বর্ণমালা-সাধন' সকল বস্তুর অভ্যন্তর এবং সকল শক্তির মূল।"

হৃদয় উজ্জ্বল এবং ঠিকমত রূপান্তরিত হইলে মহোলোকের স্পন্দন আসিয়া তাহার স্তর বিকশিত করে। মহোলোক বিজ্ঞানের স্পন্দনে পূর্ণ। যখন মহোলোকের স্পন্দন আসিয়া নিম্নপ্রদেশ পূর্ণ করে, তখন তাহার কম্পনে সকলই আলোকিত হইয়া উঠে। লিঙ্গমূল হইতে নাভিপ্রদেশ পর্যন্ত উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়। মানুষ আর মানুষ থাকে না—দিব্যরূপে প্রকাশিত হয়। দিব্য সত্তার অনুভব হয়। তখন নানা দিব্য সত্তার সহিত পরিচয় হয়। উর্ধ্বস্তরের সাধকেরা এই দিব্য সত্তাকে নামিয়ে এক দিব্য সংঘ স্থাপিত করেন। ইঁহারাই নরলোকে অমৃতের বাহক। মহোলোক হইতে সাধক জনলোকে আরোহণ করে। তখন সাধক স্থূল বিশ্ব হইতে মুক্ত হয়। জনলোক হইতে তপোলোক। মহোলোকে তপোলোকের মূর্ছনা প্রকাশিত। যেখানে জীবন ক্ষুদ্র ছন্দ হইতে মুক্ত হইয়া বিরাটের সঙ্গলাভ করে। দিব্য সংবিদের সহিত এখানে পরিচয় হয়। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এখানে থাকে না। তপোলোকের পর সত্যলোক—এই লোক শান্তি ও জ্যোতিতে পূর্ণ। একবার মানুষের উর্ধ্বগামী সত্তা এখানে আরোহণ করিলে কোনও পার্থিব বিষয়ে তাহার আকর্ষণ থাকে না। জ্ঞানের অতীত পরাশান্তি তাহাকে নির্বাণ-কেন্দ্র সহস্রারে অথবা বিশ্বপতি হিরণ্যগর্ভপুরুষ বা বিরাট্ পুরুষে লইয়া যায়। এই মার্গে সাধক ঈশ্বরীয় শক্তি এবং বিশ্বের কর্মধারার উপর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়।

সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বিশ্বব্যাপারে লিপ্ত হইতে চান না। ব্রহ্মসেতু উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। উর্ধ্বলোকে অনেক শুদ্ধ সত্তা বিচরণ করেন। অনেকে স্বকীয় শক্তি দ্বারা নিম্নস্তরের সত্তাদিগকে উজ্জীবিত করেন, ইঁহারাই অবতার নামে অভিহিত হন। উর্ধ্বশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া নিম্ন বিশ্বে জড়তার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া চেতনা জাগরিত করাই ইঁহাদের কাজ। তাঁহারা মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া স্বকীয় শক্তিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহারা এক একটি জ্যোতিষ্কস্বরূপ। পার্শ্ববর্তী সকলকে জ্যোতিঃস্নাত করিয়া পথ দেখানোই তাঁহাদের

কাজ। মহাশক্তির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাঁহারা নিজে কিছু করেন না। মহাশক্তিই তাঁহাদের দ্বারা সব কিছু করান।

সাধক যখন ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে থাকেন, তখন এক একটি চক্রের উন্মীলনে এক একটি জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রত্যেক জগতে হয় সাধকের স্থিতি ও তাহার উপর তাঁহার প্রভুত্ব। সাধারণ জ্ঞান বিষয়গামী। ইহা হইতেই বিষয়ে অনুরক্তি জন্মে, যাহা মুক্তির পথে পরম বিঘ্ন। বিষয়সম্পর্ক-হীন চিৎই প্রজ্ঞা—সম্বন্ধহীন, নির্বিষয় জ্ঞান। যেখানে প্রকাশের সহিত বিষয় আসে, সেখানে পরিপূর্ণ শিবভাব থাকে না। সত্ত্ব গুণের উপরে এই ভাবের স্থান। "চিত্তের বিষয়বিমুখ আস্পৃহা" ইহার জন্য আবশ্যক।

"দৈবী সম্পৎ বিশেষতঃ দিব্য ভোগ সাধককে সূক্ষ্ম জগতে আকৃষ্ট করে থাকে। এ সংস্কারও আত্মবোধের পক্ষে দুর্ভেদ্য বাধা......মানুষ দেবতার মত হইতে পারে, সর্ব দৈবী বৃত্তিতে পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু শান্ত হইতে পারে না। প্রাণের তৃষ্ণা প্রশমিত হইলেই সাধক শাশ্বত শান্তি ও তত্ত্বের সাক্ষাৎ পায়।"

গ্রন্থের আভাস সংক্ষেপে উপরে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি স্থূল ধারণা হইতে পারে। ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রন্থকার যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে হইলে বিস্তারিত ভাষ্যের প্রয়োজন। যাঁহাদের তন্ত্রশাস্ত্রে কিছু জ্ঞান আছে, তাঁহারা গ্রন্থপাঠে লাভবান্ হইবেন, তান্ত্রিক-সাধক গ্রন্থে বর্ণিত সাধনার বিভিন্ন স্তরের সহিত আপনাদের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। গ্রন্থকার Mysticism of the Tantras গ্রন্থে তন্ত্রসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থকে তাহার পরিশিষ্ট মনে করা যাইতে পারে।

বাংলার শিক্ষিত সমাজে তন্ত্রশাস্ত্র বহুদিন অবহেলিত ছিল। উড সাহেবের তন্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে অনেকের দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইয়াছে। ডাঃ সরকার বঙ্গীয় পাঠকের দৃষ্টি এই শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া কল্যাণকর কর্ম করিয়াছেন। গ্রন্থে অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। পরবর্তী সংস্করণে তাহার সংশোধন হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং ইহার প্রাচীনতা—শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস-প্রণীত এবং শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, পোঃ খড়দহ (২৪ পরগণা) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১২২; মূল্য—১৷৷০ টাকা।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই পুস্তকে আচার্য শ্রীরামানুজ স্বামী প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তের মূল কথা-গুলি ২৫টি অনুচ্ছেদে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রোদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছে। বাঙলা দেশে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের আলোচনা কম। আলোচ্য বইখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চিত্তে উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। এই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়ও বটে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া-ছিলেন—

"বেদের কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবদ্যোতক, দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈত-শ্লোকগুলি একেবারে চাপা দিয়া যাইতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈতশ্লোকগুলিকে তদ্রূপ অদ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা তো বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে, এটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মূর্খোচিত কাষ। আবার সমগ্র বেদ অদ্বৈতভাব-সমর্থক, ইহা প্রমাণের চেষ্টাও তদনুরূপ মূর্খোচিত। বেদ দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই। * * * সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপানাবলী দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পরবিরোধী তাহা নহে।" ('আমাদের উপস্থিত কর্তব্য'—ভারতে বিবেকানন্দ)

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার সময়েও স্বামীজী-নির্ণিত (যাহা তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনালোকে অনুভব করিয়াছিলেন) এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী রাখা প্রয়োজন। তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্তই যে বেদান্তের একমাত্র সিদ্ধান্ত এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের থাকিবে না।

দাস্য-মধুর (নাটক)—শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ-প্রণীত; শ্রীরামাশ্রম—পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী; পৃষ্ঠা—১৮২; মূল্য—২৲ টাকা।

এই নাটকখানিতে তুলসীদাসজী এবং মীরাবাঈ-এর জীবন-দ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া পাশাপাশি দাস্য ও মধুর ভাবের সাধনা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সমান্তরাল ভাবে নাটকের পটভূমি একবার তুলসী-দাসজীর সাধনক্ষেত্রসমূহে এবং আর একবার মীরাবাঈএর সাধনার স্থান মেবারে লইয়া গিয়া দুইটি জীবন-কথাকে একটি নাট্যে গ্রথিত করা ভাবুক গ্রন্থকারের লিপিকুশলতা এবং কল্পনাসৌষ্ঠবের পরিচায়ক। নাটকের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ উপভোগ্য। ভগবদ্ভক্তগণকে বইটি তৃপ্তি দিবে।

আলোর তৃষা (প্রবন্ধাবলী)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস-প্রণীত; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পৃষ্ঠা—৮২; মূল্য—১৷৷০ টাকা।

আলোচ্য বইটি ১০টি ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রবন্ধের সমাবেশ। প্রবন্ধগুলির নাম:—মায়ের দিকে, আলোর তৃষা, অন্তর্জীবন, জীবনের ত্রিবেণীসঙ্গমে, মনের খেলা, মাতৃমহিমা, জীবন ও সাধনা, কবি, পনরই আগষ্ট, শ্রীঅরবিন্দনামের বিস্ময়। ইহাদের মধ্যে দুইটি ছাড়া অপর সবগুলিই সাময়িক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সকল লেখাগুলির মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবনের সাধনা'-র ব্যাখ্যা কমবেশী আকীর্ণ থাকিলেও লেখকের স্বাধীন মনন ও প্রকাশধারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন স্পষ্টভাবে এবং মিষ্ট করিয়াও বলিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য কোন পাঠক যদি বইখানির সাহিত্যিক মূল্যই বেশী দিতে চান তাহা হইলে আমরা আশ্চর্য হইব না।

বারাণসী ও সারনাথ—শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত-প্রণীত; প্রকাশক শ্রীঅসীমকুমার দত্ত, ৩২।১এ, নন্দন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫; পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৬০; মূল্য আট আনা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী বা বারাণসী ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগের শুধু মহাতীর্থই নয়, ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রধানতম কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত। লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-খানিতে ৺কাশীধাম ও সারনাথে জ্ঞাতব্য ও দর্শনীয় জিনিসগুলি মোটামুটি বিবৃত করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির, অন্যান্য দেবস্থান মঠ ও আশ্রম, প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ শিক্ষা ও সেবা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইবে এবং হৃদয়ে কাশীদর্শনের বাসনা জাগরিত হইবে। গঙ্গাতীরস্থ অসি, তুলসী, হরিশ্চন্দ্র, কেদার, দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা প্রভৃতি ঘাটের মনোরম বর্ণনা; সারনাথের প্রত্নতত্ত্বমালা, বৌদ্ধবিহার, ধর্মরাজিক স্তূপ, অশোকস্তম্ভ, ধর্মচক্র জিন বিহার, বোধি-বৃক্ষ প্রভৃতির বিবরণ, গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং জাপানী চিত্রকর কোসেতসু নোসু অঙ্কিত চিত্র-পরিচিতিও প্রদত্ত হইয়াছে। দেবস্থান, পুরাকীর্তি ও দ্রষ্টব্যস্থানের নির্ভরযোগ্য বিবরণ-সমন্বিত পুস্তিকাখানি ভ্রমণকারিগণ নির্দেশিকা (guide)-রূপে ব্যবহার করিলে গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

Sri Ramakrishna Mission Student's Home Golden Jubilee Souvenir, 1955 (Mylapore, Madras)

মায়লাপুর (মাদ্রাজ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রা-বাসের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকখানি বহু দিক্ দিয়া অভিনবত্বের দাবি করিতে পারে। প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে শুভেচ্ছা বাণীগুলির প্রতি—বিভিন্ন মনীষী,

শিক্ষাব্রতী, দেশহিতৈষী ও রাষ্ট্রনায়কগণের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শুভ কামনা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উপর বর্ষিত হইয়াছে। পত্রিকায় বর্ণিত ছাত্রাবাসের ইতিহাস ও ক্রমবর্ধমান প্রসারের বিবরণীর সহিত এইগুলি পাঠ করিলে যে কোন পাঠকের মনে হইবে যে, ইহাতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন বা পল্লবিত ভাব নাই। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠানটির আদর্শশিক্ষা-বিস্তারকল্পে অবদান সত্যই অতুলনীয়। 'প্রাচীন গুরুকুল-প্রথা ও বর্তমান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা,' 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা,' 'বালকদিগের ধর্মশিক্ষা,' 'ভারতীয় যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান,' 'জাতিগঠনে ছাত্রগণ কি করিতে পারে' প্রভৃতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ চিন্তাশীল সুধীজন কর্তৃক পরিবেশিত হইয়াছে। প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের (যাঁহারা অধিকাংশই কৃতী ও কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত) ছাত্রাবাসের স্মৃতিগুলি যেমন মনোরম ও সুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদও বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বোম্বাইতে অনুষ্ঠান—বোম্বাই (খার) শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০ তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শনিবার ১৪ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী) কে জি মহাবিদ্যালয়ের সুবৃহৎ কক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি আলেখ্য সুদৃশ্যভাবে সাজাইয়া একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রুতিসুখকর ভজনসঙ্গীত ও স্থানীয় রামকৃষ্ণমিশন ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক বৈদিক স্তোত্রপাঠ শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করে। মাননীয় সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাভন সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক জি এল. মাথরানি, অধ্যক্ষ নরেন্দ্র কে দেশাই। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের বিভিন্ন দিক্ ও তাঁহার অমূল্য বাণীর তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া বলেন। রবিবার ১৫ই ফাল্গুন দ্বিপ্রহরে কয়েক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতৃপ্তির সহিত খাওয়ানো হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন প্রাঙ্গণে যে বিরাট সাধারণ সভা বসে তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার শ্রীডি কে কান্তে, ডক্টর সি এ মেহতা, পি আর নায়েক আই সি এস, প্রিন্সিপ্যাল এন্ বি বুটানি এবং অধ্যক্ষ জি সি ব্যানার্জি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ ভাষণ দেন। শ্রীমতী কান্তে বিদ্যার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পর চার ঘণ্টা যাবৎ শ্রীহেমন্ত কুমার মুখার্জি ও ভারতখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীদের এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলিয়াছিল।

মাদ্রাজে পীড়িতসেবা—মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি গত ২৯ বৎসর যাবৎ মাদ্রাজ শহরের মায়লাপুর এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুঃস্থ রোগিগণের সেবা করিয়া আসিতেছে। প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় বিভাগে মোট রোগিসংখ্যা ছিল ১,০৭,৪৩৯ (নূতন রোগী—২৭,৪২৪)। ১৯৫৩ সালে সংযোজিত দন্তবিভাগটিতে রোগীর ভিড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগে রোগি-সংখ্যা ছিল ২৭৪৭। ১৯৫৩ সালে যে ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীটি স্থাপিত হইয়াছে উহারও কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। ১৯৫৪ সালে এখানে ১,১৪০টি রক্ত-

মল-মূত্রাদির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। আলোচ্য বৎসরে প্রাতিষ্ঠান ২৬,৯৬৫ দুর্বল নারী ও শিশুগণের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করিয়াছেন।

ম্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জেলা দক্ষিণ কানারার প্রধান শহর ম্যাঙ্গালোরে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শাখাকেন্দ্রের ১৯৫৪ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। এই কেন্দ্রটির সেবাকার্য প্রধানতঃ শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারমূলক। আশ্রমের ছাত্রাবাসে আলোচ্যবর্ষে ৩৫টি দরিদ্র বালক (জাতিনির্বিশেষে) রাখা হইয়াছিল। উহাদের সকলপ্রকার খরচ আশ্রমই বহন করিয়াছেন। বালকগণের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের সহায়তাদানই আশ্রমের লক্ষ্য। আশ্রমে আলোচ্যবর্ষে সাধু মহাপুরুষগণের বার্ষিক স্মৃত্যুৎসব পরিচালিত হইয়াছিল। দরিদ্র রোগি-গণের সেবার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার আয়োজন অগ্রসর হইতেছে।

পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের সফর—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ১৯৫৫) ঢাকা কেন্দ্রে গমন করেন। তিন সপ্তাহ তাঁহার ঢাকা অবস্থানকালে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহার পুণ্যসঙ্গ এবং ধর্মোপদেশলাভে বিশেষ উপকৃত ও উৎসাহিত হন। মহারাজজী ঢাকা হইতে ৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ) কুমিল্লা যান। এখানে তিনি ৫ দিন থাকিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দের ধর্মপ্রেরণা ও আনন্দ বর্ধিত করেন। কুমিল্লা হইতে আগরতলা হইয়া পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ ১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ) শিলচর আসেন এবং স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে অবস্থান করেন। শিলচরে তিনি দশ দিন ছিলেন। বহু নরনারী তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ ও সাধননির্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। শহরের বিশিষ্ট নাগরিক এবং ধর্মপিপাসুগণ প্রত্যহই মহারাজজীর পুণ্যসঙ্গলাভার্থে আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন। শিলচর সেবাশ্রমে দশদিনব্যাপী যে ভাবগম্ভীর আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা ভক্তগণের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক থাকিবে। শিলচর হইতে মহারাজজী করিমগঞ্জ এবং তৎপরে শিলং গমন করেন। এই দুই স্থানেও মহারাজজীর পূত সান্নিধ্যে শত শত ভক্ত নরনারী বহুতর আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

মালদহে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—গত ২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল, '৫৫) হইতে ৪ দিন ধরিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ বার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে প্রথম দিন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণোৎসব হয়। বেলুড় মঠাগত স্বামী পূর্ণানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি ছাত্রদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্মহীনতার ক্ষোভ দূর করত তদ্বিপরীত নিয়মানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা ও সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সুনাম অর্জনে ব্রতী হইতে বলেন। রাত্রি ৮৷৷টা হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিপুল জনতার সম্মুখে বর্ধমানের শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুরের চণ্ডীকীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিন মালদহের ব্যায়ামবীর শ্রীশুভনারায়ণ গিরিজী মহারাজের সভা-পতিত্বে বিবেকানন্দ শিশু-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উহাতে শিশু-সঙ্ঘের ছোট ছোট বালকবালিকাবৃন্দ কৃতিত্বের সহিত ব্যায়াম, ব্রতচারী নৃত্য ও ক্রীড়াদি প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। ৬৷৷ টায় মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহকারী সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত মহাশয় আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। উহাতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা—যেমন আদিবাসী, সাঁওতাল, পলিয়া প্রভৃতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—বাস্তুহারাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা—বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার,—দুর্বল বাঙ্গালী জাতির শারীরিক দুর্বলতা দূরীকরণার্থে ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা,—ছাত্রদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তৎপরে স্বামী পূর্ণানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রীতি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৃতীয় দিন সকাল ৯টায় কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বৈকালে স্বামী পূর্ণানন্দ একটি জনসভায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। চতুর্থ দিন শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী বিবেকানন্দজীর তৈলচিত্র সহ বিরাট এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম এবং ভজন ও কীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। মালদহের সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে অনেকগুলি দল আসিয়াছিল। সন্ধ্যায়

স্বামী পূর্ণানন্দ একটি জনসভায় শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনী ও বাণীর তাৎপর্য মনোমুগ্ধকর ওজস্বিনী ভাষায় আলোচনা করেন।

আসানসোল কেন্দ্রে বার্ষিক উৎসব—গত ২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫) হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ দিন আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন প্রত্যুষে এক শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে, এবং পরে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি আশ্রমের পূজাগৃহে সম্পন্ন হয়। তিন দিন সন্ধ্যাবেলা তিনটি বিরাট জনসভায় যথাক্রমে ঠাকুরের, শ্রীমায়ের ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, এবং অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। ইহা ব্যতীত এই কয়দিন ভাগবত আলোচনা, কীর্তন গান এবং বিবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠানও হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন বহু নর-নারীর সমাগম হয়। রবিবার মধ্যাহ্নে অনুমান তিন হাজার ব্যক্তি আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উৎসবের শেষ দিবস শিক্ষা-বিষয়ে নির্দিষ্ট ছিল। এই দিন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উদ্যোগে ছাত্রদের হাতের কাজের এক প্রদর্শনী দেখান হয়। এই দিন অপরাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন বহুমুখী বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন এবং ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ডাক্তার সেন আসিলে বিদ্যালয়ের স্কাউটগণ তাঁহাকে সম্বর্ধনা করে। ডাক্তার সেন শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনার আভাস দেন। আরও বলেন যে উপায় ভিন্ন হইলেও ছাত্রদের মানুষ করাই সকল বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সভা শেষ হইবার পর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 'চিতোর গৌরব' নাটক অভিনয় করে।

কাঁথিতে অনুষ্ঠান—কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জন্মোৎসব ১১ই চৈত্র হইতে ১৩ই চৈত্র পর্যন্ত পূজা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যান, ধর্মসঙ্গীত, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা প্রসাদ-বিতরণ এবং আলোচনা-সভার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিপালিত হইয়াছে। ব্যাখ্যান ও ভাষণাদিতে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ (মহকুমা-শাসক), অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মৃণালিনী রায়, শ্রীমতী শৈলজা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার যশস্বী গায়ক শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষাল তাঁহার দুই জন ছাত্র সহ ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন।

১৪ই চৈত্র লাউদা গ্রামে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বেরা ও কতিপয় উৎসাহী ভক্তগণের উদ্যোগে এক ধর্ম-সভা হয়। আশ্রমের ও বাহির হইতে আগত সাধু ও ভক্তগণ এবং শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

সাগরদ্বীপে উৎসব—ভাগীরথীর মোহানায় অবস্থিত সাগরদ্বীপে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মনসাদ্বীপ শিক্ষাকেন্দ্র গত কয়েক বৎসরের ন্যায় এবারও সুষ্ঠুভাবে ঠাকুরের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছেন। উৎসবের তারিখ ছিল ২৫শে চৈত্র, ১৩৬১ (৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫)। একশতবর্গমাইল আয়তনের ষাট হাজার জনগণ-অধ্যুষিত সুবৃহৎ দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শত শত নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দিগন্তবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের মাঝখানে আশ্রমের ছায়াশীতল শান্ত সুন্দর পরিবেষ্টনীতে সারাদিন ধরিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজাহোমাদি সম্পন্ন করেন আশ্রম-সেবক স্বামী নিরাময়ানন্দ। বৈকালে একটি জনসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্রীপ্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন বক্তা যুগাবতারের জীবন ও উপদেশ আলোচনা করেন। আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অভিনয় এবং 'মনসাদ্বীপ যুবক নাট্য সমিতি'র পরিবেশিত সমস্ত রাত্রিব্যাপী যাত্রা সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিল। প্রায় তিন হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবিধ সংবাদ

লক্ষ্মীপুর যুবশিবির—পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে (গোবরডাঙ্গা শহরের নিকটে) গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত একটি যুব শিবির পরিচালিত হয়। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস, গ্রাম-সংগঠন প্রভৃতি মনোভাবের বিকাশসাধনই উক্ত যুব শিবির সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল। সমবেত প্রার্থনা (Community Prayer), কুচ্ কাওয়াজ, নতুন রাস্তা তৈয়ারীর কাজ, গ্রাম-পরিক্রমা, নৈশ বিদ্যালয় সংগঠন, গ্রামের লোকদের লইয়া সান্ধ্য মজলিস প্রভৃতি শিবির-জীবনের দৈনন্দিন কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিবিরের কর্মীরা প্রত্যেকদিন ৩ ঘণ্টা কাজ করিয়া ২৩ দিনে গ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুইটি নূতন রাস্তা তৈরী করে। রাস্তা দুইটির মোট দৈর্ঘ্য ১,৫০০ ফুট। গ্রামবাসীদের আনন্দদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় শিল্পী ও শিবিরের কর্মীদের লইয়া কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সর্বশেষে চারদিন-ব্যাপী এক সমাপ্তি-অনুষ্ঠানের দ্বারা শিবিরের কাজ শেষ হয়। শিল্পপ্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, পুরস্কার-বিতরণী-সভা, মহাভারত-ব্যাখ্যা প্রভৃতি উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল। এই সব অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষতের এ্যাড্ মিনিষ্ট্রেটর প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, হাবড়া সমাজ উন্নয়ন ব্লকের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ ডি ডি বোস, পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, বাণীপুর জনতা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাইচরণ চক্রবর্তী, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবঙ্কিম মুখার্জি। এছাড়াও স্থানীয় শিক্ষক, অধ্যাপক, সমাজসেবী এবং আরও অনেকে এই একমাসের মধ্যে শিবির পরিদর্শনে আসেন এবং শিবিরের নূতন প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান।

পরলোকে যদুনাথ দে—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রীযদুনাথ দে গত ৯ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) কলিকাতায় নিজবাটীতে ৮০ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদু বাবু কর্মজীবনে ডাক বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বেলুড় মঠের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘকালের সংযোগাবসরে যদু বাবুর সরল বিশ্বাসী ভগবন্নির্ভরশীল সেবাপরায়ণ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া অনেকেই মুগ্ধ হইতেন। শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

হাফলংএ অনুষ্ঠান—হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন-উৎসব বিগত ২৯শে চৈত্র, ১৩৬১ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই ছাত্রাবাস-নির্মাণকার্যে আসাম গবর্ণমেণ্টের এক বিশেষ অর্থমঞ্জুর রহিয়াছে। আসাম সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীজয়ভদ্র হাগজের ভিত্তিস্থাপন-কার্য সম্পন্ন করেন। এই উৎসবে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্নজাতীয় নরনারীর এক বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। হাফলংএর সুদৃশ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে ঘন ঘন মাঙ্গলিক জয়ধ্বনি, শঙ্খনিনাদ, বৈদিক শান্তিপাঠ ও সমবেত সঙ্গীতে এক বিচিত্র গম্ভীর পরিবেশে শ্রীজয়ভদ্র হাগজের শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত চিত্রপটে মাল্যদান এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনস্থল পুণ্যভূমি শ্রীদক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীর ও অপরাপর পুণ্যতীর্থাদির পবিত্র মৃত্তিকা সযত্নে ভিত্তি-কেন্দ্রে স্থাপন করেন। ইহার পর সারগর্ভ প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রাবাস-স্থাপনের উদ্দেশ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিলে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তী যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২ই ফাল্গুন পুণ্যজন্মতিথি দিনটি বৈদিক প্রার্থনা, বিশেষ পূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত পাঠ, ভজন, প্রবচন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় কর্তৃক দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ১৫ই ফাল্গুন আজমীর রাজ্যের চীফ কমিশনার শ্রীএম্, কে, কৃপালনীর সভাপতিত্বে এক বিরাট

জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন পণ্ডিত শ্রীকিষণ লাল দ্বিবেদী, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রী ভি, ভি, জন এবং স্বামী আদিভবানন্দ।

হিরাকুদ (ওড়িশ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি কর্তৃক গত ১৫ই ফাল্গুন উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরী, দিবস-ব্যাপী কীর্তন, চণ্ডীপাঠ এবং ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দ কর্তৃক পূজা, হোম, আরাত্রিক প্রভৃতির অনুষ্ঠান, দ্বিপ্রহরে প্রায় সহস্রাধিক নরনারায়ণের পরিতোষপূর্বক সেবা এবং সায়াহ্নে পাঁচ শতাধিক শ্রোতৃবৃন্দের একটি সভা হয়। সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় গুরুদ্বারের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত জি, এস্, বাজাজ। রাত্রে সঙ্গীতানুষ্ঠানে সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত ২১শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় বালকবালিকাগণের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং ২২শে ফাল্গুন ভোর ৫টা হইতে ১২টা পর্যন্ত মঙ্গলারতি, উষা-কীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভোগরাগ, দ্বিপ্রহরের পর ভক্ত ও নরনারায়ণ সেবা এবং অপরাহ্নে মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা হয়। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি মহারাজের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ প্রচুর আনন্দলাভ করেন। সন্ধ্যারতির পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পরদিন রাত্রে স্থানীয় যুবকবৃন্দ কর্তৃক 'আনন্দমঠ' মঞ্চস্থ হয়।

খেপুত (মেদিনীপুর) গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষ্যে গত ১২ই ফাল্গুন প্রাতে মঙ্গলারতি ও প্রভাতফেরী, পূর্বাহ্নে পূজা ও হোমাদি, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ এবং অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর রায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর ভক্তগণ সমবেতভাবে ভজনাদি করেন।

কাশীপুর (ভাতার, বর্ধমান) যুবসঙ্ঘ কর্তৃক বিগত ২৯শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যূষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, প্রাতে পূজার্চনা এবং দ্বিপ্রহরে চারি শত দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীষষ্ঠীদাস চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা হয়। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। যুবসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীরামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় "স্বামী সারদানন্দের চক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলেন। সভায় সঙ্গীত, ভজন, আবৃত্তি প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। গ্রামসেবক শ্রীমাণিক চন্দ্র দে মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও প্রেরণায় এই গ্রামে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

রাণাঘাট রামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী কমিটীর উদ্যোগে ১৯শে ও ২০শে চৈত্র স্থানীয় পিপ্‌ল্‌স্ ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জন্মজয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড় মঠের উদ্বোধন-শাখাকেন্দ্রের স্বামী প্রেমঘনানন্দ পূজা ও হোম সম্পন্ন করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুর উদ্যানবাটীর সেবক-প্রধান স্বামী সাধনানন্দজীর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও সুললিত ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দদান করিয়াছিল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একটি জনসভায় ঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কাশীপুর ব্রতীসঙ্ঘ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমবেত নরনারীগণকে হাতে হাতে মিষ্টান্ন প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

মাজু (হাওড়া) হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে গত ২০শে চৈত্র, ১৩৬১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তী-স্মৃতিসভায় বেলুড় মঠের স্বামী মনীষানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সহজ সরল ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করেন।

চুঁচুড়া প্রবুদ্ধভারত-সঙ্ঘ কর্তৃক স্থানীয় ডাচ্ কুঠিতে গত ২৬শে চৈত্র, ১৩৬১ একটি জনসভার আয়োজন হয়। শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী এবং স্বামী মনীষানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা আলোচনা করেন।

পাণ্ডুয়া (হুগলী) নীরদগড় কলোনীতে ১০ই বৈশাখ আয়োজিত একটি জয়ন্তীসভায় অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র মজুমদার ও উপরোক্ত শেষের বক্তৃদ্বয় পাঁচশত গ্রামবাসীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-মর্ম হৃদয়স্পর্শীভাবে ব্যাখ্যা করেন।

উদ্বোধন

চৈতন্য-মহাসাগরে

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন ন মমাস্ত্যসহিষ্ণুতা॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন চ ক্ষতিঃ॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ॥

—অষ্টাবক্র-সংহিতা, ৭।১-৩

আমি যখন নিজের পরমসত্যের পরিচয় লাভ করি তখন আমি আর বিন্দু নই—সিন্ধু—জন্মহীন ক্ষয়-বিনাশহীন অনন্ত চৈতন্যসিন্ধু। বাতাসের বেগে তরণী যেমন জলের বুকে হেলিতে, দুলিতে, চলিতে থাকে তেমনই 'আমি'-মহাসাগরে স্বভাবরূপ বাত্যায় তাড়িত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একটি পোতের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তরণীর হিল্লোলে সাগর কি চঞ্চল হয়? বিশ্বের স্পন্দন ও গতিতে আমারও তাই কোন অসহিষ্ণুতা নাই।

সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্ নয়। মুহূর্তে মুহূর্তে অসংখ্য বীচিমালার যে উত্থান ও বিলয়—উহা সমুদ্রেই ঘটিতেছে। ঢেউ থাকিলেও সমুদ্র, না থাকিলেও সমুদ্র। তরঙ্গের আবির্ভাব-তিরোধানে সমুদ্রের বৃদ্ধি-হ্রাস হয় না। ঠিক সেইপ্রকার 'আমি'-রূপ অন্তহীন বিশাল জলধিতে অজস্র সংসার-বৈচিত্র্য তরঙ্গের ন্যায় যদি একবার মাথা তুলে আবার মিলাইয়া যায় তাহাতে আমার কোন লাভ নাই, লোকসানও নাই। আমি যাহা তাহাই থাকি—যত কিছু বৈচিত্র্য আমারই চৈতন্যসত্তায় ওতপ্রোত।

আমি যখন আমার পরিচ্ছিন্ন জীবত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমগ্রাত্মক ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হই তখন আমার সত্যেই বিশ্বসত্য। অসীম চৈতন্য-মহাসাগরে বিশ্ব শুধু একটি কল্পনা—আমারই কল্পনা—আমারই অস্তিত্ব-আলোক-আনন্দে রচিত কল্পনা। ঐ বিশ্বকল্পনা আমিই।

সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়াছে—এক সর্বপ্রসারী নিরাকারে সমুদয় আকার লীন হইয়াছে। এই পরমসত্যে সুস্থির থাকিয়া আমি শান্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি।

কথাপ্রসঙ্গে

হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব

হিন্দুর নিকট ভারতবর্ষ নানা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন একটি বিশাল ভৌগোলিক ভূমিভাগ মাত্র নয় যেখানে সে জন্মিয়াছে, বড় হইয়াছে—উহা তাহার আবেগজীবনের একটি সামগ্রিক চেতনা। ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র খণ্ডতাকে হিন্দু এক অবিভাজ্য ভাব-সত্তায় সংগ্রথিত দেখিতে পায়, তাহার নিজের সত্তার সহিত এই ভারত-সত্তামিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হিন্দুত্বকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের বিভিন্ন নদ নদী বন প্রান্তর জনপদ পর্বতকে, ভারতের প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর রীতিনীতি সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে উহার সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলেন যে, হিন্দুর পক্ষে কোনমতেই আর ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণতা হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া দেখা সম্ভবপর হয় নাই, হইবেও না। তাহার ভাষায়, চিন্তায়, পারিবারিক ও সামাজিক লেনদেনে, ব্যষ্টি-ও সমষ্টিগত আচরণে, ধর্মকৃত্যে ভারতবর্ষের সমগ্র ভূগোল, শত শত শতাব্দীর ঐতিহ্য ঢুকিয়া আছে। হিন্দুর নিকট হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব এই দুটি শব্দ একই বস্তুর—একটিই সমরস অনুভূতির নির্দেশক।

হিন্দুত্বের দৃষ্টিতে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা থাকিবার কথা নয়। প্রতিদিকে ভারতের প্রতি সীমার প্রত্যেক হিন্দু নিত্য তাহার দেবপূজায় বসিয়া যখন পাঠ করে—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" —তখন একবার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার ধ্যানে আসে না কি? মাটির ভারতবর্ষ নয়, এক পুণ্য ভাবময় অখণ্ড ভারতবর্ষ? যে ভারতবর্ষ অঙ্গ-বঙ্গ-ঔড্র-কলিঙ্গে, মথুরা-ইন্দ্রপ্রস্থ-বারাণসী-মিথিলায়, গান্ধার-সৌরাষ্ট্র-কেরল-মদ্রে, বিন্ধ্য-অবন্তী-কৌশাম্বী-মালবে? সুদূর দক্ষিণ দেশের শত শত হিন্দু নরনারী সারাজীবন স্বপ্ন দেখিয়া চলে—উত্তরে শিব-অন্নপূর্ণাক্ষেত্র বারাণসীতে কবে গিয়া অন্তত ত্রিরাত্রি বাস করিয়া আসিব—কতদিনে হিমালয়ের দুর্গম পথ অধিরোহণ করিয়া কেদারনাথ বদরী নারায়ণে উপস্থিত হইব। তেমনি আবার আর্যাবর্তের অধিবাসিগণেরও প্রাণে প্রাচীনকালের সেই মহামতি অগস্ত্য ঋষির মতো বিন্ধ্যগিরি ডিঙাইয়া দক্ষিণাবর্তের বিপিনে, লোকালয়ে পরিভ্রমণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। আকর্ষণ করে রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, কাবেরী, গোদাবরী, শ্রীরঙ্গম্, কাঞ্চী। দক্ষিণের হিন্দু যখন উত্তরে যায় তখন সে একটুও অনুভব করে না তাহাকে বিদেশীদের মধ্যে বিচরণ করিতে হইতেছে। ওখানে ভাষা আলাদা, পোষাক পরিচ্ছদও হয়তো ঠিক এক নয়, খাদ্য অন্য, তবুও প্রাণের মধ্যে একটি নিবিড় সংযোগ অহরহ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে—ভারতাত্মার যোগ। উত্তরের হিন্দুরও দক্ষিণে গিয়া লাভ হয় অনুরূপই অভিজ্ঞতা।

ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের হিন্দুর অপর কোন অঞ্চলকে অনাদর করিবার অবসর হিন্দুত্বের প্রাচীন সংগঠকগণ রাখেন নাই। এত বিভিন্ন প্রকার শারীরিক আকৃতি, ভাষা, মানসিক প্রকৃতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি এক নিবিড় অনুরাগ মানুষের মনে সঞ্চার করিয়া একটি অখণ্ড জাতীয়তা সৃষ্টির কী অত্যদ্ভুত কৌশলই তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন!

বলিও না ইহা ধর্মীয় জাতীয়তা—কুসংস্কার। কুসংস্কার যদি এত সবলতা দিতে পারে, এত ঐক্য-বন্ধন আনিতে পারে, এত ভালবাসা জাগাইতে পারে তবে তাহার ন্যায় ভাল আর কি আছে? জাতীয়তাকে দৃঢ়নিবদ্ধ রাখিতে কত দেশে কত

উপায়ই তো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি, উহাদের কয়টি কালের আঘাত সহিতে পারিয়াছে? ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতিটি কি উহাদের তুলনায় মন্দ? শত শত রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, রাজনৈতিক সংঘর্ষ ভারতবর্ষকে তোলপাড় করিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসীর অন্তরাত্মাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই—যে অন্তরাত্মার নাম হিন্দুত্ব—ভারতীয়ত্ব। হাঁ, ইহার প্রতিষ্ঠা ধর্মে। কিন্তু ধর্ম কি মানুষের বিলাস? শক্তি নয়?

উহা শক্তিই—মহাশক্তি। এই মহাশক্তিকেই আমাদের সুদূরদর্শী পূর্বপুরুষগণ জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণের কাজে লাগাইয়াছিলেন। ঐ কাজের দিন এখনও ফুরায় নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয়তাকেও দৃঢবদ্ধ রাখিতে হইবে ভারতবাসীর বিভিন্ন ধর্মীয় শক্তিসমূহকে সুসংহত করিয়া। এই সুসংহতি কিন্তু স্বাধীনতা-দিবসে রাজভবনে অনুষ্ঠিত All Faiths Prayer-এর ন্যায় একটি সাময়িক আড়ম্বর নয়। হিন্দুত্বের নিকট সর্বধর্মীয় উপাসনা কোন নূতন কথা কি? হিন্দুমাত্রই সর্বধর্মীয় উপাসক। খ্রীষ্টানের গির্জাকে, মুসলমানের মসজিদকে, বৌদ্ধের স্তূপ-বিহারকে সম্মানদান হিন্দুকে শিখাইতে হয় না। যে কোন দেশের যে কোন মানুষ যে কোন ভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন হিন্দু সেই মানুষের নিকট মাথা নত করিয়াছে, তাঁহার সাধনাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহার জন্য তাহাকে আলাদা চেষ্টা করিতে হয় নাই, কেননা হিন্দুত্বের অপর নামই যে সমন্বয়ত্ব।

আজ হিন্দুগণ ব্যতীত ভারতবর্ষে যাঁহারা নিজের দেশ বলিয়া বাস করিতেছেন তাঁহারাও হিন্দুত্বের এই সমন্বয়ী দৃষ্টি অভ্যাস করিলে শুধু নিজেরাই যে লাভবান্ হইবেন তাহা নয়, জাতীয় ঐক্যসংরক্ষণেও সহায়তা করিবেন। ধর্মভূমি ভারতে সংহতি-শক্তি-রূপে একমাত্র রাজনৈতিক একতার উপরই নির্ভর করিলে ভবিষ্যতে সঙ্কট আসা বিচিত্র নয়। অবশ্য একথা সত্য যে, হিন্দুর নিকট ভারতীয়ত্বের যাহা অর্থ অপর ভারতীয়ের নিকট সেই অর্থ সম্পূর্ণভাবে আশা করা যাইতে পারে না। যে অর্থে ইংরেজ ইংলণ্ডকে মাতৃভূমি বলে, যে আদর্শে ফরাসী ফ্রান্সের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত থাকে সেই অর্থে, সেই ভাব লইয়া তাঁহাদের ভারতকে ভালবাসা কঠিন নয়, ভারতের জন্য তাঁহারা স্বার্থত্যাগও করিতে পারেন। এই ভৌগোলিক দেশপ্রীতি অবশ্য ভারতে পূর্বেও ছিল—কিন্তু সামগ্রিকভাবে নয়, বিচ্ছিন্নভাবে। রাজপুতবীরগণ রাজপুতানাকেই বুঝিতেন, মারাঠীরা মহারাষ্ট্রের জন্যই লড়িয়াছেন, মরিয়াছেন, মোগল সৈন্যগণ দিল্লীর মোগল মসনদ বজায় রাখিতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে সামগ্রিকভাবে যে রাষ্ট্রীয় একতাবোধ ভারতীয়মাত্রকেই সাধিবার জন্য রাষ্ট্রনেতারা বার বার জোর দিয়া বলিতেছেন আমরা পরিপূর্ণভাবে উহার সমর্থন করি। ভারতবর্ষের শত শত শতাব্দীর ইতিহাসে বর্তমানের ব্যাপক রাষ্ট্রীয়সংহতি সত্যই অভিনব জিনিস। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, এই রাজনৈতিক সংহতির সহিত অপর যে একটি গভীরতর সংহতি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী—হিন্দুগণকে এক অখণ্ড ভারতপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে সেই সংহতিরও তাৎপর্য এবং ক্রিয়া আমরা যেন উপলব্ধি করি। হিন্দুত্বের সংরক্ষণ, পরিপুষ্টি ও পরিপ্রসার ভারতীয়ত্বেরই শক্তিবৃদ্ধি।

রাষ্ট্র ও প্রদেশ

সীমানা নির্ধারণের প্রসঙ্গ লইয়া সম্প্রতি আসামের কয়েকস্থানে যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও গুণ্ডামি অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সুধীব্যক্তিমাত্রই আশঙ্কিত না হইয়া পারিবেন না। কিছুকাল পূর্বে বিহারেরও একাধিক জায়গায় এই ব্যাপার লইয়াই উগ্র প্রাদেশিকতার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি রাজ্য এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নয়, একই রাষ্ট্রের প্রদেশমাত্র সে কথা যদি আমরা ভুলিয়া যাই তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি যখন অতি প্রবল হইয়া উঠে তখন আমরা আমাদের বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিস্মৃত হই। আসামী বাঙ্গালী বিহারী ওড়িয়া ইঁহারা সকলেই যে ভারতীয় ইহা কি আমাদের নূতন করিয়া শিখিতে হইবে? গত ২৫শে জানুয়ারী মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামে আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে ভারতের ভাবগত ঐক্যের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অহল্যাবাঈয়ের না ছিল বাংলার সঙ্গে সম্বন্ধ, না ছিল উড়িষ্যার সঙ্গে। (বাংলা-উড়িষ্যার) এই রাস্তা গড়িবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন মধ্যভারতের জনতার কাছ হইতে। ইহা কোন ছোট কথা নহে। সেইকালে মধ্যভারতের এক রাণী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকেও

নিজের বলিয়াই বুঝিতেন এবং নিজ প্রদেশ হইতে যে টাকা-পয়সা পাইতেন তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের সেবায় লাগাইতেন।

আমি জানি যে, শংকরাচার্য প্রচারকার্যে বাহির হইয়া জগন্নাথপুরী, দ্বারকা, বদরীনাথ এবং দক্ষিণে শৃঙ্গেরীতে এক একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল কন্যাকুমারীর কাছে কেরলে আর তিনি সমাধি লইয়াছিলেন হিমালয়ে। ইহাও জানি, ভারতের অসংখ্য সৎপুরুষ উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে সতত পরিক্রমায় বাহির হইতেন। তাঁহারা সমগ্র ভারতকে এক জানিতেন। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, আমি যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছি সেই প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত তুকারাম নিজেকে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুগামী বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। এইভাবে সারা ভারত অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে একরস বনিয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে ঘুরিবার সময় আমার একবারও মনে হয় নাই যে আমি অন্য এক প্রদেশের লোক। মনে হইয়াছে, আমি এই প্রদেশেরই। আপনারা যদি মহারাষ্ট্রে যান তবে আপনাদেরও এইরূপ মনে হইবে।" ('ভূদান যজ্ঞ,' ৭ই জ্যৈষ্ঠ, '৬২)

প্রদেশে প্রদেশে কোন বিষয় লইয়া মতানৈক্য ঘটিলে সেই অনৈক্যকে বাড়াইয়া এমন করা উচিত নয়, যাহাতে উহা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষে প্রদেশ বহু কিন্তু রাষ্ট্র এক। তবে বহু প্রদেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতা ছাড়াও যে গভীর সংস্কৃতিগত ঐক্য আছে উহারই দিকে বেশী করিয়া দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

অপরাধীর শাসন

কিছুদিন আগে কলিকাতার একটি বিচারালয়ে দুইজন মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীকে ভেজাল ঘি মজুত করিবার অপরাধে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য ধরা পড়িবার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়, কিন্তু যাহারা ধরা পড়ে তাহাদিগের দণ্ডিত হইবার খবর খুব বিরল। বিচার-প্রক্রিয়া এত বিলম্বিত এবং এত বাধা-সঙ্কুল যে দুষ্কর্মের শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের ভরসা প্রায় নাই বলিলেই চলে। ফলে দুষ্কৃতকারিগণের দুষ্টামি বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্তমান সংবাদটি অতএব সুসংবাদ।

উপর্যুল্লিখিত ক্ষেত্রে রায় দিবার সময় বিচারপতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, এই ধরনের অপরাধীরা খুনী আসামীদের চেয়েও অধিকতর দণ্ডার্হ। জঘন্য অর্থলালসার জন্য ভেজাল খাদ্য আমদানি ও বিক্রয় করিয়া ইহারা শত শত শিশু ও নরনারীর মধ্যে ব্যাধি, অস্বাস্থ্য এবং মৃত্যু ছড়াইতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ঐ পর্যাপ্ত তৎপরতা নাই। কঠোর দণ্ড দিতে আমরা ভয় পাই, 'অহিংসা' আদর্শ জাগিয়া উঠে, হিতকথা বলিয়া দুষ্টের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' ঘটাইতে চাই! আমরা ভুলিয়া যাই দুষ্টকে দণ্ডদান ধর্মেরই বিধান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—'দণ্ডো দময়তামস্মি।' কুপথগামিগণকে সুপথে আনিবার জন্য রাজা যে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন তাহা ভগবানেরই বিভূতি।

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের রাসায়নিক পরীক্ষাগার পরিদর্শন করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। খাদ্যে ভেজাল ধরিবার জন্য কয়েকজন কৃতবিদ্য মেধাবী বাঙালী যুবক-বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখিয়া আমরা বড়ই পরিতৃপ্তি বোধ করিলাম। কিন্তু ভেজাল-প্রতীকারকল্পে তাঁহাদের নিজেদের অসহায়তার কথা যখন তাঁহারা পরিশেষে বর্ণনা করিতেছিলেন তখন আমাদের চিত্ত বিষাদাচ্ছন্ন হইল। তাঁহারা বলিলেন,—"দেখুন, আমরা তো খেটেখুটে ভেজাল ধরে দিলাম—কিন্তু ভেজাল বন্ধের পরবর্তী ধাপগুলি আর আমাদের হাতে নয়। আদালতে কেস্ উঠবে, সাক্ষিসাবুদ ডাকা হবে, হিয়ারিং চলবে—এমনি করে দুবছর কেটে যাবে। তারপর আসামী পক্ষের টাকার জোরে এমনও ঘটে থাকে যে, আমরা আমাদের পরীক্ষার যে ফল আদালতে বলে এলাম তা চ্যালেঞ্জ করলেন আসামী পক্ষের আর একজন বৈজ্ঞানিক—হয়তো আমাদেরই বহু-শ্রদ্ধেয়, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী নাম-ওয়ালা কোন অধ্যাপক-বৈজ্ঞানিক। তা হলে দেখুন, আসামীর যে শাস্তি হবে সে সম্ভাবনা কত ক্ষীণ। যদিও বা দুবছর পরে কিছু শাস্তি হয় তো তা এত সামান্য যে তাতে অপরাধীরা ভবিষ্যতে ঐ ঘৃণিত কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে না।"

আমাদের মনে হয়, জনসাধারণও এই অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীদের পাপাচরণ প্রতিরোধের জন্য কিছু কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহারা উক্ত বণিক্‌দের বয়কট করেন না কেন? উহাদের দোকানের সম্মুখে একদিন বা একাধিক দিন 'অহিংস' বিক্ষোভ দেখাইতেই বা বাধে কিসে? যে কোন কারণে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের তো অন্ত নাই—সমাজের এই অনিষ্টকারী শত্রুদের ঘৃণিত প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার হিম্মত কেন জাগে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ

[গত ২৭।২।৫৫ তারিখে 'Voice of America'তে দূর-প্রাচ্যের দেশসমূহের জন্ত বেতার ভাষণের সঙ্কলন]

স্বামী পবিত্রানন্দ

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের একটি সুদূর পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তিনি। কোন ইস্কুলের শিক্ষাও তিনি পান নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কি ছিল যার জন্তে শুধু ভারতে নয় বিশ্বের বহু দেশে তাঁর নামের এত সমাদর? তাঁর অনুগামী ও ভক্ত-সংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। তাদের নাম কি ও সংখ্যা কত তা বলা কঠিন। আমেরিকা আসার সময় আমাদের জাহাজটি নিউ ইয়র্কের উত্তরণ-মঞ্চে এসে ভিড়লে পর আমাকে একজন ইমিগ্রেসন অফিসারের কাছে হাজির হতে হয়েছিল। মনে পড়ে, তিনি তখন আমায় শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীর সংখ্যা কত জিজ্ঞাসা করায় আমি ঠিক কি উত্তর দেব তাই খুঁজতে লাগলাম। এমনকি কাছাকাছি একটি সংখ্যাও বলতে পারিনি। আধ্যাত্মিক পুষ্টি সাধনের জন্তে হাজার হাজার লোক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও উপদেশের উপর নির্ভরশীল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যে কত বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন, আমি অকপটে উক্ত কর্ম-চারীকে তা বলেছিলাম। তিনিও সেটা বুঝলেন মনে হল।

এখন কথা হল, এই যুগে যখন বহুলোক ধর্মে বিশ্বাস করে না, ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন বা শুধুই বাহ্যিক অনুরাগসম্পন্ন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই জনপ্রিয়তার রহস্য কি? অবশ্য ধর্মে যে মানুষের কোন অনুরাগ নেই তা বলা ঠিক হবে না। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন। প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্তে ব্যাকুলতা সুপ্ত। সেই ব্যাকুলতা বিকাশ চায়; অচেতনভাবে পূর্ণতা প্রাপ্তির চেষ্টা করে। এই সব নর-নারীর সঙ্গে ধর্মানুভূতি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হয় না বলেই অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যাকুলতা বিকশিত হতে পারে না। তাই, এমন যদি কাউকে পাওয়া যায় যাঁর ধর্মালোচনা নিছক গির্জার রবিবাসরীয় উপদেশ, বা দার্শনিক কল্পনা কিংবা প্রাণহীন গতানুগতিকতার অনুরূপ না হয়ে প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ হয় তবে বহুলোক উৎসুক হয়ে তা শোনে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই বলতেন—"ধর্ম সম্বন্ধে যদি তোমার কিছু দেবার থাকে, তবে লোক বহুদূর হতে তোমার কাছে আসবে। কিন্তু বাস্তবিক তোমার যদি দেয় কিছু না থাকে, তবে হাজার হাজার মাইল ঘুরেও তুমি শ্রোতা পাবে না।" তথাকথিত ধর্ম-প্রচারকদের তিনি সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন—যদি কেউ আদেশ পেয়ে ধর্মপ্রচার করেন তবে তাঁর কথা বজ্রের মত ক্রিয়া করে। সেই সব কথায় এত শক্তি যে লোকে তাঁর বাণী প্রতিরোধ করতে পারে না। অতএব বক্তৃতা দেবার পূর্বে আমাদের সর্বপ্রথম ঈশ্বরানুভূতি লাভের চেষ্টা করা উচিত। তিনি খুব জোর করে বলতেন, মানুষ ধর্ম শিক্ষা দিতে ভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ পায়।

কলিকাতা হতে গঙ্গার ছ'মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, পুরোহিতরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবন আরম্ভ করেন। জোর করে তাঁকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠান সম্ভব হয়নি। সাংসারিক উন্নতিবিধায়ক 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা'কে তিনি মোটেই আমল দিতেন না। তিনি সেই বিদ্যাই চাইতেন যা দিয়ে জীবনের চরম সমস্যার সমাধান হয় ও প্রকৃতির রহস্য

উদ্‌ঘাটিত হয়। ঐ মন্দিরে জগন্মাতার মূর্তি পূজা-কালে তাঁর সেই সুযোগ এল। তাঁর কাছে পূজা বাহ্যিক ধরাবাঁধা পদ্ধতি ছিল না। নিজের মধ্যে কেবল চিন্তা নয়, খুব তীব্রভাবে চিন্তা করে দেখতে লাগলেন যে মূর্তির তিনি পূজো করছেন তা কি কেবল পাথরের—না প্রাণবন্ত! এই ধরনের চিন্তা তাঁকে এত তীব্র হ'তে তীব্রতরভাবে পেয়ে বসল যে শেষে বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে হ'য়ে উঠল একবারে অসহ্য। মানুষের চরম দুঃখই তো ভগবৎ-কৃপালাভের পরম সুযোগ। জীবনে সত্যিই যদি আমরা কোন দিন অসহায় বোধ করি তবে তখনই সাহায্য পেয়ে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণও জীবনের এমনই এক মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে জগন্মাতার প্রথম দর্শন পেলেন। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে রামকৃষ্ণের এই অনুভূতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা বলা যায়। কারণ বর্তমানের এই শুষ্ক শূন্যবাদ, গর্বিত সন্দেহবাদ ও আত্মতৃপ্ত নাস্তিক্যবাদের যুগে তিনি দেখালেন ভগবান মরিয়া যান নাই, তিনি আছেন, সত্যই আছেন। আমরা কোন জড় বস্তুকে যেভাবে দেখি, স্পর্শ করি বা বোধ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ভগবান তার চেয়েও বেশী বাস্তব ছিলেন। তিনি *ঠিক এই কথা বহুবার বলেছেন।* আর তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি এত শক্তিশালী ছিল যে, সেই অনুভূতির সত্যতাকে কেউই প্রতিরোধ করতে পারত না। শুধু এই নয়, পরবর্তীকালে বহু লোককে—এদের মধ্যে যাঁরা ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন তাঁদেরও—তিনি ঠিক এই অনুভূতি-প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো এটি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবেন, মনোবিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তো বিস্ময়ে মাথা চুলকাবেন কিন্তু কাল প্রমাণ করে দিয়েছে তাঁর এই অনুভূতি যথার্থ, মনের গড়া কল্পনা নয়। কারণ তাঁর মত প্রায়-নিরক্ষর একজনের মুখ থেকে এমন জ্ঞানের কথা বেরিয়েছে যা কবি ও দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকেরা গভীর শ্রদ্ধাভরে আকণ্ঠ পান করেছে।' তাঁর বাণী শুধু তাঁর জীবনকালেই যে বহুজীবনে পরিবর্তন এনেছে তা নয়, ছাপার অক্ষরে, মুখে মুখে আলোচিত হয়ে তা আজও আরও অনন্তগুণে শক্তি-শালী হয়ে অনেকের জীবনে পরিবর্তন আনছে।

কেবল একটি মাত্র অনুভূতি লাভ করেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্তুষ্ট হন নি। তাঁর প্রথম অনুভূতি উত্তরোত্তর আরও অনুভূতি লাভের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে, তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতির পূর্ণ বিকাশের—দ্বৈতবাদীদের পূজার্চনা প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে পূজ্য পূজক যেখানে এক হয়ে যায় সেই সর্বোচ্চ অদ্বৈতজ্ঞান বা বাইবেলের ভাষায় "আমি ও আমার পিতা এক" এই অনুভূতির—পারে চলে গেলেন। চাওয়ামাত্রই তাঁর মধ্যে যেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জোয়ার বয়ে যেত। সত্যই মন যখন পবিত্র হয়, সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তখন তাতে চিন্তা বা বাসনার উদয় হওয়া-মাত্রই তা পূর্ণ হয়, বাস্তবে পরিণত হয়। এত বেশী ও এত বিচিত্র অনুভূতি আর কারুর জীবনে এসেছিল বলে ইতিহাসে কোন নিদর্শন নেই।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু এতেই খুশী ছিলেন *না। তিনি জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করলেন* খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা কেমন করে তাদের ইষ্ট পূজো করে তাই দেখবেন। তাই তিনি মুসলমান ধর্মের সাধনা করলেন, খ্রীষ্টকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ও এই সব ধর্মের সত্য সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করলেন। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে, সব ধর্মই যে সত্য, সকলে যে একই লক্ষ্যে চলেছে এইটি দেখানই পৃথিবীর ধর্ম-চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জলকে ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন বা গ্রীক যে ভাষায়ই বলা যাক না কেন তা যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে, ঠিক সেই রকম বিভিন্ন ধর্ম কেবল পরম তত্ত্ব অনুসন্ধানের নাম মাত্র। নিজ জীবনের সাধনা-লব্ধ

আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলস্বরূপ এই অপূর্ব বাণীর বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ ধর্মের নামে সকলপ্রকার গোঁড়ামি ও উন্মাদনার প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে সংকীর্ণতার নাম গন্ধ নেই আর সেগুলি তাঁর আপন অভিজ্ঞতা-লব্ধ বলেই তা মানুষের মনকে এত বেশী নাড়া দেওয়ার অন্যতম কারণ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—ফুল ফুটলে সব দিক্ থেকে মৌমাছি ছুটে আসে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এটি খুব বেশী সত্য। তাঁর মত অখ্যাত অজ্ঞানা একজন মন্দিরের পুরোহিত এই চরম সত্যের জ্ঞান লাভ করে যখন জ্ঞানের তাৎপর্য কি আবিষ্কার করলেন, তখন লোকে দলে দলে তাঁর কাছে আসতে লাগল। কোন প্রার্থী বা আর্তকে তাঁর বাণী শোনাতে তিনি কখনও বিমুখ হন নি। মৃত্যু-শয্যায় চিকিৎসক যখন তাঁকে বেশী কথা বলতে নিষেধ করলেন তখন একবার তিনি বলেছিলেন, "হাজার বার জীবন বলি দিয়ে যদি একজনেরও উপকার করতে পারি আমি তাই করব।"

ধর্ম মানুষকে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক ক'রে তোলে এইটিই প্রচলিত মত বা আদর্শানুরূপ ভ্রান্ত ধারণা। এ ধারণা যে কত অমূলক তা যে কোন যথার্থ সাধুর জীবন দেখলেই বোঝা যায়। একবার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলে সব মহাত্মারাই অপরকে সাহায্য করতে উৎসুক হয়ে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও আমরা দেখি অপরের দুঃখ-কষ্টের প্রতি তিনি কতখানি অনুকম্পাপ্রবণ ও সংবেদনশীল। কিন্তু তিনি বলেছেন মানুষ ভগবানকে ভুলে গেছে ব'লে, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তার কোন স্বচ্ছ দৃষ্টি নেই ব'লে সে এত দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, তাই সে অন্ধকারে হাতড়ে মরছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁর জীবনব্রতের ভার পড়ল তাঁরই প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর। তিনি অন্যান্য গুরু-ভাইদের নিয়ে এক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গুরুর বাণী বহন করে আমেরিকায় এসে, এদেশে বেদান্ত-আন্দোলন আরম্ভ করেন। বেদান্ত শব্দটি হিন্দুধর্মের তত্ত্বার্থ-বাচক। হিন্দুধর্মের উদার ভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেদান্ত প্রচাররত কর্মীরা, লোককে ধর্মান্তর গ্রহণ না করিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে আরও উন্নততর করে তুলতে চেষ্টা করেন। আমেরিকায় ও বিদেশে বেদান্ত আন্দোলনের কাজ যেমন প্রচার করা, স্বদেশে এরই অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ হ'ল শুদ্ধ আধ্যাত্মিক কর্ম-সূচীর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ লোক-হিতকর কাজ করা।

সর্ব ধর্মের মূল তত্ত্ব হল—"ভগবানকে ভালবাস ও মানুষকে দয়া কর।" এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে বলেছিলেন, যারা দয়া করতে চায় তারা মনে করে দাতার স্থান গ্রহীতার চেয়ে বড়। যথার্থ দৃষ্টি এইরূপ হওয়া উচিত, দাতা মনে করবে সেবা ক'রে সে মানুষের মধ্যে ভগবানের পূজো করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর মধ্যে তিনি এক নূতন পথনির্দেশ পেয়েছিলেন এবং পরে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন ক'রে সভ্যদের মধ্যে নিয়ম ক'রে দিলেন—কেবল লোকহিতের দৃষ্টি দিয়ে জনকল্যাণকর কাজ না ক'রে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক পূজোর অনুকল্পরূপে তা যেন করা হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই তো জানেন, বিদেশে বেদান্ত প্রচারার্থে কর্মী প্রেরণ ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন আর্তত্রাণ, চিকিৎসা, শিক্ষা, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি বিবিধ কর্মে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা এইটি বিশেষ করে বলতে চাইছি যে, বিজন পল্লীতে জন্মে সংসারী লোক যে ধন মান শিক্ষা ইত্যাদিকে মর্যাদা দিয়ে থাকে সে সবের একটিও

না থাকা সত্ত্বেও, একক একটি জীবন ও বাণীর সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি শক্তিরূপে উদ্ভূত হ'য়ে বিশ্বের সর্বত্র জনগণের প্রভূত উপকার সাধনের যন্ত্রবিশেষ হ'য়েছেন এবং তাঁর প্রভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এই ঘটনাই জড়ের উপর চৈতন্যের শক্তি, বাস্তববাদের তুলনায় আদর্শবাদের মূল্য, স্থূল সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। আজ পৃথিবী উদ্দাম গতিতে বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে ও লোকেরা ক্রমাগত বিষম ভুল করে বসছে। এই অবস্থায় সভ্যতার যথার্থ আদর্শ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত হ'তে আমরা পথের সন্ধান পেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান উপদেশগুলি কি ?

১। মানব জীবনের লক্ষ্য হ'ল ভগবান বা আত্মজ্ঞান লাভ করা।

২। সব ধর্ম একই লক্ষ্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ মাত্র।

৩। প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতীক। মানুষের সেবা করা মানে ভগবানের সেবা করা। কিন্তু উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অত্যন্ত বিনয় সহকারে এই সেবা করতে হবে।

এই বাণী দেশ বিদেশের লোক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করুক, এর সাহায্যে তারা যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নততর ও মহান্ হয়, এই প্রার্থনা।

দুঃখ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দুঃখ দিয়া দিলে শক্তি
সহিবার, দুঃখ জিনিবার
কল্যাণে রেখেছ গুপ্ত
ফল্গুরূপে অন্তরে তাহার।

এক হাতে দণ্ড তব
আর হাতে আশ্বাস-সান্ত্বনা
সঞ্চিত মালিন্য হরে
হৃদি হ'তে আধির যন্ত্রণা।

দুঃখ দিয়ে স্বাদুতর
ক'রে দিলে দুঃখান্তের সুখে।
দুঃখ দিলে, করুণাও
দিলে তুমি দয়ালুর বুকে।

দুঃখ দিলে প্রতিকারও
দিলে তুমি এ আর্ত ভুবনে
সেবাধর্ম জাগাইলে
তুমি পুন দরদীর মনে।

দুঃখ দিয়া প্রকৃতিরে
করিয়াছ শুশ্রূষাকারিণী
নিদ্রারে করেছ তুমি
সর্বশোক-সন্তাপহারিণী।

সর্বশেষে মহানিদ্রা
সর্ব তাপ করে যে হরণ
দুঃখ দিলে ভয় কিসে ?
দয়াময় দিয়াছ মরণ।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য প্রকাশ করিতে যাইলে প্রথমেই প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে, নাটকের উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়-বস্তুটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে গিরিশচন্দ্রের মহান্ প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। নাটকের উদ্দেশ্য হইল বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে কি করিয়া সমাজে প্রগতি হইবে এবং সমাজের দুর্নীতি নিবারণ করিয়া দীপ্তিময়ভাব নানান্তরে চলিবে। এই ভাবটি নানা চরিত্র, ঘটনা ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দেখানই হইল নাটকের উদ্দেশ্য।

যেমনটি দেখিয়াছি তেমনটি লিখিয়াছি, এই কথা উচ্চাঙ্গের নাটকে প্রযোজ্য হয় না। শুধু ইহা নহে, শিল্পের জন্যই শিল্প, এ কথাও উচ্চাঙ্গের নাটক বা কাব্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োগ হয় না, কারণ উচ্চাঙ্গের কাব্যে পরিণতি দেখাইতে হইবে। সমাজের উপর, জাতির উপর কিরূপ ভাবরাশি প্রতিভা বিস্তার করিবে এবং কোন্ পথে সমাজ ও জাতির মনকে লইয়া যাইবে, তাহাতে কিরূপ সুফল হওয়া সম্ভবপর এবং সমাজের দূষনীয় বিষয়বস্তু কিভাবে বর্জন করিতে হয়—কাব্য এই সকল বিষয় অজ্ঞাতসারে বিকাশ করিবে। একজন প্রবীণ দার্শনিকের, সমাজ ও জাতির বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সমাজের দোষসকল নিরাকরণ করা, সমাজের ভিতর নূতন প্রদীপ্তভাব জাগ্রত করা এবং ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতির প্রগতি কোন্ দিকে ধাবিত হইবে তাহা প্রাণস্পর্শী ভাষায় নির্দেশ করিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদ্দেশ্য। দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক ও উপদেষ্টা এই তিনেরই ভাব একত্রে অলক্ষিতভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভিতর গ্রথিত থাকে। সেইজন্য কঠোর দর্শনশাস্ত্রাপেক্ষা সরস কাব্য পড়িতে সকলে এত আগ্রহ প্রকাশ করে। আলোচ্য বিষয় হইতেছে মহাকবি গিরিশ-চন্দ্র তাঁহার নাটকে উক্ত ভাবসমূহ কতদূর পর্যন্ত দর্শাইতে পারিয়াছেন? গিরিশচন্দ্র সাধারণতঃ শিল্পের জন্যই শিল্প দর্শাইয়াছেন কিংবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা করিয়া সমাজ ও জাতির উন্নতিকল্পে নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তিনি সাধারণ যাত্রার পালা-বাঁধা কবিওয়ালা ছিলেন, কি একজন দার্শনিক, উপদেষ্টা ও গভীর চিন্তাশীল মহাকবি ছিলেন, ইহাই হইল আলোচ্য বিষয়। গিরিশচন্দ্রের রচনাসকল শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আর্যজাতির দর্শন-শাস্ত্রানুযায়ী গিরিশচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অর্থাৎ মহাকবির সম্মান পাইবার উপযুক্ত অধিকারী। একাধারে এরূপ উচ্চাঙ্গের নট ও নাট্যকার জগতে আজ পর্যন্ত অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সাহিত্যের মধ্যে নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উভয়ই অত্যন্ত দুরূহ বস্তু। সেইজন্য বঙ্গসাহিত্যে নাট্যশাস্ত্র-আলোচনা সবিস্তরভাবে স্বল্পই হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সাহিত্য পড়াইতে পারগ হইবেন কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাটক পড়াইতে অসমর্থ হইবেন; কারণ যাঁহার দর্শনশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, মানবচরিত্র, ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং অধিষ্ঠান (Poze) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকিবে তিনিই উচ্চাঙ্গের নাট্যশাস্ত্র অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত অধ্যাপক হইবেন। ইহার প্রত্যেকটিই নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। কোনটিই অবহেলার সামগ্রী নহে। সাধারণ নরনারীর নিকট নাট্য-সাহিত্য বা অভিনয় ক্ষণিক সুখদায়ক, আনন্দ উপভোগের বিষয়বস্তু কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটক-

অভিনয় বা নাট্যশাস্ত্র জাতির মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশ এবং মেরুদণ্ড, জাতির উন্নতির নব-নব পথপ্রদর্শক। উচ্চাঙ্গের নাটক বর্তমান যুগে জাতিকে নব বল প্রদান করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভ্রম বা ভ্রান্তি দর্শাইয়া দিতেছে। নাট্যকার আচার্য, নট-নটী-উপদেষ্টা এবং নাট্যালয় সর্বভাবের ঘনীভূত আনন্দময় মন্দির। ইহা বিলাসকক্ষ নহে, জাতির জয়-যাত্রার চৈতন্য-উৎপাদনের মন্দাকিনী। স্বয়ং মহেশ্বর ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং ধাতা।

যিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভক্তচূড়ামণি নাগ মহাশয়ের অলৌকিক পূত-জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের প্রত্যেক স্তরের নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এমনকি হাড়ি-মুচী মেথর-মুদ্দফরাশের হাবভাব চালচলন কথাবার্তা পর্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, যাঁহার একটি বিশেষ কথা ছিল, "জগতে বড়-ছোট বলে কিছু নাই, প্রত্যেক বস্তুই শিক্ষণীয়, প্রত্যেক বস্তুই মহান্, প্রত্যেক বস্তুই প্রণম্য" সেই বিরাট ধীশক্তিসম্পন্ন মহাকবির বিষয় সংক্ষেপে বলিতে যাওয়া আর 'ধনের খোলায় হিমালয় রক্ষা করা' এক বস্তু। "সহিত" শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দটা উৎপন্ন হইয়াছে। সহিত শব্দের অর্থ সঙ্গ। যাহা আমাদের সমাজ-জীবনের সহিত একান্তভাবে সদাসর্বদা জড়িত তাহাই আমাদের সাহিত্য। আমাদের জীবনের বা সমাজের হুবহু চিত্র দুই প্রকারে প্রকাশ করিতে পারি—যথা, ভাষাশিল্প ও চিত্রশিল্প। মনের নানা স্তর এবং অন্তরের ভাবরাশি চিত্রশিল্প হইতে ভাষাশিল্পে সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য ভাষাশিল্পের সর্বত্র এত প্রসার।

কবি দুই শ্রেণীর, যথা, চিত্র-কবি ও শব্দ-কবি। অর্থাৎ এক শ্রেণীর কাব্যে কেবলমাত্র ভাষার পারিপাট্য লক্ষিত হয় কিন্তু মনোমধ্যে কোন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। অন্য শ্রেণীর অর্থাৎ চিত্র-কবির বর্ণনায় ঘটনানিচয়ের স্পষ্ট চিত্র বা রূপ ফুটিয়া ওঠে। ইহারাই শ্রেষ্ঠ কবি-পদবাচ্য হন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন চিত্র-কবি। তাঁহার নাটকে বর্ণিত ঘটনা বা চিত্রসকল এত সুন্দর এবং স্পষ্ট যে চিত্রশিল্পী (Painter) অনায়াসেই সেই সকল তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারেন। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যেক চরিত্র ও চিত্র প্রত্যক্ষদর্শীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয় বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্থানে স্থানে স্বল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া চরিত্রানুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনাতে তাঁহার যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ছিল গভীর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান ছিল, তেমন উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তি বিপুলভাবে বিদ্যমান ছিল। ইহা ব্যতীত সুন্দর ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাও পরিপূর্ণ ছিল। নাটকের ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা। সর্বপ্রকার শক্তি ও গুণের অপূর্ব সমাবেশ হওয়ায় তাঁহার বর্ণিত চরিত্র ও চিত্রগুলি এমন মধুর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ভিত্তিহীন, কেবলমাত্র কাল্পনিক হইলে ইহা এত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হইত না। মহাকবি গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন যে, ভাবসকল প্রত্যক্ষ-ভাবে সম্মুখে না দাঁড়াইলে তিনি এরূপ স্পষ্টভাবে কোন বিষয় বর্ণনা করিতে পারিতেন না। যখন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন, যখন বাহ্যিক কোন জ্ঞান থাকিত না, সম্মুখে কোন বস্তুও দেখিতে পাইতেন না তখন সেই ভাবাবস্থায় যে সকল চিত্র দেখিতেন স্পষ্টাক্ষরে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেন কোন রকমে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র স্বয়ং লেখনী ধারণ করিতে পারিতেন না। সেই ভাবাবস্থায় চিন্তাস্রোত এত দ্রুতগতিতে ধাবমান হয় যে, কোন রকমে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় মাত্র। ইহা ব্যতীত সেই স্তরে অন্য কোন উপায় নাই। সেইজন্য মহাকবি গিরিশচন্দ্রের চরিত্রসৃজন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত ও মনোরম।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই শ্রোতাদিগকে প্রশান্ত-বদনে বলিতেন, "Visualising the ideas, visualising the ideas" অর্থাৎ ভাবকে প্রত্যক্ষ-রূপে দর্শন কর। "Bring down the ideas into your nerves" অর্থাৎ ভাবসকলকে স্নায়ুর মধ্যে প্রবাহিত কর। মন ও স্নায়ু এক বস্তু। মনকে উচ্চস্তরে তুলিয়া দিলে অর্থাৎ যাহাকে মনস্তত্বে "ভাবালোক" বলে সেই স্তরে চিৎশক্তি বা মনকে স্থিতি করিতে পারিলে ভাবসকল স্পষ্ট জীবন্তভাবে প্রতীয়মান হয়। ভাবসকল যেন কথা কয়। সত্যকারের জপ যেমন কথা কয় ভাবও সাধকের সহিত আকারে ইঙ্গিতে কথা কয়।

সেইজন্য গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে বলিতেন,—"ভাবসকলকে স্পষ্ট দেখা যায়।" ভাব হইল অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভাবালঙ্কারের জন্মদাতা। যোগি-গণ ধ্যান-ধারণা করিয়া যে অবস্থায় উপনীত হন, গিরিশচন্দ্র অজ্ঞাতসারে স্বভাবসিদ্ধ শক্তিবলে সেই অবস্থা পাইয়াছিলেন, অথচ তিনি তাঁহার কারণ জানিতেন না। দার্শনিক মতে গিরিশচন্দ্রের ভাব-সকল বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার মনটা অতি উচ্চস্তরে যাইতে পারিত।

গিরিশচন্দ্র যখন গঙ্গার ধারে বা অন্যত্র পথে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন একটা ফটোগ্রাফের ক্যামেরা তাঁহার বুক ও চোখের ভিতর রহিয়াছে। রাস্তার প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয়ের তিনি একটি হুবহু ফটো তুলিয়া লইতেছেন। এইজন্য তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি বহুপ্রকার; অসংখ্য রকমের ব্যক্তি ও ঘটনার সমাবেশ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা এত সুস্পষ্ট, সরস ও হৃদয়গ্রাহী, এত স্বাভাবিক ও জীবন্ত, মনে হয় যেন দুই চারি দিন পূর্বে ঠিক অমুক স্থানে এই ঘটনা দেখিয়াছি। ইহাই হইল তাঁহার রচনার প্রধান শিল্পত্ব। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রসকল প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও সহিত মিশিয়া যাইতেছে না। প্রত্যেক চরিত্র স্বতন্ত্র এবং তাহাদের মনের গতি কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও বিকশিত হইতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞান হিসাবে তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলি অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক। তাঁহার climate of mental psychosis এর তুলনা নাই। মহর্ষি বেদব্যাসের আদর্শে গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-অঙ্কন তুলনীয়। মহর্ষি ব্যাসদেব হইলেন প্রত্যক্ষদর্শী মহাকবি—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মহর্ষি ব্যাসের বর্ণনা অতুলনীয়। মহাভারতের প্রত্যেক চরিত্র পৃথক্ করিয়া তুলিয়া লওয়া যায়, অথচ পুঞ্জ চিত্র করিয়া নানাভাবে সকলকে সংশ্লিষ্ট করিতেছে। যে নিয়ম-পদ্ধতিতে মহর্ষি বেদব্যাস নানান্ তেজস্বী প্রাণবন্ত চরিত্র চিত্রণ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন ঠিক সেই অনুপম পদ্ধতিতে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বর্ণিত চরিত্রসকল সৃষ্ট হইয়াছে; এমনকি স্থানে স্থানে গিরিশচন্দ্র উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছেন। ইহা অনুকরণ নহে, অনুকরণে প্রাণশক্তির স্ফুরণ হয় না, সজীব চিত্র মৃতপ্রায় দর্শিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ তেজস্বী নরনারী কখনও অনুকরণ করে না। অনুকরণে জীব, সমাজ ও জাতি শক্তিশালী হয় না। ইহা দুর্বল, নিজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন জাতির স্বর্ণ শৃঙ্খলমাত্র। মহা-তেজস্বী স্বাধীনচেতা গিরিশচন্দ্র অনুকরণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি কখনও কাহারও অনুকরণ-প্রয়াসী হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই ভক্তদের বলিতেন, "গ্যাখ্, আমাকে আর G.C.কে কেহ কখন অনুকরণ করিস্ নি।" স্বামীজী ও গিরিশচন্দ্র সত্যসত্যই অনুকরণের বহির্ভূত মহাপুরুষ ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীর্যসম্পন্ন-জাতি গঠন করিবার তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টা ছিল। জাতির ভিতর কিরূপভাবে শক্তি আনিতে হয়, জাতিকে কিরূপে

জাগ্রত করিতে হয়, জাতির ভিতর কিরূপে তেজঃপূর্ণ ভাব দিতে হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সাহিত্যের ভিতরও সেই ভাবটি পরিপূর্ণভাবে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র যখন যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তখন সেই চরিত্রের ভিতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী, নির্ভীক ও একাগ্র ভাব বিকাশ করিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার জীবন-কাহিনী, ইহাই হইল তাঁহার মেরুদণ্ড। নিজের প্রকৃত যে মনোভাব এবং মনোমধ্যে যে সময়ে যেরূপ ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলি সেই মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রকৃতি। তিনি কঠোর অবোধ্য ভাষা বা শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সরল সহজবোধ্য গ্রাম্য বা প্রচলিত শব্দ দ্বারা চরিত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দর্শাইয়াছেন। গ্রাম্য ভাষা ও স্ত্রীলোকদিগের ভাষা যে কত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী তাহা গিরিশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" কাগজে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ পাইয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের ভাষা অমূল্য সম্পদ্। মনের ভাব-প্রকাশের বাহন হইল ভাষা। যে ভাষার দ্বারা সহজে শ্রোতার মন পাওয়া যায় সেই ভাষাই জীবন্ত ভাষা। আটপৌরে ভাষার মধ্যে জাতির প্রাণশক্তি নিহিত আছে।

গিরিশচন্দ্রের একাগ্রতা অতি অদ্ভুত ছিল। বোধ হয় এই একাগ্রতা থাকার জন্যই তিনি এত উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন যে চরিত্র তিনি অঙ্কন করিতেছেন, বর্ণনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ একাগ্রভাব দিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিতেছেন। সেখানে উচ্চ বা নীচ বলিয়া কোন বিষয় নাই। যদি কোন উচ্চ বিষয় বস্তুতে একাগ্রতা না থাকে তাহা হইলে সেই বিরাট বিষয়টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু যদি অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে, অতি তুচ্ছ বিষয়ে, অতি নগণ্য বিষয়ে একাগ্রভাব থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয়বস্তু অতি মহান্ রূপে ফুটিয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্র স্বভাব-নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার সহিত কেহই তর্কযুক্তিতে পারিত না। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ মহাতার্কিক ছিলেন সেইরূপ গিরিশচন্দ্রও তর্কে পরাস্ত হইতে জানিতেন না। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রসকল যখন যেভাবে কথাবার্তা কহিতেছে—তাহাতে তর্কযুক্তির কোন ভুল বা ভ্রান্তি হয় নাই। গিরিশচন্দ্র স্বভাব-নৈয়ায়িক হইয়াও অতি উচ্চস্তরের কল্পনা ধারণ করিতে পারিতেন। তাঁহার গ্রন্থে যথেষ্ট ইহার প্রমাণ আছে। গিরিশচন্দ্রের ভিতর দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি উভয়বিধ বিরুদ্ধভাব একসঙ্গে অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন। তাঁহার বর্ণিত চরিত্রে যেমন নৈয়ায়িকের তর্কযুক্তির সুন্দর অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, কল্পনাশক্তির বিকাশও সেইরূপ পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের এক বিশেষ অঙ্গ।

রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা এবং অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বাড়ীর গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি অতিশয় সরল, নম্র ও মোলায়েম প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত অকপট ব্যক্তি ছিলেন। যেমন তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি অসাধারণ ছিল তেমনি তিনি গৃহে অত্যন্ত মজলিসী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার নিকট বহু প্রকৃতির লোক সমাগম হইত। কেন তাঁহার সহিত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আলাপ-আলোচনা করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত তাহার একমাত্র কারণ এই যে, একই দেহের ভিতর দশ বারটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাস করিতেন এবং প্রত্যেক গিরিশচন্দ্রই স্বতন্ত্র-প্রকৃতির ; একের অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ বা সৌসাদৃশ্য ছিল না, প্রত্যেকেই স্বাধীনপ্রকৃতির। একটি বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, অদ্ভুত

প্রতিভাবান্, জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ তাহাও গিরিশচন্দ্র এবং অতি নিম্নস্তরের লোক তাহাও গিরিশচন্দ্র। সেইজন্য তিনি অনেক সময় সুনাম ও দুর্নাম, যশ এবং অপযশের ভাগী হইয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে গিরিশচন্দ্রের কাব্যের সার্থকতা কোথায়? কেনই বা তাঁহার গ্রন্থসকল এত হৃদয়গ্রাহী হইল? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে একটি কথা বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যে অধিষ্ঠান বা pose অতীব সুন্দর এবং এক আশ্চর্য বস্তু। অলঙ্কার-শাস্ত্র দিয়া বিচার করিতে হইলে এই অধিষ্ঠান বা দাঁড়া বা pose নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ। মানবের মনে যেমন যেমন ভাবের উদয় হয় তাহার ভাষা, গাত্রের বর্ণ, আচার-ব্যবহার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা বা দাঁড়ান সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নরনারী ভাবানুযায়ী প্রতিক্ষণে চালিত হইতেছে। দ্বিতীয় হইল সামঞ্জস্য-ভাব। এই সামঞ্জস্য-ভাব বা cadence গিরিশচন্দ্রের নাট্যকলার অতুলনীয় সম্পদ্। স্বতন্ত্রভাবে কি করিয়া পরিমিত শব্দের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা গিরিশ-চন্দ্র পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট কোন চরিত্রই অসমঞ্জস ও অপরিমিত ভাষা ব্যবহার করে নাই। প্রত্যেক চরিত্রই অপরাপর চরিত্রের মর্যাদা ও পরিমাণ বা প্রাপ্য বিষয় রক্ষা করিয়া বাক্যালাপ করিতেছে। ইহাকে সামঞ্জস্য-ভাব বা cadence বলিয়া থাকে। In cadence all the component parts must chime in unison to lead on to symphony. গিরিশচন্দ্রের নাটকে ইহা সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কাব্য ও নাটক পাঠকালে অধিষ্ঠান ও সামঞ্জস্য-ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। তৃতীয় হইল বিবর্তন বা transition। ইহা গিরিশ-চন্দ্রের কাব্যে এক নূতনত্ব। এই বিবর্তন হইল তাঁহার রচনার এক প্রধান গুণ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গিরিশচন্দ্রের পূর্বকালীন কবিরা দৈহিক বিবর্তন দেখাইতে পটু ছিলেন। গিরিশচন্দ্র পূর্বকালীন কবিদিগের প্রথা বা রীতি ত্যাগ করিয়া মনোবিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিলেন। মনের কিরূপ পরিবর্তন হয় এবং ধীরে ধীরে তাহা কিরূপ অন্যপথে চালিত হয় তাহাই তিনি কাব্যে সুচারুরূপে দর্শাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে কবি, দার্শনিক, বাঙলা ভাষার জীবন্ত অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নূতন প্রবর্তক, মহাভক্তিমান্ নরসিংহ। ভাস্করসম তেজ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাতির ভিতর ভাস্করসম তেজ তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নূতন জাতি, নূতন ভাব, নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ, নূতন প্রচেষ্টা, নূতন ভাষা, নূতন শব্দ, নূতন ছন্দ, নূতন অলঙ্কার—ইহাই হইল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা। জাতি যত স্বাবলম্বী হইবে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার সৌন্দর্য তত উপভোগ্য হইবে। তুচ্ছ বস্তু বা কার্যের ভিতর যিনি মহান্‌কে দেখিতে পান তিনিই হইলেন মহৎ লোক। গিরিশচন্দ্রের জীবন ও রচনা-প্রণালীতে এই ভাবটি অতি স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে বিকশিত হয়েছে। তাঁহার তুলনা তিনি স্বয়ং। নাম-যশের তিনি কাঙাল ছিলেন না; তাঁহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা তিনি নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন:—

ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে যায়।
মৃত্যুভয়
আছে কি কুসুমে?

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়ীতে থাকিতাম তখন প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত দেখি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনি। দুপুরে প্রায়ই খাওয়া-দাওয়ার পর দিদিমা ও পাড়ার বৃদ্ধারা এক জায়গায় বসিয়া কথামৃত-পাঠ শুনিতেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সরল উপমাবহুল কথা-গুলি শুনিতে ভালবাসিতাম। তাহার পর যখন নিজের বাড়ীতে আসিয়া হাই স্কুলে ভরতি হইলাম তখন স্বদেশী যুগ চলিতেছে, সবার মুখে স্বামী বিবেকানন্দের নাম ও বাণী শুনিতে পাই। প্রবল আগ্রহ লইয়া স্বামীজীর জীবনী ও বাণী স্কুল লাইব্রেরী হইতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু তখন বেলুড় মঠ বা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না। স্বামীজীর বই পড়িয়া গ্রামে আমাদের একটি ছোট দলের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সাধ্যমত আমরা গরীব-দুঃখীর কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিতাম, কখন কখন রোগীর সেবাও করিতাম।

গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম এবং ১৯১৭ সালে একজন পরিচিত লোকের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হইল। তখন অবশ্য তিনি বেলুড় মঠে যোগ দেন নাই, সাধু হইবার জন্য নিজে তৈরী হইতেছেন ও অপর কয়েকটি যুবককেও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

ইঁহার সঙ্গে আমি প্রথম বেলুড় মঠে যাই এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন সন্তানের, বিশেষ করিয়া মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পরিচিত হই। তিনি যখন বাগবাজার বলরাম মন্দিরে থাকিতেন তাঁহার কাছে খুব যাইতাম। তাঁহার সঙ্গ এত ভাল লাগিত যে, কয়েক দিনের অদর্শনেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতাম। আমাদের সহিত কথা তিনি খুব কমই বলিতেন, বয়স্কদের সঙ্গেই নানাপ্রসঙ্গ চলিত, তবুও যতক্ষণ মহারাজের সামনে বসিয়া থাকিতাম কি আনন্দেই যে মন ভরিয়া থাকিত তাহা প্রকাশ করিবার নহে। মনে হইত যেন মহারাজের চারিধারে আনন্দ জমাট বাঁধিয়া আছে। যখন সেখান হইতে চলিয়া আসিতাম তখন মহারাজের চিন্তায় মন ভরিয়া থাকিত এবং আবার কবে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইব সেই ভাবনায় অস্থির হইতাম।

মনে আছে—একদিন সকালে বলরাম মন্দিরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যে ডান পাশের ছোট ঘরটি পাওয়া যায় সেখানে শ্রীশ্রীমহারাজ খাটে বসিয়া আছেন এবং আমরা একদল ছেলে তাঁহার সামনে মেজেতে বসিয়া রহিয়াছি। কেহ কেহ তখন ধ্যান জপ করিতেছিলেন। এমন সময় খবর আসিল যে পূজনীয় রামলাল দাদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়) মহারাজজীকে দেখিতে আসিতেছেন। মহারাজ আমাদিগকে বলিলেন যে, রামলাল দাদা ঘরে ঢুকিলেই যেন আমরা 'রামলাল দাদাকী জয়' বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি। রামলাল দাদা ঘরে ঢুকিবামাত্র আমরা সকলে ঐরূপ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলাম। তিনি যেন থতমত খাইয়া গেলেন এবং হাতজোড় করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ বেশ আমোদ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আছি আর কেমন? যেন বালকবৎ—রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে। এই হয়তো ভাল আছি আবার হয়তো পরক্ষণেই কেমন হ'য়ে গেলাম।" রামলাল দাদার

সঙ্গে কত রকম হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল। আমরা মহারাজের বালকভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের ভালবাসার কি কোন তুলনা ছিল? কত দিন মনে হইয়াছে—লোকে বলে মা-বাপের ভালবাসার তুলনা নাই কিন্তু মা-বাপের ভালবাসা যে মহারাজের ভালবাসার কাছে অতি তুচ্ছ! সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। আমরা ছেলেরা একটি দল বাঁধিয়া কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে উৎসব দেখিতে গিয়াছি। খুব ভক্ত-সমাগম হইয়াছে। কিছুক্ষণ আনন্দে কাটিবার পর যোগোদ্যানের একজন সাধু আমাদিগকে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীমহারাজকে একটু প্রসাদ পাঠাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত এবং আমাদের মধ্যে কেহ যদি এ কাজটি করিত তবে সুখী হইতেন। আমি তখনই রাজী হইয়া গেলাম। মহারাজকে এই সুযোগে একবার দেখিতে পাইব ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম। পায়ের ভিজা জুতা বন্ধুর কাছে রাখিয়া খালি পায়ে একটি টিফিন ক্যারিয়ারে প্রসাদ লইয়া বাগবাজারে বলরাম মন্দিরের দিকে রওনা হইলাম। বৃষ্টি যাহাতে টিফিন ক্যারিয়ারের ভিতর না যায় সেজন্য টিফিন ক্যারিয়ারটি মাথার কাছে ছাতির নীচে ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিতে লাগিলাম; মনে ভয় ছিল দেরি হইলে শ্রীশ্রীমহারাজের খাওয়া হইয়া যাইবে। যাহা হউক, আমি যাইয়া দেখি মহারাজ তখনও স্নান করেন নাই। মহারাজ প্রথমে বেশ আনন্দিত হইয়াছেন মনে হইল এবং উৎসবের বিষয় সব জানিয়া লইলেন। কোন্ সাধু ঠাকুরের প্রসাদ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখিলেন যে আমি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছি অমনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে শীঘ্রই বাড়ীতে ফিরিয়া কাপড় বদলাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথায় মনে হইল ভিজিয়া অসুখ করিলে আমার চেয়ে তিনিই বেশী কষ্ট পাইবেন!

একদিন আমরা ছেলের দল শ্রীশ্রীমহারাজের সামনে মাটিতে বসিয়া আছি এমন সময় কয়েকজন ভক্ত ভদ্রলোক মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহারা বজবজে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব-উপলক্ষ্যে মহারাজকে বজবজে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ কিন্তু যাইতে রাজী হইলেন না। শরীরটা তেমন ভাল নাই, বলিলেন। ভক্তগণ নানাভাবে তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকায় মহারাজ আমাদিগকে দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যদি এই ছেলেদের লইয়া মহারাজের মত তাহাদিগকে আদরযত্ন করেন তবে মহারাজেরই সেবা করা হইবে। ভক্তগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া নির্দিষ্ট দিনে আমাদিগকে বজবজে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে আছে, আমরা মঠের কয়েকজন সাধুর সহিত সকালে বজবজে যাইয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলাম এবং শ্রীশ্রীমহারাজের প্রাপ্য আদরযত্ন পাইয়া বিব্রত বোধ করিয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ একবার দক্ষিণভারত-ভ্রমণে চলিয়া যান। আমরা প্রায় প্রতিরবিবার তখন মঠে যাইতাম। রাত্রি থাকিতে আমরা সকলে কোন জায়গায় একত্র হইতাম এবং বড় বাজারের ঘাট হইতে এক পয়সা দিয়া ষ্টীমারে হাওড়ার পারে যাইয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া হাঁটিয়া মঠে যাইতাম। মঠে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) এবং অন্যান্য মহারাজ আমাদের দলের ছেলেদের নানাভাবে ভবিষ্যৎ জীবন-গঠন সম্বন্ধে সাহায্য করিতেন। এ জীবন ভোগের জন্য নয় এবং লেখা-পড়া শেষ করিয়া কিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে জীবন উৎসর্গ করা যায় তাহা বলিয়া উৎসাহ দিতেন। আমাদের দলের অনেকে বেলুড় মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া এখন নানাস্থানে দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য যোগ্যতার সহিত চালাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি মাস কাটিয়া

গেল। একদিন শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ দক্ষিণ ভারত হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছেন। নির্ধারিত দিনে ষ্টেশনে গিয়া দেখি প্লাট্‌ফরমে দাঁড়াইবার জায়গা নাই। ষ্টেশনে কর্মচারীরা বলিতে লাগিলেন, 'কই, তাঁহারা ত জানেন না যে ঐ গাড়ীতে কোন নামকরা লোক আসিতেছেন, তবে এত ভিড় কেন?' ট্রেন সময়মত আসিয়া দাঁড়াইতেই বয়স্ক কয়েকজন ট্রেনের কামরায় ঢুকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে মাল্যভূষিত করিলেন। মহারাজ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিরে সবার দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হাস্যরঞ্জিত মুখশ্রী আমাদের হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করিল। আবার তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া যেন আত্মহারা হইলাম।

১৯১৯ সালে ৺কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা হইবে ঠিক হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ ঐ পূজা-উপলক্ষ্যে কাশী যাইবেন শুনিয়া জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাদের সহিত আমাকেও পূজার ছুটিতে কাশীতে যাইতে বলিলেন। আমি সানন্দে রাজী হইলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত একই আশ্রমে দিনের পর দিন থাকিবার সৌভাগ্য হইবে জানিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। যাইবার জন্য দিন গণিতে লাগিলাম। কিন্তু হঠাৎ শুনিলাম যে শ্রীশ্রীমহারাজ দুর্গাপূজায় কাশীতে যাইতে পারিবেন না। এ সংবাদে মন বিষাদে ভরিয়া গেল। শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তিনি যাহাতে ৺পূজায় কাশীতে যান ছোট ছেলের মত আবদার করিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ দুঃখের সহিত জানাইলেন যে তাঁহার যাওয়া হইবে না বটে কিন্তু আমরা কাশীতে যাইয়া খুবই আনন্দ পাইব এবং আমাদিগকে কাশী যাইতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার সেই স্নেহমাখা অনুমতি আমরা শিরোধার্য করিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ ৺কাশীধামের মাহাত্ম্য ও ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণাদেবীর কতই না গুণগান করিলেন। আমাদের বলিলেন, আমরা যেন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, স্বয়ং বিশ্বনাথ কাশীতে সত্য-সত্যই বিরাজ করিতেছেন এবং ৺কাশীর পথের প্রতি ধূলিকণাটিও পবিত্র! কত সাধু-সন্ত কত কত যুগ কাশীতে তপস্যা করিয়া ওখানকার বায়ুও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। কাশীর কি কোন তুলনা আছে ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমহারাজের কথায় আমাদের মনের

(শেষাংশ ৩২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আকাশের গান

অনিরুদ্ধ

দূর আকাশের অসীম নীলিমা 'পর
বহুল আশায় বেঁধেছিনু আমি ঘর।
সে মহা-উর্ধ্বে নাহি কোন বাধা ভয়
মোহ সংশয় সেথায় কিছুই নয়।

চঞ্চল কিছু করে না কখনো ভিড়
সুখ লাগি কেহ বাঁধে না তথায় নীড়।
মুক্তি—মুক্তি—মুক্তিই শুধু চাওয়া
তন্দ্রাবিহীন কেন্দ্রমুখীন ধাওয়া।

মাটিরে দলিয়া গগনে রাখিনু জয়
সে-ই তো চরম কীর্তির পরিচয়।
হেথাকার গৃহ! কতই দীনতা-মাখা
নিয়ত ঘুরিছে তীব্র-যাতনা-চাকা।

একদা আকাশ ক'হল হাসিয়া ডাকি—
"ভেবো না বন্ধু আমি উর্ধ্বেই থাকি।
যাহা ছেড়ে এলে আমাতেই তাহা বাঁধা
ছাড়িলে পূর্ণসত্য হবে না সাধা।"

আকাশ-নিলয় ভাঙ্গিয়া নামিনু নীচে
দেখিনু সত্য বলিতাম যাহা মিছে।
মুক্তি রহিল প্রতি অনুভবে মিশি
ক্ষণিকে গ্রথিত নিত্যই দিবানিশি।

গগনের জয় পৃথিবীতে নিল বাসা
সকল মর্ত্যে ছায় অমর্ত্য আশা।
হেথায় হোথায় দ্বন্দ্বের নাই স্থান
জীবন-সত্যে বাজে আকাশের গান।

জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

জাতীয় ভাষা জাতির ধমনীতে রক্ত-ধারার মতো। জৈবিক প্রেরণায় দেহে যখন সাড়া জাগে তখন তাহার রক্তপ্রবাহ সৃষ্টিধর্মী হইয়া উঠে। কেবল ব্যষ্টিজীবনেই নয়, সমষ্টি-জীবনেও এই সত্য পরিস্ফুট। বাঙ্গালীর জাতি-দেহে বাহিরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যখনই কোন চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে তখনই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাহার মূককণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে ভাষা-গুঞ্জন, এবং সেই গুঞ্জনধ্বনি সুস্পষ্ট হইয়া সৃজনীশক্তি লাভ করিলে তাহারই মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে জাতির ভাব-বিগ্রহ। ব্যক্তি-জীবনে যাহা চাঞ্চল্য, জাতি-জীবনে তাহাই আন্দোলন। এই আন্দোলনে ভাষার দান যেমন অসামান্য, ঐ ভাষার মূলে আন্দোলনের দানও তেমন কিছু কম নয়। তাই বাঙ্গালীর ইতিহাসে বাহিরের আঘাতে যে প্রধান তিনটি আন্দোলনের সন্ধান মিলে তাহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই বাংলা ভাষা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাংলা ভাষার সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং চরম পরিণতির মূলে রহিয়াছে যথাক্রমে বৌদ্ধ, মুসলিম এবং ইংরেজ বিপ্লব। ঐ শেষোক্তটিই বর্তমান প্রবন্ধের নিয়ামক।

ভারতীয় গণ-মন স্বভাবতঃই রাষ্ট্র-সচেতন নয়, সমাজ-সচেতন। রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ বাহিরের আমদানি। স্বতঃস্ফূর্ত নয় বলিয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় ভারতীয় ভাবধারায় ইহা অনেক কৃত্রিম। ভারতীয় সভ্যতার সাধনা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখে ভিন্নখাতে চিরকাল অগ্রসর; তাই ঐ সংকীর্ণ এবং স্থলবিশেষে মারাত্মক 'নেশন' দেবতার পরিবর্তে ভারত চিরদিন 'ভূমা'র উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। তথাপি মুসলমান যুগ পর্যন্ত এই জাতীয়-চেতনার অল্প-বিস্তর যাহাকিছু প্রকাশ তাহাও ঐ যুগের কয়েকজন বড় জমিদার বা সামন্ত রাজাদের গণ্ডীর বাহিরে সর্বসাধারণকে বড় একটা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। শুনা যায়, যে পলাশীর মাঠে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইতেছিল তাহারই অনতিদূরে গ্রামবাসীরা সেইদিন সন্ধ্যাকালে কীর্তনানন্দে মত্ত ছিল।

কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শে আসার ফলে এই অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল; দেখা দিল জাতীয়তাবোধের পরিপূর্ণ উন্মেষ। বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষা শিখিয়া, ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসিয়া ইয়োরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individualism) পরিচয় পাইল সকলের আগে এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সদ্যঘটিত ফরাসী-বিপ্লবের ভাব-বন্যা তাহার Liberty, Fraternity আর Equality (স্বাধীনতা, সৌভ্রাত্র ও সাম্য) এই তিন মহামন্ত্র লইয়া বাংলার দুয়ারে প্রবল ধাক্কা দিল। ইন্দো-ইয়োরোপীয় 'পুনরভ্যুদয়ে'র (Renaissance) জন্মভূমি এই বাংলা দেশ। এই যুগের উদ্গাতা রাজা রামমোহন রায়।

বৌদ্ধ ও ঐস্লামিক বিপ্লবধারা পশ্চিম হইতে পূর্বে অর্থাৎ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু এইবারে এই পাশ্চাত্যবিপ্লব-প্রবাহ বাংলা হইতে সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাংলার এই নব জাগরণ বা উত্থানের (যাহা ক্রমে সমগ্র ভারতকে পথ দেখাইয়াছে) অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতির ফলেই যে বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন মূর্ত হইয়া উঠিল এবং বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সমাজে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব বিরাট সৃষ্টি-সূচনা তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

ভারতীয় কংগেসের প্রতিষ্ঠাতা যেমন একজন ইংরেজ (হিউম্), এদেশে স্বদেশ-প্রেমের প্রথম কবিতা রচয়িতা তেমন একজন ফিরিঙ্গি। ইনি

হিন্দুকলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ডিরোজিও সাহেব। তিনি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে ইংরেজী ভাষায় সেই কবিতাটি 'ফকির অফ্ জাঙ্গিরা' নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে বাংলা ভাষায় তাহার অনুবাদ করেন।[১]

রামমোহন রায় মূর্তি-পূজা-বিরোধী পুস্তক এবং বেদান্ত ও উপনিষদের বাণী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। হিন্দুসমাজের গ্লানি দূর করিতে গিয়া নানা বাধা-বিপত্তি, প্রতিপক্ষের সহিত বিচার ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়া কয়েকখানা বাংলা পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তিকাদি সংস্কারপন্থীদের পক্ষ হইতে প্রচারিত হইতে থাকে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'সংবাদকৌমুদী' পত্রে (২৪শে মার্চ, ১৮৩৮) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভার খবর আমরা পাইতেছি—যে সভায় সভাপতির বক্তৃতায় ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং সর্বসাধারণের ঐক্যের কথা আছে।[২]

'ধর্মের সার্বজনীন ভিত্তিতে মিলিত হইলে ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব' মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে (পৃঃ ১০৭) এই চিন্তা গ্রথিত আছে। ইহা ইং ১৮৪৫—'৪৬ সালের চিন্তা। বোধহয় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভের এই আশা ঐ যুগে এই প্রথম। ইহার পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা' নামক কবিতার উল্লেখ করিতে হয়। ইহাই স্বদেশ-প্রেম-সূচক প্রথম বাংলা কবিতা। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বেই ঐ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার পরেই নবযুগের প্রথম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আসে। মাইকেল মধুসূদনের সমসাময়িক হইলেও রঙ্গলালের বিখ্যাত স্বদেশভাবাত্মক কাব্য 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' 'মেঘনাদবধ কাব্য'-প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বেই প্রকাশিত হয়। "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?"—ইত্যাদি অতি প্রসিদ্ধ কবিতাটি 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র অন্তর্গত। তাঁহার রচিত 'কর্মদেবী'র (১৮৬২) রাজস্থানী সতীবিশেষের চরিত্র এবং 'শূরসুন্দরী'র (১৮৬৮) রাজস্থানী বীররমণীর দৃষ্টান্ত স্বদেশী যুগে বাংলা ভাষার দান হিসাবে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ নাটক' রচিত হইয়া (১৮৬০) বাংলার বুকে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ইংরেজ সরকার প্রত্যক্ষভাবে এই পুস্তকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত কোন পুস্তক অবলম্বনে জাতীয় চাঞ্চল্যের সূচনা এই প্রথম বলিতে হইবে। "নীলবানরে সোনার বাংলা" এবং "হে নিরদয় নীলকর" নীলদর্পণের এই গান দুইটি যথেষ্ট উত্তেজনা সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদনের রচনায় প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ বা স্বদেশের স্বাধীনতা-বিষয়ক কোন লেখা মুখ্য হইয়া দেখা না দিলেও জাতীয় আন্দোলনের অনুপ্রেরকরূপে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটা প্রবল বিদ্রোহের সুর, কাঠামোতে একটা বিরাট ও সুদূর-প্রসারী 'ওলট-পালট' তিনিই সর্বাগ্রে আনিলেন। নির্জীব পয়ারের চিরাচরিত আধিপত্য চূর্ণ করিয়া ওজস্বিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দোধারার প্রচলন কেবল

১ "স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী-
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; ...." ইত্যাদি

২ "......এই মত উক্ত আছে যে, এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তী বন্ধন করিতে পারা যায় অতএব প্রজালোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত......"

—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২০

সাহিত্যেই নয় বাঙ্গালীর নির্জীব দেহকাণ্ডেও একটা অসাধারণ শক্তি-সঞ্চারের কারণ হইল। যে সাহিত্য নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া পরোক্ষে কার্য সাধন করে, ইঙ্গিতে জাতিকে পরিচালিত করে, বিচারের সর্বোচ্চ তুলাদণ্ডে তাহাই তো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। মধুসূদনের সাহিত্য তাহাই করিয়াছিল। যে পুরুষার্থপ্রবণ পৌরাণিক জাতীয় চরিত্রগুলি অসহায় অদৃষ্টবাদ ও নির্বীর্য ভক্তির আত্ম-নিবেদনের প্রাবল্যে ক্রমেই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, মধুসূদন সেইগুলিকে রণসাজে সাজাইয়া নূতন করিয়া আলোকে লইয়া আসিলেন। তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' এবং 'মঘনাদবধকাব্য' তো তাহাই। মেঘনাদে পাশ্চাত্ত্য Individualism পূর্ণ বিকশিত। জাতির জড়ত্ব ভাঙ্গিবার জন্যই যেন কবি সমুদ্রের উদ্দেশে রাবণের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

"উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবাও অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো নাগো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা ;"

এই বজ্রনিনাদে জরাগ্রস্ত তো দূরের কথা, মৃতও যেন কাঁপিয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের উক্তি—

"দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে .... "

নিম্নের তিনটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন—

"............শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয় ; পর পর সদা।"

(—মৃত্যুর পূর্বে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের উক্তি)

"আজ মধুসূদনের স্মরণে বাঙ্গালার গগনে পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা' ছড়াইয়া দাও! প্রত্যেক বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর—হৃদয়ে এই কয়টি কথা যেন গাঁথা থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এদেশে মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিষ্ফল।"

—'সাহিত্য', ১৩২৩

মধুসূদন তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' সুন্দ ও উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিণাম দেখাইয়া ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষময় ফল নির্ধারণ করিলেন—

"ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জয়"

কবির চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে দেশাত্মবোধক রচনার প্রচুর নিদর্শন বর্তমান। ইহা ছাড়া তাঁহার 'পদ্মাবতী', 'শর্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতি নাটকগুলিতেও স্থানে স্থানে এবং কোনটাতে আগাগোড়াই এই স্বদেশপ্রেম, পরানুকরণ-নিন্দা, সমাজের পুঞ্জীভূত অনাচারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

আজন্ম বিদেশী ভাব-চিন্তায় অনুপ্রাণিত এবং বিজাতীয় ধর্মে দীক্ষিত মধুসূদনের স্বদেশী ভাব ও ভাষায় ফিরিয়া আসা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য এই মমত্ববোধ বাংলা ভাষার তথা জাতীয় আন্দোলনের দিক্ দিয়া যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। পরবর্তী হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দদাস, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির লেখায় এই স্বাদেশিকতাই অধিকতর নগ্ন ও মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের চৈত্রসংক্রান্তিতে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে 'হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৎসরে একটি করিয়া মোট ১৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। জাতীয়ভাবপ্রচারক এত বড় প্রচেষ্টা ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। এই উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় বহু জাতীয় সংগীত রচিত

হয়। ইহাদের অধিকাংশই ঐ মেলায় গাওয়া হইত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "মিলে সবে ভারত সন্তান", দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "এ দেশের দুঃখে কার না আসে চোখের জল" এবং "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি", গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কিরে" এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "আসি ভারত ভূমে একবার" ও "কবে উদিবে সৌভাগ্যভানু ভারতবরষে" গান কয়টি উল্লেখযোগ্য। এই মেলার যাবতীয় অনুষ্ঠান বাংলা ভাষাতেই হইত। গান ব্যতীত বাংলা ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতাবলীও প্রদত্ত হইত। স্বদেশী ভাষায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যাপক সূচনা এই হিন্দুমেলাতেই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুমেলায় ১১শ অধিবেশনে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "দিল্লীর দরবার" নামক কবিতা পাঠ করেন। পরে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (১৮৮২) অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতীয় মেলার আদর্শে বিভিন্নস্থানে আরও কয়েকটি মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই সময়ে কয়েকখানা দেশাত্ম-বোধক নাটকও রচিত হইয়া এই সব মেলায় অভিনীত হইতে থাকে। তন্মধ্যে মনোমোহন বসু রচিত 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর রচিত পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪) এবং 'সরোজিনী নাটক' (১৮৭৫) উল্লেখযোগ্য। 'সরোজিনী'র প্রথম অভিনয় হয় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। এই সময়ে (একটু আগে বা পরে) বাংলার তাৎকালিক প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকই স্বদেশী গান রচনায় ব্যাপৃত হন। ইঁহাদের মধ্যে ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত "কত আর ঘুমে রবে," আনন্দচন্দ্র মিত্রের "উঠ উঠ সবে ভারত সন্তান" এবং "অবজ্ঞেয় বঙ্গবাসী অবনীতে এবে," রাধানাথ মিত্রের "ভারত-ভূমি সমান আছে ভবে কোন্ স্থান," দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর "হবে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন," "দ্বিজ হও ক্ষত্র হও বৈশ্য শূদ্র আর" এবং "ভারত শ্মশান হোক্……" রাজকৃষ্ণ রায়ের "কোথা সে বীরত্বলীলা," "শক্র দেয় গালি লয় কর পাতি" এবং "ক্ষিপ্ত বঙ্গবাসী প্রশমিত হও," রাজকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায় রচিত "ম্লানমুখচন্দ্র ভারতি তোমারি", মনোমোহন বসুর "নদী সিন্ধুনীরে, পোত থরে থরে" স্বর্ণকুমারী দেবীর "আধ-অবনতিকথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা" মীর মুশার রফ্ হোসেন রচিত "ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল," অশ্বিনীকুমার দত্তের "আয়রে আয়রে ভারতবাসী" এবং "আয় আয় সবে ভাই দ্বারে দ্বারে," মনোমোহন চক্রবর্তীর "ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী, বঙ্গনারী" এবং ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের "স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়" প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ-বিষয়ক একশত গানের সমষ্টি 'ভারত গান' প্রকাশিত করেন এবং অশ্বিনী-কুমার দত্ত ও মনোমোহন চক্রবর্তীর রচনা সম্ভবতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের পুরুষকারকে মুখ্যতঃ দেশহিতৈষণায় পরিবর্তিত করিয়া বিদেশী Patriotismকে বাংলা ভাষায় ফুটাইয়া তোলেন। তাঁহার 'কবিতাবলী', 'বীরবাহুকাব্য', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতিতে ইহার প্রমাণ মিলিবে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি "ভারত সংগীত" নামে যে বিখ্যাত কবিতা প্রকাশ করেন, ইহার মত চমৎকার দেশাত্মবোধক কবিতা পূর্বে আর বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। 'কবিতাবলী'র অন্তর্গত 'ভারতে কালের ভেরী' 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারত বিলাপ', 'ভারত কামিনী', 'ইউরোপ ও আসিয়া' 'মন্ত্রসাধন' 'কালচক্র', 'রিপন-উৎসবে ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ভাবই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। শেষোক্ত কবিতাটিতে কবি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতের

জাতীয় চিত্র আঁকিতে গিয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে ভারত-মাতার পতাকা-তলে ঐক্যবদ্ধ কল্পনা করিয়াছেন। সারাদেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় চেতনার পূর্বাভাস এই কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।[৩]

কবি নবীনচন্দ্র সেন মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের ভাবের অনুকরণে তাঁহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করেন। হেমচন্দ্রের তুলনায় তাঁহার Patriotism বেশী মধুর করিয়া আঁকা। এই সময়ে ভারতে কোঁতের (Augusti Comte) 'Humanitarianism'এর আমদানি হয়, যাহার ফলে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয় সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে। "নবীনচন্দ্র এই Humanitarianismকে মহাভারতের গল্পের ছাঁচে ফেলিয়া নূতন Nationalismএর সৃষ্টি-পুষ্টি করিয়া 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থে বিংশশতাব্দীর অভিনব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।"[৪]

এই যুগে ঢাকার কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের স্বদেশী কবিতা বাংলা দেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার রচিত 'ভারত বিলাপ,' 'যমুনালহরী', 'দিন কি এমন হবে,' 'নে রে বিদায় আজি ভারতে হোরি,' 'উঠরে বাছাসকল ডাকেন মা দুঃখিনী,' 'দুঃখের সময় চিরতো রয় না' প্রভৃতি গান ও কবিতা উল্লেখযোগ্য। 'ভারত-বিলাপ' কবিতাটি অতিদীর্ঘ, মোট ২০০ পঙ্‌ক্তি। "কতকাল পরে, বল ভারতরে। দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে॥ * * নিজবাসভূমে পরবাসী হলে।" প্রভৃতি অতি বিখ্যাত লাইনগুলি এই 'ভারত-বিলাপে'র অন্তর্গত। ইহার একস্থানে দাস-সন্তানের জন্ম না দিয়া সন্তানপ্রসব কিছুকাল বন্ধ রাখা উচিত, যেহেতু কেবল বীরপুত্রের জন্মেই গর্ভব্যথা সার্থক—নারীদের প্রতি কবির এই উপদেশ অভিনব।[৫]

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া অনেক স্বদেশী কবিতা রচনা করেন।" "ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস, স্বদেশ উদ্ধার তার কর্ম নয়", "নির্জন কাননে আপনার মনে," "রক্ত বিন্দু হতে শুনি এ জগতে," "আয় রাজপুত আয় প্রিয় শিখ," ইত্যাদি কবিতাগুলিতে উপদেশের আবরণে তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক লিখিত বক্তৃতা (১৮৭৩) তৎকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইহার পরে তাঁহার 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। ইহা প্রথমে ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলেও পরে বাংলা ভাষায় 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পরিকল্পনার খসরা দেওয়া হইয়াছে।

সমাজ ও পরিবার বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি ব্যতীত মনীষী ভূদেবচন্দ্র জাতীয়তাবোধক গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার রচিত "ভারতে জনম লভি ভারতের দুঃখ ভাবি" ইত্যাদি কবিতাও আছে।

৩ "ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী
ডাকিছে পারসী পাঞ্জাবী শিখ,
ডাকিছে তোমায় বীরপুত্রগণ
রাজোয়ারময় যত নির্ভীক।
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হতে
কুমারীপ্রান্ত যেথানে শেষ।"
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ "যত ভারতকামিনী আছ ঘরে।
বিরম প্রসব কিছুকাল তরে॥
কি হবে প্রসবে অযুতে অযুতে।
বলবীর্য-বিবর্জিত দাসসুতে॥
যদি নাহি হবে, সুত শূর হয়ে।
শুধু গর্ভ ব্যথায় কি কাজ সয়ে॥"

বাংলা তথা ভারতে যে মুক্তি-আন্দোলনযজ্ঞের সূচনা হয়, তাহার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাং ১২৭৯ সনে বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি বাংলার ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করিলেন। ইউরোপীয় জাতীয়তা-বোধকে দেশী ছাঁচে ঢালিয়া এই বঙ্গদর্শনের মারফতেই তিনি বিলাইতে লাগিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে হিন্দুমেলার ২য় অধিবেশনে গীত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত "মিলে সবে ভারত সন্তান" গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এই বঙ্গদর্শনেই প্রথম প্রকাশিত হয়। *দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথমে* দেশ-প্রেমকে দার্শনিক তত্ত্ববেদিতে প্রতিস্থাপিত করেন। এই হিসাবে তিনি দেশপ্রেমদর্শনের দর্শনকার। উপকথাচ্ছলে যে স্বজাতিপ্রেম ও শাশ্বত মানবধর্মের বস্তুতান্ত্রিক বিকাশ ও ব্যাখ্যা তাঁহার 'মৃণালিনী,' 'দেবী চৌধুরাণী, 'আনন্দমঠ' এবং 'সীতারামে', তাহারই নিছক তত্ত্বরূপ 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধে'। নিজস্ব রক্ষার জন্য অপহরণকারীর সঙ্গে যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ এবং তাহা যে সর্বথা কর্তব্য—ইহা তিনি 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' প্রবন্ধে জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী এবং 'আনন্দমঠকে' "ত্রয়ী" আখ্যা দিয়াছেন। জাতীয়তাবোধে ইহাদের স্থান নির্দেশ করিতে গিয়া মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন— "মৃণালিনী যাহার আরম্ভ, আনন্দমঠে তাহার পূর্ণ উৎসার এবং সীতারামে তাহার শেষ কলধ্বনি······"

জন্মভূমির এমন জননীমূর্তিও বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ আঁকিয়া দেখাইতে পারেন নাই। "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা— (আনন্দমঠ) ইহার সঙ্গে যখন মিলাইয়া পড়ি "এসো মা নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি"—ইত্যাদি (ক'দপ্তর), তখন মনে হয় মাতৃবোধনের এই মন্ত্র, দরবিগলিত ধারায় মাতৃহারার এমন ক্রন্দন বুঝি এই নরম কোমল বাংলার মাটিতে বাঙ্গালীর দ্বারা বাংলা ভাষায় ছাড়া জগতের অন্য কোন ভাষায় আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না।

এতকাল বাঙ্গালী যে বীরত্বের, যে বীর মাতৃ-সাধকের আদর্শ মনে-প্রাণে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহারই মূর্ত বিকাশ দেখা গেল স্বামী বিবেকানন্দে। স্বদেশমাতৃকাকে কালসাগরে *নিমজ্জিতা দেখিয়া তাহার উদ্ধার-সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র* যে পথের সন্ধান দিয়া গেলেন, বিবেকানন্দ সেই পথেই যেন গোটা জাতিটাকে অনেক দূর আগাইয়া নিয়া গেলেন নিজের জীবন-দৃষ্টান্তে আকর্ষণ করিয়া। পুঁথিগত পরিকল্পনা যেন কর্মে রূপায়িত হইল। সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী স্বীয় অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে আত্মশক্তির এমন পরিচয় দিলেন, যাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য জাতি ভারতের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ তখনই সম্ভবপর না হইলেও, তাহার বনিয়াদ সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়া গেল। নিজের জীবন-দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি দেখাইলেন,—এমন জরাগ্রস্ত পরাধীন জাতি তখনও এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারে, অনেক স্বাধীন দেশেও যেমনটি দুর্লভ। আত্মবিস্মৃত, হতচেতন ভীতিসন্ত্রস্ত জাতির সমক্ষে এই বিবেকানন্দী দৃষ্টান্তের বড় বেশী প্রয়োজন ছিল। জাতির আত্মশক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিলেন, ফিরাইয়া আনিলেন আত্মবিশ্বাস। রণক্ষেত্রের লক্ষ যোদ্ধার অপেক্ষাও এই বিশ্বাস বড়। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম যে অন্য কোন দেশের ঐসকলের তুলনায় নিকৃষ্ট তো নয়ই বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, বিবেকানন্দই সর্বপ্রথমে এই সত্য ভারতে ও ভারতের বাহিরে কঠোর যুক্তি এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণসহায়ে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধন্য সেই বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের

শিক্ষা যাহাতে বিবেকানন্দ ক্ষুদ্র আত্মমুক্তির বাসনা ত্যাগ করিয়া অপরের মুক্তির প্রেরণায় প্রাণপাত করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বিবেকানন্দকে বলিতে দেখি—"মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদি সে নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।" ভারতের এক জাতিত্বের দিক্ হইতে ইহা যে কত বড় কথা তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এই তিনখানি মাত্র বই বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের রচনা। তাঁহার সমস্ত বাংলা প্রবন্ধের সমষ্টি 'ভাববার কথা' নামক পুস্তক। এই সমস্ত পুস্তকে এবং পত্রাবলীতে স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতিকে অগ্রসর করিবার দুর্বার আহ্বান অগ্নিময়ী ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। আদ্যোপান্ত এমন আবেগপূর্ণ সতেজ গম্ভীর ভাষার ব্যবহার পরবর্তীকালে আর বড় একটা দেখা যায় নাই। এই হিসাবে তাঁহার পত্রাবলী বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয়।

"আমি চাই এমন লোক—যাহার শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতরে এমন একটি মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"

"......ফেলে দে ধ্যান,—ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। * * দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে। আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবি নে? * * নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়েই মরে যা।"—পত্রাবলী

"যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম।"

"স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।"

এই সব কথার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। বঙ্কিমের সঙ্গে এই দিক্ দিয়া স্বামীজীর বড় সাদৃশ্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাশক্তির উদ্বোধক, বঙ্কিম যেন সেই শক্তির সাহিত্যিক এবং বিবেকানন্দ তাহার মূর্ত কর্ম-বিগ্রহ।

এখন এমন আর একজনের নাম করিব, জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যাঁহার দান অসামান্য। ইনি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ইনিই সর্বপ্রথমে বিদেশী বীরগণের জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে বঙ্গবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। 'ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত', 'আত্মোৎসর্গ', 'ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি পুস্তক জাতীয় ভাবোদ্দীপক এক একটি রক্তধারা বিশেষ। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' এবং 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' নামক নিবন্ধে তিনি স্বদেশীয়গণের বহু দোষ ত্রুটি এবং জাতীয়তার পথে অগ্রসর হইবার উপায় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ এবং তজ্জনিত সারা বাংলায় দেশাত্মবোধের নব জাগরণ ও সমগ্র ভারতে তাহার সংপ্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে যে, ইহাকে বন্দে মাতরমের যুগ বলিলেই সার্থক নামকরণ হয়। আর একটি বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের এই আন্দোলনে যোগদান।

'বন্দে মাতরম্' গীত রচিত হইবার সঙ্গেসঙ্গেই উহাকে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যে উহা জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হইত, রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরম্ গান করেন। ইহার পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ আর গাওয়া হয় নাই। ১৯০৬ হইতে অদ্যাবধি উহা নিখিল ভারত জাতীয় সঙ্গীতরূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষ্যে সরকার বন্দে মাতরম্কে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বরিশালের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া পুলিশের আঘাতে হতচেতন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করিতে থাকেন। অধিবেশনে রক্তাক্ত পুত্রকে দাঁড় করাইয়া মনোরঞ্জনবাবু যখন বক্তৃতা শুরু করেন তখন এক মর্মস্তুদ দৃশ্যের অবতারণা হয়। এই উপলক্ষ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ "আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল" এবং "মাগো, যায় যেন জীবন চলে" ইত্যাদি গান দুইখানি রচনা করেন। রসরাজ অমৃতলাল বসুও নীরব ছিলেন না; তিনিও গাহিলেন—"ওরা জোর করে দেয় দিক্‌না বঙ্গ বলিদান" ইত্যাদি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি" গানে বন্দে মাতরমের উল্লেখ আছে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ-উপলক্ষ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিলেন। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বঙ্গভঙ্গের দিনে বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা যাহাতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এই ব্রতকথা পাঠ করে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। এমন সরল ভাষায় সহজ করিয়া গল্পের ভঙ্গীতে দেশ-প্রেম প্রচারের ব্যবস্থা পূর্বে আর দেখা যায় নাই। মহিলা কবি মানকুমারী বসুর 'আনন্দমঠ' শীর্ষক কবিতা 'নব্য ভারতে' প্রকাশিত হইল। এবং কান্তকবি রজনীকান্ত সেন কম্বুকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই", রজনীকান্তের "ওই হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব গগনে", "ঐ অভ্রভেদী ধবল শৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ", "আর কিসের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা", "আজ এক করে দে সন্ধ্যা-নমাজ", "মোটা হোক্ সে সোনা মোদের", "মা বলে ভাই ডাক্‌লে মাকে ধরবে টিপে গলা", "কেমন কেমন বিচার করে গোরা" প্রভৃতি গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের কালে প্রত্যক্ষতঃ আগাইয়া আসিলেও ছোটবেলা হইতেই যে তিনি স্বজাতির পরাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁহার রচনাবলীই ইহার প্রমাণ। হিন্দুমেলার শেষদিকে যোগ দিয়া তিনি যে 'দিল্লীর দরবার' কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক "সরোজিনী"তে "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানখানিও রবীন্দ্রনাথের রচিত। ইহা ছাড়া কবির কিশোর বয়সে রচিত—

১। "তোমারি তরে সঁপিনু দেহ······
২। "দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখগান গাহিয়া···
৩। "কেন চেয়ে আছ গো মা ····
৪। "আমায় বলো না গাহিতে বলো না······
৫। "আনন্দধ্বনি জাগাও······
৬। "অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি······
৭। "ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি···
৮। "গাবে যদি গাওরে সবে······
৯। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ·····
১০। "আয় আয় ভাই আয়রে সবে······
১১। শোনো শোনো আমাদের ব্যথা··· ··

এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত

১২। "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে······

১৩। "আগে চল আগে চল ভাই ·····

১৪। "তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ······প্রভৃতি গানগুলিতে স্বদেশহিতৈষণা এবং দেশমাতৃকার প্রতি প্রাণময় আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ "ইংরেজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ইহার পরে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন। এই সময়ে কবির গদ্য ও পদ্য এই দুই বিভাগের রচনার ভিতর দিয়াই স্বদেশী বন্যার অজস্র ধারা অবিশ্রান্ত বহিতে থাকে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট কলিকাতা টাউনহলে রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ১৩১২—আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমাদর ও প্রশ্রয়ের পরিবর্তে প্রতিকূলতা এবং আঘাতের দ্বারাই যে আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে ইহাই তিনি দেশবাসীকে শুনাইলেন। এই সভাতেই কবির 'সোনার বাংলা' গানখানি গাওয়া হইয়াছিল। ১৩১২ সনের ২২শে ভাদ্রের 'সঞ্জীবনী'তে 'সোনার বাংলা' প্রকাশিত হয়। 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠানের জন্য তিনি লিখিলেন—"বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল ······ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গানখানি। এই সঙ্গে স্মরণীয়—

১। "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান্···

২। "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে···

৩। "আমাদের যাত্রা হলো শুরু·· ইত্যাদি গান তিনটি ১৩১২—আশ্বিনের 'সঞ্জীবনীতে' মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নের গান কয়খানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ··

২। "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে···

৩। "নিশিদিন ভরসা রাখিস্···

৪। "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি···

৫। "আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না···

৬। "ও আমার দেশের মাটি···

৭। "আমার প্রাণের মানুষ···

৮। "ছি ছি চোখের জলে ভিজাস্‌নে আর মাটি···

৯। "আপনি অবশ তবে বল দিবি তুই কারে···

১০। "মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ··

১১। "যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা···

১২। "যে তোরে পাগল বলে ··

১৩। "তোমার কোলে জনম আমার

১৪। "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ··

১৫। "কে জাগিবে আজ ··

১৬। "অয়ি ভুবনমনোমোহিনি···

১৭। "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে···

১৮। "আত্মদানের উৎসব-ধারায়···

১৯। "আমরা পথে পথে সব সারে সারে···

২০। "জননীর দ্বারে আজি ঐ শুন গো শঙ্খ বাজে ···· ইত্যাদি।

১৩১২ সনের ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রতধারণ' নামক মহিলাদের জন্য লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে 'আত্মশক্তি' নামে ইহার নামান্তর হইয়াছে। বরিশালের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সরকার জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে, কলিকাতায় যে প্রতিবাদসভার অনুষ্ঠান হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে বঙ্গদর্শনে উহা প্রকাশ লাভ করে। এই সঙ্গে তাঁহার 'শিক্ষাসমস্যা', 'জাতীয় শিক্ষা', 'ততঃ কিম্' এবং 'সাহিত্য-সম্মেলন'—প্রবন্ধ কয়টিও স্মরণীয়। ১৩১৪ সনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পাবনা-অধিবেশনের সভাপতিরূপে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ দেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়

সম্মিলনীর আর কোন সভাপতিই ইতঃপূর্বে মাতৃভাষায় অভিভাষণ লিখিয়া পাঠ করেন নাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসবে কবির "জনগণমন……" গান সর্বপ্রথমে গীত হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বরে কংগ্রেস-অধিবেশনেও এই গান গাওয়া হইয়াছিল। ক্রমেই ইহার জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গিয়া ইহাকে অন্যতর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীতে পরিণত করিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষার দান যে কত বেশী তাহার নিদর্শন এই "বন্দে মাতরম্" এবং "জনগণমন……"। কবির "দেশ দেশ নন্দিত করি ……" গানটিও এইখানে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক বাণীমন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এত অধিক পরিমাণে মিশিয়া আছে যে, তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়াও বড় সহজ নয়। তাঁহার গভীর সত্যদৃষ্টি জাতি-প্রেমের রসে জারিত হইয়া যে অমোঘ মন্ত্র-বাণীর সৃষ্টি করিয়াছে, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা এক পরম বিস্ময়।

স্বদেশী যুগে বাংলার চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। কেবল স্বদেশী গানই নয়, তাঁহার 'দুর্গাদাস', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলিও জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা যোগাইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। 'আর্যগাথা' তাঁহার জাতীয়ভাবমূলক প্রথম পুস্তক। তাঁহার কতকগুলি গান ভাব-ভাষা-ছন্দ-সুরে সত্যই অভূতপূর্ব। ইহাদের মধ্যে (১) "বঙ্গ আমার জননী আমার……(২) "ভারত আমার ভারত আমার · ···(৩) "মা বলে ডাক, মা বলে ডাক…… (৪) "তুমিত মা সেই, তুমিত মা সেই···(৫) "আজি গো তোমার চরণে জননী…… (৬) "বাজ ভেরী বাজ উচ্চনিনাদে……(৭) "জাগো জাগো পুরনারী··· (৮) "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা··· (৯) "যেদিন সুনীল জলধি হইতে……(১০) "কি মাধুর্য জন্মভূমি জননী আমার ·····(১১) "কিসের শোক করিস্ ভাই··· (১২) "ঘুচাতে চাস্ যদি এই হাতাশাময় বর্তমান··· প্রভৃতি গান কেবল সেই যুগেই নয়, বর্তমান সময়েও শ্রোতার মনে এক অপূর্ব ভাবাবেশের সৃষ্টি করে।

বাংলার আত্মগরিমা-ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বাংলার ঐতিহ্য দেশপ্রেমের রসে জারিত হইয়া অনবদ্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার (১) "মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে……(২) "ধ্যানে তোমার রূপ দেখি মা· ···(৩) "মধুর চেয়েও আছে মধুর…… (৪) "কোন্ দেশের দুর্দশায় মোর……ইত্যাদি কবিতায় কবির বাংলা ও বাঙ্গালী-প্রীতি অতুলনীয়রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় আন্দোলনে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের "বল বল বল সবে····," 'শিকল ভাঙার গান,' "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" প্রভৃতি গানের প্রভাবও অসামান্য।

এই বিষয়ে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র দানও অসাধারণ। আনন্দমঠের পরে বাংলা ভাষায় রচিত আর কোন উপন্যাসই স্বদেশী যুগে পথের দাবীর মত এত বেশী সাড়া আনিতে পারে নাই। এত অল্প সময়ের ভিতরে ইহার ১ম সংস্করণের সমস্ত কপি বিক্রীত হইয়া যায় যে, সরকার ভীত হইয়া (কিছু কালের জন্য) এই পুস্তককে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে। পথের দাবী আগাগোড়াই বিদ্রোহাত্মক তীব্র বাণী-প্রেরণায় ভরপুর। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিবার এমন উগ্র কল্পনা পরবর্তী আর কোন উপন্যাসে দেখা যায় নাই। "দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল সমস্ত যে কেড়ে নিলে তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার? এ ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে

ভারতী? ছি!"—কথাগুলির ভিতরে জাতির আত্মগ্লানি এবং সেইজন্য একটা চাপা আক্রোশ বিদেশী সরকারকে যেন পিষিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছে। রামদাস তলওয়ারকরের বক্তৃতা যেন পরাধীন জাতির অন্তরের পুঞ্জীভূত বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগের মত। ইহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার মত।

এই স্বদেশী যুগধারার শেষ বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম। 'অগ্নিবীণা', 'ডমরু', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক তাঁহার বিদ্রোহী কবিতায় ভরা। সরকার এইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়া প্রকারান্তরে ইহাদের মর্যাদাবৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তাই করিয়াছিল। সুরছন্দসহযোগে বিদ্রোহ-বহ্নির এমন দাবানলপ্রবাহ বাংলা ভাষার আর কোন কবির কবিতাতেই পাওয়া যায় নাই। কবির এই বিদ্রোহ কেবল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই নয়, গ্লানিকর সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধেও। তাঁহার "নারী", "সাম্য" প্রভৃতি কবিতা সামাজিক নির্মমতার উপরে যেন সত্যোজ্জ্বল কশাঘাত। তাঁহার—(১) "দুর্গম গিরি কান্তার মরু · (২) "টলমল টলমল পদভরে ·· (৩) "চল চল চল—উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল··· · (৪) "অগ্রপথিক হে সেনাদল··· (৫) "জাগো অনশনবন্দী · ···(৬) "তোরা সব জয়ধ্বনি কর · ···(৭) "জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা····· প্রভৃতি গানের তুলনা নাই। পরবর্তী "কদম্ কদম্ বড়ায়ে যা"র পদধ্বনির পূর্বসূচনা যেন এই গানগুলিতে তালে তালে ফাটিয়া পড়িতেছে।

এইরূপে দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসাদির ভিতর দিয়া জাতি তাহার হৃতসম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে লাগিল। রজনীকান্ত গুপ্ত পাঁচ খণ্ডে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লিখিলেন। তাঁহার রচিত 'আর্যকীর্তি' গ্রন্থে রাজপুত, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতির বীরত্ব-কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক বাংলার ইতিহাস লিখিলেন। নিখিল-নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বিখ্যাত 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'সীতারাম রায়', 'সমরসিংহ' প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-মনীষি-বৃন্দের জীবন-বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ায় সার্থক জীবনী-সাহিত্যের অভাব দূরীভূত হইল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, অজিত চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনবৃত্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকারের (পৃথক্ ভাবে) বিদ্যাসাগরচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' প্রভৃতি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্ম-চরিতগুলিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধে এই সকল গ্রন্থের পরোক্ষ প্রেরণা অবিসংবাদিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন, মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের নাটকগুলি বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। বাঙ্গালীর আত্মচেতনালাভে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের প্রভাব যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাত্রাভিনয়ে অঘোর চক্রবর্তীর বীররসের 'গীতাভিনয়' গুলি উল্লেখযোগ্য। বরিশালের মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা এবং গানগুলি বাংলার সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও জাতীয় প্রেরণা ছড়াইতে কম সাহায্য করে নাই।

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অবদানও এই দিকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বঙ্কিমের পরে তদনুকরণে রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গ-বিজেতা', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মপাল' ও 'শশাঙ্ক' এবং বাংলার বারভূঁইয়াদের বৃত্তান্ত-অবলম্বনে বিভিন্ন পুস্তকাদির প্রভাবও নগণ্য নয়।

জাতীয়তাবোধে বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলির দান যে অসামান্য ইহা বলাই বাহুল্য। ১৮১৬ খৃঃ অব্দ হইতে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পর্যায়ে বাংলা ভাষায় যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, সারা বাংলা দেশের শহর ও মফস্বল হইতে প্রকাশের হিসাব মিলাইয়া, সেগুলিকে অসংখ্য বলিলেও যেন অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের অধিকাংশেরই আয়ুষ্কাল অতি অল্প হইলেও জাতির সর্বাঙ্গীণ আন্দোলনে ইহাদেরই দান সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া ইহাদের কোনোটাই একেবারে ব্যর্থ নয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (তখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত) সেই সুদূর অতীতেই (১৮৬৮) "ইংরেজ-শাসনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যন্ত্রস্বরূপ হইবে" এমন অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। স্বদেশী যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (দৈনিক) এবং 'স্বরাজ' (সাপ্তাহিক) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। স্বরাজে প্রকাশিত "স্বরাজগড়", "বিবেকানন্দ কে?", "আমার ভারত-উদ্ধার" প্রভৃতি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন। তাঁহার "বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি" স্বজাতিপ্রেমের একখানি বিশিষ্ট দলিলস্বরূপ।

বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার সূচনা হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ সালে কৃষ্ণনগরে "বাখাবর" সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রত্যেক প্রস্তাব বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। জাতীয়ভাব জনসাধারণের ভিতরে প্রচার করিবার জন্য জেলায় জেলায় প্রতি বৎসর একবার করিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নাটোর-অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় স্বয়ং তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করিবার পর, রবীন্দ্রনাথ সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজী অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহার পরে বাং ১৩১৪ সনের (ইং ১৯০৭?) প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পাবনা-অধিবেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বাংলা অভিভাষণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর ভবানীপুর-অধিবেশনে দেশবন্ধু "বাঙ্গলার কথা" নামে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা-অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির "স্বাগতম্" নামক অভিভাষণে দেশবন্ধু যাহা বলেন তাহাও জাতীয় রাজনৈতিক-চেতনার উদ্বোধক হিসাবে গণনীয়।

বাংলার জাতীয় আন্দোলনের এই ভাব-বন্যা ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। কাশীর হিন্দুস্থানী কবি হরিশ্চন্দ্র সর্বপ্রথম হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতা হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার পর হইতে অদ্যাবধি বাংলা নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়, বিশেষতঃ হিন্দীতে অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন মারাঠী পণ্ডিত বাংলাদেশে আসিয়া "হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক পর্যন্ত হইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার লেখা 'দেশের কথা', 'বাজীরাও', 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' প্রভৃতি গ্রন্থ জাতীয় ভাবে পূর্ণ। বরোদায় থাকাকালে অরবিন্দ ঘোষ (পরে ঋষি) বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "ইন্দু-প্রকাশ" পত্রে ১৮৯৩ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পর পর সাতটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহাতেই বুঝা যায়, বাংলার

এই সাহিত্য বাহিরে কিরূপ প্রচারিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য অরবিন্দ তখন বাংলা ভাল জানিতেন না।

ক্ষুদিরাম প্রভৃতির আত্মবলিদানের কথাবলম্বনে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিদ্রোহাত্মক বহু গান রচিত হইয়াছিল। "বিদায় দে মা ঘুরে আসি" ধরনের গানগুলি বাংলার পল্লী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলে জাতীয় আন্দোলনে বাংলা ভাষার দানের একটা অতি বড় অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পরিশেষে যুবকবাংলার উত্তর সাধক অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বাংলা রচনা-রাশি যাহা স্বজাতির দিগ্‌দর্শনে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে —স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

নমি নমি নমি*

আবদুল গণি খান

দেব কণ্ঠস্বর
অমৃত তূর্যধ্বনি
শুনিলাম তব উপবনে।
রত্নছায়া কোহিনুর মুকুতার মেলা
অর্ঘ্য-পশরা—
সাজিয়াছে গঙ্গা-দ্বার খুলি।
মৃগনাভি সম—
সৌরভসংহতি তব
        ছুটিয়াছে শতেক সীমায়।
অনাবিল ঊর্ধ্ব সুষমায়—
ডাক দিল তীরে যাত্রীদের
বংশীধ্বনি পুকারিল
মহামন্ত্র ঘোষি পারাপার তরে—
        যত মত তত পথ রচি!
অন্তহীন মহিমায় দিগন্ত সন্ধ্যায়—
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রেম
অভিভূত করিল আমায়।
        তব অপরূপ লীলা!
আলো-স্তম্ভ এলো ছুটে
হৃদয়ের মিনার আকাশে
প্রতিচ্ছবি মহা উজ্জ্বল—
প্রদীপ্ত—জ্বলন্ত—চিরসত্য আলোময় দ্বার
খুলে যায় নিমেষে আবার!

নীড়হারা পাখি—
দীপালোক মাঝে
মৃত্যুর চুম্বন সমাপ্তিতে—
        গ্রহ সীমা ছাড়ি চলে
        পরিব্যাপ্ত আলোময় আকাশের পানে।
প্রশান্ত সাগর বুকে ধরি
সৃষ্টি হয় ঘাত-প্রতিঘাত
বিভীষণ সাগরের ফেনা
শিশিরের ঢেলা ছুটে যায়
        চলে নিরুদ্দেশ ঃ
নীল চারিভিত জুড়ে দেয় দেখা
        শাশ্বতের রেশ!
গাহিবারে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ-গীতি—
দানপত্র নত বুদ্‌বুদ
        বায়ু স্রোতে চলে ঃ
ক্ষণিকের মোহ—তারা চলে
মেঘের আকারে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে বহু দূরে
উড়ে যায় বাতাসের টানে
        কোথায় কে জানে?
বহুদিন ব্যাপি—
হঠাৎ নেমেছে মর্ত্যে স্পর্শে কার
        কোটি কোটি আবে রহমত।
        নয়া বাঁধনের সনে নয়া কথামৃতে!

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২০তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ধমানে আহূত জনসভায় ২৬শে চৈত্র, ১৩৬১ লেখক কর্তৃক পঠিত।

আনে আলোড়ন
আনে শিহরণ—জাগাবারে অসীমের জ্ঞান।
ধরণী মৃত্তিকা প্রান্তরে
প্রণয় সঞ্চারি
ভেঙে মায়া কারাগার মোহ জঞ্জাল
এলে বুঝি হে যুগাবতার!
স্রষ্টায় বিলীন হ'তে চলে অভিযান
জীবনের সৌর আকাশে ওঠে ধূমকেতু
জ্যোতির্ময় চির উজ্জ্বল
এলো পাপী-তাপী এলো দুর্বল
এলো মুক্তি লাগি।

তোমার জ্যোতিতে চলে
চলে সবে তীর্থগামী দল
হিন্দু মুসলিম ক্রিশ্চান দ্রাবিড়।
দীপাবলী সাজালে যেথায় থরে বিথরে।
অজস্র মৃত্যুর ছাপ
নিষ্ঠুর বেষ্টন চারিধার
তারই পাশে হেরি তব অপরূপ নব অভিজাত !!
তব প্রসাধনরেণু
মাথি নির্ভয়ে
পদতল চুমি—
নমি নমি নমি।

সত্যকাম ও চতুষ্পাদ ব্রহ্মোপাসনা

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।৪-৯ অবলম্বনে)

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

এমন একদিন ছিল যখন শিষ্য হত শ্রদ্ধাবান্ ও সত্যাশ্রয়ী আর অন্তর্দ্রষ্টা গুরু জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত দৃষ্টি দিয়ে শিষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই বুঝতে পারতেন। সাধনার ক্ষেত্রে ফাঁকি স্থান পায়নি, তাই মেকি নিয়ে কারবার হয়নি। সবটুকুই ছিল খাঁটি, নিখুঁত ও সুন্দর। তখন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধও হত মধুর, অচ্ছেদ্য, অপার্থিব। শিষ্যের শ্রদ্ধা ও গুরুর আন্তরিকতার যোগসূত্র এমন একটি জায়গায় পৌছত যেখানে শিষ্য বুঝতে পারত—সে আপ্তকাম, তার চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই বাকি নেই। সাধনার তীব্রতায় সে জড়প্রকৃতির মধ্যেও উপলব্ধি করত প্রাণের স্পন্দন—পৃথিবীর সৌন্দর্য, জলের প্রবাহ, আলোর হাসি, বায়ুর গতি, আকাশের বিশালতা তাকে দিত নবীন জীবন। বিহগের কলতানেও সেই মহান্ সঙ্গীত, ফুটন্ত ফুলের মধ্যে তাঁরই সুষমা—সর্বত্রই যেন প্রকৃতিদেবীর উন্মুক্ত গ্রন্থাগারের সাদর আহ্বান! 'আত্মানং বিদ্ধি'—এই বাণী যেন ওতপ্রোত।

আদর্শ গুরু ও আদর্শ শিষ্যের স্বরূপ জ্ঞাপন করে এই সুপ্রাচীন বৈদিক আখ্যায়িকা।

শান্ত প্রকৃতির শান্তির নীড়ে গুরু গৌতমের পুণ্য আশ্রম। হরিদ্রুমান্ ঋষির পুত্র ব্রহ্মজ্ঞ গৌতম। দিকে দিকে তাঁর যশোগীতি—শিষ্যসমাজে তাঁর অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা। কিশোর সত্যকামের কানেও পৌছেছে এই কথা—যে তাঁর কাছে যায় সেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। তারও চাই জীবনের পরম শ্রেয়ঃ আত্মজ্ঞান।

জননীর আশীর্বাদ-পাথেয় নিয়ে সত্যকাম একাকী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলেছে। ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই! বিদ্যার আকর্ষণ, অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহ যেখানে প্রবল, সেখানে সব দুঃখকষ্টই যে অকিঞ্চিৎকর। পথে

নবীনতার কত আস্বাদ তার ক্ষুধিত মনের অনুসন্ধিৎসা মিটিয়ে দিচ্ছে। দিনমণি অস্তাচলগমনে উদ্যোগী, হোমধেনুগুলি আশ্রমে প্রত্যাবর্তনরত। ব্রহ্মচারিবৃন্দ হোমক্রিয়ায় ব্যস্ত। পুণ্য সান্ধ্যলগ্নে সত্যকাম তপোবনে উপনীত হল। ঊর্ধ্বে নক্ষত্রমণ্ডিত সীমাহীন আকাশ—নিম্নে শ্যামল ভূমির উপরে শিষ্যপরিবৃত আচার্য। যেন একটি প্রজ্বলিত দীপশিখার চতুষ্পার্শ্বে বিকাশোন্মুখ দীপাবলী।

উপযুক্ত বিশ্রামের পর সত্যকামের পথক্লান্তি দূর হলে গুরু গৌতম তাকে ডেকে পাঠালেন। সত্যকাম ঋষিচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধীরে ধীরে নিবেদন করল, "ভগবন্, আপনার নিকট পবিত্র ব্রহ্মচর্যদীক্ষা-বাসনায় বহুদূর থেকে এসেছি, কৃপা করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" আচার্য প্রিয়দর্শন বালকের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শুধালেন, "সৌম্য, তোমার গোত্র কি?"

শ্রদ্ধাবনত বালক সরলভাবে উত্তর দিল, "ভগবন্, আমার কী গোত্র তা তো জানি না। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলেছেন, 'বৎস, স্বামিগৃহে আত্মীয়-অভ্যাগতের পরিচর্যা এবং আরও বহু কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। তোমায় পাবার পর, যৌবনেই আমি ভর্তৃহীনা, তোমার গোত্র জানি না। তবে আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, তাই তুমি জাবাল সত্যকাম। আমার নামেই তোমার পরিচয়।' "

সত্যনিষ্ঠ সত্যকামের মুখ থেকে মায়ের মুখের কথাগুলি হুবহু বেরিয়ে এল অত্যন্ত সহজভাবে। সে গুরুর কাছে পিতার পরিবর্তে মায়ের নামেই পরিচিত হল—জাবাল সত্যকাম।

অপূর্ব সারল্যমণ্ডিত মুখখানির দিকে ঋষি গৌতম সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করলেন। বালক তো নয়, যেন নিষ্কোষিত তরবারি। সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রাণে সংশয়ের লেশমাত্রও রইল না। তিনি মুহূর্তমধ্যে অবগত হলেন উপগত কুমারের ব্রাহ্মণ্যতেজ। তাকে আলিঙ্গন করলেন, শুভাশিস্ দিয়ে বললেন, "তুমি অব্রাহ্মণ নও বৎস, তুমি সত্যবংশোদ্ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে আর এরূপ সত্যনিষ্ঠ! যাও, সমিধ আহরণ কর। তোমায় ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেব।"

আশ্চর্য উদারতায় ভরা ঋষির প্রাণ—সসীম শরীরের মধ্যে নিঃসীম করুণাসমুদ্র! তাইতো সেখানে স্থান পেল না বিধিনিষেধের বাধা। তাইতো তিনি স্থান দিলেন আচার-গত ধর্মের উপরে প্রত্যক্ষ ধর্মকে। ব্রাহ্মণগোত্রের জ্বলন্ত প্রমাণই যে সত্য ও সরলতা।

সত্যবতী জননী জবালার পরিচয়ে গুরুকৃপায় সত্যকাম ঋষিশিষ্যত্ব প্রাপ্ত হবে। তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। নবোন্মেষের আশায় আনন্দোজ্জ্বল বালক ক্ষিপ্রগতিতে সমিধসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এল। আচার্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোমক্রিয়া সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণের বিধি অনুযায়ী তাকে উপনীত করলেন। অজ্ঞাতগোত্র বালক এখন ব্রাহ্মণকুলোচিত মর্যাদাসম্পন্ন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী! উপনয়নান্তে তৎকালীন বৈদিক প্রথানুযায়ী শিষ্যকে আদেশ করলেন, "সৌম্য, আমার গোধন থেকে চার শত তোমাকে দিলাম, এরা কৃশ ও দুর্বল। উপযুক্ত সেবাযত্নে তুমি এদের সুস্থ সবল কর।" স্নেহধন্য শিষ্য গুরুচরণারবিন্দ বন্দনা করে বিনম্রনম্রবচনে জানাল—যতদিন না সহস্র হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ গোধন হয় ততদিন ফিরবে না।

বাড়ী থেকে স্নেহময়ী মাকে ছেড়ে গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিল—আজ আবার তাঁর সঙ্গেও বিচ্ছেদ! কিন্তু তাঁর আদেশ সযত্নে পালন করতেই হবে। গুরুই যে সব—ইহকাল পরকালের পরম আশ্রয়।

নিবিড় বনানী—জনপদ থেকে বহু দূরে যেখানে কোন সঙ্গী নেই, কথা বলারও কোন লোক নেই সেইখানে একাকী সত্যকাম। নিঃসঙ্গ জীবন। বনের সুপক্ব ফল তার ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়—নদীর সুপেয় জল

তৃষ্ণা দূর করে। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হয়ে দিনগুলি কেটে যায়। গুরুর নির্দেশমত ত্রিসন্ধ্যা যথারীতি নিত্যকর্ম ও হোমাদি চলতে থাকে—আর চলে চার শত গোধনের প্রাণপণ সুষ্ঠু পরিচর্যা। স্বচ্ছন্দ বনজাততৃণ-ভোজনে আর যথেচ্ছ বিচরণে রুগ্ন দুর্বল গরুগুলি অচিরেই সুস্থ সবল হয়ে উঠল। তাদের দেখে সত্যকামের আনন্দ যেন ধরে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আর ভাবে—নিশ্চয়ই তার উপর গুরুদেব সন্তুষ্ট হবেন। গুরুর প্রসন্নতাতেই তো নিখিল তত্ত্বের অধিগম। সহস্রসংখ্যক গোধন নিয়ে প্রত্যাবর্তনের দিনটির সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

নির্জনে কয়েক বৎসর এইরূপ কঠোর তপস্যা ও একনিষ্ঠ সেবায় অতিবাহিত হয়ে গেল। অন্তরীক্ষচারী দেবগণও মুগ্ধ—বিস্মিত! কোন্ সময়ে যে সহস্র সংখ্যার পূর্তি হল তপস্যাতন্ময় সত্যকাম জানতেও পারল না।

এই সময় একদিন একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। কৃপাপরবশ বায়ুদেবতা একটি প্রকাণ্ড বৃষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ডাক দিলেন, "সত্যকাম, সত্যকাম।"

"একি! বৃষের মনুষ্যোচিত কণ্ঠস্বর।" সে অবাক্ হয়ে যায়। "কখনও এরূপ অসম্ভব তো কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। এ যে অভাবনীয়—অশ্রুত-পূর্ব! কোন দেবতা নিশ্চয়ই এই পশুশরীরে ভর করেছেন। যা হোক দেখা যাক—কি হয়। এর ডাকে সাড়া দিই।" সত্যকাম বায়ুরূপী বৃষভের আহ্বানে উত্তর দিল "কি ভগবন্?"

"বৎস, আমাদের সংখ্যা তো সহস্র পূর্ণ হয়েছে। তোমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ। এখন আমাদের ঋষি গৌতমের আশ্রমে চল।" সত্যকাম একে একে সমস্ত ধেনুই গুণতে লাগল—সবিস্ময়ে দেখল সত্যই এক হাজার। "বৎস, পবিত্র ব্রহ্মচর্যে তোমার চিত্ত দর্পণের মতো নির্মল হয়েছে। আবিলতাহীন চিত্তেই ব্রহ্মের ধারণা হয়, তাই তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করব।" সশ্রদ্ধভাবে সত্যকাম ব্রহ্মের কথা শোনে।

"ঐ যে পূর্ব দিক্—ওটি পরমাত্মার এক পাদের একটি কলা, পশ্চিম দিক্ আর একটি কলা—ঐ দক্ষিণ দিক্ একটি, আর এই উত্তর দিক্ও একটি কলা। এই চার কলা বা অংশের সমষ্টিযোগে ব্রহ্মের একপাদ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ পূর্ণ। সমস্ত বস্তুর প্রকাশক বলে এই পাদটির নাম প্রকাশবান্। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদের উপাসনায় রত থাকেন তিনি ইহলোকে প্রখ্যাত হন এবং দেহাবসানে প্রকাশাত্মক লোকসমূহ জয় করে অনন্ত সুখ লাভ করেন। ব্রহ্মের চার পাদের একটি পাদের কথা বললাম, অপর একটি পাদ অগ্নিদেবতার কাছে শুনতে পাবে।"

সত্যকামের সামনে থেকে যেন একটি বিরাট আবরণ সরে গেল। প্রতিভাত হল—চতুর্দিক এক অপূর্ব অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তায় পরিপূর্ণ—সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্ধ্বে অধোদেশে সর্বত্র, মধ্যস্থলে ভাবঘন সত্যকাম!

পরদিন প্রভাতে গোধনসহ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা। অনেক দূরের পথ। কিন্তু পথের ব্যবধানে আসন্ন গুরুদর্শনের আনন্দ তো ম্লান হয় না। পথি মধ্যেই সন্ধ্যা সমাগত। উপযুক্ত স্থানে গরুগুলিকে যথারীতি রেখে সত্যকাম উপাসনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অগ্নি প্রজ্বালিত করে পূর্বাস্য হয়ে ধ্যান করতে লাগল। প্রজ্বলিত অনলের লেলিহান সাতটি জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচী—যেন অজ্ঞানের অন্ধকার সাগ্রহে দূর করতে চাইছে। হঠাৎ অগ্নিমধ্যস্থ ভাস্বর লোহিতাক্ষ পুরুষের দিব্য বাণী শোনা গেল—"সত্যকাম, সত্যকাম।" গতকালের ঘটনা মানস-পটে ভেসে ওঠে।

"বলুন প্রভু, কি অনুশাসন।"

"সত্যকাম, তোমায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছি, অনুধাবন কর। এই জীবকুলপরিপূর্ণ ধরণী ব্রহ্মের একটি অংশ, অসীম অন্তরীক্ষ একটি, দ্যুতিসম্পন্ন

স্বর্গ একটি কলা আর অনন্ত সমুদ্র অপর একটি। এই চার কলায় ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ পূর্ণ। এই পাদের অন্ত নেই, তাই এর নাম অনন্তবান্। যিনি ব্রহ্মের এই অনন্তবান্ পাদের উপাসনা করেন, তিনি অনন্ত মহিমা প্রাপ্ত হন এবং দেহান্তে অনন্ত লোক-সমূহে তার একাধিপত্য হয়। হংসরূপী আদিত্যের কাছে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ সম্বন্ধে উপদেশ পাবে।"

সত্যকামের চক্ষুর সম্মুখ থেকে যেন দ্বিতীয় যবনিকা অপসৃত হল। অন্তরে ব্রহ্মানন্দ—নয়নে ব্রহ্মজ্যোতি। আজ তরুলতাসমাকীর্ণ পৃথিবী অধিকতর সুন্দর ও সুখকর—নবরূপে রূপান্বিত। জল স্থল অন্তরীক্ষ সবই মধুময়। সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বায়ু ও অগ্নিদেবতা যে উপদেশ দিয়েছেন তারই স্মরণ-মননে আরও একটি দিন অতিবাহিত হল। মাত্র অর্ধপথ অতিক্রান্ত। সন্ধ্যা-সমাগমে যথাবিধি হোমের সময় একটি উড্ডীয়মান হংস নেমে এসে সত্যকামের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "এই উজ্জ্বল হংস নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী আদিত্য—আর আদিত্য ও হংসের উভয়েরই ধর্ম সমান, উভয়েই শুভ্র ও গগনবিহারী।"—চিন্তান্বিত সত্যকাম।

"সৌম্য সত্যকাম, ব্রহ্মের তৃতীয় পাদের উপদেশ গ্রহণ কর। ঐ যে সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি, ওটি ব্রহ্মের একটি কলা। সূর্য এক কলা, চন্দ্র একটি এবং বিদ্যুৎ আরেকটি। এই চার কলায় ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ পূর্ণ। এই পাদটি জ্যোতির্ময়, তাই এর নাম জ্যোতিষ্মান্। এই পাদের উপাসনাকারী ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ হন্ এবং দেহত্যাগের পর জ্যোতিষ্মান্ লোকসমূহ জয় করেন। সত্যকাম, মদ্গু পক্ষী তোমাকে ব্রহ্মের অবশিষ্ট পাদটির অনুশাসন দেবে।"

উপদেশান্তে হংস দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হল, কিন্তু মনের মধ্যে চির-জাগরূকই হয়ে রইল। সত্যকামের এ কী অপূর্ব অনুভূতি! এ যে অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসোগোচরম্—"বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য সম প্রভা! শুধু জ্যোতির সমুদ্রে জ্যোতির তরঙ্গ, তার মধ্যে অগণিত বিচিত্র জীব বিন্দুবৎ ভাসমান।

সত্যকামের শ্রদ্ধা ও তপস্যায় নিখিল প্রকৃতি প্রসন্না। তাই একটির পর একটি করে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। ব্রহ্মের তিনটি পাদের জ্ঞানলাভ হয়ে গেছে, আর একটি মাত্র বাকী। এই একটি হলেই পূর্ণজ্ঞান—ব্রহ্মের ষোল কলার বিষয় সবই জানা হবে। কী আনন্দ! আনন্দের রেশ তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে গন্তব্যস্থানের দিকে। আশ্রমও তো বেশী দূরে নয়—সম্ভবতঃ একদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

আরও একটি দিন মনের মধ্যে অম্লান স্মৃতি রেখে কালের গর্ভে ডুবে গেল। সন্ধ্যাকালে হোমের সময় আগের দিনগুলোর মতোই একটি নতুন ঘটনা ঘটে। একটি জলচর পাখী সামনে এসে উপস্থিত। এই জলচরই হংসরূপী-আদিত্যোক্ত মদ্গু। মদ্গু প্রাণের প্রতীক। "বৎস সত্যকাম, ব্রহ্মের চতুর্থ পাদের বিষয় শোন।"—সুমধুর বাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে।

"বৎস, এই স্পন্দনাত্মক প্রাণশক্তি ব্রহ্মের চতুর্থপাদের প্রথম কলা। এই প্রাণেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত। চক্ষু দ্বিতীয়, শ্রোত্র তৃতীয় এবং মন চতুর্থ কলা। এই পাদটি আয়তন বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ, এর নাম আয়তন-বান্। কেননা, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমাহৃত ভোগ্য-সমূহ এই চতুর্থ পাদেই বিশ্রান্ত থাকে এবং এখানেই সমস্ত ভোগ নিষ্পন্ন হয়। যিনি চতুষ্কল পাদটিকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয়ে 'আয়তনবান্' রূপে উপাসনা করেন, তিনি জীবদ্দশায় উপযুক্ত আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং মরণের পরে আয়তনবান্ অর্থাৎ অবকাশযুক্ত লোকসকল জয় করেন।"

প্রাণরূপী পক্ষী অদৃশ্য হল। সত্যকামেরও অজ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। সমস্ত

জ্ঞান তার অধিগত—করামলকবৎ প্রত্যক্ষ। বায়ু, অগ্নি, সূর্য, প্রাণ এই সব মহাপ্রকৃতি রূপ গ্রহণ করে তার জ্ঞানোন্মেষ করেছেন। মহাপ্রকৃতি ব্রহ্মেরই সৃষ্ট, ব্রহ্মেরই কলা। আবার প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি এই সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিও ব্রহ্মেরই অংশ। ব্রহ্ম এক, কিন্তু তিনিই আবার বহুরূপে—অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিরূপে নানাভাবে লীলা করছেন। যা কিছু সৃষ্টি স্থিতি সংহারের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন—সবই তো তাঁরই।

পথ চলা শেষ। সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে আচার্য-গৃহে উপস্থিত হল। সঙ্গে অনিন্দ্যকান্তি সহস্র ধেনু। গুরু গৌতম তাকে সম্বোধন করে বললেন, "ব্রহ্মবিদিব বৈ ভাসি—হে সৌম্য সত্যকাম, তুমি ব্রহ্মবিদের মতো প্রতিভাত হচ্ছ। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি নিরুদ্বেগ, তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, মুখমণ্ডল হাস্যপূর্ণ। তোমাকে সেইরূপই মনে হচ্ছে। কে তোমাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন?" সত্যকাম শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করে সবিনয়ে জানায়, "দেবগণ কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে ব্রহ্মের অনুশাসন দিয়েছেন, কোনও মানুষের কাছে এই তত্ত্ব লাভ করিনি। আমি আপনার শিষ্য—আপনি আমার গুরু, আপনি ভিন্ন কে আর আমাকে উপদেশ দেবেন? ভগবন্, আপনারই কাছে শুনেছি আচার্যের নিকট যে বিদ্যা লাভ করা যায়, তাইই হয় সুফলপ্রসূ—সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুন।"

শিষ্যের ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় গুরু অত্যন্ত প্রীত। তিনি প্রিয়তম শিষ্যকে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মের চার পাদ ও ষোল কলা যথাযথভাবে উপদেশ করলেন। কিছুই অবশিষ্ট রইল না, অংশমাত্রও পরিত্যক্ত হল না।

দেবগণের উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব গুরুর উপদেশের সঙ্গে মিলে গেল। অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হল উভয়ই এক—সত্য, সনাতন। সত্যকাম আপ্তকাম—আত্মারাম।

আচার্য শঙ্কর বৈদিক আখ্যায়িকাগুলিকে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিরূপে নির্দেশ করেছেন—"তত্রাখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা।"

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত অনুধাবনযোগ্য* :—

"এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল আর সকলে কি শিখাইল—এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতেই এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা আরও অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উত্থিত। শিষ্য বরাবরই সত্যসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা যে বহির্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে—কর্মজীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ধর্ম হইতে কার্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সর্বদা অন্বেষিত হইতেছে; আর এই সকল গল্প পাঠে আমরা ইহাও দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাঁহাদের দৈনিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে যে সকল জিনিসের সঙ্গে সর্বদা সংস্পর্শে আসিতে হইত, তাহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন! অগ্নি, যাহাতে তাঁহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাঁহারা ব্রহ্মের একাংশরূপে জ্ঞাত হইতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। ইত্যোম্।

* জ্ঞানযোগ, (দশম সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৩৬৮

কবীর বাণী

("তূ সুরত নৈন নিহার" বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

প্রেম-নয়নে বিশ্বপতিরে
দেখ ভাই দেখ চাহি,
বিশ্ব ছাইয়া বিরাজেন তিনি
তাঁর পরে কেহ নাহি।
অন্তর মাঝে বিচার করিয়া
এ কথা বুঝিও তুমি,
এই যে জগৎ তোমারি জগৎ
তোমারি পুণ্যভূমি।

সদ্‌গুরু সাথে মিলনের পর
প্রণয় উঠিবে জাগি,
আপাত-নিত্যে ভেদ কিবা আছে
বুঝাবেন তব লাগি।
বিশ্বাতীতের পরিচয় লভ
তাঁহার আশিস্ মাগি!

এই যে ধরণী সত্য নগরী
কুটিল-শোভন পথ,
চিত্ত সবার ভরিয়া তুলিছে
পুরাইছে মনোরথ!
মরম ইহার যে জন বুঝিল
ফিরিল আপন ধাম,
পথ কোথা তার নাহি ছিল জানা
অপরূপ অভিরাম!

সেথায় বিরাজে অনন্ত সুখ
লীলার নাহিক শেষ,
গ্রহণ-ত্যাগের অবসান ঘটে
না রহে পাওয়ার ক্লেশ।

নির্বাণ পদ অসীম অপার
আনন্দ মূরতি তাঁর,
দিকে দিকে তাহা লভিছে প্রসার
রূপে রূপে একাকার।
বন উপবন কুসুমে কুসুমে
ধরেছে নবীন রূপ,
অমৃত লহরী বহিছে তথায়
অপরূপ অপরূপ!

হংস সেথায় ক্রীড়ায় মগ্ন
অনাহত ধ্বনি বাজে,
রতন ভূষিত দীপ্ত আসনে
মহান্ পুরুষ রাজে।
শত কোটি রবি সে জ্যোতি সমীপে
দীপ্তিবিহীন লাজে।
পথের বীণার সুরঝঙ্কার
বিঁধিছে হৃদয়-মাঝে!
অমৃত-উৎস উৎসারি উঠি
বহিছে পীযূষধারা,
জনম মরণ সে সুধা-সায়রে
উলসে আপন-হারা!
যিনি সৎ মাঝে সবার শ্রেষ্ঠ
'শূন্য' কহিল তাঁরে,
সব সত্যের ভাণ্ডার তিনি
ইহা বুঝিল না—হা রে!
সব তত্ত্বের অতীত রচনা
যাঁহাতে হতেছে গাঁথা,
তিনি যে প্রেম তিনি যে নিত্য
তুলনা তাঁহার কোথা!

সেথায় বিরাজে অনন্ত লোক
যেথায় আমার স্বামী,
নাম তাঁর ভাই নাহি যায় বলা
এ কথা জেনেছি আমি।
গিয়াছেন যিনি সেই দূর দেশে
তিনি জেনেছেন তত্ত্ব,
বচন শ্রবণ দুয়ের অতীত
ইহা বুঝেছেন সত্য!
রূপ ও স্বরূপ নাহি সেথা কিছু
কিছুই যায় না দেখা,
দৈর্ঘ্য প্রস্থ বুঝাব কিরূপে
নাহি আয়তন রেখা।

বল্লভ যারে করিবেন কৃপা
সে লভে অসীম পথ,
জনম মরণ ব্যথিবে না তারে
পুরাবেন মনোরথ!
কহিছে কবীর এ সব তত্ত্ব
মুখে নাহি বলা যায়,
লিখিয়া কিছুই হয় না প্রকাশ—
প্রকাশ করা যে দায়।
মধু আস্বাদি মূকেরা যেমন
কিছু না কহিতে পারে,
কহিছে কবীর এ দশা তেমন
বলিতে হৃদয় হারে!

বাংলার বাউল—সঙ্গীত ও সম্প্রদায়

শ্রীমতী মিনতি দেবী

বাউল সম্প্রদায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সাধক সম্প্রদায়গুলির অন্যতম। এই সম্প্রদায়ে সৃষ্টি-কাহিনী আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া গেলেও বাউল বা সহজভাবের সাধনা অতি পুরাতন এবং বহু শতাব্দী আগে থেকেই এদেশে প্রচলিত। ইতিহাস থেকে জানতে পারি, প্রায় ১২০০ বছর আগে আচার্য লুইপাদ সর্বপ্রথম এই সহজিয়া ধর্মমত প্রচার করেন। বেদোক্ত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির সঙ্গেও বাউলদের সাধনার যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাউল শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি এ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী বহু মতামত শোনা যায়। বাউল সম্প্রদায়ের সাধনা অন্যান্য সাধনপ্রণালী থেকে বহুলাংশে পৃথক্, এমনকি অন্যান্য ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বাউলদের অনেক আচারবিধি শাস্ত্র ও সমাজ বিরোধী বলেও মনে হতে পারে। তাই অনেকে বলেন, 'বাতুল' বা পাগল শব্দটিই বিকৃত হয়ে 'বাউল' রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরই জন্য বোধ হয় বাউল সম্প্রদায়ের অনেকে ক্ষ্যাপা নামেও অভিহিত হন। আবার কারুর মতে, বায়ু+অস্ত্যর্থে ল, এভাবে বাউল শব্দটি নিষ্পন্ন, অর্থাৎ নিজেদের দেহে বায়ু বা যোগশাস্ত্র নির্দেশিত স্নায়বিক শক্তি সঞ্চারের জন্য যাঁরা সাধন করেন, তাঁরাই বাউল।

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি দুটি শাখা বর্তমান, একদল বাউল নামে ও অপর শাখা নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত দলের আদি-প্রবর্তক হচ্ছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং শেষোক্ত দল সৃষ্টি করেন নিত্যানন্দের পুত্র বলভদ্র গোস্বামী। নাথ-সম্প্রদায়ের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ নাঢ় পণ্ডিত ছিলেন শেষোক্ত শাখার একজন অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। নাঢ় পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রী নাঢ়ীর নাম অনুযায়ী তাই এই সম্প্রদায়কে নেড়ানেড়ী বলা হয়।

মহাপ্রভুকে যে কি সূত্রে বাউল নামে অভিহিত করা হয়েছে, ইতিহাস খুঁজলে তার কারণ নির্দেশ করা শক্ত হবে না। প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে মাধবেন্দ্র পুরী নামে জনৈক ভক্তজনের আবির্ভাব ঘটে বাংলা দেশে। তাঁর জীবনকাহিনীর সবিশেষ কিছুই তিনি প্রকাশ করেননি; কেবল এইটুকুই জানা গিয়াছিল, তিনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত পুরী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ও আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত; নির্জন স্থানে তাঁকে প্রায়ই আকুল হয়ে কাঁদতে কিংবা পাগলের মত হাসতে দেখা যেত। তাঁর এই অদ্ভুত স্বভাবের জন্যই লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল বাউল বা বাতুল। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারতেন, এই বাতুলতা তাঁর বাহ্যিক আবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ দেশের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। মাধবেন্দ্রপুরীর দেহাবসনের পর তাঁর শিষ্যেরা অদ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণব এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রামচন্দ্রপুরী এবং ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্য ছিলেন যথাক্রমে উপরিউক্ত দুই শাখার প্রধানতম প্রচারক। অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপকে নিজের ধর্মমতে দীক্ষিত করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও নিমাইকে তিনি স্বমতে আনতে সক্ষম হননি। অবশ্য এর কিছুদিন পরে আপনার ভ্রম উপলব্ধি করে নিমাই স্বেচ্ছায়ই ঈশ্বরপুরীকে নিজের গুরুত্বে বরণ করে নেন; তখন তাঁর নাম হয় ক্ষেপা নিমাই। মাধবেন্দ্রপুরীর বাউল নামের সূত্র ধরেই চৈতন্যদেবকেও বাউল সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এদেশের বাউলেরা তাঁকে নিজেদের আদিগুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিত্যানন্দ গোস্বামীও মহাবাউল নামে পরিচিত।

আগেই বলেছি, বাউলের মত সহজভাবের সাধনা ভারতবর্ষে বহু আগে থেকেই প্রচলিত। এর কারণ, প্রিয়কে দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় করার এই সরল সাধন-প্রণালীর মধ্যে এদেশের মুমুক্ষু জনসাধারণ নিজেদের মনোমত জিনিসটিই খুঁজে পেয়েছিল। তা ছাড়া মধ্যযুগীয় একাধিক সাধক ও সঙ্গীতকার স্বরচিত সুললিত পদ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এই ভাবকে ধর্মপিপাসু নরনারীর অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই তারা একে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। তাই দেখতে পাই, বহু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিবর্তন অগ্রাহ্য করে এরা আজো মানুষের অন্তরে জেগে রয়েছে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও অম্লান গৌরবে। যথার্থ সাম্যভাবই বাউল ধর্মকে আজ এত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাধনপ্রণালী পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় অপেক্ষা বাউলদের বহু পার্থক্য দেখা যায়। প্রতিমাপূজা তীর্থদর্শন ব্রত উপবাস ইত্যাদি কোন কিছুরই তাঁরা প্রয়োজন স্বীকার করেন না। বাউলেরা জাতিভেদও স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, আচণ্ডাল সকলেরই কৃষ্ণপ্রেম-লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাই মহাপ্রভুর উপদেশের মূল কথাই হোল, "আচণ্ডালাদি করিও কৃষ্ণভক্তি দান।" বাউলদের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। মহাপ্রভুও বলে গেছেন, "আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী কিছুই নই, যিনি নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসাগরস্বরূপ, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসানুদাস।" এই-ই হচ্ছে সমস্ত বাউলদের অন্তরের কথা। বাউলদের মধ্যে সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর সাধকই আছেন। তবে সন্ন্যাসগ্রহণকারী বাউলদের সাজপোষাকে সন্ন্যাসীসুলভ কোন স্বল্পতা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বাউলদের ধর্মমতের পরিচয় দিতে হলে বহু পদকর্তার সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে তা সম্ভব

নয়। গানগুলি কেবল ছন্দোবৈচিত্র্যেই নয়, ভাবের গভীরতার দিক্ দিয়েও অপূর্ব। সহজিয়া ভাবের এই সব সাধকেরা তাঁদের সঙ্গীতগুলিতে উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব এমন সরল-ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন, যা শুনলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

নিজের মধ্যে বিশ্বকে উপলব্ধি এবং প্রেমের পথে মনের মানুষের অনুসন্ধান করাই বাউলদের সাধনার মূলমন্ত্র। দেবতার সন্ধানে তাঁরা দেবালয়ে যান না। তাঁদের মতে, যে বিরাট পুরুষ ছড়িয়ে রয়েছেন জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে, একটিমাত্র ক্ষুদ্র আবদ্ধ ঘরে তাঁকে চিন্তা করা সংকীর্ণতারই পরিচয়। এই দেহমন্দিরেই বাস করেন সেই মনের মানুষ এবং হৃদয়-বৃন্দাবনেই তাঁর অবিরাম লীলা-খেলা; তাঁকে খুঁজে পাওয়াই আমাদের জীবনের সার্থকতা। তাই বাউলদের আকুল আবেদন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গানের মধ্যে—

আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যেরে,
হারায়ে যেই মানুষে, তার উদ্দেশ্যে
বেড়াই ঘুরে।
ও যে না জানি কী কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
কুলমান সব গেল রে, তবু না পেলাম তারে'
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে, তাইতে মোরে দেয় না দেখা যে রে।
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস্
কৃপা করে আমায় বলে দে রে।

কঠিন পাষাণঘেরা দেবালয়ে যেমন মনের মানুষের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি নীরস ও নিষ্প্রাণ জগতের মধ্যেও তাঁকে কেউ লাভ করতে পারে না। তাঁকে পেতে হলে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, পাওয়ার আগ্রহে নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার দ্বিধাহীনতা; নতুবা ঘরের কোণে কপট অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিলেও তাঁর আসন টলানো যাবে না। যে মায়া-অঞ্জন আমাদের চক্ষুকে অন্ধ করে রেখেছে, চিরজ্যোতির্ময়ের মায়াস্পর্শে যেই তমসা দূর হয়ে দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হলে তবেই আমাদের সীমায়িত প্রাণে পরিপূর্ণ নির্ভরতার উপলব্ধি করতে পারবো তাঁর সীমাহীন বিরাট রূপকে, তবেই এ জীবন-পাত্র উচ্ছলিত হয়ে উঠবে তাঁর অকৃপণ করুণাধারায়, বাউল কবিও তাই গেয়েছেন

মনের মানুষ কোথায় গেলে পাই, তারে একদিন না দেখলাম ভাই,
আমার সকল চেষ্টা বৃথা হোল, এখন আমি কোথায় যাই ?
ক্ষেপা বলে, ওরে আমার মন, মনের মানুষ মনের মধ্যে কর রে অন্বেষণ,
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সকল ঠাঁই।

গুরুনির্বাচনেও বাউলদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। 'গুরু' কথাটি তাঁরা ব্যক্তিবিশেষকে নির্দেশ করতে ব্যবহার করেন না, শব্দটি তাঁদের কাছে গভীর ও বহুবিস্তৃত অর্থ বহন করে আনে। তাই একাধিক গুরু-নির্বাচনেও তাঁদের বাধা বা আপত্তি নেই। বাউলদের ভাষায় "গুরু করবো শত শত মন্ত্র করব সার; যার সঙ্গে মন মিলিবে দায় দিব তার।" বাউলদের মতে, যাঁর কাছ থেকে কোন জিনিস সামান্য মাত্রও শিক্ষা করা যায়, তিনিই গুরু, সেই হিসেবে সজীব ও নির্জীব পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই মানুষের গুরু; কারণ সকলের কাছ থেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু শিক্ষণীয়

বিষয় আমরা আহরণ করে থাকি। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই আমাদের নমস্য। বাউল এ কথাটাই গানের মাধ্যমে বলেছেন—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?　　তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, ও তোর গুরু অগণন,
ও তোর গুরু সর্বজন।
গুরু রে তোর বরণডালা,　　গুরু রে তোর মরণজ্বালা,
গুরু রে তোর হৃদয়-ব্যথা যে ঝরায় দু'নয়ন॥

মানুষের মাঝে যে অনন্তশক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে চিনে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, মানুষের প্রকৃত পরিচয় আজো আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল; তাই আমাদের ভ্রান্ত মন ঘরের রত্নকে ফেলে রেখে অকারণ ঘুরে মরে বাইরের কোন্ মরীচিকার সন্ধানে, কে জানে! মায়াবদ্ধ মানুষের এই বিড়ম্বনাকে উদ্দেশ্য করেই স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন: 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' বাউলের একাধিক গানেও স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই, যেমন:—

কারে বলবো, কে করবে বা প্রত্যয়
আছে এই মানুষ সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

অথবা,

এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে—
শত মুনিঋষি চারি যুগ যারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,　　সে চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়?
ওযে আলেক মানুষ, তেমনি সদায় আছে আলেকে বাসা।
অচিন দলে বসতি তার,　　দ্বিদল পদ্মে আরাম তার,
আমার ভ্রান্ত হোল মন,　　আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন,
সিরাজ সাঁই বলে, ঘুরবি লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে।

নিশাবসানে সূর্যের উদয় হবেই, এ কথা যতটুকু সত্যি, ভক্তের ডাকে ভগবান্ সাড়া দেবেন, এ কথাও ঠিক সেই পরিমাণেই নিশ্চিত। ভক্তের আকুল আহ্বান তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না; সেই ঐশ্বর্যময় বিশ্বপতি অসীম আশায় তারই পথ চেয়ে রয়েছেন, যে তাঁকে জয় করে নিতে পারবে অকপট প্রেমের মধ্য দিয়ে। বাউল কবি অন্তরের সঙ্গে এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই অপরূপ দৃঢ়তায় তিনি বলতে পেরেছেন—

যদি　আমায় ছাড়া, ওগো রসিক,　　তোমার প্রেমের লীলা চলে
তবে　এখান থেকেই দাও গো বিদায়,　　আমি　বসবো না তা বলে।
হাটের ধুলোয়, মাঠের তাপে　　আমি　চলতে যে আর নারি,
তুমি　প্রেমের দায়ে লবে খুঁজে জানি হৃদবিহারী,
তাই　বসলাম এবার পথে।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্ত থেকে জীবনদীপ নির্বাপিত হবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পরম-কারুণিক পরমপিতা আমাদের রক্ষা করে চলেছেন গভীর মমতায়, পিতৃতুল্য স্নেহে। জীবনচক্রের অন্ধ আবর্তে দিক্‌হারা পথিককে পথনির্দেশের জন্য সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ দীপশিখা হাতে নিদ্রাহীন চোখে

জেগে রয়েছেন ক্লান্তিহীন নিরলসতায়। মৃত্যুর পরেও আমাদের জীবন-পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটবে তাঁরই বাহুদুটির মধ্যে। বাউল কবি তাই পরম নিশ্চয়তায় গাইতে পেরেছেন—

পরাণ আমার স্রোতের দিয়া, আমায় ভাসাইলে কোন ঘাটে?
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরই মালা গো।
সাথের সাথী জ্বালে বাতি, নাইকো কূল কিনারা গো,
দিবারাতি চলে বাতি, জ্বলে সাথে সাথে গো।
অকূল পাড়ি, থামতে নারি, আর যে চলে ধারা,
* * * *
অকূলের কূল গো, দরিয়ার সাগর,
আর কয় বাঁকে, কেমন ডাকে পাইমু গো লাগর?
তোমার কোলে লইবা তুইলে, জুড়াইমু গিয়া,
তোমার কোলে নিঝুম সুখে জুড়াইমু হিয়া।

পরম নির্ভরতার অপরূপ সুর প্রায় প্রতি বাউল গানের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বাউল সঙ্গীতগুলি আমাদের প্রাণে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। সেই জন্যেই এই গানগুলির আবেদন এত মধুর, এত গভীর।

মণি মহেশ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সুদুর্গম শৈব তীর্থ মণি মহেশ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গত ১৯৪১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহর হইতে বাসে ডালহৌসি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে আর একজন পূজ্য সন্ন্যাসী-ভ্রাতা—স্বামী অপূর্বানন্দজী। পাঠানকোট হইতে ডালহৌসী পঞ্চাশ মাইল উচ্চতায় ছয় হাজার পাঁচ শত ফুট। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর গ্রীষ্মনিবাস, সৈনিক বিভাগের একটি অন্যতম কেন্দ্রস্থলও বটে। বিকাল সাড়ে আটটায় ডালহৌসি পৌছিলাম। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য চাম্বা। ডালহৌসী হইতে চাম্বা যাইবার তিনটি রাস্তা আছে। একটি চির (Chir) বাংলা হইয়া বিশ মাইল। দ্বিতীয়টি খজুয়ার হইয়া আঠার মাইল এবং অপরটি একুশ মাইল। মালবাহী ঘোড়া ভাড়া করিয়া আমরা প্রথমোক্ত পথে চলিলাম। নয় মাইল হাঁটিবার পর চির বাংলা। দোকান হইতে কিছু দুধ কিনিয়া আহারপর্ব শেষ করিলাম। রান্না-বান্নার কোনই ব্যবস্থা ছিল না, আর ঘোড়াওয়ালারাও অপেক্ষা করিবে না। চিরবাংলা হইতে কাশ্মীর যাওয়ার একটি পায়েহাঁটা রাস্তা আছে।

ঘোড়াওয়ালা মদ খাইয়া অনেক গোলমাল করিয়াছিল, তাই চাম্বা পৌছিতে আমাদের বেশ দেরি হইয়া গেল, প্রায় সন্ধ্যা। বিভা নদীর পুল অতিক্রম করিয়া চাম্বা শহরে প্রবেশ করিলাম। নদীর পশ্চিম কূলে টোল আফিস ও পূর্ব কূলে প্রকাণ্ড একটি দ্বিতল ধর্মশালা। সামান্য চড়াইয়ের পর

তোরণদ্বার। তাহার পরেই সুবিস্তীর্ণ মাঠ, নাম চৌগাঁও। হিমালয়ের মধ্যে এত বড় মাঠ অতীব বিরল। মাঠের চারিপাশে বাড়ীঘর, দোকানপাট, ডাকবাংলা, ডাকঘর, স্কুল, জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল ও লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ও হোটেল ইত্যাদি। ইহার সামান্য উপরিভাগে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের পাশেই ছয়টি মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত (শিব), পঞ্চমুখশিবলিঙ্গ, গৌরী-শঙ্কর ও লক্ষ্মীদামোদরের নিত্যপূজা ও ভোগারতি হয়। ইহা ছাড়াও শহরে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। প্রধান তোরণদ্বারের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। আমরা পোষ্টাফিসের নিকট স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তিনি বাজারের ধর্মশালায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং যে কয়দিন থাকিব সে কয়দিন তাঁহার বাড়ীতেই 'ভিক্ষা' গ্রহণ করিতে বলিলেন। শিক্ষকমহাশয় রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত।

ব্রিটিশযুগে চাম্বা ছিল হিমালয়স্থিত একটি ছোট করদ রাজ্য। চাম্বা শহর এই রাজ্যের রাজধানী। পূর্বে চল্লিশ মাইল দূরে ভরমুরে এই দেশের রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব নাম ব্রহ্মপুর। খ্রীঃ ৯২০ সালে রাজা সহিল বর্মা চাম্বাতে রাজধানী স্থাপন করেন। চাম্বা অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুটের উপর। চারিদিকেই উচ্চ পর্বতমালা। সেজন্য কোন কোন বৎসর বরফও পড়িয়া থাকে। রাজার রাজকন্যা চম্পাবতী এই স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন বলিয়াই জায়গাটির নাম হয় 'চাম্বা'। ইহা হইতে এরাজ্যেরও ঐ নাম হয়। প্রবাদ এই যে, চম্পাবতী অতিশয় রূপসী, বিদুষী, সতীসাধ্বী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদি আলোচনার নিমিত্ত নিত্য একজন মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিতেন। একদিন পিতা সন্দিগ্ধমনে কন্যার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাত্মার আস্তানায় প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাজা এই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—"কন্যার উপর সন্দেহ করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না।" রাজা ঐ স্থানে প্রিয়তমা কন্যার একটি মন্দির নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি ঐ মন্দিরে চম্পাবতী দেবী-রূপে পূজাদি গ্রহণ করিতেছেন। বৈশাখ মাসে এই মন্দিরে একটি মেলা হয়। আরও একটি প্রবাদ আছে যে, রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পর এই নগরে জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। দূরে একটি প্রস্রবণ হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া নালা কাটিয়া জল আনিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোন কারণবশতঃ ঐ নালায় জল আসিল না। সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণগণ বিধি দিয়াছিলেন যে, রানী অথবা তাঁহার কোন পুত্র এই নালাতে জীবনোৎসর্গ করিলে জল আসিবে। রানী নেনা দেবী সহাস্যবদনে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করায় স্রোতের ধারা নালাতে বহিতে লাগিল। রাজা তথায় একটি মন্দির নির্মাণ করিলেন। চৈত্র মাসের শেষ ভাগে ঐখানে একটি মেলা হয়। সাধারণতঃ রমণী ও শিশুগণ ঐ মেলায় যাইয়া থাকে। পর্বতশিখরে দেবী চামুণ্ডার মন্দির আছে। চাম্বার রাজপরিবার শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রাজা সহিল বর্মা প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পূর্ব রাজধানী ভরমুরে থাকাকালীন একদিন চুরাশী জন সন্ন্যাসী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসিগণ রাজার সেবা ও যত্নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সন্তানলাভের বর প্রদান করিলেন। ইহার পর রাজার দশ পুত্র ও এক কন্যা হয়। এই শুভাশীর্বাদের জন্য তিনি চুরাশীটি মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাই চম্পাবতী। নয়টি পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহের মর্মর প্রস্তর আনিতে যাইয়া বিন্ধ্যগিরিতে দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করে। দশম পুত্র কৃতকার্য

হইয়া বর্তমান লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শেষজীবনে রাজা সহিল বর্মা প্রিয়পুত্র যুগাকরকে রাজকার্যে অভিষিক্ত করিয়া সন্ন্যাসধর্মাবলম্বনে গুরু চর্পটনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন সকাল-বেলা শিক্ষকমহাশয়ের সাহায্যে কুলী এজেন্সী হইতে একটি কুলীর ব্যবস্থা করা হইল। পরে শিক্ষকমহাশয়ের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করিয়া বেলা এগারটায় আমরা মণিমহেশ দর্শনে যাত্রা করিলাম। বিভা নদীর ধারে ধারে চলিয়াছি। চড়াই উৎরাই নাই বলিলেই চলে। পনর মাইল পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় চূড়ী নামক স্থানে আসিলাম। নদীর ধারে একটি শিবমন্দির ও একটি ধর্মশালা আছে। আমরা দোতলার একটি ঘরে আশ্রয় লইলাম। স্থানীয় একজন মাড়োয়ারী দোকানদার পরিতোষপূর্বক 'ভিক্ষা' দিলেন।

পরদিবস (১৪ই সেপ্টেম্বর) নদীর ধারে ধারেই চলিয়াছি। বিশেষ কোন চড়াই উৎরাই নাই। নয় মাইল পথ চলিয়া একটি চটীতে দুপুরের আহারাদি করি। বিশ্রামান্তে আরও ছয় মাইল চলিয়া দুরুংগাটীতে আসা গেল। এখানে একটি দোতলা পাকা বাড়ী আছে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন চৌকীদার নিযুক্ত ছিল। তাহাকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়া দোতলায় 'আসন' করিলাম। দোকান হইতে জিনিসপত্র আনিয়া রান্না করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া আমাদের খুবই গালাগালি করিতে লাগিল এবং আমাদের জিনিসপত্র সব বাহিরে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল। তখন চৌকীদার ও একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিল, "মহাত্মাজী, আপলোগ্ কুছ্ না বলিয়ে, চুপচাপ রহিয়ে।" তাহারা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ যাবৎ খুবই বচসা করিয়া ঠাণ্ডা হইল। ঐ লোকটির ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল, সে নেশা করিয়াছে। যাহা হউক রাত্রিটা বেশ ভালভাবেই কাটিয়াছিল।

তাহার পরদিন (১৫ই সেপ্টেম্বর) ভোর বেলায় যাত্রা করিয়া প্রায় আড়াই মাইল যাওয়ার পর বিভা নদীর পুল অতিক্রম করিলাম। সেতু হইতে খালি নামক গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাইল খাড়া চড়াই। চলিতে বেশ কষ্ট হইয়াছিল। পূর্বে এই রাস্তা নদীর অপর তীরের পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাহাতে প্রায় দশ মাইল বেশী হাঁটিতে হইত। যদিও বর্তমান রাস্তায় চলিতে খুবই কষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে একদিনের পথ বাঁচে। খালি গ্রামটির উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। চড়াই শেষ করিয়া গ্রামে আসিতেই দূরে চিরতুষারের দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। একজন গ্রামবাসীকে ঐ বরফের পাহাড়টা কতদূরে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, উহাই মণিমহেশের পাহাড়—আরও দুইদিনের পথ। আমরা মণিমহেশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম।

খালিগ্রাম হইতে আমরা ভরমুরের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। চড়াইয়ের পর চড়াই, কেবলই চড়াই। আর সমস্ত পথটাই জনমানবশূন্য। ঘন চির গাছের (Pine) জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ চলিয়াছে। ঐ সব গাছের ফাঁক দিয়া সূর্য উঁকি দিতেছেন। বহু নীচে একটি নদী দেখা যাইতেছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর একটি আট নয় বৎসরের ছেলের সঙ্গে দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ভরমুরে যাইবে, তথাকার স্কুলে পড়িবে। তাহার সহিত নানা রকমের আলাপ করিয়া চলিয়াছি। হঠাৎ সে বলিল "মহাত্মাজী পানি পিউঙ্গা।" তাহাকে কমণ্ডলুর জল দিতে গেলে সে বলিল, "য়হ্ তো গন্দা পানি।" জল না খাইয়াই সে চলিতে লাগিল। আমরাও চলিয়াছি। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার ছেলেটি বলিল, "বহুতহী প্যাস্ লগী হ্যায়।" তখন তাহাকে থলে হইতে মিষ্টি দিয়া জলপান করিতে দিলাম। মিষ্টি খাইয়া কমণ্ডলুর জল মুখে দিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "অওর নেহী, ব্যস্।" তাহার

সন্তুষ্টির জন্য আমিও কিছুটা জল পান করিলাম। কিন্তু সে অতি কষ্টে সামান্য একটু মুখে দিয়াছিল। আরও প্রায় এক মাইল চলিয়া একটি গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামে মাত্র চার পাঁচটি পরিবার বাস করে। এক একটি চালাতেই একটি করিয়া পরিবার। এখানেও জল কোথাও দেখিতে পাইলাম না। গ্রামের বাহিরে একটি ডালপালার তৈয়ারী চালা দেখিলাম। তাহাতে একটি মাটির কলসী, কলসীর মুখটি ঢাকা। তার উপর একটি এলুমিনিয়মের গ্লাস আছে। ছেলেটি দূর হইতে উহা দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া ঐ কলসী হইতে খানিকটা জল পান করিল। আমরা ত ইহা দেখিয়াই অবাক্। এখানে কোথা হইতে জল আসিল! ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আঙুল দিয়া দেখাইল, ঐ নীচে নদী। ওখান হইতে গ্রামবাসীরা রোজ জল আনিয়া দৈনন্দিন কাজকর্ম করিয়া থাকে। আর এক কলসী জল পথিকদের জন্য রাখিয়া দেয়। নদীটি গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল নীচে। নিত্য অতটা খাড়া চড়াই ও উতরাই করিয়া রোজকার প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। তাহা হইতে আবার পথিকদের তৃষ্ণা-নিবারণের নিমিত্ত এক কলসী জল রাখা আছে! আরও কিছুক্ষণ চড়াই উতরাই করিয়া বেলা প্রায় একটায় ভরমুরে আসিলাম। ভরমুরের উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট। এখানে তিরাশীটি দেবদেবীর মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে হরিহর শিব, দ্বিতীয় মন্দিরে নৃসিংহদেবের পূজা হয়। এই দুইটি মন্দির প্রায় হাজার বৎসর পূর্বের নির্মিত। পাশেই পার্বতী, মহালক্ষ্মী ও গণেশের মন্দির। বাকী সব শিবের মন্দির। অধিকাংশ শিবের কোনই মন্দির বা আচ্ছাদন ছিল না। প্রায় বার বৎসর হইল মহাত্মা স্বামী জয়কৃষ্ণ গিরিজী নামক জনৈক নাগা সন্ন্যাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐ সব শিবের আচ্ছাদন হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ আছে। এখানে ডাক্তারখানা, পোষ্ট্ আফিস, বনবিভাগের ডাক বাংলো, রাজার তরফ হইতে একটি পাকা ধর্মশালা এবং কয়েকটি দোকানপাট আছে। মণি-মহেশে যাত্রার সময় যাত্রীদের বিশেষতঃ সাধু মহাত্মাদের থাকিবার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। এই কারণে নাগা মহাত্মাজী জন-সাধারণের কল্যাণের জন্য ঐ সব মন্দির করিয়াছেন। জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না দেখিয়া তিনি প্রায় দুই মাইল দূরে একটি প্রস্রবণ হইতে নল সহযোগে জল আনিয়া জনসাধারণের ও যাত্রীদের খুবই উপকার করিয়াছেন। তিনি জুনা আখড়ার একজন মহাত্মা। তাঁহার বিছানাপত্রের ও পোষাক-পরিচ্ছদের কোনই আড়ম্বর নাই। খুবই তিতিক্ষা-পরায়ণ সাধু। বিছানার মধ্যে একটি ছোট চাটাই আর পোষাকের মধ্যে কৌপীন ও একটি বহির্বাস। নিকটেই কয়েকটি পাহাড়ী পরিবার বাস করিতেছে। এখানে বেশ ঠাণ্ডা, দূরে পর্বত-শিখরে বরফের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। নাগাজীকে দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদের সহিত অতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

নাগাজী বলিলেন, পনর দিন পূর্বে যাত্রা শেষ শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে দর্শনের কোনই অসুবিধা হইবে না। একটু ঠাণ্ডা বেশী হইবে। কথিত আছে যে, যখন কাশ্মীর মুসলমানদের অধিকৃত হয় তখন অমরনাথ তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এই পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং মণি-মহেশ নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হয় মণি-মহেশ। এ সব অঞ্চলের লোকেরা কৈলাস বলিয়া থাকে। এখানে জন্মাষ্টমীতে যাত্রা আরম্ভ হয় আর রাধাষ্টমীতে শেষ হয়। জন্মাষ্টমীতে যাত্রীরা হ্রদে স্নান করিয়া থাকে। আর রাধাষ্টমীতে চাম্বা হইতে ছড়ি যায়। সেই সময় বহু যাত্রী ও গদ্দিদের সমাবেশ

হয়। সকলেই হ্রদের চারি পারে তাঁবু খাটাইয়া সারারাত্রি ভজনাদি করিয়া কাটায়। প্রত্যেক তাঁবুর সম্মুখে ধুনী জ্বালাইয়া থাকে। পরদিন স্নান ও পূজাদি করে। আর গদ্দিরা হাজার হাজার ভেড়া বলিদান দিয়া থাকে। এ অঞ্চলের যাহারা ভেড়া চড়ায় তাহারা কেবল কৌপীন ও একটি লম্বা গরম জামা ব্যবহার করে। আর কোমরে একটি একশত বিশ হাত লম্বা ভেড়ার কাল লোমের আধ ইঞ্চি মোটা রশি জড়ান আছে। ইহাকেই গদ্দি বলে। ইহা হইতে তাহাদের নাম হয় 'গদ্দি'।

ভরমুর হইতে মণি-মহেশ কুড়ি মাইল। দশ মাইল পরে একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম হর্ষির। ওখানে মণি-মহেশের পাণ্ডাদের বাস। এই দশ মাইলের মধ্যে আর কোন লোকালয় নাই। তার পরের দশ মাইল একেবারে জনপ্রাণীশূন্য। পাঁচ মাইল পরে ধনশৌড়ে; ওখানে কেবল একটি ধর্মশালা আছে। যাত্রীরা ঐখানেই রাত্রিবাস করিয়া থাকে। এই বিশ মাইলের মধ্যে কোথাও চাউল, আটা, ডাল কিছুই পাওয়া যায় না, সবই এখান হইতে লইতে হয়।

পরদিন (১৬ই) ভোরবেলা হর্ষিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। নাগাজী একজন অতিরিক্ত কুলী দিয়াছিলেন। চাম্বা হইতে ভরমুর পর্যন্ত ঘোড়া যাতায়াত করিতে পারে। ভরমুরের পর সাধারণতঃ ঘোড়া যাতায়াত করে না, কারণ রাস্তা ক্রমেই দুর্গম হইতে দুর্গমতর। বেলা প্রায় বারটায় আমরা হর্ষির গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামের মোড়লের সহিত দেখা হইবার পর সে গ্রামের বাহিরের একটি ছোট কুঠিয়াতে আমাদের থাকিতে বলিল। আরও দুই তিনটী কুঠিয়া আছে। কুঠিয়াগুলি লম্বা চওড়ায় প্রায় সমান। একটি লোকের হাত পা ছড়াইয়া শুইতে কুলায় না। কুঠিয়াটির মাঝখানে ধুনী জ্বালিবার একটী গর্ত আছে। গর্তের দুই পাশে আমরা দুইজনে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে কুলী আসিল। তখন দিনমণির আর দেখা নাই। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট। নিকটবর্তী পাহাড়গুলির চূড়া বরফে ঢাকা।

মোড়ল বলিল, এই গ্রামে তাহারা চল্লিশ ঘর ব্রাহ্মণ আছে। সকলেই মণি-মহেশের পূজারী। রাজা জায়গীর দিয়াছেন। এইরূপ আদেশ আছে যে, প্রত্যেক যাত্রীদলের সঙ্গে একজন পূজারী যাইবে। সে পথ-প্রদর্শকের ও পূজারীর দুই কাজই করিবে। কিন্তু তাহাদের নিকট কিছু চাহিতে পারিবে না। অবশ্য যাত্রীরা সকলেই কিছু কিছু দিয়া থাকে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে পাণ্ডাদের অত্যাচার নাই। তাহারা হাট, বাজার, শহর ও বর্তমানকালের সভ্যতা হইতে দূরে থাকিয়া যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছে। কোন্ ঘর হইতে পূজারী যাত্রীদলের সঙ্গে যাইবে তাহা মোড়ল ঠিক করিয়া দিবে। ইচ্ছামত কেহ যাইতে পারিবে না। সেইজন্য মোড়লকে সকলেই মান দিয়া থাকে। আমাদের সঙ্গেও একজন পূজারীকে দিতে হইবে। যাহাদের পালা ছিল তাহাদের ডাকা হইল। একটি লোক আসিল, বয়স সাতাশ কি আটাশ হইবে, কানে খাটো, এবং কথা বলিতে পারে না। তাহার আরও দুই ভাই আছে, তাহারা অন্যত্র কোথায় গিয়াছে। অতএব ইহাকেই আমাদের লইতে হইবে কারণ এই পরিবারেরই পালা পড়িয়াছে। এমন নয় যে, ইহাকে বাদ দিয়া অন্য পরিবারের লোক যাইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কোন উপায় নাই। আমরাও কোন আপত্তি করিলাম না। মোড়ল হাতের ইসারায় তাহাকে সব বুঝাইয়া দিল। সেও মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন (১৭ই) সকালে আমরা দুইজন, কুলী দুইটি ও পূজারী এই পাঁচজন যাত্রা করিলাম। মণি-মহেশের পাহাড় হইতে অমর গঙ্গা নামে একটি

পাহাড়ী ছোট নদী বাহির হইয়া বিভা নদীতে পড়িয়াছে। আমরা অমর গঙ্গার ধারে ধারে চড়াই করিতে করিতে চলিয়াছি। এই রাস্তা পূর্বদিনের চেয়েও অনেকগুণে খারাপ। পাহাড়ীদের পক্ষে ইহাই রাস্তা। আমাদের পক্ষে ইহাকে রাস্তা বলিয়া নাম দেওয়া যায় না। পনর দিন পূর্বে যাত্রা-উপলক্ষ্যে যাত্রীদের যাতায়াতের দরুণ একটি পথের চিহ্ন আছে বলিয়া মনে হয়। নচেৎ পথই খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। এমনকি পথ হারাইবার খুবই সম্ভাবনা। সারা পথটিতে আমরা এই কয়জন ব্যতীত আর কোন প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায়—আছে মাত্র অমর গঙ্গার হরহর ধ্বনি। ধীরে ধীরে চলিয়াছি, দুই দিকেই উঁচু উঁচু পাহাড় ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত। এইভাবে চলিয়া বেলা এগারটায় পাঁচমাইল দূরে ধনশৌড়ে আসিলাম। এখানে সরকার যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি দোতলা ধর্মশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কারণ হর্ষির হইতে মণিমহেশ পর্যন্ত এই দশ মাইলেব মধ্যে কোন লোকালয় নাই। একদিনে এই দশ মাইল যাইয়া পূজা ও দর্শনান্তে ফিরিয়া আসা খুবই কষ্টকর। ধর্মশালা হওয়াতে যাত্রীরা প্রথম দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া দ্বিতীয় দিন দর্শনাদির পর হর্ষিরে ফিরিয়া আসে। এই স্থানটি খোলা ময়দানের মত। আকাশ পরিষ্কার, বেশ রোদ। আমরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া রৌদ্রে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। চারিদিকের পর্বতশিখরে ধবধবে তুষার রাশির উপর সূর্য কিরণ পতিত হইয়া চক্‌মক্ করিতেছে। অধিকাংশ পাহাড়ের শিরোভাগ গাছপালাশূন্য। এই স্থানটির উচ্চতা এগার হাজার পাঁচ শত ফুট। আহারান্তে বিশ্রামের পর দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যদেব মেঘের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে বেশ জোর এক পশলা বৃষ্টি হইল। ঠাণ্ডার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। জামা কম্বল যাহা ছিল সবই জড়াইলাম। তাহাতেও নিস্তার নাই। এদিকে প্রকৃতি শান্ত হইল। চারিদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমরাও কিছু খাইয়া রাত্রির মত নিদ্রাদেবীর শরণ লইলাম।

পরদিন (১৮ই) ভোরবেলায় দেখিলাম, যে সকল পাহাড়ের মাথায় বরফ ছিল না, সেই সকল পাহাড়েও বরফ পড়িয়া আছে। বেলা সাতটায় আমরা দুইজন, একটি কুলী ও পূজারী এই চারজনে মণিমহেশ-দর্শনে যাত্রা করি। চাম্বার কুলীটি আমাদের সঙ্গে কিছু খাবার ও কাপড়-গামছা লইয়া চলিল। অপর কুলীটিকে আমাদের জিনিস-পত্র সব পাহারা দিতে ও রান্না করিয়া রাখিতে বলিলাম। এই কুলীটি পূর্বে দর্শন করিয়াছে। কিন্তু চাম্বার কুলীটি কখনও আসে নাই। আজও আমরা ছাড়া অন্য কেহ নাই। পূজারী পথপ্রদর্শক হইলেও কোন জবাব পাইবার উপায় নাই। কাজেই মণিমহেশই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক! রাস্তা পূর্বদিন হইতে অধিকতর খারাপ। কোন কোন স্থানে অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতে হইতেছিল। প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা। এক জায়গায় আলগা পাথরের সিঁড়ি। কোন পাথর এক ফুট উঁচু, কোন পাথর নয় ইঞ্চি। আবার কোন পাথর পনর ইঞ্চি চওড়া, কোথাও বা এক ফুট। সিঁড়ি-গুলি লম্বাতে দুই ফুট, এক একটি আড়াই ফুটও আছে। সামঞ্জস্য নাই বলিলেই হয়। আবার কোন কোন পাথর নড়ে। ডানদিকে অমর গঙ্গা দ্রুতগতিতে বহিয়া যাইতেছে। কোন প্রকারে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিলাম। প্রায় পঞ্চাশের উপর সিঁড়ি হইবে। আবার কিছুক্ষণ চড়াইয়ের পর পাহাড়ের উপর আসিয়া পথের বামদিকে একটি ছোট কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। ইহার নাম গৌরীকুণ্ড। নীল রঙের পরিষ্কার জল। এক মাইল দূরে ডালবা হ্রদ। সম্মুখেই মণিমহেশ পর্বত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ধর্মশালা হইতে দুই মাইল

পর্যন্ত কিছু কিছু গাছপালা দেখিয়াছিলাম। তারপর সবই গাছপালাশূন্য নগ্ন পাহাড়। যাত্রীদের কেহ কেহ এই গৌরীকুণ্ডেও স্নান করিয়া থাকে। পাহাড়ীরা সাধারণতঃ হর্ষির হইতে খালি পায়ে দর্শনে আসিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের রীতি। যদিও কেহ জুতাসহ আসে তাহা হইলে এই স্থানে উহা ছাড়িয়া যাইতে হয়। আমাদের কুলীটিও এই স্থানেই জুতা রাখিল। পূজারী খালি পায়েই আসিয়াছিল। আমরা মণিমহেশকে প্রণাম করিলাম। বাকী এক মাইল পথ পূর্বেকার তুলনায় সমতল বলিলেই হয়। ডালের দক্ষিণদিকে আসিয়া পাথরের উপর বসিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।

আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি শনিবার। এই হ্রদেই স্নান করিতে হয়। ইহাকেই 'ডাল' বলিয়া থাকে। ইহার চারিধারের জলের উপর স্বচ্ছ কাচের মত বরফ ভাসিতেছে। নির্মল আকাশ, বেশ রোদ। একটু বিশ্রামান্তে বরফ ভাঙ্গিয়া স্নান করিলাম। নিকটেই একটি মর্মর পাথরের চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ। জনৈক শেঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাত্রিগণ এই শিবকে মণি-মহেশের উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া থাকে। উন্মুক্ত আকাশই শিবের আচ্ছাদন। আমরাও শিবের পূজা করিলাম। আনীত গোমুখীর জল, চন্দনমাখান বেলপাতা, সুগন্ধি ধূপ ও আতর উৎসর্গ করিয়া কিছু পাহাড়ী ফুল তুলিয়া অঞ্জলি দিলাম। রুটি ও গুড়ও নিবেদন করিলাম। পরে আমরা চা তৈয়ার করিয়া শিবের প্রসাদ পাইলাম। পাত্রের অভাবে ছিপি বা কমণ্ডলুতেই চা তৈয়ার করা হইল। এই ছিপি সামুদ্রিক নারিকেলের মালা হইতে তৈয়ার হয়। সাধু মহাত্মাগণ ধাতুনির্মিত কমণ্ডলু ব্যবহার না করিয়া ইহাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন শত ফুট ও প্রস্থে আড়াই শত ফুট হইবে। চারিধারেই কাঠ কয়লা ও ভেড়ার শিং দেখিতে পাইলাম। রাধাষ্টমীর পূর্বদিন রাত্রে যাত্রিগণ ধুনী জ্বালিয়া তাঁবুতে বাস করিয়াছিল। ঐ সব ধুনীর কাঠ কয়লা পড়িয়া আছে। আর গদ্দিরা মণিমহেশের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার ভেড়া বলিদান করিয়াছিল। সেই সব ভেড়ার শিং দেখিতে পাওয়া গেল। ধুনীর কাঠ পাঁচ মাইল নীচে ধর্মশালার নিকট হইতে আনিয়াছিল। এই ডালের উচ্চতা প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট।

সম্মুখে অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত মণি-মহেশ পর্বত দণ্ডায়মান। চতুর্দিকের পর্বতশ্রেণীও বরফে আচ্ছাদিত। সূর্যরশ্মি ঐ চিরতুষারের উপর পতিত হওয়ায় উহার ছটাতে চোখ যেন ঝলসাইয়া গেল। আর ঐ প্রতিফলিত প্রভায় চারিদিক এক দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতি শান্ত ও ধীর স্থির। সাড়া শব্দ নাই, গাছপালা নাই, জনপ্রাণী নাই, আছে কেবল শীত আর শীত। তপনদেব ইহার নিকট হার মানিয়াছিলেন। আবার ডালের স্বচ্ছ সলিলের তরঙ্গমালার সহিত মণি-মহেশের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিতেছে। হ্রদে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্ফুটিত পুষ্পসকল আনন্দে বিভোর হইয়া যেন মণি-মহেশের মহিমা কীর্তন করিতেছে। মনে হইল ইহাই সেই অমরাপুরী। এই আবহাওয়ায় মানবের মনকে ইহ জগতের কথা একেবারে বিস্মরণ করাইয়া কোন্ এক অজানা দেশে লইয়া যায়। কিছুকালের নিমিত্ত এই প্রাকৃতিক অপূর্ব শোভা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মণি-মহেশ পর্বতশিখরের উচ্চতা আঠার হাজার ফুট।

প্রায় রোজই এই স্থানে বৈকাল বেলায় বৃষ্টি বা বরফ পড়িয়া থাকে। মণি-মহেশকে শেষ প্রণামান্তে আমরা বেলা বারটায় যাত্রা করিয়া দেড়টায় ধর্মশালায় ফিরিয়া আসি। দেখিলাম তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মণি-মহেশ-দর্শনে ডালহৌসী হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা ধর্মশালার পাশেই তাঁবু

খাটাইয়া আছেন। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া আহার করিলাম। কিছুক্ষণ পরে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই হর্ষিরে আসি ও রাত্রি যাপন করি। পরদিন ভরমুরে আসিয়া নাগাজীর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে একদিন থাকিতে হইল। পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বর মহালয়া ও সূর্যগ্রহণ। গ্রহণ-উপলক্ষ্যে একটি কুণ্ডতে স্নান করি। পরদিন ছুরুংগাটিতে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া চুড়ীতে রাত্ত কাটাই। দোকান-দারের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেলা এগারটায় একটি জায়গায় আহারের ব্যবস্থা হইল। এখান হইতে চাম্বা আরও ছয় মাইল। এই চটীতে একটিমাত্র দোকান ও পাশের ছোট ঘরটিতে যাত্রীরা বিশ্রাম করিয়া থাকে। দোকান হইতে ধান্য মিশ্রিত মোটা চাউল কিনিলাম। আর কিছুই পাওয়া গেল না। ভাল চাউলের কথা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বলিল, এই চাউল আমাদের রাজা খাইয়া থাকেন। সঙ্গে এক মুঠা ভাজা মুগ ডাল ও একটি আলু ছিল। অগত্যা উহাতেই আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যার পূর্বেই চাম্বাতে আসিয়া বাজারের ধর্মশালায় উঠিলাম এবং শিক্ষকমহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। পরদিন মন্দিরাদি দর্শন করি এবং শহরটি বেড়াইয়া দেখি। এ দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই আমিষভোজী। এমনকি নিরামিষভোজী দের জন্য একটিও হোটেল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই শহরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। দুপুরে আহারান্তে দুইটি কুলীসহ ডালহৌসী অভিমুখে যাত্রা করিয়া নয় মাইল চড়াইয়ের পর সন্ধ্যায় খজুয়ারে আসি। এইখানে একটি ডাক বাংলা, একটি শিবমন্দির, দুইটি দোকান ও একটি পুরাতন দোতলা ধর্মশালা আছে। মন্দিরে ও নাটমন্দিরে কাঠের নানা রকম কারুকার্য আছে। আমরা সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া ধর্মশালার দোতলায় রাত্রি যাপন করিলাম। ধর্মশালার সম্মুখেই একটি হ্রদ। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি হইয়া গিয়াছে। উহাতেই 'গল্‌ফ্ কোর্ট' করিয়াছে। আর বাকী অংশে সামান্য জল আছে। পরদিন নয় মাইল পথ চলিয়া বেলা দশটায় ডালহৌসীতে আসি। এই নয় মাইলের মধ্যে প্রথম ছয় মাইল চড়াই, বাকী তিন মাইল সমতল ও সামান্য উতরাই। বারটার সময় বাস ছাড়িবে। নিকটবর্তী একটি হিন্দুস্থানী পানের দোকানদার হোটেলের মত সাত আটজন লোককে খাওয়াইতেছে। আমরাও খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দোকানদার বলিল, 'হ্যাঁ দুই জনের হইয়া যাইবে, তবে চার আনা হিসাবে পয়সা দিতে হইবে।' আমরা তাহাতেই রাজী হইলাম। দুইটি থালায় বাঁসমতী চাউলের ভাত, অড়হরের ডাল ও দুই রকম তরকারি সাজাইয়া দিয়াছিল। আমরাও বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে মণি-মহেশের যাত্রার কথা হইয়াছিল। পরে দোকানদার পয়সা গ্রহণ না করিয়া বলিল, 'আপলোগ্ মহাত্মা হ্যাঁয়, অওর মণি-মহেশ দর্শন করকে আয়ে। আপলোগোঁকো খিলাকে ম্যাঁয় তো ধন্য হো গয়া।' বারটায় বাস ছাড়িয়া চারটায় পাঠানকোটে পৌছিলাম।

"নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ—

(৯।৭।১৮৯৭ তারিখে লিখিত একটি পত্র হইতে)

প্রথম বারিপাতে

(৫ঠা জ্যৈষ্ঠ—১৩৬২ বঙ্গাব্দ)

শ্রীশান্তিময় ঘোষ

এলে ভরসার ভৃঙ্গার ভরি অমৃত ঢলঢল
প্রথম বরষা স্নিগ্ধ সরসা— মরু-চোখে ভরা জল।
এলে বহ্নির তপ্ত বক্ষে
অশ্রু সে যেন শুষ্ক চক্ষে
অনলে শীতলি সলিল-সখ্যে
সরসিয়া ধরাতল।
এলে আনন্দ অমিয়-ক্ষরণ
দহন-দলন হে দুখ-হরণ
বহু প্রার্থিত পুলক পরম
মরা গাঙ্গে ঝরা ঢল।

তৃষিত নদীর শুকান হৃদির তটে ফিরে এলে প্রাণ,
দূর্বাদলের মোছা শ্যামলিমা অধরে বাঁচার গান
জাগিল তোমার প্রথম পরশে
ঝলসান চোখে মুগ্ধ দরশে
চাহিল ঊর্ধ্বে,—আঁখিকোণে খসে'
পড়িল অশ্রু ম্লান।
বল্লরী-বুকে কচি কিশলয়
বাঁচিল, নাচিল হসিত হৃদয়,
হাসিল কুসুম করি মধুময়
সুরভি সুধায় স্নান।

তুমি সে প্রাণের পদ্মে পরাগ,—তৃষায় তড়াগ-নীর,
তোমার বিহনে বিপুল দহনে শেষ হয় সব শ্রীর।
নিতি সৃষ্টির কৃত্রিমতায়
মানুষ নিয়ত শত সুখ চায়,
তোমার বিহনে সকলি শুকায়
আনন্দ অবনীর।
তাই তোমা বরি হে প্রথম দান—
হে প্রথম বারি-বিন্দু মহান্
এই বরষের,—লহ সম্মান!—
এস আরও ঢালি নীর।

পুণ্যস্মৃতি

(২৯৬ পৃষ্ঠার পর)

দুঃখ কোথায় ভাসিয়া গেল! তাঁহার উৎসাহে মন আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। নির্ধারিত দিনে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া কাশী রওনা হইলাম।

কাশীতে পৌঁছিয়া যখন সেবাশ্রমে প্রথম ঢুকিলাম, মনে হইল—আমরা ভুল করিয়া কি কোন সাহেবদের বাগানে ঢুকিয়াছি? এমনই পরিপাটি ও ফিটফাট সব কিছু। রাস্তা লাল সুরকি দিয়া ঢাকা, কোথায়ও একটু ময়লা বা ছেঁড়া কাগজ বা শুকনা গাছের পাতা নাই। বাড়ীগুলি সুন্দর রং করা। আশ্রমে ঢুকিলেই যেন মন পবিত্রতায় ভরিয়া উঠে! কোথায়ও কোন গোলমাল নাই, আর সব কিছুই—বৃক্ষলতা পর্যন্ত যেন আনন্দে ধ্যানে মগ্ন। কাশীতে যে কয়দিন ছিলাম পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিলাম।

মঠের জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমরা নানা দর্শনীয় স্থান ও নানা মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। বেশ মনে আছে একটি বাগানে নির্জন স্থানে একজন প্রাচীন সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি গাছে ঝুলান একখানা তক্তার উপর বসিয়া থাকিতেন এবং মৌনী ছিলেন। আমরা গেলে হাত দিয়া নীচে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্তি এখনও বেশ মনে আছে। পরে জানিয়াছিলাম এঁর নাম শ্রীচামেলী পুরী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরু শ্রীতোতাপুরীর গুরুভাই। শ্রীশ্রীমা যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন চামেলী পুরীকে দর্শন করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। সত্যই সাধুমহারাজগণ তপস্যা দ্বারা ৺কাশীর বায়ু পর্যন্ত পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ৺দুর্গাপূজার ছুটি কাটিয়া গেল, আবার আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া ৺কাশীর সকল গল্প বলিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মানব জীবন ধন্য করিবার জন্য অনেকেই তখন শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট যাতায়াত করিতেন। দেখিতাম কেহ বহুদিন কার্য-সিদ্ধির জন্য যাতায়াত করিতেন, আবার কেহ বা ২।৪ দিন যাতায়াত করিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইতেন। আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ সহজেই কৃপালাভ করিতেছে দেখিয়া আমারও মনে দীক্ষা লইবার বাসনা জাগিল। কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শন কিংবা তাঁহার শ্রীমুখের দু'একটি কথা শ্রবণেই মন আনন্দে এত ভরিয়া থাকিত যে দীক্ষা লইবার কথা অনেক সময় মনেই পড়িত না। আবার এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইলে পরে মনে কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া কখন কখন মন বেশ চঞ্চল হইত।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে তাঁহাকে সবাই একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনও এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে তাঁহার কাছে ডাকিলেন এবং আমার গায়ের জামা খুলিয়া শরীর দেখাইতে বলিলেন। জামা খুলিবার পর আমার শরীরের চারিদিক তিনি দেখিলেন এবং তাঁহার সামনেই মাটিতে বসিতে বলিলেন এবং আমাকে সকালে ও সন্ধ্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীভগবানের একটি বিশেষ রূপ চিন্তা করিতে ও নাম মনে জপ করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে আমি মা-বাপের প্রথম সন্তান হওয়ায় তাঁহারা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করিবেন এবং আমি যদি তাঁহাদের আশা পূর্ণ করি তাহাতেই ধর্ম হইবে—সংসার-ত্যাগ করিলেই যে ধর্ম হইবে এমন কোন কথা নাই। আমি তখন বলিতে গেলে ছেলেমানুষ। ভাবিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দিলেন না তখন আমি নিশ্চয়ই উপযুক্ত আধার নই। এই চিন্তা আমাকে অভিভূত করিল।

কিন্তু বলরাম মন্দিরের দোতালা হইতে নীচে নামিবার সময় বোধ হইতে লাগিল আমার সমস্ত শরীর পালকের মত হাল্কা এবং আমি যেন শূন্যে চলিতেছি। অল্প সময়ের মধ্যেই সদর রাস্তায় নামিলাম কিন্তু তখনও আমার সেই অবস্থা। শ্রীশ্রীমহারাজের বর্ণিত শ্রীভগবানের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি যেন আমার সামনে দেখিতে লাগিলাম। এইভাবে সেদিন তো গেলই, পরে আরও কিছুদিন চলিল। মন সর্বদাই কোন্ এক রাজ্যে যেন উঠিয়া থাকিত। দৈনন্দিন কাজ করিতে কষ্ট হইত। আবার ইহাও ভাবিতাম যে, শ্রীশ্রীমহারাজ যখন কৃপা করিলেন না তখন আমি যে অযোগ্য আধার সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আবার মনে হইত শ্রীশ্রীমহারাজ যে বলিতেন, সবাই সব সময়ে কৃপা প্রার্থনা করে কিন্তু কৃপা করিলে কি তাহা ধারণ করিতে পারে! গোষ্পদে সমুদ্র ধারণ করা কি সম্ভব? এই দ্বন্দ্বময় চিন্তা আমায় এমন পাইয়া বসিল যে আমার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি যেন একেবারেই লোপ পাইল।

বহুদিন পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় দীক্ষিত হইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল এবং কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আর এক সন্তানের শ্রীচরণে বসিয়া অন্তরের আবেদন জানাইলাম, কারণ শ্রীশ্রীমহারাজ তখন ইহজগতের লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজের যে কৃপালাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিবার কথা মনে আসিল না। শুভদিনে যখন কৃপালাভ করিলাম, দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম যে শ্রীশ্রীমহারাজ যে নাম ও রূপের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন এখন তাহাই পুনরায় পাইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে শয্যাসংখ্যা ৫টি বাড়াইয়া ১৪০টি (৪৪টি স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্ধারিত) করা হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে ১৩৫টি শয্যা ছিল। অস্ত্রোপচার-বিভাগে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা রোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধি লক্ষণীয়। কর্কটরোগ (Cancer) চিকিৎসার জন্য একটি নূতন ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে। অন্তর্বিভাগীয় মোট ৩১৮০ জন রোগীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২৬৯৮ এবং নারী ও শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১০২৫ ও ২৫৭। বহির্বিভাগের ছয়টি অংশ: (১) পুরুষ-সাধারণের জন্য, (২) স্ত্রীলোক ও শিশু সাধারণের জন্য, (৩) দন্তরোগ, (৪) চক্ষুরোগ, (৫) কর্ণনাসিকা ও গলরোগ, (৬) যৌনরোগ। আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগে সর্বসমেত ২,৩০,২২২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ফিজিওথেরাপি (Physiotherapy) বিভাগ আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-সরঞ্জামে সুসজ্জিত করাতে বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎপ্রবাহ-চিকিৎসা রোগীদিগের সুলভ হইয়াছে। এই বিভাগে মোট ৪৯০৫ জন চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ১৯৬ জনের রেডিয়াম চিকিৎসা, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে মলমূত্ররক্তথুথুপ্রভৃতির ৭২৬২টি নমুনা পরীক্ষা ও রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) বিভাগে ১৩০৯টি (অন্তর্বিভাগীয়-৫৫৯) পরীক্ষা করা হয়। ১৯২১ সালে স্থাপিত এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি ব্রহ্মদেশস্থিত ভারতীয়, পাকিস্তানী, বর্মী, অ্যাঙ্গলোবর্মী ও অন্যদেশীয় হিন্দুমুসলিমবৌদ্ধখ্রীষ্টান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ২৪শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রথমদিন সকালে পূজা ও হোমে বহুসংখ্যক ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় 'কামারপুকুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা' সবাক্ চিত্রটি দেখানো হয়। ঐ চিত্রের ভারতীয় পরিবেশ আমেরিকান ভক্তেরা বিশেষভাবে উপভোগ করেন। দ্বিতীয় দিন কেন্দ্রের উপাসনালয়ে স্বামী নিখিলানন্দজী 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সমাগত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। রাত্রে স্বামী নিখিলানন্দজীর সাম্প্রতিক ভারতভ্রমণ বিষয়ক একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই কেন্দ্রের আমেরিকান ভক্ত ও বন্ধুমণ্ডলী উহাতে কাশ্মীর, নূতন দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, এলাহাবাদ, বারাণসী বেলুড় মঠ, ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ, কাঞ্চি, মাদুরা, ত্রিবিন্দ্রম, কন্যাকুমারী, অজন্তা ও ইলোরা, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর, হরিদ্বার, মায়াবতী, বৃন্দাবন, আগ্রা এবং পরিশেষে কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর দৃশ্যাবলী ও জীবন-ধারার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় লাভে বিপুল তৃপ্তি অনুভব করেন। এই চলচ্চিত্রটি দেখানো আরম্ভ হইবার পূর্বে মিসেস্ এলিজাবেথ ডেভিডসন ও কাউন্টেস্ কোলোরেডো ম্যান্‌স্‌ফিল্ড (ইঁহারা স্বামী নিখিলানন্দজীর সহিত ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন) সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারতীয় বন্ধুগণের গভীর আতিথেয়তা এবং এই ভ্রমণের ফলে তাঁহাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সার্থকতার বিষয় বিশেষ আবেগের সহিত উল্লেখ করেন।

কালাডি (ত্রিবাঙ্কুর)-তে অনুষ্ঠান—বিগত ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৫ (১০ই বৈশাখ) হইতে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি কালাডিতে পাঁচদিন-ব্যাপী আচার্য শ্রীশঙ্কর ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী যুক্তভাবে আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত

হইয়াছে। ডক্টর পি জে টমাস, পি-এইচ.-ডি উৎসবের উদ্বোধন করেন; উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন শঙ্করাচার্য শুধু অসাধারণ হিন্দু দার্শনিকই নহেন, তিনি ছিলেন কেরল সংস্কৃতির আদর্শ মূর্তবিগ্রহ। দ্বিতীয় দিন হরিজন-সম্মেলনে সভাপতি হন দেবসোম-সঙ্ঘের শ্রী পি এন্ মাধবন্। বিশিষ্ট বক্তাগণ হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় একটি মহিলা-সম্মেলন হয়। শ্রীমতী টি সি কচুকুট্টি আম্মা ভারতীয় নারীজাতির বৈশিষ্ট্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে সত্য ও পবিত্রতা বিষয়ে জোর দেন। অন্যান্য বক্তা জননী সারদাদেবীর ভাবাদর্শগ্রহণের বর্তমান প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলেন। তৃতীয় দিন শঙ্কর-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মূল শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ হইতে এবং বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার অংশ বিশেষ অবলম্বনে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন কর্তৃক ব্যাখ্যা ও ভাষণাদি সারাদিন ধরিয়া চলে। সর্ব ভারতীয় ত্রিবিন্দ্রম বেতারকেন্দ্র ঐগুলি প্রচার করেন। চতুর্থ দিন (২৭শে এপ্রিল) হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জগতে ধর্মের অবদান অপরিসীম; মানব-ইতিহাসে বিজ্ঞানের মহত্তম আবিষ্ক্রিয়ার চেয়েও তাহার শক্তি ও প্রভাব অনেক বেশি। ধর্ম কতকগুলি আচার বা আচরণমাত্র নয়—অনুভূতিতেই উহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয়। তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বিভিন্ন ধর্মের মূল্য ও অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করিতে আবেদন জানান। জনাব সেখ পরীদ ইসলাম-সংস্কৃতি এবং মাননীয় ফাদার আলেকজান্দ্রিয়োজ খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষদিন ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন আচার্য শঙ্করকে হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক হিসাবে যে স্থান ও মর্যাদা দেওয়া উচিত, বর্তমানে তাহা আমরা দিই না। সর্বোচ্চ দর্শন ও চিন্তাধারা যে কোন সমাজ বা যে কোন ধর্মেরই হোক উহা সমস্ত বিশ্ববাসীর পরম সম্পদ্। মন্ত্রী মহোদয় শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে পরিচালিত কালাডি মহাবিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন। কালাডি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আগমানন্দ শঙ্কর কলেজের প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সকলের সমবেত সহায়তা প্রার্থনা করেন।

এই উৎসবের দিনগুলিতে যথারীতি পূজা, আরতি, ও ভজন, এবং রাত্রে কেরলের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়—গত ৩০শে বৈশাখ (১৪ই মে) পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের নব-নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে যে জনসভা হয় তাহাতে পাঁচশতাধিক স্থানীয় গণ্যমান্য লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। এই নূতন বাড়ীটির জন্য কিঞ্চিদধিক বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯০৯৫৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই চিকিৎসালয় হইতে দৈনিক গড়ে ১০০ রোগী ঔষধ লইয়া থাকে। চিকিৎসালয়টি দিন দিন জনপ্রিয় হইতেছে।

কাশ্মীরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব—গত ১৫ই মে, ১৯৫৫ (৩১শে বৈশাখ) শ্রীনগর (কাশ্মীর) রামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উৎসবের শুভারম্ভ হয়। শ্রীনগরের প্রেমসঙ্গীত-নিকেতনের ছাত্রবৃন্দ ভজন-গান গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর

আনন্দ দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবাদর্শ অবলম্বনে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ বিমল মুনিজী মহারাজ (জৈন সাধু), পীর হিস্‌সামুদ্দীন, শ্রীনগর এস্ পি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজিয়ালাল কাউল, শ্রীমতী উমা রাজদান, (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল), শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কাচরু, শ্রীমতী রাজওয়াধ্ ওয়া, শ্রীওমেন্দ্র গাঞ্জু এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীকিলাম তাঁহার সুললিত অভিভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' ও সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবধারাটি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন। সভায় স্থানীয় বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

জয়রামবাটীতে অনুষ্ঠান—গত ১১ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্র জন্মভূমিতে শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে পুষ্প, পতাকা ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত শ্রীশ্রীমায়ের পট, লইয়া সঙ্গীত সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম, শ্রীশ্রীগীতা এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। রামকৃষ্ণমিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ভক্তনরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। বৈকালে স্বামী মহেশ্বরানন্দ মহারাজের পরিচালনায় একটি সভায় শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী ভবেশানন্দ এবং স্বামী অচিন্ত্যানন্দ। ঐ রাত্রিতে এবং পরবর্তী রাত্রেও যাত্রাভিনয় সমাগত অতিথি এবং গ্রামবাসিবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছিল।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জন্মোৎসব—বাগেরহাট (খুলনা) কেন্দ্রে এই উৎসব পরিচালিত হয় ১৮ই চৈত্র। বিশেষপূজা হোম, ভজনকীর্তন এবং দুহাজার নরনারীকে প্রসাদ-বিতরণ ব্যতীত দুইদিন রামায়ণ গান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ তিন দিন ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উৎসবদিনে জনসভায় ভাষণাদিতে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবহারজীবী শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস এবং শ্রীভূপেশ চন্দ্র আইচ।

মৈমনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবার ২৪শে চৈত্র হইতে ১৬ দিন-ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। আনুষ্ঠানিক পূজাদি, ভগবৎ-সঙ্গীত, শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা, পালাকীর্তন এবং শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, উৎসব-সূচীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। ২৫শে চৈত্র ৬ হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়া এবং ২ হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। পূর্বপাকিস্তানে বিবিধ সেবা ও প্রচারকার্যরত শ্রীরাম-কৃষ্ণ মিশনের তিনজন সন্ন্যাসী—স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ ও স্বামী শর্মানন্দ উৎসবে যোগ দিয়া এবং উহার নানা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া স্থানীয় জনগণকে প্রভূত পরিতৃপ্তি দান করিয়াছেন। এই উৎসবেরই পরিবিস্তাররূপে কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল শহরে কয়েকটি ছায়াচিত্র-বক্তৃতার (বক্তা—স্বামী প্রণবাত্মানন্দ) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ঢাকা জেলার পল্লীশাখাকেন্দ্র বালিয়াটি শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠে ৫ই, ৬ই এবং ৭ই জ্যৈষ্ঠ এই তিনদিন উৎসব হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভজন-সঙ্গীত, বিশেষপূজা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ এবং বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী

ও উপদেশের আলোচনা উৎসবের কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল।

পুরীর চক্রতীর্থস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১০ই বৈশাখ সকাল হইতে বিশেষপূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন-কীর্তন ও সমবেত ভক্ত নরনারী এবং দরিদ্র-নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ-বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে স্বামী অন্নদানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। ১৭ই বৈশাখ রবিবার, একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়।

সোনার গাঁ (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বিগত ৬ই এবং ৭ই জ্যৈষ্ঠ যথাক্রমে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর ত্রিনবতিতম এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিংশাধিকশততম শুভ জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে উভয় দিবসেই প্রাতে নগর-কীর্তন, মধ্যাহ্নে বিশেষ-পূজা, হোম ও ভোগ-নিবেদনান্তে প্রসাদবিতরণ এবং অপরাহ্ণে জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্রাধিক নরনারী জাতি-ধর্মনির্বিশেষে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিবিধ কার্যে যোগদান করিয়া উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রথম দিনের জনসভায় নেতৃত্ব করিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব এম-এ, পি-এইচ্-ডি.। দ্বিতীয় দিনের সভা পরিচালিত হইয়াছিল বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী কর্তৃক। বিভিন্ন বক্তা ছিলেন—ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ, পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী দেব, নারায়ণগঞ্জের আইনব্যবসায়ী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেব এবং আমিনপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মোঃ আমিনুদ্দিন আহম্মদ।

রাঁচি রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম উৎসব-সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২০তম জন্মোৎসবের অঙ্গস্বরূপে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে) স্থানীয় দুর্গামন্দির-প্রাঙ্গণে এক সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই বৎসর একটি রচনা-প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ২২শে মে সন্ধ্যায় দুর্গামন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক মহতী জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দজী। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী। ইঁহারা দুই-জন ব্যতীত পণ্ডিত ভবভূতি মিশ্র ও শ্রীতারাকুমার ঘোষ ঠাকুরের সমন্বয়বাদ ও মাতৃসাধনা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্বামী সুন্দরানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভারম্ভে ও সমাপ্তিতে অনুষ্ঠান-উপযোগী ধর্ম-সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিহার সঙ্গীত শিক্ষাভবনের শিল্পিগণ।

টাকী (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রম উৎসবের আয়োজন করেন ২৯শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত। বিভিন্ন সভা, পাঠ এবং ধর্মা-লোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং শ্রীস্মরজিৎ দত্ত। স্থানীয় তিনটি ব্যায়াম-সমিতির ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন, তরুণগণ কর্তৃক 'স্বাস্থ্য ও সংগ্রাম' নাটিকা এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের 'সিদ্ধার্থ' নাটিকাভিনয় সর্ব-জনোপভোগ্য হইয়াছিল। সুগায়ক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ময়নাডালের মিত্রঠাকুর-সম্প্রদায় ভজন ও কীর্তন দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে (প্রায় পাঁচ হাজার) পরিতৃপ্ত করেন। উৎসবের শেষ দিন চারি সহস্রাধিক নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

প্রাচ্য বাণী-মন্দির—বিগত ১৬ই বৈশাখ, (৩০শে এপ্রিল, '৫৫) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্না লাল বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাচ্য বাণীমন্দিরের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন সুসমাপ্ত হইয়াছে। প্রাচ্য বাণীমন্দিরের সভাপতি ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন টোল ও প্রকাশন বিভাগে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং কলিকাতা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রাচ্য-বাণীমন্দিরের যুগ্মসম্পাদিকা ও লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃতশিক্ষা পরিষৎকে অবিলম্বে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীতে উন্নীত করিয়া সংস্কৃতশিক্ষাসংপ্রসারণের প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া তোলার জন্য জনসাধারণ ও বঙ্গীয় সরকারের নিকট আবেদন জানান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও পশ্চিম-বঙ্গ সংস্কৃতশিক্ষা পরিষদের সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, আলোচ্য বৎসরে রাঁচিতে একটি প্রাচ্য বাণীর শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসরে প্রাচ্যবাণী হইতে ১২০ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিগত বৎসরে দশখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে দারাশুকোহ-কৃত সংস্কৃতগ্রন্থ 'সমুদ্র-সঙ্গমে'র বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ইংরেজী অনুবাদ সহ সর্বপ্রথম সংস্করণ, ভারতীয় মধ্যযুগে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারবিষয়ক তথ্যসংবলিত খান-খানান-আব্দার রহিমের সংস্কৃত কাব্যাবলী, চার্বাক-দর্শন, সনাতন গোস্বামীর মেঘদূত টীকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যবাণী কর্তৃক সংগৃহীত পাঁচ হাজার হস্তলিখিত পুঁথির যথাযথ সংরক্ষণ একটি সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। সভান্তে মহাকবি ভাসের 'অভিষেক' নাটক সংস্কৃতে অভিনীত হয়।

পরলোকে প্রাচীন ভক্ত—শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর মন্ত্রশিষ্য অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রেসিডেন্সী পোষ্টমাষ্টার শ্রীঅমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে, ১৯৫৫) পূর্বাহ্নে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বালিগঞ্জস্থ বাসভবনে সজ্ঞানে ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। খৃঃ ১৯০৮ সালে তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ২য় ভাগে ১৮শ সংখ্যক বেনামী স্মৃতিকথাটি তাঁহারই লিখিত। কর্মব্যপদেশে অমূল্য বাবুকে বিভিন্ন সময়ে শিলং, ঢাকা, কুচবিহার, মালদহ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানেই বন্ধু-বান্ধব ও ভক্তদের লইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারার আলোচনা ও প্রচার এবং উৎসবাদির আয়োজন করিতেন। জগদম্বার চির-শান্তিময় ক্রোড়ে প্রাচীন ভক্তের বিদেহ আত্মা শাশ্বত বিশ্রাম লাভ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

জনাই গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বার্ষিকী—হুগলী জেলার জনাই গ্রামে গত ছয় বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়াছে। উৎসবের দিন ধার্য হইয়াছিল ২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল) রবিবার। পূর্বদিন উৎসব মণ্ডপে 'প্রেমিক-স্মৃতি-সঙ্ঘ' এবং অন্যান্য অনেকে মিলিয়া কালীকীর্তন দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন করেন।

রে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত শ্রীকাশীনাথ ঘোষাল শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা পাঠ ও কীর্তন করিয়া সকলকে আনন্দ দেন। উৎসবের দিন উষার আলোকের সঙ্গে গ্রামের কিশোর ও কিশোরীদল সিংহাসনে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্কন্ধে বহন করিয়া সুমধুর কীর্তনগানের সহিত শোভাযাত্রায় বাহির হয়। মালীপাড়া নিবাসী 'কচি'বাবুর বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে এবং তৎসংলগ্ন ঠাকুর দালানে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। 'কচি' বাবুর সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত উদার ও সুন্দর মনের ভাবের দ্বারা তাঁহার 'কচি' নাম সার্থক। সকাল টার পর পূজা আরম্ভ হয়। জনাই ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের বহুলোক—এমনকি যাঁহাদিগকে কখনও ধর্মকথা বলিতে বা শুনিতে দেখা যায় নাই তাঁহারাও পূজামণ্ডপে আসিয়া পূজা দেখিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীমার চরণাশ্রিত ভক্ত শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীরেণুপদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন। সন্ধ্যারতির পর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসে। শ্রীনিতাই বন্দ্যোপাধ্যায়, পককেশ বৃদ্ধ প্রবীণ সুর-রসিক সঙ্গীতাচার্য শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয়চাঁদ ভটাচার্য এবং ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জনৈক ত্যাগব্রতী কর্মী এই উৎসবে যোগদান করিয়া গ্রামবাসিগণকে প্রভূত উৎসাহ ও তৃপ্তি দিয়া গিয়াছেন।

কুমিল্লায় অনুষ্ঠান—কুমিল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব এবং বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন বিগত ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ) হইতে ১১ই চৈত্র (২০শে মার্চ) দিবস-চতুষ্টয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অসীমানন্দজী কয়েকদিন পূর্ব হইতেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া সেবকদের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করেন। তিনি প্রতিদিন সায়াহ্নে ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও আলোচনা দ্বারা ভক্তদের তৃপ্তিদান করিতে থাকেন। প্রথম দিন বিকালে আশ্রমপ্রাঙ্গণে অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ মহোদয় শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন। ২৩শে মার্চ বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ সদলবলে ঢাকা হইতে কুমিল্লা আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমনে ভক্তমণ্ডলী ও সেবকদের প্রাণে বিপুল উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। উৎসবের তৃতীয় দিন (২৪শে মার্চ) ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দিন বিকাল ৫ ঘটিকায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। আশ্রমের বিরাট প্রাঙ্গণ ভক্তজনসমাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতি পূজ্যপাদ মহারাজজী তাঁহার সুললিত কণ্ঠে বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে অর্ধ ঘণ্টাধিক কাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে একটি ভাষণ দান করেন। সম্মেলনে অন্যান্য বক্তা ছিলেন স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ (ছায়াচিত্রযোগে)। রাত্রে স্থানীয় 'উদয়ন সঙ্ঘ' কর্তৃক 'ঋণমুক্তি' আখ্যায়িকা অবলম্বনে যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ দিন (২৫শে মার্চ) আশ্রমে সমস্ত দিবস ব্যাপী উৎসবানন্দ চলে। বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীলীলা-কীর্তন এবং বেলা ২ ঘটিকায় মহোৎসবের প্রসাদ বিতরণ চলিতে থাকে। এই বৎসর প্রসাদের বৈশিষ্ট্য খিচুড়ির পরিবর্তে অন্ন-ব্যঞ্জনের' ব্যবস্থা। রাত্রি ৮ ঘটিকায় উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

আগরতলা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (গান্ধাইল রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা) এই উৎসব পৌষ মাসের শেষে পাঁচদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রাচীন ভারতের মহীয়সী রমণীগণের কীর্তিকাহিনী পরিজ্ঞাপক একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জিলা-শাসকের পত্নী শ্রীমতী রামুন্নি। একটি মহিলাসভায় বক্তৃতার অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী পারুল হালদার (সভানেত্রী), শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুনীতি ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী শ্যামলা দেবী। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর প্রতিকৃতিসহ সহস্রাধিক ছাত্রী ও মহিলাদের একটি শোভাযাত্রা সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। আর একটি মহিলা-সভার পরিচালনা করেন অধ্যাপিকা নীরা চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপিকা মঞ্জুলা ঘোষ, শ্রীমতী রাণীবালা সেন ও শ্রীমতী শ্যামলা দেবী মায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক্ হৃদয়গ্রাহীভাবে আলোচনা করেন। শিশুদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা এবং একদিন সকালে ২৮ জন কুমারীকে বিবিধ উপচারে দেবী-বুদ্ধিতে পূজা উৎসবের অপর দুইটি হৃদয়াকর্ষক কর্মসূচী ছিল। অন্য একদিন দশ সহস্র নরনারীকে মায়ের প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসি-ত্রয়—স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী শিবরামানন্দ এই উৎসবে যোগ এবং ভাষণাদি দিয়া জনসাধারণের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন। স্বামী চণ্ডিকানন্দ একদিনকার একটি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ ধর, অধ্যাপক হিমাংশু গাঙ্গুলী, অধ্যাপক আম্বার প্রভৃতি ঐ সভায় বক্তৃতা দেন।

পঞ্চখণ্ড (শ্রীহট্ট জেলা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী স্মরণে, গত ২৮শে মাঘ হইতে ১লা ফাল্গুন পর্যন্ত দিবসত্রয় ভজন, কীর্তন, শোভাযাত্রা, চণ্ডীপাঠ, মহিলা ও পুরুষদের সভা, কবিগান ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে বিরাট উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা একটি দর্শনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ ও শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অটলানন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া জনসাধারণের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন।

বসিরহাট (২৪ পরগণা) মিলনী সিনেমা হলে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি মহতী সভা গত ২৯শে ফাল্গুন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী পূর্ণানন্দের প্রাঞ্জল ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করে। শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীগোকুলকৃষ্ণ আচার্যও সভায় মায়ের কথা আলোচনা করেন। স্বামী পূর্ণানন্দ স্থানীয় দুইটি বালিকা-বিদ্যালয়ে ও বসিরহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বেলিয়াতোড় (বাঁকুড়া) গ্রামে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব বিশেষ উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত ৮ই মাঘ হইতে তিন দিন ধরিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। পূজা হোমাদি, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, মহিলাসভা, ব্যায়াম, প্রদর্শন, রামায়ণ-গান, বাজীপোড়ান ও যাত্রাভিনয় উৎসবের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। একদিন প্রায় ১০।১২ হাজার নরনারী সুশৃঙ্খলভাবে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন। গ্রামের চতুর্দিকস্থ প্রায় ৪০ খানি গ্রাম এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে; অন্যূন ৫০ হাজার দর্শক উজ্জ্বল পূজামণ্ডপে মাতৃমূর্তি দর্শন করিয়া ধন্য হন। বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, জেলাশাসক ও শ্রী এম্, এ, টি, আয়েঙ্গার ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রামের ইতিহাসে এই শতবর্ষজয়ন্তী একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

উদ্বোধন

সাধু কে?

সন্তস্ত এব যে লোকে পরদুঃখবিদারণাঃ।
আর্তানামার্তিনাশার্থং প্রাণা যেষাং তৃণোপমাঃ।
তৈরিয়ং ধার্যতে ভূমির্নরৈঃ পরহিতোদ্যতৈঃ॥

মনসো যৎ সুখং নিত্যং স স্বর্গো নরকোঽপরম্।
তস্মাৎ পরসুখেনৈব সাধবঃ সুখিনঃ সদা॥

বরং নিরয়পাতোঽত্র বরং প্রাণবিয়োজনম্।
ন পুনঃ ক্ষণমার্তানামার্তিনাশমৃতে সুখম্॥

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৬১।৩৩-৩৫

যাঁহারা রোগ-শোক-বিপদে মুহ্যমান জনগণের আর্তি দূর করিবার জন্য নিজের প্রাণকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, সেই পরদুঃখমোচনশীল ব্যক্তিরাই যথার্থ সাধু। অপরের হিতসাধনে উদ্‌যোগী সেই মহাত্মারাই তো এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছেন।

নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি মন হইতে চলিয়া গেলে চিত্তে উদিত হয় এক অপরিসীম নির্মল সুখ। উহাই স্বর্গ। আর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় মনের যে বিরামহীন চাঞ্চল্য উহারই নাম নরক। সেই জন্যই সাধুগণ নিজের সুখের কথা না ভাবিয়া সর্বদা অন্যের সুখেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

[যিনি সাধু তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত হয় আর্তের সেবায়। আপনার জন্য তাঁহার ভাবিবার, করিবার কিছু নাই। তিনি বলেন,] ব্যথিতের কষ্ট যদি লাঘব করিতে না পারিলাম তো বাঁচিয়া সুখ কি? বরং প্রাণবিয়োগ হউক, নরকে পতিত হই সেও ভাল, তবুও 'নিজের জন্য জীবন-ধারণ'—এমন কলঙ্ক বহন করিয়া জগতে একমুহূর্তও থাকিতে চাই না।

কথাপ্রসঙ্গে

জনগণের শ্রীরামকৃষ্ণ

শহরের কল-কারখানা, আফিস-আদালত, দোকানপাট, ছায়াচিত্রের মায়া, হাসপাতাল, ক্লাব, কলেজ, এমনকি বড় রকমের একটা ইস্কুল হইতেও দূরে, একান্তই একটি পাড়াগাঁয়ের প্রান্তরে তিন সহস্র লোকের সম্মিলন। আশেপাশের অনেকগুলি গ্রাম হইতে তাহারা আসিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উপলক্ষ্যে। মজা দেখিতে আসে নাই, ধর্ম-মেলা জানিয়াই আসিয়াছে। মুখে চোখে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে চালচলনে একটা শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা লক্ষ্য করা কঠিন নয়। তিন সহস্রের প্রায় সকলেই কৃষাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাদের নিকট কি মূর্তিতে আসিয়াছেন? যাহাকে আমারা 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' বলি এই তিন সহস্র 'অশিক্ষিতে'র তো তাহা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন্ বাণী ইহাদের নিকট প্রচার করিব? অথবা করিব না? শুধু তাহাদিগকে খিচুড়ি খাওয়াইয়া, 'জয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জয়'—জয়ধ্বনি উচ্চারণ করাইয়া, তাহাদের পর্ণ কুটিরের পাশ দিয়া গ্রাম্যপথে শোভাযাত্রার সঙ্কীর্তন শুনাইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিব? আর, ভাবিব ইহার বেশী আর শ্রীরামকৃষ্ণকে কি বুঝিবে এই গঁওয়ার-ভূঁইয়ার দল—কি বুঝিবে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সাধনা, তাঁহার কাব্যিক উপমা, তাঁহার সমন্বয়ী দর্শন, তাঁহার বেদবেদান্তের তাৎপর্যনির্ণয়, তাঁহার বিশ্বভ্রাতৃত্ব? যাহারা ক্ষেতে লাঙ্গল লাগায়, মাটি কাটে, ইঁটের পাঁজা সাজায়, মোট বয়, নৌকা চালায়, মাছ ধরে, তাহাদের নিকট কোন্ শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলিয়া ধরিব?

শ্রীরামকৃষ্ণ কি জনগণের? এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা মনে পড়ে। তিনি অপরদেশের শ্রমজীবীদের সহিত ভারতীয় শ্রমিকের তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"লৌকিক বিদ্যার অভাব বাদ দিলে অপর সব বিষয়ে ইউরোপের তুলনায় ভারতের জনসাধারণ অনেক বেশী সভ্য।"

"ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি বা যে কোন দেশের একজন চাষাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, তুমি কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত? সে আপনাকে বলিয়া দিবে, সে উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীলদলভুক্ত, সে কাহার জন্যই বা ভোট দিবে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলিবে, আমি আর কিছু জানি না, গির্জায় গিয়া থাকি মাত্র! বড় জোর সে বলিবে, আমার পিতা খ্রীষ্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত!

অপর দিকে একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, সে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানে কি না; সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া 'হাঁ' করিয়া থাকিবে।......তাহাকে কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার ধর্ম কি? সে আপনার কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দু একটি কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি।"

আমরা 'শিক্ষিত' শব্দের যে অর্থ করি, 'সংস্কৃতি' বলিতে যাহা বুঝি, এই গ্রামবাসীরা সেই অর্থে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্ নয় সত্য, কিন্তু তথাপি ধর্মবীরগণের জীবন-মর্ম ইহারা তথাকথিত শিক্ষিত-গণের অপেক্ষা বেশীই বুঝিতে পারিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সংসারের ভোগসুখ, বিদ্যা-মান-বিভব না চাহিয়া মা কালীর দর্শনের জন্য পাগল হইলেন, এই ঘটনা লেখাপড়া-জানা বাবুদের তুলনায় তাহারা অনেক সহজভাবে মানিয়া লইতে পারিবে। তাহারা যে শিশুকাল হইতে ঠাকুরমা-দিদিমার কোলে বসিয়া শুনিয়া আসিয়াছে ধ্রুবের গল্প, প্রহ্লাদের গল্প, ভগবানের নামে উন্মাদ-হওয়া অনেক আউল-আউলীদের কাহিনী। ভগবানকে যে দেখা যায়, তাঁহাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে, শক্তিরূপে, আনন্দরূপে পাওয়া যায় এ বিশ্বাস তাহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎসাধনা ও সিদ্ধিলাভের কথা তাহারা তাই ভালরূপেই বুঝিতে

পারিবে, বুঝিয়া খুশী হইবে, উপকৃত হইবে। প্রাচীন কালের উপকথা এইকালে নূতন করিয়া সত্য-সত্যই ঘটিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারা বল পাইবে, প্রেরণা পাইবে—কালিকলমের প্রেরণা নয়, স্থির বিশ্বাসের, স্নিগ্ধ ভক্তির জীবন-দায়ী প্রেরণা।

সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক কথা নয়। উহা সনাতন হিন্দুধর্মের বহু-বিঘোষিত সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশের জনসাধারণকে সমন্বয়ের শিক্ষা বুঝাইতে অনেক যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পর পর নানা মতে সাধনা করিয়া যে সমন্বয়ের সত্য নিজ জীবনে প্রকট করিয়াছিলেন ঐ কাহিনী পল্লীবাসীদের বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। ঐ কাহিনী শুনিলে তাহাদের নিকট সমন্বয় একটি তত্ত্বমাত্র না থাকিয়া প্রাত্যহিক জীবনের একটি বলবান্ অভ্যাসে পরিণত হইবে, কেননা জীবন দেখিয়াই জীবন জাগিয়া উঠে। যাঁহারা শহরে থাকেন আধ্যাত্মিক বিচারের দিক দিয়া না হউক, সভ্যতার লেনদেনেই তাঁহাদিগের জাতিভেদ উঠিয়া যায়, সকল ধর্মের, সকল মতের লোকের সহিত শেক্ হ্যাণ্ড করিতে, খানাপিনা করিতে, একত্র চলিতে, বসিতে, এমনকি বৈবাহিক যোগাযোগও বাধাইয়া দিতে তাঁহারা বাধ্য হন। তাঁহাদের কোন সংস্কার নাই, তাই কুসংস্কারও নাই; ধর্ম লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় নাই, তাই ধর্মবিবাদও বিশেষ নাই। ধর্মসমন্বয়ের উপদেশ তাঁহাদিগকে না বলিলেও চলে। কিন্তু পল্লীগ্রামে ভিন্ন কথা। 'অসংস্কৃত' গ্রামীণরা ধর্মকে এখনও 'আধুনিকতা'-ঝাণ্ডার বাতাসে উড়াইয়া দিতে পারে নাই—যত কুসংস্কারের চাপেই হউক তাহারা এখনও তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিতেছে, হরি-লুটের বাতাসা কুড়াইতেছে, আষাঢ় মাসে রথের দড়ি টানিতেছে, পাঁচ দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শিবরাত্রির মেলায় হাজির হইতেছে। পল্লীগ্রামে ধর্ম আছে, বহু প্রকার মত আছে, তাই বিবাদের সম্ভাবনাও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-কথা পল্লীবাসীকে শুনাইতে পারিলে সেই সম্ভাবনা কমিবে, গ্রামীণ সমাজের সংহতি বাড়িবে।

ত্যাগের কথা আজকাল সুশিক্ষিতদের কাছে বলা মুস্কিল। 'বাবু' সংস্কৃতি পালিস করা ছাড়া কোন জিনিসকে গ্রহণ করিতে নারাজ। ত্যাগ-বৈরাগ্যকেও তাই অনেক মসৃণ করিয়া, অনেক বার্নিস মাখাইয়া আজকাল সংস্কৃতি-মান্দের কাছে ধরিতে হয়। পল্লীগ্রামে এত পালিসের বালাই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের আপস-হীন বৈরাগ্যের কথা নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচেই তিন হাজার চাষীর কাছে বলা চলিবে। হাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীই ছিলেন, পুরাপুরি সন্ন্যাসী—ভগবানকে একমাত্র সার জানিয়া ভারতবর্ষের অজস্র পথে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া-বেড়ানো করঙ্ক-কন্থা-ধারী শত শত গৃহছাড়া ফকীর-বৈরাগীদের মতোই। হাঁ, তিনি জগৎকে মিথ্যাই জানিতেন, বলিতেন। হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,—"হৃদু, জগৎ যদি সত্য হত তোদের কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ নগ্নভাবেই কৃষক-শ্রমিকদের বলা চলিবে। মিষ্টার অমুক তমুকের মন রাখিতে উহার উপর একটা আরাম-জনক 'বাবু-দর্শনের' প্রলেপ মাখাইতে হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত প্রধান প্রধান উপদেশগুলির প্রত্যেকটিই একটা না একটা কাহিনীর সহিত জড়িত—তাঁহার নিজের জীবনে-ঘটা কাহিনী। তাঁহার 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' রূপ বর্তমানকালের সেবাধর্মের মহা-প্রেরণাদায়ী শিক্ষাটি যে ঘটনাগুলির*

* তিনটি যথা:—(১) তীর্থযাত্রাকালে দেওঘরে দরিদ্র গ্রামবাসীদের দুঃখে কাতর হইয়া ধনী মথুরকে উহাদিগের সেবাতে নিয়োগ (২) 'জীবে দয়া'—এই প্রাচীন উপদেশ শুনিয়া স্বগতোক্তি ও উহার কালোপযোগী রূপান্তর-নির্দেশ (৩) সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছুক নরেন্দ্রনাথকে জগদ্ধিতায় আত্মনিয়োগে প্রেরণা দান; (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়; দিব্যভাব, ৯ম অধ্যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট যথাক্রমে দ্রষ্টব্য)।

মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে কিতাবগত বিদ্যার অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হৃদয়ের স্বচ্ছতা। যে উপদেশ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সজীব উহা হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়। 'অশিক্ষিত' জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ উপদেশই বেশী কার্যকরী।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী জনগণের পক্ষে দুর্বোধ্য নয়, যদি না আমরা আমাদের পাণ্ডিত্য দিয়া, কাব্যালঙ্কার দিয়া উহাকে 'পোষাকী' না করিয়া তুলি। 'পোষাক' দেখিলে গঁওয়ার-ভূঁইয়ারা দূরে সরিয়া যাইবে। বলিবে—"ইহা তো 'বাবু'দের, আমাদের জন্যে নয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে লইয়াও যদি এই ধরনের শ্রেণী-বিভাগ গড়িয়া উঠে তাহা হইলে আফশোষ রাখিব কোথায়?

জনগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করিবার সময় আমরা যেন তাঁহার জয়ধ্বনি দিবার জন্য ব্যস্ত না হই। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি নাম নয়—উহা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৎসরের ধর্মসাধনার একটা ঘনীভূত ভাব। সেই ভাবটিই জনগণের কাছে করিতে হইবে তাহাদের শোনা, জানা ধারণার মধ্য দিয়া, রামায়ণের, মহাভারতের, পুরাণের মধ্য দিয়া, প্রাচীন সাধক-সাধিকাদের জীবন-কাহিনীর মধ্য দিয়া। প্রাচীনকেই তাহারা নূতন করিয়া দেখিতে শিখুক, নূতনের ভারে তাহাদিগকে বিব্রত না-ই করিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য জনগণকে 'রামকৃষ্ণ-ভজা' করা নয়, 'রামকৃষ্ণ-মজা' করা—নামবিহীন রামকৃষ্ণের ভাব-রূপ জীবনমর্মে উপলব্ধিমান করানো।

ভবিষ্যতের ধর্ম

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে, ১৯৫৫) ব্যাঙ্গালোরে 'বিশ্ব-ধর্মানুশীলন সংস্থা' (Union for the Study of the Great Religions) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন।

"মানুষের ভঙ্গুর ও সদা-পরিবর্তনশীল জীবনে যে চিন্তাধারা ও আদর্শ-নিষ্ঠা যথার্থ তাৎপর্য ও মূল্য আনে তাহাই ধর্ম; অতএব ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তির বেশী দরকার হয় না। ধর্ম চাই, কি চাই না ইহা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন—কি ধরনের ধর্ম চাই? প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, অথবা ক্ষমতা ও বিদ্বেষের ধর্ম?"

এখনও বহুক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে অসহিষ্ণুতা, এক-দেশিতা, দম্ভ, প্রবলভাবে বিদ্যমান। ঐগুলি যে সক্রিয়ভাবে পরিহার করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, আজিকার মানবসমাজ যে দুহাজার বৎসর আগেকার সঙ্কীর্ণবুদ্ধি লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না, টিকিলেও উহা যে জগতে সর্বজনীন শান্তি-প্রতিষ্ঠার অনুকূল হইবে না—ইহা কোন কোন ধর্মাবলম্বীদের মাথায় আসে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের অন্তিম বক্তৃতার শেষের লাইনগুলি মনে পড়ে:—"যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইয়া তাঁহার ধর্মই শুধু বাঁচিয়া থাকিবে তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। তাঁহার জন্য আমি দুঃখবোধ করি। তাঁহাকে আমি স্পষ্ট শুনাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহার মতো লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর ইহাই লেখা থাকিবে—'বিবাদ করিও না, পরস্পর সহায়তা কর; পরস্পরকে বিনাশের চেষ্টা না করিয়া একে অন্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর; কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।'" ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ এই কথাই পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

"একতা, পারস্পরিক সমাদর এবং মিলন না বাড়াইয়া যে ধর্মসমূহ বিভেদ, বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে উহারা ধর্মবিদ্বেষীদের হাতে পড়িয়া ধর্মশক্তিকেই ব্যাহত করে।..... সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যা এবং ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি এখনও বন্ধ না হয় তাহা হইলে জড়বাদের ক্রমবর্ধমান অনিষ্টকে ঠেকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে।"

ধর্মের শাশ্বত সর্বজনীন রূপটিই বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। অনেক সময়ে ধর্মের মূল সত্যটির দিকে দৃষ্টি না দিয়া আমরা অবান্তর কতকগুলি আচার ও বিশ্বাসকেই ধর্ম বলিয়া মনে করি এবং ধর্মকে গালি দিই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ সতর্ক করিয়া দিতেছেন—

"ধর্ম মানে কোন ভোজবাজি, ডাকিনী-বৃত্তি বা ঝাড়-ফুঁক নয়। ধর্ম কোন অন্ধবিশ্বাসও নয়। কতকগুলি কালোনুপযুক্ত পুরাতন মতবাদ এবং অযৌক্তিক কুসংস্কারের সহিত ধর্মকে গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়। এগুলি তো ধর্মের ঘোর বাধা—যাহা আধ্যাত্মিক জীবনের সহজতাকে নষ্ট করিয়া দেয়।"

আজ সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহ ঘটনা-পরম্পরার অপরিহার্যতা হেতু বিশ্ব-সংযোগের কথা ভাবিতে বাধ্য হইতেছে। জাগতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সংযোগ উত্তরোত্তর রূপ লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ আধ্যাত্মিক মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"জগদ্বাসীর মৈত্রীবন্ধন যদি স্থায়ী করিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে মনস্তাত্ত্বিক একতা ও আধ্যাত্মিক সাম্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

ধর্মের শাশ্বত সত্য যুগে যুগে অপরিবর্তনীয় থাকে, কিন্তু উহার আনুষ্ঠানিক দিক, মতবাদ প্রভৃতিকে কালের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হয়। যে ধর্ম ইহা পারে না সে দুর্বল হইয়া যায়। সমসাময়িক ঘটনা বা ভাবধারাকে ভয় করিলে চলিবে না। উহাদিগের চ্যালেঞ্জ ধর্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই ধর্মের 'স্বাস্থ্য' ও 'উন্নতি' অব্যাহত থাকিবে। রাধাকৃষ্ণন্ বলিতেছেন—

"সমাজে কি কি শক্তি কি ভাবে ক্রিয়া করিতেছে ধর্মসমূহের যদি সেদিকে হুঁস না থাকে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সৃজনক্ষম আচরণ করিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উহাদের নির্জীব হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালে ডারুইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের ক্রমবিকাশবাদ শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মের বহু বিশ্বাস এই ক্রমবিকাশের আক্রমণে ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ধর্ম ও ক্রমবিকাশবাদের সম্বন্ধ প্রখর যুক্তিসহ পাশ্চাত্ত্যজগৎকে শুনাইয়াছিলেন। ক্রমবিকাশ প্রকৃতির (Nature), আত্মার নয়। আত্মা নিত্যপূর্ণ। প্রকৃতির আবরণ যত সরিয়া যায় আত্মসত্য তত উন্মোচিত হইতে থাকে। অতএব বিশ্বপ্রকৃতির ক্রমবিকাশরীতি আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ স্বামীজীর চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করিতেছেন—

"বংশানুক্রম (Heredity) ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) নিয়মানুযায়ী মানুষ যে আপনা হইতেই ক্রমবিকশিত হইয়া উঠে তাহা নয়। মানুষের ক্রমবিকাশ তাহার সজ্ঞান চেষ্টার সহিত জড়িত। বিশ্ব-জীবনের প্রবাহ নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সে বাড়িয়া চলে। এমনি ভাবে তাহার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি বাস্তব হইয়া উঠে। এই দেহেই পূর্ণতার স্পর্শে সে যেন নূতন জন্ম লাভ করে।"

পরিশেষে ভবিষ্যতের ধর্ম সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিসও (যাহা স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে এবং বিদেশে বার বার তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ উল্লেখ করিয়াছেন। উহা এই যে, ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। বোধ করি সময়াভাবেই এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা তিনি করিতে পারেন নাই। করিলে ভাল হইত।

মুগ্ধতা

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর সাম্প্রতিক রাশিয়া-ভ্রমণ সমগ্র বিশ্বে শুধু কৌতূহল নয়, বিস্ময় ও মুগ্ধ শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে। এই মুগ্ধতা নেহরুজীর প্রতি নয়, নেহরুর মধ্য দিয়া মানবাত্মার অমর মহিমার ঘোষক, নির্বৈর, সর্বভূতহিতরত ভারতবর্ষের যতখানি দেখা যাইতেছে তাহারই প্রতি। রাজনীতিকেই চরমমূল্য দানে অভ্যস্ত পাশ্চাত্ত্য, আজ

মনুষ্যত্বের মূল্য ভুলিতে বসিয়াছে। চরিত্রে মিথ্যা, স্বার্থান্বেষণ, কপটতা ছাড়াও যে খাঁটি নেতা থাকিতে পারে নেহরুকে দেখিয়া আজ পাশ্চাত্ত্যের লোক তাহা বিশ্বাস করিতেছে। নেহরু ভারতত্যাগের পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছিলেন তাঁহার এই ভ্রমণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, মৈত্রীভাবের প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টিই উহার লক্ষ্য। রাশিয়া, পোলাণ্ড এবং যুগোশ্লাভিয়ায় তাঁহাকে রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা এবং জনগণ যেভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে এই লক্ষ্য যে আশাতীতরূপে সফল হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ভারতবর্ষ যখন অপর কোন জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন অতি ধীরে ধীরে, অজ্ঞাতসারে মানবমনে মায়া ধরাইয়া করে। ভারতের প্রভাব হঠাৎ-তাক্-লাগাইয়া-দেওয়া কিছু নয়। ইংরেজী ভাষায় শুধু Fascination (সম্মোহনী শক্তি) শব্দটি দ্বারাই এই প্রভাবের রীতি নির্ণয় করা যায়। ভারতীয় আদর্শে বাহিরে চাকচিক্য নাই, বাগাড়ম্বর নাই। তাই প্রথমে মানুষ উহাকে উপহাসই করে, অবজ্ঞা করে—কিন্তু একবার যদি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহাতে সে fascinated হয়, মজিয়া যায়। যাহারা মজে তাহারা কিন্তু মরে না, নব জীবন লাভ করে। ইংরেজ তাহার গণ্ডীবদ্ধ জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবার ভয়ে ভারতের কাছে নবজীবন লাভ করিতে চাহে নাই। চোখের সামনে উইলসন্, ম্যাক্সমূলার, হ্যাভেল প্রভৃতির দশা দেখিয়া সে ভারতের fascinationকে এড়াইয়া চলিত। আখেরে ইংরেজের লাভ হইয়াছিল, না ক্ষতি?

রাশিয়া প্রমুখ পূর্ব ইয়োরোপের দেশসমূহ নেহরুজীকে ভালবাসিয়াছে—নেহরুর মধ্য দিয়া ভারত-দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া উহাকে সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই হৃদয়-সংযোগের প্রভাব অতি দূর-প্রসারী।

সাধুর যাদু

সাধুসন্ন্যাসীর 'ভেষ' (ছদ্মবেশ) লইয়া জনগণকে যে প্রতারণা করা যায়, ইহা ভারতবর্ষে নূতন কথা কিছু নয়। স্বয়ং জননী সীতাদেবী স্বামী এবং দেবরের বহুতর সতর্কীকরণ সত্ত্বেও এই প্রতারণা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন নাই। এবং তাঁহার মুহূর্তের দৃষ্টি-বিভ্রমের ফলেই বুড়া বাল্মীকিকে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শেষের চারটি কাণ্ড লিখিতে হইয়াছিল। সীতাদেবীর সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্য যেমন ভারতীয় নারীগণের সর্বকালের আকাঙ্ক্ষণীয় আদর্শ, জননীর ভুলটুকুও বোধ করি তাঁহার উত্তরকালীন কন্যাদের জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে! গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে, ১৯৫৫) নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু একটি মহিলা-সভায় সাধুবেশী প্রবঞ্চকগণ হইতে সতর্কতার কথা বলিয়াছিলেন।

"এই সকল সাধু তাহাদের গৈরিক বসনের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করে, কিন্তু এই পোষাক পরিলেও তাহারা প্রকৃত সাধু নহে। জনগণকে প্রতারণা করিবার জন্য সাধুবেশে এইরূপ লোক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমি চাই জনগণ যেন তাহাদের বিশ্বাস না করে।"

কিন্তু সাধুকে বিশ্বাস করিয়া প্রবঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য শুধু নারীদেরই নয়, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বৈষয়িক সর্বকর্মে কৃতিত্বমান পুরুষ—পুরুষব্যাঘ্র-গণেরও বটে। নহিলে আজ অলিতে গলিতে এত ভুঁইফোঁড় 'বাবা', 'মা', 'অবতার'গণের আবির্ভাব ও প্রচারডিণ্ডিম কেন? তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে কে? তাঁহাদিগের ধর্মপণ্যের ক্রেতা কাহারা? সাধুর যাদু বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় মনীষাকেও স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। সাধুর পায়ে তাঁহারা লুটাইয়া পড়েন মাদুলীর জন্য, ভস্মের জন্য, নির্মাল্যের জন্য, উদ্দেশ্য—মোকদ্দমা জয়, পুত্রলাভ, ব্যাধি-আরোগ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধুবেশীদের নীতি-বিগর্হিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ চাল-চলন তাঁহাদের চোখে ঠেকে না।

ঠেকিলেও তাঁহারা সহিয়া যান। আবার সাধু এবং সাধুভক্ত ছাড়া তৃতীয় পক্ষের মধ্যে যাঁহাদের চোখে ঠেকে তাঁহারা বড়জোর দুটি একটি চুটকী ব্যঙ্গ গল্প লিখিয়া এই সামাজিক প্রবঞ্চনার প্রতিবাদ করেন।

ধর্মের ব্যবসা হালকা সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়। প্রখর বিচার, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, নির্ভীক নৈতিক জনমত-গঠন—এইগুলিই আশু প্রয়োজনীয়—বিশেষতঃ আজিকার মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গলায়। তবেই সাধুবেশী রাবণরা জব্দ হইবে এবং গৈরিক থাকুক বা না থাকুক প্রকৃত সাধুকে চিনিয়া লইতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

ভবিতব্য

গত ১২ই ও ১৩ই আষাঢ় (২৭শে ও ২৮শে জুন, ১৯৫৫) কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার উপস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, বিহার ও উড়িষ্যা এই ছয়টি রাজ্যের পুনর্বাসন সচিবদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রী সি এন্ চন্দ্র (কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী) তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন—

"গোদাবরী নদীর ধারে হায়দারাবাদ রাজ্যে বেশ চমৎকার আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে এক প্রস্তে ৫ হাজার একর চাষযোগ্য জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেখানে ৭।৮ শত বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে। তাহা ছাড়া, আরও দুই হাজার পরিবারকে ছোটনাগপুরে বাসস্থান দেওয়া যাইতে পারে। উত্তর অন্ধ্র ও দক্ষিণ উড়িষ্যায় আরাকু উপত্যকায় পঞ্চাশ বর্গমাইল স্থানে বহু উদ্বাস্তু কৃষিজীবী-পরিবার বসবাস করিতে পারিবে। মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে উদ্বাস্তুদের বসবাসের উপযোগী স্থান সংগ্রহের জন্য সরকার সচেষ্ট আছেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই আষাঢ়, মঙ্গলবার)

এই সংবাদ অনেকেরই নিকট সুখাবহ সন্দেহ নাই। যাহারা গৃহহারা, সহায়সম্বলহারা তাহারা আশ্বস্ত হইবে, কেননা পুত্রকলত্র লইয়া মাথা গুঁজিবার একটু স্থান তো মিলিবে, ক্ষুধার দুমুঠা অন্নের সংস্থান তো হইবে—নাই বা রহিলাম বাঙ্গলামায়ের স্নেহাঞ্চল ধরিয়া। আগে জীবন-রক্ষা, আশ্রয়—পরে হৃদয়াবেগ, সংস্কৃতি, জাতীয়তা! যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা শত-সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সমস্যাটির এই ধরনের একটি সমাধান ছকিতে পারিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক অধিবাসিগণের অনেকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন, কেননা ঢাকা, মৈমনসিং, বরিশাল, নোয়াখালি হইতে দলে দলে 'বাঙ্গাল'দের তাঁহাদের ঘরের পাশে বসবাস করাটাকে তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন অপর কয়েকটি রাজ্য বিশেষতঃ বিহারের মুখে হাসি ফুটিবে, কারণ উদ্বাস্তুদের যদি বাঙ্গলার বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের সীমা সম্প্রসারণের যুক্তি দুর্বল হইয়া যাইবে। অতএব সাম্প্রতিক সম্মেলনটি বহুজনের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছে।

কিন্তু শ্রী সি, এন, চন্দ্রের পরিবেশিত সংবাদে সকলে হাসিতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও চোখে গভীর বেদনার অশ্রু দেখা দিয়াছে। এমনও লোক আছেন যাঁহাদের নিকট বাঙ্গলা মানে অখণ্ড বাঙ্গলা, বাঙ্গালী মানে পূর্ব-পশ্চিম-ভেদরহিত এক অবিভাজ্য জাতি। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী ভ্রাতা-ভগ্নীর দূর দূরান্তরে এইভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন নিজদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদনেরই ন্যায় কষ্টদায়ক। এই বিচ্ছিন্নতা বাঙ্গালীজাতির সামগ্রিকতাকে, তাহার সাংস্কৃতিক বলিষ্ঠতাকে ব্যাহত করিবে সন্দেহ নাই।

শক্তিভিক্ষা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জয় জয় পরমেশ।
যেন—তোমার স্মরণে না রয় এ মনে
ধূলিমালিন্যলেশ।
তোমা পানে সদা সুপথে চলিতে শক্তি দাও,
সতত অনৃতে চরণে দলিতে শক্তি দাও,
সত্য যা কিছু জানিতে বলিতে শক্তি দাও
মন হতে প্রভু ঘুচাও দ্বন্দ্ব দ্বেষ॥

জয় জয় পরমেশ।
সুদিনে কুদিনে তোমারে পূজিতে শক্তি দাও,
পরম ইষ্ট খুঁজিতে বুঝিতে শক্তি দাও,
জীবন-সমরে সতত যুঝিতে শক্তি দাও
চীর-বেশ মোর হয় যেন বীর-বেশ॥

জয় জয় পরমেশ।
তব দান বলি দুঃখ সহিতে শক্তি দাও,
সকল ভ্রান্তি কলুষ দহিতে শক্তি দাও,
দেশে দেশে তব পতাকা বহিতে শক্তি দাও
সব দেশ যেন হয় মোর নিজ দেশ॥

জয় জয় পরমেশ।
পরের দুঃখ-ব্যথায় কাঁদিতে শক্তি দাও,
সবারে মৈত্রী-বাঁধনে বাঁধিতে শক্তি দাও,
আমরণ তব ব্রতটি সাধিতে শক্তি দাও
তোমা হতে শুরু তোমাতেই হোক শেষ॥
জয় জয় পরমেশ।

সাধুসঙ্গ ও শরণাগতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

আমরা শুধু এ সংসারে ভোগের দিকটাই দেখি। ভোগ ছাড়া যে আর একটা দিক আছে সেটা বড় কেউ দেখে না। এই ভোগের বাসনা আর সব ভুলিয়ে দেয়। ঠাকুর বলতেন, মানুষ সে যে মান-হুঁস। আমাদের হুঁস খালি বিষয় নিয়ে, বাকীটা বেহুঁস; কিন্তু হুঁসতো দুটোতেই রাখতে হবে। তাঁকে পাওয়াই তো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁর জন্যে আমরা কি ত্যাগ করেছি? কতটুকু দিয়েছি তাঁকে? তিনি তো বার বার এসে ডেকে যাচ্ছেন, আমরা কি তাঁকে ফিরিয়ে দিই নি? সংস্কার বড় সাংঘাতিক জিনিস। কত এর প্রভাব আমাদের জীবনে! গীতা এই কথাই বলেছেন যে, প্রকৃতিই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় কামনা বাসনার মধ্যে।

কাজেই আমরা যে মান-হুঁস আমাদের এই হুঁসটি হওয়া দরকার। যেন আমরা সংস্কারের দাস না হয়ে তাঁর দাস হই, তাঁকে চাই। আর এই হুঁসটির জন্য দরকার সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ মস্ত বড় জিনিস, ঈশ্বরলাভের পথে পরম সহায়। ঠাকুরের কাছে সব বড় বড় লোক কেন আসতেন? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ভক্ত নেতা কেশব সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এঁরা কেন যেতেন ঐ মুর্খ বামুনের কাছে? বই পড়ে, শাস্ত্রালোচনা করে যা তাঁরা পাননি তাই পেতেন ঠাকুরের পূত সান্নিধ্যে এসে বসলে। ডাঃ সরকারের সঙ্গে থাকতো—যে সব রোগীদের দেখতে যেতে হবে তাদের দীর্ঘ এক তালিকা। কত জায়গায় যেতে হবে, কিন্তু ঠাকুরের কাছে এলে আর তাঁর নড়তে ইচ্ছা করত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। শেষে বলতেন ঠাকুরকে, "এই দেখ তুমি, আমার লিষ্ট। রোগী দেখব বলে বেরিয়েছি আর তুমি আমার সব নষ্ট করলে।"

এই সাধুসঙ্গ দুর্লভ। সাধুসঙ্গই মানুষের হুঁস এনে দেয়। যাঁরা ঠাকুরের কাছে আসতেন তাঁদের কেউ কেউ বড় সাধক, তবুও আসতেন একটা নূতন কিছু পাবেন বলে। তাঁর কথা শুনে, তাঁকে দর্শন করে, সত্যি তাঁরা নূতন ভাব পেতেন। ঠাকুর বলতেন সাধুসঙ্গ মানে 'ঘড়ি' মেলানো, অর্থাৎ সংসারের দিকে ঘড়ি কতটা 'ফাষ্ট' যাচ্ছে আর ঈশ্বরের দিকে কতটা 'স্লো' চলছে সাধুর কাছে গিয়ে সেইটাই দেখা। সেইটাই 'রেগুলেট' করতে হয়।

মনটা তো আমাদের ঠিক ভাবে বাঁধা নেই। মন যেন একটি অলঙ্কার। সেটিকে বন্ধক দিয়েছি স্ত্রীপুত্র সংসারের কাছে। ঠাকুরের কাছে গেলে সে বন্ধক ছুটিয়ে আনবার উপায় জানা যেত। অদ্ভুত তন্ময়তা আসত, ঈশ্বরের পথে মনকে ছুটিয়ে আনা তাই সহজ হয়ে যেত সকলের।

গীতায় কর্মযোগের কথা আছে। শুধু কর্ম নয়, যোগযুক্ত কর্ম। অর্জুন যোগ রেখে কর্ম করতে চান নি প্রথমে। হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি যুদ্ধ-কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁকে শেখালেন কর্ম করতে অনাসক্ত হয়ে। ভগবান অর্জুনকে প্রবৃত্তি ও অনাসক্তি দুটোই শেখালেন। আমরা কি করি? আমরা কেবল প্রথমটাই নিয়েছি।

* গত ২৭।৩।৫৫ তারিখে কুমিল্লায় বক্তার ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীসুধা সেন, এম্-এ কর্তৃক অনুলিখিত।

প্রবৃত্তি আমাদের 'বলাদিব নিয়োজিতঃ' (গীতা, ৩।৩৬) করে রেখেছে। ঘাড় ধরে জোর করে বাসনা-কামনাযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করছে। আমরা আসক্ত হয়েই পড়েছি, অনাসক্ত হতে শিখিনি। সারাজীবন কেবল ইন্দ্রিয়ের দাসত্বই করে চলেছি, ধর্মকে রেখেছি বুড়ো বয়সের জন্যে। ধর্ম কি কেবল বুড়ো বয়সের জিনিস? বাল্যকাল থেকেই ধর্মকে ঠিক রেখে চলতে হয়। যিনি আমার শুভবুদ্ধি, কল্যাণবুদ্ধি রূপে ভিতরে আছেন তাঁকে কেবল বাহিরে এনে চুবিয়ে চুবিয়ে নির্জীব করে দিচ্ছি। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

গীতায় ভগবান বলেছেন 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' (গীতা-৯।৩৩)। আমার আরাধনা কর, কারণ সংসার অনিত্য, অসার। তাই হে অর্জুন, সারাৎসার আমাকে ভজনা কর। এই যে সংসারে অনিত্যতাবোধ ও তাঁকে নিত্যজ্ঞানে ধরা এইটি সাধুসঙ্গ থেকে হয়। ঠাকুরের কাছে তো কত লোক যেতেন কিন্তু কেউ কেউ রাসমণির বাগান ও বাড়ি প্রভৃতি দেখেই চলে যেতেন। সঙ্গীদের যদি ঠাকুরের কাছে দেরি হত তো ওঁরা নৌকায় গিয়ে বসতেন। কী সংস্কার! সাধুসঙ্গে এই সব অশুভ সংস্কার দূর হয়ে যায়। ছোট বেলা থেকেই শুভ সংস্কার দ্বারা চালিত হতে শিখতে হয়। আমরা বিষয়ে যুক্ত হওয়াটা খুব শিখেছি। বিযুক্ত হওয়াটাও শেখা দরকার। যাঁর সত্তায় আমরা সত্তাবান্ তাঁকেই ধরতে শিক্ষা করতে হয়। পাহাড়ে উঠতে গেলে আশ্রয়দণ্ড চাই। উঠে গেলে আর দণ্ডের দরকার হয় না। আমাদের ঠিক তেমনি কর্মকে কেবল দণ্ডস্বরূপ আশ্রয় করে চলতে হয়। যোগ রেখে চলতে হয়। এর জন্যে প্রতিদিন কঠোর অভ্যাস দরকার। নতুবা ইন্দ্রিয়গুলি কোথায় আমাদের নিয়ে যায়!

উপনিষদ্ বলেন—দেহ রথ, বুদ্ধি সারথি, লাগাম হল মন, ইন্দ্রিয় ঘোড়া, ভিতরে রথী হলেন 'তিনি'। ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়াগুলো বাহিরের নানা আহার্য গ্রহণ করে করে এমন পুষ্ট হয়েছে, এমন বলবান্ হয়েছে যে লাগাম ছিঁড়ে সারথিকে ফেলে উন্মত্ত বেগে ছুটছে। মন কিছুতে রাশ টানতে পারছে না, বুদ্ধিও বিপর্যস্ত!

গীতা এ বিষয়ে কী গভীর শিক্ষা দিচ্ছেন!—

'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥
(৩।৩৪)

সকল ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ঐ সকলের বশীভূত হয়ো না। তারা জীবের শত্রু অথবা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক।

ভগবান নিজে বলেছেন ইন্দ্রিয়গুলোর বশীভূত হয়ো না। কিন্তু সে সংযম আমাদের নেই। আমরা লাগাম ছেড়ে দিয়েছি, তাই ইন্দ্রিয়গুলো এত বলবান্।

'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (গীতা ২।৬১)। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ কর; আমাতে যোগযুক্ত হও।

পশ্চাতে যদি তিনি না থাকেন, ভিতরে যদি চৈতন্য না থাকে, তবে রথ চলছে কি করে? ভিতরে ঢুকতে হবে। ধর্ম অর্থ ভিতরে ঢোকা, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সবাইকে মোড় ফিরিয়ে নিয়ে অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। আমরা কেবলই বাইরে ঘুরছি। আমাদের লক্ষ্যের ঠিক নেই, মনকে সংসার থেকে গুটিয়ে নিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে দিতে হবে।

এত যে ভোগ করা হ'ল, সে কি ভোগ না দুর্ভোগ? কত পুরুষকার, কত চেষ্টা যে ভোগের পেছনে ব্যয় করা হয়, কিন্তু কি পাওয়া যায়? মন ইন্দ্রিয়ের রাজা, অথচ মনকে গোলাম করে রাখে মানুষ। অন্তর্মুখ মনই তো সাত্ত্বিক মন, বহির্মুখ মন রাজসিক। বহির্মুখীন বৃত্তিকে ছেড়ে মনকে অন্তর্মুখ করতে হবে। অবিদ্যাশক্তি বাইরে

টানে আর বিদ্যাশক্তি টানে ভিতরে। অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য সাধনা চাই। কিন্তু বহির্মুখী বৃত্তি বা বিষয় ভোগের জন্যে এই সাধনার দরকার হয় না।

মানুষের আসল আনন্দ বাহিরে নয় ভিতরে। ঐ যে কেশব বাবু মাঝে মাঝে সংসার থেকে পালিয়ে আসতেন বেলঘরের বাগানে—কেন? সংসার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে চাইতেন আনন্দ লাভের জন্যে। ঠাকুর বলতেন, যে ঘরে বিকারের রোগী সেই ঘরেই আচার আর জলের জালা,—রোগ সারে কখনও? সেখান থেকে রোগীকে সরাও, নির্জনে নিয়ে যাও, তবে তো রোগ সারবে।

প্রথম দর্শনেই ঠাকুর কেশববাবুকে বলেছিলেন—কেবল এঁরই ফাৎনা নড়ছে—মাছে টোপ খেয়েছে। আর বলেছিলেন—ব্যাঙাচির লেজ খসেছে; জলেও থাকতে পারে ডাঙ্গায়ও। এই যে ল্যাজ খসা—অনাসক্ত হয়ে থাকা, এর জন্যে সাধন চাই। আমাদের যতকিছু সাধন, উদ্যম, পুরুষকার সবই আমরা সংসারেই ঢেলে দিচ্ছি!

সাধুসঙ্গ এক, আর গান এক—এই দুটোতে মন একেবারে তন্ময় হয়ে যায়, একাগ্র হয়। সাধু-সঙ্গ না ঘটলে সৎগ্রন্থ পাঠ করতে হয়। গানেও গভীর তন্ময়তা আসে। ভগবান বলেছেন—

'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

হে নারদ, আমার ভক্ত যেখানে আমার নাম গান করেন আমি সেখানেই থাকি। বাস্তবিক গানে ডুবে যাওয়া যায়। পাণ্ডিত্যে তা হয় না। একটা গল্প আছে, একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ষড়দর্শনে তাঁর অধিকার হয়েছে—অথচ তিনি কিছুতেই প্রকৃত শান্তি পাচ্ছেন না। শান্তির আশায় নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে করতে তিনি এক সাধুর কাছে উপস্থিত হলেন। সাধু তাঁকে আশ্রয় দিলেন। সাধুর আশ্রমে পুকুর আছে। সাধু সেই পণ্ডিতকে স্নান করতে পাঠালেন। পণ্ডিত স্নান করছেন, এমন সময় পুকুরে একটি মাছ ভেসে উঠল, মাছ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করল,—আমার ভীষণ পিপাসা কেমন করে মিটাই? পণ্ডিত অবাক্; ভাবলেন—জলে থাকে, অথচ পিপাসা, আবার মাছ হয়ে কথাও বলে! একি আশ্চর্য ব্যাপার! যাক, একটু হুঁস্ হতেই বল্লেন—তুমি মুখ দিয়ে জল নাও আর কান দিয়ে ফেলে দাও, তাই তোমার পিপাসা মিটে না, এইবার উল্টে যাও, তাহলেই ঠিক হবে, পিপাসা মিটবে। মাছ বললে—'এই তোমার উপদেশ'। বলে চলে গেল।

পণ্ডিত তখনই উঠে গিয়ে সাধুকে সব কথা বল্লেন। সাধুও বল্লেন—'ঠিকই তাই।'

পণ্ডিত বহু পড়েছেন, এত শুনেছেন—কিন্তু সবই কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ঠাকুর বলতেন গরুর কথা। খেয়ে দেয়ে জাবর কাটছে, জাবর কাটা চাই। নইলে কিছুই হয় না।

আর চাই আত্মসমর্পণ। নান্যঃ পন্থাঃ—তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়—পা দুটো জড়িয়ে ধরে। তাঁকে ধরতে হয় যিনি জগৎ ধরে আছেন। আমাদের চেয়ে তিনি অনেক বেশী করেন। আমরাই তাঁকে আবরণ দিয়ে জঞ্জাল চাপা দিয়ে রাখি, আবর্জনায় ঢেকে রাখি। একদিন একজন এসে বলেন—'খোঁড়, জঞ্জাল সরাও, ভিতরে মোহরের ঘড়া আছে।' আমরা তা জানি না, যখন কেউ সে খবর দেয় তখন দেখি অসম্ভব আবর্জনা, সরানো কত কঠিন! তখনই শরণ নিতে হয়।

গীতা বলেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' (৭।১৪) হে অর্জুন, আমার মায়া বড় দুস্তর। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'—যারা আমার শরণাগত হয়—'মায়ামেতাং তরন্তি তে' তারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।

সংসারে জাঁতা ঘুরছে, সকলে তাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কীলকটির সঙ্গে যে থাকে সেই কেবল অক্ষত রয়ে যাচ্ছে। কীলের আশ্রয়